Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলতীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৮৪৯ - ৫০ শক ২

৬৩ ভাগ। ৩২।৩৩ সংখ্যা।
১লা ও ১৬ই পৌষ, ১৩৩৪ সাল, ১৮৪৯ শক, ৯৮ ব্রাহ্মাব্দ।
16th Dec. & 1st Jan. 1927-28.
বার্ষিক অগ্রিম ৩৲।

প্রার্থনা।

হে দয়াময়! আমাদের কাছে হরিনামের মহিমা তুমি আরো প্রকাশ কর। দিবসের প্রথমে হরি, শেষে হরি, জীবনের প্রথমে হরি, শেষে হরি, সব কাজের প্রথমে হরি, শেষে হরি। এইরূপে সমুদায় কাজ হরি বন্ধনে বাঁধ। হরি ছাড়া খাব না, শোব না, কোন কাজ করিব না। হে জগন্নাথ! অনেক দিকে দৃষ্টি রাখিলে কেমন করিয়া তোমায় পাইব? বৃদ্ধ বয়সে যেন পাঁচদিকে দৃষ্টি না যায়। এখন আমাদের দৃষ্টি যেন একদিকেই স্থির থাকে। পরমেশ্বর, আর কেন আমাদের জীবন চারিদিকে বিভক্ত হয়? বৃদ্ধের একমাত্র সম্বল হরি। বৃদ্ধের বর্ণমালা কেবল হরিমালা। বৃদ্ধের জমিদারী কেবল হরির কাগজ পত্র। বৃদ্ধের খাওয়া দাওয়া কেবল হরি অন্ন, হরি রস। যদি এই হরিজীবন কাহারও দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহাকে বলি ভক্ত। জগদীশ্বর, আমাদের যৌবন, বৃদ্ধাবস্থা সব হরিতে। প্রাতঃকাল, সায়ংকাল সব হরিতে। হরিগত প্রাণ হউক। চক্ষে রাখ হরি, বক্ষে রাখ হরি। মাথায় রাখ হরি, কর্ণে রাখ হরি। হরি নামামৃত মুখে ঢালিয়া দাও। খানিকটা হরিকে মাথার মুকুট করিয়া দাও, খানিকটা কণ্ঠের হার করিয়া দাও। তাহলে বলিব হরি আমার অঙ্গের ভূষণ; "জগচ্চন্দ্র হার পরেছি, ভূষণ বাকি কি আছে রে" কাজ কর্ম্ম কি ছাড়িয়া দিব? না। সকলেতে হরি মাখিয়ে নেব। কেবল পুঁথিতে শাস্ত্রে হরি থাকিলে হইবে না। শেষে জমাট হরি। জীবনে হরি-নাম রস ছড়াছড়ি করিতে হইবে। নাম সার জীবন ভূমিতে ছড়াইতে হয়। ধন খরচ করিতে হয়। ভাই হাতে রহিল না, হরি বুদ্ধিতে বদ্ধ থাকিল না, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আহা কি মিষ্ট নাম! এ নাম রসে গোলা, অমৃতে গোলা, সুধায় গোলা। সেই রস, নিত্যনিরঞ্জন, দয়া করে আমাদিগকে দাও। ঘরময়, বাড়ীময় হরি ছড়াছড়ি। দয়াল হরি, তোমার কাছে আর কি প্রত্যাশা করিব? সব হরিনামের রাঙ্গা রঙ্গে লাল করিয়া দাও। আর কিছু অপবিত্র থাকিবে না। দয়াময় পরমেশ্বর, সংসারটাকে হরিতে মাখামাখি কর। আকাশময়, শরীরময়, বিশ্বময় হরি। হরি, দয়া করে নামে ভক্তি দাও, নামে মুক্তি দাও। হরি বলে খাই, হরি বলে শুই, হরি বলে বেড়াই, হরি বলে জীবন ধরি, হরি বলে প্রাণত্যাগ করি। হরিনামের ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখ। হে পাপ হরণ, যদি এজন্য তোমার নাম হরি হয়ে থাকে, তবে মনের পাপ তাপ হর। হে হরি! হর অন্ধকার, হর পাপাচার, হর বাসনা, হর কামনা, হর স্বার্থ; হরিয়া চিত্তবিষাদ, হৃদয়ে পুণ্যশান্তি দাও। হরি নামে সকল পাপ তাপ যাইবে, চক্ষে আনন্দ ধারা বহিবে। হে কৃপাময়ি, হে মঙ্গলময়ি, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন

হরি বর্ণে, হরিরূপে, হরিনামে ডুবিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি। তোমার চরণে এই প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আচার্য্য—কেশবচন্দ্র।

—০—

ভারতে সাধনার দ্বিধারা।

ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্তরে ভীমকায় হিমাচল ভারতীয় আত্মার অটল অচল যোগভাবের প্রতিমূর্ত্তি। আর ঐ গিরিকন্যা খরস্রোতপ্রবাহিনী পুণ্য তোয়া কূলনাদিনী গঙ্গা আর্য্য হৃদয়বাসিনী তরঙ্গময়ী সুন্ধা ভক্তির দিব্য প্রতিকৃতি। ভারতীয় আত্মার উচ্চ যোগের গুরু ঐ হিমালয়। প্রাচীন ভারতের ঋষি আত্মাগণ কত যুগ যুগান্তরের সাধনায় উজ্জ্বল ব্রহ্মদর্শন, গভীর ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ সুধাপানের উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। আর্য্য ঋষিগণের নিকটে ব্রহ্ম যেমন বিরাট তেমনই মধুর, অমৃতময়। তাঁহারা অন্তরে ভূমা মহানের কি গভীর আনন্দ কি শাশ্বত সুখ লাভ করিয়াছিলেন তাই তাঁহারা উচ্চস্বরে জগতের নিকট প্রচার করিলেন "ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি" ভূমা মহান্ যিনি তাহাতেই সুখ, অল্প বস্তুতে, ক্ষুদ্রেতে সুখ নাই, আনন্দ নাই। তাই তাঁহাদের দর্শনের ঈশ্বর, ধারণার ঈশ্বর, সম্ভোগের ঈশ্বর হইলেন "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"। তাঁহারা ডুবরি হইয়া তাঁহাদের তপস্যাক্ষেত্র কত নৈমিষারণ্যে কত নির্জ্জন গিরিগুহায় ব্রহ্মের অনন্ত অথচ মধুর, অমৃতময় প্রকাশ সাগরে ডুবিলেন, ডুবিয়া কত সত্যরত্ন কত তত্ত্ব রত্নই উদ্ধার করিলেন। তাঁহাদের এই সাধনার ফলে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা কতই সাত্ত্বিক ভাবে মণ্ডিত, কতই জ্ঞান, ভক্তি ও সৎকর্ম্মের আকর। তাই প্রাচীন ভারতের বেদ বেদান্ত পুরাণাদির ভিতর দিয়া, প্রাচীন ভারতের দর্শন বিজ্ঞান ব্রত বিনয়াদি মূলক বিচিত্র গ্রন্থ সকলের ভিতর দিয়া ভারতের প্রাচীন সভ্যতা বর্ত্তমানের শিক্ষা সভ্যতায় মণ্ডিত সমস্ত ইউরোপ ও আমেরিকার ধর্ম্ম পিপাসু নরনারীর নিকট কত আদরণীয়। ভারতের ঋষিগণ কত দীর্ঘ সাধনার পর ভূমা পরব্রহ্মের উজ্জ্বল সাক্ষাৎ দর্শন পাইলেন, আনন্দময় অমৃতময়রূপে তাঁহাকে প্রাণে আস্বাদন করিলেন ব্রহ্ম এত মধুর, এত সুখের, তাই ঋষিগণ তাঁহার সাযুজ্য, সালোক্য, সারূপ্য লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মানুষ চিরকালই অপূর্ণ, চিরকালই অল্পাধিক চঞ্চল, দুর্ব্বল, তাই মানুষ যতই সাধনশীল হউক না কেন, পৃথিবীর ঝড় তুফান বিপদ পরীক্ষা তাহার জীবনের শাখা পল্লব শুধু নয়, কিন্তু জীবনের গোড়া পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া তাহাকে ভীত করে, বিপন্ন করে চঞ্চলকরে। হিমালয় বন্ধু হইয়া ভারতের ঋষি আত্মাকে বলিলেন, দেখ আমি কেমন আমার স্বরূপাত্মক অনন্ত অণু পরমাণুমূলক শিলা সকলের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া দৃঢ় যোগেতে কি বিরাট আকার, কি অচল অটল রূপ ধারণ করিয়া স্থির ভাবে যুগ যুগান্তর ধরিয়া রহিয়াছি, কত ঝড় তুফান, শিলাবৃষ্টি আমার উপর দিয়া যাইতেছে আমার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, আমি সকল অবস্থায় ধীর স্থির অটল অচল, কেননা আমি যোগ প্রবণ। ঋষি আত্মাগণ হিমালয়ের নীরব বাণীতে উদ্বোদ্ধ হইয়া গিরিগুহা আশ্রয় করিলেন, ব্রহ্মস্বরূপে আপনার স্বরূপ মিলাইয়া ক্রমে ব্রহ্মেতে অটল যোগলাভ করিলেন, ভারতের ভবিষ্যৎ বংশের জন্য ও সমস্ত পৃথিবীর জন্য আপনাদের ব্রহ্মযোগের জীবনকে অতুলনীয় আদর্শরূপে রাখিয়া গেলেন।

উচ্চ হিমাচল শিখরেই গঙ্গার উৎপত্তি। তথায় ক্ষীণ ধারায় গঙ্গা লোকচক্ষুর গোচর হইলেন। সেই ক্ষীণ ধারা দেখিয়া কাহার মনে উদয় হইতে পারে এই গঙ্গা ক্রমে নিম্নভূমিতে আসিয়া আপনার এত প্রভাব বিস্তার করিবে প্রশস্তবক্ষে খর প্রবাহিনী স্রোতস্বতীরূপে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া, শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার গন্তব্য পথে ক্রমাগত সাগর পানে ছুটিবে, পরিণামে আপনার অস্তিত্ব অসীম সাগরে বিসর্জ্জন দিয়া আত্ম বিসর্জ্জনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে?— ভক্তিযোগে জীবের ব্রহ্মাভিমুখীন ঐকান্তিকী গতি, অনন্ত ব্রহ্মে জীবের আত্ম নিমজ্জন, আত্ম বিসর্জ্জন সকলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গঙ্গা।

মাতৃ স্বভাবা গঙ্গা বাহ্যভাবে জীবের কত কল্যাণ সাধন করিতেছে, কত ভাবে সেবা করিতেছে, কত গ্রাম নগরকে মহা সমৃদ্ধিতে পূর্ণ করিতেছে, কত কঠিন ভূমি রসাল করিতেছে, ফল শস্যেই পূর্ণ করিতেছে, কিন্তু গঙ্গার প্রকৃত মহত্ত্ব জীবের উচ্চ আত্মিক কল্যাণ সাধনে, বাহ্য ব্যাপারে নহে। বঙ্গ ও ভারতের নরনারীর নিকট গঙ্গা সত্য সত্যই স্বর্গের দেবী মূর্ত্তি। গঙ্গা দর্শনে কত নিদ্রিত প্রাণ ধর্ম্মভাবে জাগিয়া উঠিতেছে। গঙ্গা সুরবে নীরবে প্রতিদিন শত শত নরনারীকে পূজা বন্দনায়

আহ্বানতেছে। পূজা বন্দনায় প্রবৃত্তি দান করিতেছে, আপনি ভক্তির দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সকলের প্রাণে ভক্তিরসের সঞ্চার করিতেছে। তাইত গঙ্গায় অবগাহিত নরনারীর হৃদয় হইতে কত ব্যাকুল প্রার্থনা, কত স্তব স্তুতি প্রতিনিয়ত উত্থিত হইতেছে।

ধন্য হিমালয়! তুমি ভারতকে যে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্ম-ধ্যান, ব্রহ্ম-যোগের অধিকারী করিয়াছ, তাহার তুলনা পৃথিবীর আর অন্যত্র কোথায়? ধন্য গঙ্গা, তুমি বঙ্গ ও ভারতের অগণ্য অসংখ্য নরনারীর প্রাণে যে হরিভক্তি, মাতৃভক্তির উদ্দীপন করিতেছ সে ভক্তির তুলনা আর কোথায় মিলে?

এই গঙ্গা পুলিনেই প্রাচীন হিন্দু জাতির বিশিষ্ট তীর্থ কাশীধাম। এই গঙ্গা পুলিনেই ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার অনুগত ভক্তদলের ভক্তি সাধন ক্ষেত্র নবদ্বীপ। নবযুগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রমুখ শিক্ষা সভ্যতায় মণ্ডিত যুবকদলকে ভক্তি বন্যায় ভাসাইয়া হরি প্রেমে মাতাইয়া ভারতের বক্ষে ভক্তির নব উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত করিবার বিশিষ্ট ক্ষেত্র নববিধানের ভক্তিতীর্থ মুঙ্গেরও এই গঙ্গা পুলিনেই। এই গঙ্গা পুলিনেই নববিধানে ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও তাঁহার দলের যোগ ভক্তির উচ্চ সমন্বয় সাধনের স্থান মহানগরী কলিকাতা। নব-যুগে মহাযোগ মহাভক্তির উচ্চ সাধনে বঙ্গ, ভারত, সমস্ত পৃথিবী ধন্য হইল, ভারতে হিমালয় ও গঙ্গার অবস্থিতি নবভাবে সার্থক হইল। নবযুগে নববিধানে ভারতের যোগ ও ভক্তি সাধনের দুইটী ধারা সমন্বিত হইয়া হিমালয় ও গঙ্গার মহিমা গৌরব নবভাবে বর্দ্ধিত করিল।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

রোগ, শোক, জরা, বার্দ্ধক্যে প্রপীড়িত হইয়াও অনেক সময়েই লোকে মরিতে চায় না। এই যে বাঁচিয়া থাকার পিপাসা ইহার ভিতরে মোহ অন্ধতার আবরণ একটু থাকিতে পারে, কিন্তু মোহ অন্ধতা ভেদ করিলে দেখা যায়, এই পিপাসার মর্ম্ম স্থানে অনন্ত জীবনের অন্তঃ সলিলা ধারা প্রবাহিত। আত্মা অনন্ত জীবনের অধিকারী, সে কেন মরিতে চাহিবে? তাই মানুষ বুঝিয়া না বুঝিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়।

ঈশ্বর যাহাকে যে স্থানে স্থাপন করেন সে স্থান আপাততঃ কণ্টকময় হইলেও তাহাকে সেই স্থানেই থাকিতে হয়। এমন কি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবন্ধুগণেরও দোষ দুর্ব্বলতার দিক দেখিয়া মন বলিতে পারে এমন কণ্টকময় স্থানে থাকা হইবে না, থাকিলে ধর্ম্ম জীবন রক্ষা হইবে না। কিন্তু জীবনের ঈশ্বর যিনি, তিনি বলেন, তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিয়াছি আমি, তুমি অন্যের বিচার না করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া জীবনের কার্য্য করিয়া যাও। আমি এখানেই তোমাকে প্রেম,ভক্তি,দয়া,ক্ষমা, আনন্দ, শান্তিতে, সজ্জিত করিয়া তোমার জীবন স্বর্গের শোভা সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিব।

শ্রীকেশব ও শ্রীরামকৃষ্ণ।

কিছুদিন হইতে আমাদের ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও পরমহংস রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিতেছে তাহা পাঠ করিয়া আসিতেছি। বিরুদ্ধ সমালোচনা করা সহজ, কিন্তু সমালোচিত লোক হওয়া কঠিন। সাধু জিউমিসি (gewmicse) কহিয়াছেন "It is easy to criticise but difficult to become" সত্যই আমরা তাহা দেখিয়া আসিতেছি। একজন সাধু চলিয়া গেলে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ তাঁহাকে বড় করিবার জন্য অপর সাধু সম্বন্ধে অনেক কল্পিত কথা রচনা করিয়া তাঁহাকে ছোট করিবার চেষ্টা করেন। পাশ্চাত্য অপেক্ষা প্রাচ্যের হাওয়া আরও এইরূপ। কেশব ও পরমহংস উভয়ের যে সম্বন্ধ তাহা তাঁহারাই বুঝিয়াছিলেন। জহুরিই জহর চেনেন। তাঁহাদের উভয়ের পরিচয়ই এইরূপ ছিল। স্বর্ণকার যদি কষিত কাঞ্চনে গুণের ব্যত্যয় দেখিতে পান তাহা হইলে তাঁহার নিকট সে সোণার সে আদর থাকে না। পরমহংস মহাশয় যদি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ভিতর সেই রূপ কিছু দেখিতেন অথবা ব্রহ্মানন্দ যদি পরমহংসের ভিতর সেইরূপ দেখিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের ভিতর সে মণি কাঞ্চনের যোগ কতদিন থাকিতে পারিত। ফুলের ভিতর কীট প্রবেশ করিলে ফুল অচিরেই শুকাইয়া যায়। একজন একজনের ভিতর সেরূপ কিছু দেখিলে সে সম্বন্ধ কীট-দষ্ট ফুলের ন্যায় অচিরেই শুকাইয়া যাইত। ব্রহ্মানন্দ পরমহংস দেবের পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পরমহংস দেব কেশবের সে উচ্চ জীবন কোন দিন বিস্মৃত হন নাই। কেশব ও রামকৃষ্ণ যখন উভয়েই শরীরে বর্ত্তমান, তখন একদিন উভয়ের আলোচনার মধ্যে পরমহংসদেব ব্রহ্মানন্দকে বলিয়াছিলেন যে "আমি গাছের গুঁড়ি, আমি নিজেই ভাসিতেছি আর তুমি জাহাজ, তুমিও ভাসিতেছ এবং সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার লোককে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছ।" ব্রহ্মানন্দ কোন দিন নিজের উপর কোন স্থান দান করেন নাই, সুতরাং পরমহংস মহাশয়ের সে উক্তিতে বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহণের পর যখন তাঁহার অনুষঙ্গিক কোন কোন প্রেরিত পরমহংস মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়াছিলেন এবং সে সময়ে প্রেরিতদের মধ্যে যে অমিল

আসিয়াছিল, তাহা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে "তোমরা নিরাশ হইও না। একজন সাধু মহাজন চলিয়া গেলেই এইরূপ হইয়া থাকে। বড় জাহাজের কাছে অনেক নৌকা বাঁধা থাকে, জাহাজটা চলিয়া গেলে নৌকা গুলা টল মল করিতে থাকে।" তাই বলিতেছি কেশবের ভিতর যে মহত্ব ছিল তাহা পরমহংসদেব বুঝিয়াছিলেন আর পরমহংসের ভিতর যাহা ছিল তাহা কেশব বুঝিয়াছিলেন। যে লেখক অথবা যে গ্রন্থকার বিরুদ্ধ ভাব লিখিতে যাইতেছেন ইহাতে বেশই বুঝা যাইতেছে যে তিনি কেশবকেও বুঝেন নাই এবং পরমহংসকেও বুঝিতে পারেন নাই। পরমহংস মহাশয় "কেশবের কাতনা নড়েছে" বলিয়াছেন একথা কোন দিন সত্য হয় নাই ও কোন দিন সত্য হইবেনা। তাঁহার মুখ-বিনিসৃত "কেশবের কাতনা ডুবেছে" এই কথাই চিরদিন সত্য থাকিবে। বঙ্গের সুলেখক বঙ্কিম চন্দ্র তাঁহার লিখিত ধৰ্ম্ম-গ্রন্থে লিখিয়া গেলেন "এযুগে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ" আর তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর, পরবর্ত্তী প্রকাশক সে কথা গ্রন্থ হইতে উঠাইয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার "বোধদয়ে, লিখিয়া গেলেন "ঈশ্বর নিরাকার ও চৈতন্য-স্বরূপ" আর তাঁহার পরবর্ত্তী প্রকাশক গ্রন্থ হইতে সে কথা উঠাইয়া দিলেন। সত্য সত্য এদেশের হাওয়া কি ভয়ানক।

আজ এই অবসরে আর এক কথা বলিতে আসিলাম। পরমহংস মহাশয়ের কোন কোন ভক্ত বলিয়া থাকেন যে তাঁহার নিকট হইতে কেশবচন্দ্র ধৰ্ম্ম সমন্বয় বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। একথাও যার পর নাই অসত্য ও অমূলক। যখন কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন তাহার অব্যবহিত পরে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহার ধৰ্ম্ম সমন্বয় বিষয়ক "শ্লোক-সংগ্রহ" পুস্তক প্রকাশিত। তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা ও পুস্তক প্রকাশের অনেক পরে পরমহংসের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়। উদার চেতা পাঠকবর্গ দেখিতে থাকুন যে এদেশে শিষ্য প্রশিষ্যদের মধ্যে ভক্তকে উচু করিবার জন্য কিরূপ অযথা কথা প্রকাশিত হইয়া থাকে। যেদিন কেশবচন্দ্র গ্রন্থ ও গুরুবাদের সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া একাকী তাঁহার নির্জ্জন কুটীরে উপাসনায় বসিয়াছিলেন সেই দিন হইতেই তাঁহার ভিতরে ধৰ্ম্মের সেই সার্ব্বজনিক ও সর্ব্বভৌমিক ভাব নিভৃত জল স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছিল। আমি বিগত মে মাসে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির দেখিয়া আসিলাম আর প্রাঙ্গনের প্রবেশ দ্বারে "খৃষ্টীয়ান ও মুসলমান প্রবেশ নিষেধ" এই কথা পড়িয়া আসিলাম। দেখুন কোথাকার সত্য কোথায় চলিয়া যাইতেছে! যে কালী মন্দিরে পরমহংসদেব আজীবন সাধন ভজন করিলেন এবং যে মন্দিরের প্রাঙ্গনের দ্বারে উপরোক্ত নিষেধ বাক্য উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত সেই আশ্রমে ব্রহ্মানন্দ ধৰ্ম্ম-সমন্বয় শিক্ষা করিলেন এ সত্য পশ্চিমাকাশে সূর্য্যোদয়ের মত এক ভিত্তি বিহীন অদ্ভূত সত্য। যাঁহারা এ সত্য প্রচার করিতে চান তাঁহারা একবার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, তৎপ্রকাশিত "শ্লোক সংগ্রহ" এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ভিতরে ধৰ্ম্ম সমন্বয় এবং তদানুষঙ্গিক ঘটনার প্রকৃত ইতিহাস পাঠ করুন। কেশব ও রামকৃষ্ণ উভয়ের পরিচায়ক ইতিহাসের বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির খৃষ্টীয় বিধানের "ক্রশ" হিন্দু বিধানের "ত্রিশূল" এবং ইস্‌লাম্ বিধানের "অর্দ্ধচন্দ্রের" সমন্বয় সূচক উন্নত চূড়া লইয়া উত্থিত হইয়াছিলেন। আজ এ ইতিহাস কি অমানিশার অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে? সত্য সত্যকে প্রকাশ করিবেন।

মজঃফরপুর। সেবক—শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

শ্রীকেশবচন্দ্র সঙ্গে।

কমলকুটীরের এখন যেখানে উপরে উঠিবার সিঁড়ি হইয়াছে, তখন এখানে সিঁড়ি ছিল না। এইখানেই আমাদের ধৰ্ম্মতত্ত্ব শিক্ষার বিদ্যালয় হইত। শ্রীকেশবচন্দ্র দক্ষিণ মুখ করিয়া একটী চেয়ারে বসিতেন আর আমরা সম্মুখস্থ বেঞ্চেতে বসিতাম। প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া আমাদের বৈঠক হইত।

নববিধানের নব নব তত্ত্ব বিষয়ে আমাদিগকে উপদেশ ও পাঠ দিতেন সিষ্টর কুঁজোর দর্শন শাস্ত্র, হ্যামিলটনের দর্শন শাস্ত্র "একসিহমো" নামক পুস্তক ইত্যাদি পাঠ করিতেন তিনি উপদেশ দিতেন। একদিন একখানি বড় বাইবেল খুলিয়া তাহার ভিতর কতকগুলি ছবি দেখাইয়া দেখাইলেন মৃত শশ্মানে কতকগুলি কঙ্কাল পড়িয়াছিল, ক্রমে সুবাতাস বহিতে সে কঙ্কালগুলি মানুষের পঞ্জর আকারে পরিণত হইল তাহার পর সেগুলি মনুষ্য দেহে গ্রথিত হইয়া জীবন্ত মানবাকারে দণ্ডায়মান হইল। তিনি বলিলেন নববিধানও এইরূপ। পুরাতন ধৰ্ম্ম সকল মৃত কঙ্কালরূপে সংসার শশ্মানে পড়িয়াছিল বিধানের সুবাতাস বহিয়া তাহাদিগকে একদেহে গ্রথিত করিয়া পবিত্রাত্মার জীবন সঞ্চারণ প্রভাবে নবজীবন দিয়া জীবন্ত নববিধান আকার ধারণ করিয়াছে। তিনি যে কেবল উপদেশ দিতেন তাহা নহে আমাদিগকে সাধনেরও পন্থা দেখাইয়া সাধন শিক্ষা দিতেন। এখন কমল সরোবরের উত্তর ধারে যেখানে একটি সিমেণ্ট করা চাতাল আছে এখানে একটি কুটীরের মত ছিল। প্রাচীন ঋষিগণ যেমন কুটীর প্রাঙ্গনে বসিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেন তেমনি কয়েকবর্ষ আমাদিগকে এই চাতালটীর উপর বসাইয়া আপনি মধ্যস্থলে বসিয়া কেমন করিয়া ধ্যান যোগ করিতে হয় শিখাইয়া দিতেন।

একদিন তিনি বলিলেন ঐ মাথার উপর আকাশের দিকে তাকাও একটি নক্ষত্রের প্রতি লক্ষ্য কর মনকে ঐ নক্ষত্রের পদতলে রাখ ক্রমে মনকে খালি করিয়া চিন্তাশূন্য কর, যতক্ষণ পার চিন্তাশূন্য অবস্থায় থাক। মনকে চিন্তাশূন্য করা এক সেকেণ্ড দুই সেকেণ্ড করিয়া প্রতিদিন বাড়াইবে। এই মনকে চিন্তাশূন্য করা অভ্যাস হইলে চিন্তা শূন্য মনে ক্রমে ব্রহ্ম আসিয়া স্বরূপ দেখা দেবেন

আর একদিন বলিলেন গভীর অন্ধকারে বসিয়া নির্জ্জনে ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি কি এখানে আছ দেখা দাও ক্রমে দর্শন পাইবে ইত্যাদি এক এক দিন এক এক নূতন সাধন শিখাইতেন। এই কয়দিনের উপদেশের সার আমি ইংরাজিতে লিখিয়া তাঁহাকে দিয়াছিলাম তিনি নিউ ডেস্পেনসেন পত্রিকায় Advise to young men নাম দিয়া ছাপাইয়া দিয়াছিলেন।

অনুগৃহীত।

—•—

শ্রীনববিধানের বিজয় নিশান।

নববিধানাচার্য্য ভক্ত ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "হে নববিধানের বিজয় নিশান, তোমার মধ্যে অনেক বস্তু নিহিত আছে, তোমাকে যে স্পর্শ করে তাহার আর ইন্দ্রিয়শক্তি থাকে না, তাহাকে বৈরাগী হইতেই হইবে, যেখানে তোমার আবির্ভাব সেখানে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা। যে পরাজয় করে সেই বিজয় নিশান (নিশান অর্থে জয়)" আরও বলিলেন "নববিধানের প্রেরিতগণ, এই নিশান হস্তে ধারণ করিয়া তোমরা দেশ দেশান্তরে চলিয়া যাও, এই নিশানের বলে তোমরা বড় বড় বীরের কাছেও কুণ্ঠিত হইবে না। * * * তোমরা যেমন মাকে দেখিয়া, মার সঙ্গে কথা কহিয়া সুখী হইয়াছ, এইরূপ তোমাদের ভাই ভগ্নীদিগকেও নববিধানের সুধা পান করাইয়া সুখী কর।"

এই আশার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে অনন্ত অমর এই নববিধান ২।৫ জন লোকের কথায় কি নিষ্প্রভ হইবে? অথবা যাঁরা কতকগুলি যুক্তি তর্ক দেখাইয়া এই বিধানের মূল মূল সত্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন বা এ বিধানকে অস্বীকার করেন তাঁদের কথায় নববিধান বিশ্বাসিদল কি ভীত হইয়া সত্যের সংগ্রামে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবেন? এ বিধান প্রচারের জন্য বা নববিধান রক্ষার জন্য অধিকতরদায়ী কাহারা? প্রধানত দায়ী প্রেরিত প্রচারক ও সেবকদল। কারণ পবিত্রাত্মার প্রেরণায় এই স্বর্গের বিধানকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁরা আহুত হইয়াছেন। তাঁদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় এই নববিধান। এই বিধানকে বিজয়ী করিবার জন্য তাঁরা পবিত্র পরমেশ্বরের ও তাঁর মণ্ডলীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, "মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন," যেখানে বিধান খর্ব্ব হয়, যেখানে বিধানের অপমান হয়, যে অবস্থায় বিধানের উচ্চ আদর্শ বিপর্য্যয় হয়, সেখানে তাঁরা যাবেন না, সে সঙ্গ তাঁরা করিবেননা এই হচ্চে নববিধান প্রেরিত প্রচারক ও সেবকদিগের প্রধানতম কার্য্য। যদি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা ও আলোচনা করা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সত্যই আমরা অল্প বা অধিক পরিমাণে নববিধানকে খর্ব্ব করিয়া লোকানুরাগ ভাজন হইবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নববিধানের দেবতার ও মণ্ডলীর নিকট ঘোরতর অপরাধী হইতেছি।

এই নববিধান প্রচার ও নববিধান রক্ষায় জন্য দায়ী নববিধান বিশ্বাসী গৃহস্থ ও সাধকগণ। যেহেতু নববিধান যে এ যুগের পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্ম তাহা তাঁরা স্বীকার করিয়া নববিধানের উচ্চ আদর্শে নিজ নিজ পরিবার গঠন করিতে ঈশ্বর ও মণ্ডলীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু অনেক স্থানে তাহা হইতেছেনা, নববিধান-বিশ্বাসিগণ অনেক স্থলে সংসার সঙ্কটে পড়িয়া পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে তাঁহারা নববিধানের বিধি রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। এস্থলে তাঁরা মনগড়া প্রণালী ঠিক করেন এবং তাঁদের মনের মত আচার্য্য বা পুরোহিতও পাইয়া থাকেন সুতরাং কার্য্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হয় না। নববিধান ধর্ম্মকে এইরূপ বিপর্য্যস্ত দেখিয়াই নববিধান মণ্ডলী মধ্যে একটা আন্দোলন চলিতেছে।

সেদিন ব্রাহ্মসমাজের কোন প্রাচীন বক্তা বক্তৃতাকালে বলিলেন, "রাজা রামমোহন রায় এক ঈশ্বরকে স্রষ্টা পাতা ও পিতা বলিয়া তাঁর উপাসনার ব্যবস্থা মাত্র করিয়াছিলেন কিন্তু জীবনে তাহা সাধন করেন নাই। তারপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই এক ঈশ্বরের উপাসনা উপনিষদ্ গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া জীবনে সাধন করিলেন।

রাজা রামমোহনের যে ধর্ম্ম বীজাকারে ছিল তাহা মহর্ষির জীবনে প্রস্ফুটিত হইল, কিন্তু মহর্ষি স্বদেশীয় অর্থাৎ হিন্দু ভাবকেই প্রাধান্য দিলেন। তারপর শ্রীকেশবচন্দ্র আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে এক মহান সার্ব্বজনীন উদারধর্ম্মে পরিণত করিলেন, তাহাই হইল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ। রাজা রামমোহনের উদার ধর্ম্মের বীজ পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইল কেশবচন্দ্রের জীবনে। কেশবচন্দ্র সমস্ত ধর্ম্মের মূলে যে সত্য আছে, সেই ধর্ম্মের যে যে অনুষ্ঠান আছে তাহাকে আহ্বান করিয়া তাহার ভিতরের সারতত্ত্বগুলিকে গ্রহণ করিলেন। এই যে উদার সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ইহারই নাম নববিধান আমিও এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে নব বধান ব'ল।"

এ স্থলে সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় বিধাতার অখণ্ড নিয়মে যে ধর্ম্মবিধান সমস্ত সম্প্রদায়কে, সমস্ত মানবমণ্ডলীকে এক সর্ব্ব-জনীন প্রেমে আবদ্ধ করিতে আসিয়াছেন সেই ধর্ম্মবিধানকে অস্বীকার করিয়া আমরা পরিত্রাণ লাভ করিব কিরূপে? নববিধান জীবন্ত ঈশ্বরের বিধান, ইহার দর্শন শ্রবণ সম্পূর্ণ নূতন। ইহার বিজ্ঞান নূতন, ইহার সাধনা নূতন, অথচ ইহাই সমস্ত পুরাতন বিধানের পূর্ণতা। যাঁহারা এই বিধানকে বিশ্বাস করিয়া ইহার বিজয় নিশান হস্তে লইয়া এই মহাপ্রেম বিধানের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবেন তাঁহারাই ধন্য এবং কৃতার্থ হইবেন। আমরা প্রার্থনা করি মা নববিধান বিধায়িনী তাঁর এই বিশ্ববিজয়ী বিধানকে প্রতি জীবনে প্রতি পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধরায় স্বর্গরাজ্য স্থাপন করুন। এবং সকল প্রকারের অশান্তি দূর করিয়া দিন।

নিতান্ত অযোগ্য—

সেবক—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

তিন সমাজের মিলন।

(২য়)

গত ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে উপরোক্ত শীর্ষক নামে যে পত্র বাহির হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমার আরও যে নিবেদ্য আছে তাহাই আজ নিবেদন করিতে আসিলাম। আমার এই পঞ্চ সপ্তাত বর্ষে যে অভিজ্ঞতা, বুভুৎসা ও অনুসন্ধিৎসা প্রসূত আলোক আসিয়াছে তাহাই আমার নিবেদ্য। Church Integrity অর্থাৎ ধর্ম্ম মন্দিরের মৌলিক তত্ত্ব নিয়ামক যে সত্য চলিয়া আসিতেছে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই তাহা অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। খৃষ্টবাদীদিগের বিবিধ সম্প্রদায়ের ভিতরে ও সেই Integrity সংরক্ষিত হইতেছে। Roman Catholic বলি আর Protestant, Presbyterain, Trinitarian অথবা Unitarian বলি সকলেই খ্রীষ্টবাদী ও সকলেই বাইবেল অনুসরণ করিতেছেন, ইস্‌লামবাদীদিগের মধ্যেও সিয়া ও সুন্নীদিগের বিভক্ত ধর্ম্মমন্দিরে সেই হজরৎ মহম্মদ ও কোরাণের অনুসরণ চলিতেছে অথচ উভয় দলই স্ব স্ব ধর্ম্মমন্দিরে স্ব স্ব Integrity রক্ষা করিতেছেন। অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়েও বিভক্ত ধর্ম্ম মন্দিরে সেই ভাব চলিতেছে। আজ আবার বলিতেছি ব্রাহ্মসমাজের যে মন্দির হইতে "খৃষ্ট বিভীষিকা" শব্দ বাহির হইয়াছে সে সমাজ কোন্ মৌলিক সত্যের উপর দণ্ডায়মান তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। আবার যে সমাজের ধর্ম্ম মন্দির নববিধান এবং নববিধানাচার্য্যের সম্বন্ধে এক মহা প্রতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহারও Integrity সহজেই অনুমেয়। Integrity শব্দের অর্থ "Unimpaired state of things" অর্থাৎ এক অক্ষুণ্ণ ও অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা ও বিশেষত্ব। এরূপ স্বাতন্ত্র্য ও স্ব স্ব বিশেষত্ব সংরক্ষণ ভাব ও বিসদৃশ অবস্থায় তিন সমাজের প্রকৃত মিলন সম্ভব, বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে কি রাসায়নিক সংযোগ সম্ভব হইতে পারে? "Oil and vinegar do not mix together" তৈল এবং ভিনিগার উভয়ের মিশ্রণ কোনদিন সম্ভব হয় নাই ও কোনদিন হইবেনা। আমি ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে আমাদের অত্যন্ত স্নেহের কল্যাণীয় শ্রীমান্ নবজীবনের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ পত্র পাঠ করিলাম। শ্রীমানের এই আবেগ অকাঙ্ক্ষা আমাদের বরণীয়। তিনি তাঁহার নববিধানভক্ত পিতার সন্তান হইয়া শৈশব ও ছাত্র জীবন হইতে নববিধানের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও সমাজ সংক্রান্ত কার্য্যে অদম্য উদ্যম ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। তিনি আমাদের এই সমন্বয় ভাবাত্মক ধর্ম্মের ভিতর অপর বিভাগীয় ব্রাহ্মসমাজের মিলনের স্থান অন্বেষণ করিতেছেন। অবশ্যই আমাদের সমক্ষে ধর্ম্মে ধর্ম্মে মিলনের মহা Revelation আসিয়াছে। সমন্বয় সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। সমন্বয় বস্তু শব্দাত্মক বস্তু নহে। ইহা এক প্রাণ পূর্ণ জীবন্ত বস্তু সমন্বয়ের বিধানে এক মজ্জাগত সম্বন্ধ বর্ত্তমান। ইহার অর্থ Spiritual union ভাবের প্রবাহ একই দিকে না ছুটিলে মিলন অসম্ভব। পাঞ্জাবের পঞ্চনদ হিমালয়ের বিভিন্ন প্রস্রবণ হইতে বিনির্গত হইয়া একই দিকে একই লক্ষ্যে আসিয়া সিন্ধুনদে মিলিত হইয়াছে। এই লক্ষ্যগত মিলনই মিলন ও সমন্বয়। পঞ্চনদের পঞ্চস্রোত একই দিকে আসিয়া এক প্রকাণ্ড স্রোতে মিশিয়া গেল। তিন সমাজের এইরূপ মিলনকে মিলন বলি। ভিতরে লুক্কায়িত ব্যবধান থাকিলেও মিলন অসম্ভব।

তাহার পর বলিতে আসিলাম যে তিন সমাজের মিলন প্রশ্ন অত্যন্ত গভীর চিন্তা, সাধনা ও গবেষণা সাপেক্ষ। শ্রীমদ্‌ব্রহ্মানন্দ যখন তাঁহার পৈতৃক বাস-ভবনে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে গ্রন্থ, তন্ত্র, মন্ত্র ও গুরু বিহীন উপাসনায় জীবনের উষাকালে নিবিষ্ট হইতেন, তখনই তাঁহার ভিতরে সমন্বয়ের বীজ মন্ত্র প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার পর যখন শ্রীমদ্ মহর্ষি দেবের সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোপাসনায় যোগদান করিতেছিলেন তখন সেই স্রোতের ভিতরও তাঁহার জীবনে এক সার্ব্বভৌমিক স্রোত উদ্বেলিত হইয়াছিল। গঙ্গা যখন সহস্র ধারায় আসিয়া পড়িল, তখন আর ক্ষুদ্র প্রস্তর স্তূপ তাহার গতি রোধ করিতে পারিল না। ব্রহ্মানন্দের ভিতর যে সহস্র ধারা আসিয়া পড়িল তখন আর তাহা আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীরে আবদ্ধ থাকিতে পারিল না। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে সে প্রাচীরের ভিতর উদার নৈতিক, অনুদার নৈতিক উভয় স্রোতের সম্মিলন সম্ভব হইলনা। তাহার পর বক্তব্য যে মন্দিরের ভিত্তিমূলে ও প্রাচীরে প্রত্যেক ইষ্টক খণ্ডে প্রতিবাদের প্রস্তর রেখা পড়িয়া রহিয়াছে তাহার সঙ্গে উন্নত মিলন প্রতিকৃতি বিশিষ্ট মন্দিরের মিলন কোন্ স্থানে নিহিত জানিনা। নববিধান মন্দিরের প্রকৃতি-গত সত্য অন্যরূপ। ভূমধ্য সাগর যেমন সমুদায় সাগর স্রোতকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দণ্ডায়মান, নববিধান মন্দির ও সেইরূপ সার্ব্বসাময়িক ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বিধানের সমুদায় স্রোতকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দণ্ডায়মান। গঙ্গা শতমুখে সিন্ধুর সঙ্গে মিশিতেছেন। শতমুখী মিলনই তিন সমাজের তিন স্রোতকে এক অখণ্ড মিলনে মিলাইতে পারে।

তাহার পর আর এক প্রতিপাদ্য সমস্যা সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছে। মণ্ডলীগত মিলন মত গত অথবা শব্দগত নহে। এ মিলনের প্রকৃতি মজ্জাগত। উপাসনায় ভাব, চিন্তা, আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা সমুদায়ের মিলনে মণ্ডলীর মিল। সমাজ আর কিছু নহে। সমগ্র মণ্ডলী যখন যে ভাবে এক অখণ্ড ভাবের মধ্যে আত্মিক জন্ম লাভ করে তখনই সে মণ্ডলী সমাজ নাম ধারণ করে। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই এই। তিন সমাজের মিলনে কি মণ্ডলীর এ অবস্থা আসিবে? কাট গোলাপ ও সুগন্ধিযুক্ত গোলাপ এ পর্য্যন্ত মিলিল না।

তাহার পর বক্তব্য, এই মিলন কি আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের তিন

বিভাগের মিলনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। সকল ধর্ম্মই একই ব্রহ্মের নিকট হইতে আসিয়াছে। হিমালয়ের প্রচ্ছন্ন গিরিগুহাবাসী ঋষি কণ্ঠ হইতেই "ব্রহ্ম" নাম আসিয়াছে। যে আলোকের গভীর দর্শনে হিন্দু ঋষি তাঁহাকে "ব্রহ্ম" বলিলেন সেইআলোক দর্শনেই মহর্ষি ঈশা তাঁহাকে "Light of lights" এবং হজরৎ "নুর" ও "নসো" নামে ডাকিলেন। হিন্দু সাকারে আসিয়াও "ব্রহ্ম" ও "ব্রহ্মাণী" মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নাম মাহাত্মে পড়িয়া মানুষের নাম ও "ব্রহ্মব্রত" "ব্রহ্মদেব" ও তদনুরূপ নাম সংজ্ঞা আসিয়াছে। ইহারাও যখন ব্রহ্মোপাসক হইলেন তখন ইহাঁরাও বাহিরের পার্থক্য সত্বেও আমাদের মণ্ডলীগত ব্রাহ্ম। ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মণ একই ভাবাত্মক। এখন বেদীর প্রশ্ন আসিয়া পড়িল। তিন সমাজের মিলনে তিন সমাজের বেদীর মিলন স্বভাব সিদ্ধ। তিন সমাজের কি বেদীর বিনিময় সম্ভব হইবে? যদি তাহা সম্ভব হয় তাহা হইলে ব্রহ্মবাদী হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টীয়ানেরও বেদীর অধিকার আছে। ব্রহ্ম বিশ্বাসী মাত্রেই ব্রাহ্ম। মহর্ষি ঈশা ও মহর্ষি মহম্মদের মত কয়জন ব্রাহ্ম আসিয়াছেন? সকল ময়নাই এক সুরে গান করে। জানিনা কোথায় মিলন সম্ভব হইবে। ব্রাহ্ম সমাজের এখনও একদল বলিতেছেন নববিধান ভুলিয়া গিয়া মিলিত হও। সেদিন বোম্বাই প্রদেশে একজন ব্রাহ্ম কোন নববিধান বাদীকে বলিয়াছেন যে রাজা রামমোহন ব্যতীত আর কোন নেতাকে গ্রহণ করিতে পারেন না। জানিনা মিলন কোথায়?

মজঃফরপুর। সেবক—শ্রীগৌরপ্রসাদ মজুমদার।

ভক্তিতীর্থ মুঙ্গের

বিগত ২৫শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টের জন্মোৎসবে, মুঙ্গেরে অনেকগুলি ধর্ম্ম বিশ্বাসীর সমাগত হইয়াছিলেন এবার বাবু কেদারনাথ গোয়াঙ্কাদের ধর্ম্মশালায় যাত্রীনিবাস হয়, তাহাতে যাত্রীগণের স্থানের অকুলান হওয়ায়, কয়েকটী বিষয়ে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, কয়েকটী মহিলাকে মন্দির প্রকোষ্ঠে ও হাসপাতালের ডাক্তারের গৃহে থাকিতে হইয়াছিল।

ভগবৎ কৃপায় প্রতিবৎসর যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে প্রত্যেক যাত্রীর মনে এই চিন্তা আসিয়াছে যে মন্দির প্রাঙ্গনে একটী আশ্রম বাড়ী করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয়া ভগিনী মহারাণী সুচারু দেবী আশ্রমের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরের যাঁহারা তত্ত্বাবধান করেন তাঁহাদের উদাসীনতায় আশ্রমের একটিও ঘর এ পর্য্যন্ত তৈয়ার হইল না, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। ভগবানের রাজ্যে কিছুরই অভাব নাই, ব্রাহ্ম মণ্ডলীর মধ্যে এমন ধনী ও কর্ম্মী আছেন যাঁহাদের একটু মাত্র চেষ্টায় এক বৎসরের মধ্যে ঐ আশ্রমটি সম্পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে।

ব্রাহ্মসমাজের এমন একদিন ছিল, যখন ব্রাহ্মেরা সামান্য কেরাণীগিরি করিয়া এক এক সহরে ও গ্রামে অর্থ সামর্থ্য দিয়া ও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা দ্বারা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, সে সকল ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া আজ আমরা উপাসনা করিয়া আনন্দ পাইতেছি, আজ কালিকার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সে যত্ন ও চেষ্টা উদাম কই দেখা যায়! বেহারবাসী প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণের দৃষ্টি মুঙ্গেরের মন্দিরের দিকে পড়িলে ঐ আশ্রম বাড়ীটি প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হইবে না মনে হয়।

করাচি হইতে আগত প্রেমদাস ডাঃ রুবেন ও তাঁহার দল মুঙ্গেরবাসী বাঙ্গালী ও মাড়ওয়াড়ীদের মধ্যে কি যে এক উৎসাহের ভাব দিয়াছিলেন যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিয়াছেন। ভগবৎ কৃপাতেই অসাধ্য সাধন হইয়া থাকে। সেইযাদুকরের মোহিনী মন্ত্রে মগ্ন, চলিতে অক্ষম যাঁরা, তাঁহারা ছুটিয়া আসিলেন যাঁহারা মুঙ্গেরকে আগে ভক্তির চক্ষে দেখেন নাই তাঁহারা ভক্তিতে মাতোয়ারা হইয়া যাত্রীদলের সেবার জন্য আপনাদের অর্থ সামর্থ্য দিয়া সেবা করিয়া ধন্য হইলেন, শিশু ও বৃদ্ধের নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা নৃত্য গীত করিয়া প্রমত্ত হইলেন, যুবক যুবতীগণ, শিশু বালকগণকে দূরে রাখিয়া কি দেখিতে ও কি পাইতে আসিলেন তাঁহারাই তাহার সাক্ষ্য দিবেন। বৃদ্ধ সাধকের দিবানিশি অবিরাম সঙ্গীত ও নানা বাদ্য যন্ত্রের সঙ্গে সে মোহিনী সুরের ধ্বনি এখনও মনে প্রাণে যেন ধ্বনিত হতেছে।

এসো ভাই, এস ভগিনী এই সুযোগে সকলকার মিলিত চেষ্টায় মুঙ্গেরে একটী স্থায়ী যাত্রী নিবাস প্রস্তুত করিয়া লই। এই আশ্রম ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের ব্রহ্মমন্দির রক্ষার উপায় স্বরূপ হইবে এই আশ্রমে বাস করিয়া মহিলাগণ ব্রহ্মমন্দিরে পূজা করিয়া মন্দিরকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন, এস আমরা তাহারই উপায় করিয়া দিয়া যাই।

অর্থ এইরূপ স্থানের দানে সার্থক হোক্, সামর্থ্য শক্তি এইরূপ কাজে নিয়োজিত হোক্। ভগবৎ আশীর্ব্বাদে অসম্পূর্ণ কিছু থাকে না সময়ে কি এক মোহিনী মন্ত্রে কাজ সম্পূর্ণ হইয়া যায়। ভগবদ্ভক্ত শ্রীকেশবচন্দ্রের সোনার মুঙ্গের ভক্তিপ্রদায়িনী হইয়া সোনার বঙ্গে মাথা তুলিয়া দাঁড়াক্, দাতা ও কর্ম্মী তাঁহারই ইঙ্গিতে এই কাজে অগ্রসর হউন এই বিনীত নিবেদন।

ভাগলপুর পোঃ অঃ
আদামপুর। } সেবিকা:—নির্ম্মলা বসু।

শ্রীমদাচার্য্য—কেশবচন্দ্রের

জন্মোৎসব অভিবাদন।

("কার মা এমন দয়াময়ী" গানের সুর)

কেশব আমার কেশব নয় ভাই,
ব্রহ্মানন্দ-সাগর, (সে যে)
যে নববিধান-সাগর
(করে) আলিঙ্গন এপার ওপার।

সে প্রশান্ত সিন্ধুনীরে,
ভক্তমীন যত বিহরে,
(তার) কি আনন্দে ক্রীড়া করে,
সর্ব্বজীব একত্তর,
কি বিশাল সে জলধি,
তরঙ্গিত নিরবধি,
(নব) নব ভাব বীচিমালা,
(তার) চমকে নব রবিকর।
হৃদে ধরি মহাশক্তি,
উচ্ছ্বসিছে মহাভক্তি,
নিনাদে তাই দিবারাতি
"আমি যার মা আমার"।
নব প্রেম সমীর তাহে,
(ঐ) চিদাকাশ হইতে বহে,
(তার) "আমি পাখী" উড়িয়ে গাহে
"আমি নাই" "তাই আমি একাকার"।
(এস) ডুবি আমরা এ সাগরে,
সেবি ঐ জীবন সমীরে,
নব জন্ম লাভ করে
হই নবশিশু মায়ের।

সেবক—শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক

—•—

পরলোকগত ভ্রাতা অমৃতলাল ঘোষ।

স্বাবলম্বন দ্বারা কেমন করিয়া আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে হয় ভ্রাতা অমৃত লাল তাহারই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম প্রাণতাও অতি গভীর ছিল। বাল্যকালে তাঁহার অবস্থা বড়ই দুঃস্থ হইয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্যে ক্যাম্বেল মিডিক্যাল পড়িয়া ডাক্তারী শিক্ষা করেন। এই সময়েই তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় হয়। তাঁহার সরল শিক্ষার্থীর ভাব তখনই আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া ছিল। শ্রীমৎ আচার্য্য দেবের উপাসনার আকর্ষণে যখন আমরা তাঁহার অনুগামী যুবকদলে প্রবেশ করিও আমরা ব্যাণ্ড অব্ হোপ সংগঠন করি, তখন অমৃতলালের বাসায় প্রায়ই যাতায়াত করিতাম, ক্রমে তিনি আমাদের ব্যাণ্ড অব হোপে যোগ দান করেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উপাসনাতেই যোগদিতে আরম্ভ করেন।

ডাক্তারী পাস করিয়া পরলোকগত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণচন্দ্র আস ও তাঁহার স্বর্গীয় মাতুল শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে মজলগঞ্জে গিয়া ডাক্তারী ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং মজলগঞ্জ মিশনে যোগদিয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করেন।

যখন লক্ষণ বাবু প্রেরিত প্রচারক মহাশয় দিগের সম্মিলন করিবার আয়োজন করেন, ভ্রাতা অমৃতলাল যথেষ্ট উৎসাহের সহিত প্রচারক মহাশয় দিগের সেবা করিয়া সকলকারই প্রীতি-ভাজন হন, বিশেষভাবে সঙ্গীত প্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ ও অমৃত লাল বসুর গুণে অধিক আকৃষ্ট হন। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ চন্দ্র আসের উৎসাহে ও অর্থ সাহায্যে ভ্রাতা অমৃতলাল ডাক্তারী ছাড়িয়া অলঙ্কার বিক্রয়ের ব্যাবসায় প্রবৃত্ত হন।

প্রথমে তিনি তাঁহার একজন ধর্ম্মবন্ধুর সহায়তা ও সহযোগিতায় এই ব্যবসায় আরম্ভ করেন কিন্তু বন্ধুটী দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইলে সমগ্র দোকানের ভার অমৃতলালের উপরই পড়িল। ইংরাজ ব্যাবসাদার দিগের অনুকরণে স্বর্ণালঙ্কারাদি ব্যবসায়ের এমন দোকান তখন প্রায় ছিলই না। অমৃতলালের অধ্যাবসায় গুণে এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন বলিয়া অবিলম্বেই সভ্য বাঙ্গালী সমাজে তাহার ব্যবসায়ের বিশেষ আদর হইল। তাহাতে তাহার অবস্থার উন্নতিও যথেষ্ট হইল ও তাঁহার উপার্জ্জনও বেশ হইতে লাগিল।

ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনের জন্ত তিনি যেমন অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন, তাহার সঙ্গে ধর্ম্মোন্নতি সাধনেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম দুইই সমভাবে সাধনে তিনি সদাই তৎপর ছিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু স্বাস্থ্য ভগ্নহইয়া পড়ে এবং অনেকদিন হইতে হাপানী রোগে আক্রান্ত হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতেন। কলিকাতায় স্বাস্থ্য ভাল থাকে না বলিয়া কলিকাতার বাড়ী কিনিয়াও বিক্রয় করিয়া বালীগঞ্জে একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সেই খানেই থাকিতেন। কিন্তু ক্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে পুত্রদ্বয়ের উপর অনেকটা ব্যবসায়ের ভার দিয়া গিরিডিতে গিয়া তৃপ্তি কুটীর নামে একটী সুন্দর স্বাস্থ্য নিবাস নিম্মান করন এবং সেইখানেই শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। গিরিডির নববিধান মন্দির ও আশ্রম তাহারই ধর্ম্ম কর্ম্ম জীবনের অক্ষয় কীর্ত্তি। তাঁহার দুই পুত্র শ্রীমান্ নীতিলাল ও শ্রীমান ন্যায়লাল পিতার সদ্গুণের উত্তরাধিকারী হইয়া তাঁহার ব্যবসায় ও কীর্ত্তিকলাপ রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার পত্নী দেবী ও পুত্রকন্যাগণের শোকে আমরা হৃদয়ের সমবেদনা জানাইতেছি। স্বর্গস্থ ভ্রাতার আত্মা পরমমাতার ক্রোড়ে অনন্ত শান্তি সম্ভোগ করুন ইহাই প্রার্থনা করি।

—•—

নববিধানবিষয়ক।

কি জন্য আমি এই নববিধানে বিশ্বাস করি, কেনই বা ইহাকে সংসারের ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম মনে করি, এ ধর্ম্ম হইতে আমার জীবনে কি বিশেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছি? যখন পঞ্চসপ্ততি বর্ষ পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও তৎসহচরগণ এদেশে একেশ্বরবাদ সূচনা করেন তখন কি কাহারও ধারণা হইয়াছিল কি নূতন ব্যাপার আরম্ভ হইতেছে? সর্ব্ব ধর্ম্ম, বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রতিপন্ন এই সনাতন একেশ্বরবাদ উৎকৃষ্ট জ্ঞানপ্রভাবে সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহারা তখনকার কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিলেন। যখন কালক্রমে এই অভিনব ধর্ম্মবীজ বৃদ্ধির পর বৃদ্ধি, আয়তনের পর নূতন আয়তন লাভ করিয়া বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের আকার গ্রহণ করিল, তখন কি নবতর কল্যাণতর আদর্শের আবির্ভাব হইল, ঠিক যেন সমাজ এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা উৎসাহিত ও আশ্চর্য্য হইলাম; কিন্তু তখনও ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের বহু ভ্রম ছিল। কেহবা ইহাকে নববংশজ হিন্দুদিগের ইংরাজি শিক্ষার পরিচায়ক মাত্র মনে করিলেন, কেহবা ইহাকে চলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতিবাদ এবং নূতন হিন্দুধর্ম্মের সূচনা মাত্র মনে করিলেন, কেহবা ইহাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বনের প্রচ্ছন্ন সোপান মাত্র ভাবিলেন, কেহবা ইহাকে একটী সামাজিক সংস্কার মাত্র ভাবিলেন। ইহা যে একটী ঐশ্বরিক সৃষ্টি, ইহা যে একটী নূতন যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা পূর্ব্বে তাহা মনে করি নাই। কিন্তু বাস্তবিক প্রথমাবধি এই ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মে নূতন যুগধর্ম্মের উপক্রম, ইহার ক্রমশঃ বিকাশ দেখিয়া এখন স্বীকার করিতে ও বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। যখন আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেন এই মহাবার্ত্তা ঘোষণা করিলেন, আমরা আহ্লাদিত ও উৎসাহিত হইলাম, তারপর যখন তিনি নিজের অসাধারণ প্রতিভা, অসীম উদ্যম, তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাসের সহিত এই নববিধান দেশময় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের শেষাংশে একেবারে আত্ম উৎসর্গ করিলেন তখন ভাবিলাম এইবার বুঝি ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ বিবাদ সাঙ্গ হইল এবং ইহার শাখাত্রয় নূতন প্রণালীতে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু শীঘ্রই সে আশা বিফল হইল, নববিধান মণ্ডলীর নেতৃগণ ইহার উচ্চ আদর্শকে এতই হীন ও সঙ্কীর্ণ করিলেন, পরস্পরের প্রতি এতই অবিশ্বাস ও অসদ্ভাব পোষণ ও প্রদর্শন করিলেন, কেশবের বিপক্ষগণ ইহার প্রতি এতই অসত্য ও কুসংস্কার আরোপ করিলেন যে তদ্দ্বারা সকলেরই সাংঘাতিক ক্ষতি হইল। এই অন্ধকার ও অশুভ অবস্থার মধ্যে আচার্য্যদেব কেশব চন্দ্র ভগ্ন-হৃদয়ে ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই মহা অনিষ্ট মধ্যে এ যুগধর্ম্মের উদ্দেশ্য ও আদর্শ অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। পৃথিবীর নানা উন্নত জাতির মধ্যে ইহা ক্রমাগত আপনা আপনি সৌষ্ঠব ও শ্রী-বৃদ্ধি লাভ করিতেছে খ্রীষ্টীয় জগতে আধ্যাত্মিক খৃষ্টধর্ম্ম নামে ইহা পরিচিত হইতেছে; হিন্দুজাতির মধ্যে ইহা আধ্যাত্মিক সনাতন আর্য্যধর্ম্ম; মুসলমানদের ভিতরে ইহা অসাম্প্রদায়িক উদার ইস্‌লাম এবং সর্ব্বজাতির মধ্যে ইহা সার্ব্বভৌমিক সারধর্ম্ম নামে গৃহীত হইতেছে ও হইবে। যে নামে লোকে ইহাকে গ্রহণ করুক, ইহা গৃহীত হইবেই হইবে, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেছি। আমরা কলিকাতা নগরে ইহার সঙ্গে যে সকল বাহ্য আড়ম্বর মিশাইয়া থাকি তাহা সর্ব্বাংশে বজায় থাকিবে না; কেননা সে সমস্ত সার ধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়; সময় ও সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে ইহা পরিবর্ত্তিত ও পুনর্গঠিত হইবে; ইহার মধ্যে যাহা মূল সত্য তাহাই চিরস্থায়ী। মূলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধান ধর্ম্মের সঙ্গে প্রভেদ নাই, কোন কোন অনুষ্ঠানে ও আদর্শে ও সাধনে প্রভেদ আছে। উদার ভাবে দেখিলে সে প্রভেদ সাংঘাতিক বলিয়া বোধ হয় না।—"আশীষ"

(ক্রমশঃ)

—•—

সমন্বয়াচার্য্য—শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব।

১৯শে নভেম্বর।

(১)

আজ গুরুপূজা সাজা হৃদি সাজা
ভকতি কুসুম তুলে,
আঁখি পুটে জল রাখ নিরমল
প্রেম দীপালি জ্বেলে।
পবিত্রতা মলয়জে যতনে ঘষিয়ে
মানস শতদল দলে রাখগো মাখায়ে।
হৃদয় মন্দির দ্বার নিভৃতে খুলিয়ে
পূজারী পূজগো দেবে মনে করিয়ে।

(২)

দেবতা জগতে জনম নিলরে
নব সাধন পথে নব ধরম শিখাতে
দেবতা জগতে জনম নিলরে,
সবারে হৃদয়ে নিল আপনা বিলায়ে দিল
যুগে যুগে স্বদেশে বিদেশেরে।

সেবিকা—শ্রী শান্তিসুধা রায়।

ভক্তিতীর্থ মুঙ্গের

[২]

সমবিশ্বাসী ভ্রাতা ও ভগিণীগন অনেকেই জানেন ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে উৎসব করিতে শ্রদ্ধাভাজনীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী গমন করিয়া তথায় যাত্রীদের জন্য

একটী গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়া আসেন কিন্তু নানারূপ প্রতিবন্ধক হওয়া ঐ গৃহ এপর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয় নাই। আরও দুঃখের সংবাদ মুঙ্গের তীর্থের নিকটেই জামালপুর ব্রহ্মমন্দিরটীর কতকাংশ ভূমিস্মাৎ হইয়াছে ঐ মন্দির ফণ্ডে কিন্তু কিছু টাকা মজুত থাকা সত্বেও মন্দিরের ট্রাষ্টগণ বা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ উক্ত মন্দিরটী পুনঃ নির্ম্মাণের কোন ব্যবস্থাই করিতেছেন না। গত ২৫শে অক্টোবর ১৯২৭ মুঙ্গেরবাসী কয়েকটী আনুষ্ঠানিক ও সহানুভূতিকারী ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা মুঙ্গের নববিধান সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনাদী পূর্ব্ববৎ নিয়মিতরূপে চালাইবার জন্য একটী স্থানীয় উপাসক মণ্ডলী গঠন করিয়াছেন, ঐ মণ্ডলীর সভ্য সংখ্যা আপাতত ১৪জন, উহাদের মধ্যে প্রাচীন বন্ধু বাবু অধর চন্দ্র বসু তত্ত্বাবধায়ক ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দ লাল দে এম, এ, সহকারী সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন। উক্ত স্থানীয় উপাসক মণ্ডলী ভক্তি তীর্থের বিগত উৎসবে যাত্রীদিগের সেবা ও উপাসনাদীর ব্যয় নির্ব্বাহ কল্পে কতক সাহায্য করিয়াছেনে। মুঙ্গেরের গৃহস্থ প্রচারক স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ বাগচির ও উক্ত মুঙ্গের (বিহার) ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক স্বর্গীয় রামদয়াল গুপ্তের নূতন সমাধি বিগত ২৮শে ডিসেম্বর ঐ নববিধান ভক্তিতীর্থে স্থাপিত হইয়াছে, এবং সমাধি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেন নবসংহিতানুসারে প্রার্থনাদী করেন। ভক্তিতীর্থ উৎসবে সমাগত অনেকগুলি বিশ্বাসী ভাই ভগিনী ঐ অনুষ্টানে যোগদান করিয়াছিলেন। আশা করি ভক্তিতীর্থের প্রতি নববিধান বিশ্বাসী ভাই ভগিনীগণ দিন দিন অনুরাগী হইয়া তীর্থযাত্রীদের সাধনের যে সব অসুবিধা আছে তাহা দূর করিবেন। মঙ্গলময়ী মার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

ভক্তিতীর্থানুরাগী

সেবক—শ্রীঅখিল চন্দ্র রায়।

পিতৃ তর্পণ।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধানে, বিধাতার চক্রে আসিয়া, যাঁহারা শ্রীব্রহ্মানন্দের জীবন প্রভাবে পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটী আদর্শ বিশ্বাসী জীবন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র ঘোষ তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁহার জন্ম ও দীর্ঘ জীবন বৃত্তান্ত ভবিষ্যৎ বংশীয়দের একটী আদর্শ জীবনী হইবে বলিয়া সংক্ষেপে লিখিত হইল।

স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র ঘোষ ফরাসী চন্দননগরে নিজ পৈতৃক ভবনে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ মুক ও বধির হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বিধাতার অদ্ভুত লীলা যে তাঁহার ৭টী পুত্র ও ৩টি কন্যা, কেহই কোনরূপ অঙ্গহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই, প্রত্যেক সন্তান সুচতুর ও বুদ্ধিমান ও ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন আমার পিতৃদেব তাঁর পিতার চতুর্থ সন্তান ছিলেন, তিনি সকল ভ্রাতা ভগিনীদের মধ্যে বিবেকী ও বুদ্ধিমান ভগবৎ প্রেমিক ও বিশ্বাসী ছিলেন তাঁহার চরিত্রে ধর্ম্ম ও নীতির প্রভাব অত্যন্ত বেশী ছিল বলিয়া একা তিনিই কেশবচন্দ্রের দলের দিকে অল্প বয়সে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হন।

তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে হয় ময়মনসিং নিবাসী সর্ব্বজনপূজ্য ভগবৎভক্ত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ্রের কনিষ্ঠা বিধবা ভগিনী আমাদের পরম পূজনীয়া মাতৃদেবী শ্রীমতী শারদাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয় এই বিবাহ কলিকাতায় সমারোহে সম্পন্ন হয়. স্বর্গীয় প্রেরিত দেব প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় পৌরহিত্যের কার্য্য করেন। তিনি বিশিষ্ট গন্যমান্য হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু যুবক হইয়া এই বিবাহ করিতে একটুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া বৃহৎ পরিবার ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া জীবনে প্রথম বিশ্বাস ও তেজের পরিচয় দান করেন, সেই সময় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যদিয় হিন্দুসমাজের সকল প্রকার রীতি নীতির সংস্কার আরম্ভ হইতেছিল, পিতৃদেব কেবল মুখে তাহা স্বীকার না করিয়া, আপন জীবনে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, আজিকার দিনে চারিদিকে সমাজ সংস্কারের কথা বক্তৃতায় শোনাযায় কাজ খুব কমই হয়, কথা ও কাজে সমান না থাকার জন্য দেখি সমাজের কত দুর্নাম ও কত পতন হইতেছে। অতি অল্প বয়সেই তিনি জীবিকা উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হন, তৎকালে প্রত্যেক বালক নিজনিজ ক্ষমতায় চাকুরীর জন্য দেশ বিদেশে চলিয়াযাইতেন, কিন্তু বয়জ্যেষ্ঠগণের মতামতের উপর তাহাদের সুখ সচ্ছন্দতা নির্ভর করিত। আমার পিতৃদেব মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে চুঁচুড়ার রেল অফিসে প্রথম কার্য্য গ্রহণ করেন তৎপরে ভক্তিতীর্থ মুঙ্গেরে কিছুদিন বদলি হন। স্বর্গীয় বন্ধু যদুনাথ ঘোষের একান্ত আগ্রহে ও আহ্বানে পরে এলাহাবাদে কার্য্য গ্রহণ করিয়া সেখানে ১২বৎসর কাল অবস্থিতি করেন সেইখানে আমরা কয়েকটী ভ্রাতা ও ভগিনী (শ্রীযুক্ত বিমল চন্দ্র, সরলা, প্রমোদ কুমার ও নির্ম্মলা) জন্মগ্রহণ করি।

তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা, সত্যপরায়নতা কার্য্যে একনিষ্ঠতা ব্রাহ্মসমাজের সেবা ও তাহার জন্য স্বার্থত্যাগ তৎকালীন সকলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ থাকা কালীন পরমভক্ত শ্রীকেশবচন্দ্র প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে সদলে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন সংখ্যায় ১০।১৫জন থাকিতেন, তাঁহাদের আহারাদির বিরাট আয়োজন দেখিয়া কেশবচন্দ্র একদিন হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "বেতনের টাকাগুলি আফিস হইতে না আনিয়া একবারে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেই তো হয়" এই ভক্তদলের সেবার জন্য তিনি নিজের কষ্ট উপার্জ্জিত অর্থকে অর্থহ জ্ঞান করিতেন না ইংরাজী মাসের শেষদিকে ঋণ করিতে হইত কিন্তু তাহা গ্রাহ্য করিতেন না।

এলাহাবাদের রেল অফিস হঠাৎ উঠিয়া যাওয়ায় তাঁহার চাকুরী যায় ও বৎসর কাল কর্ম্মশূন্য অবস্থায় নানা কষ্টে পড়েন পরে সামান্য বেতনে লক্ষ্ণৌ রেল অফিসে কেরাণীর কার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ক্রমশঃ।

ভাগলপুর। শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু।

বিহারে নববিধান প্রচারক শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র রায়।

প্রাপ্ত।

আমাদিগের নববিধান প্রচারক শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র রায় মহাশয় কয়েক দিন মুঙ্গেরে অবস্থান করিয়া পাটনা ও মজঃফরপুর আগমন করেন। পাটনায় আমাদের নববিধান বিশ্বাসী ভ্রাতা প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ডি, এন্, সেন মহাশয়ের আতিথ্যে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া ও অত্রত্য বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। মজঃফরপুরে আসিয়া শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বাগনান নিবাসী প্রাচীন ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রসিক লাল রায় মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীমান্ সুবিমলের বাসায় অবস্থান করেন। বিগত রবিবারে তিনি আমাদের বাসভবনে সন্ধ্যাগমে উপাসনা করেন। এই উপাসনায় আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ভগিনী শ্রীমতী হেমলতা দেবী ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী বনলতা দেবী (ত্রিহুৎ বিভাগীয় বালিকা বিদ্যালয় সমূহের আসিষ্টাণ্ট ইন্স্-) পেক্ট্রেস) এবং যুবক বন্ধু সুবিমল ও যোগদান করিয়াছিলেন। সঙ্গীতের লোক না থাকায় শ্রদ্ধেয় অখিল বাবু নিজেই সঙ্গীত ও উপাসনা উভয়দিকই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিলেন। তাঁহার উপাসনা সত্য সত্যই খুব সুমধুর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। উপাসকের উপাসনা ও ভক্তিরসাভিষিক্ত না হইলে কাহারও মন ভাবে অভিষিক্ত হয় না। তাঁহার এদিনের উপাসনা বাস্তবিকই আমাদের মনকে অভিষিক্ত করিয়াছিল। যাহারা উপাসনায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে পুনরাগমনের জন্য অনুরোধ করিলেন। পাটনা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে করিতে অবগত হইলাম যে অত্রত্য নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হয় নাই। পাটনার এ ঔদাস্যে আমরা বাস্তবিকই ব্যথিত হইলাম। একজন প্রাচীন নববিধান সাধক ও প্রচারক মহাশয়ের উপাসনা সম্ভোগ জন্য মণ্ডলীর প্রাণ এরূপ উদাসীন থাকিলে সে ঔদাসীন্য স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়না। বাঁকিপুরে নববিধান সাধক ভক্ত প্রকাশ চন্দ্র যখন শরীরে তখন তিনি নব বিধানের Lay men দিগকেও উপাসনার অধিকার দিতে ব্যস্ত হইতেন। সে সময়ে নববিধান সম্বন্ধে ভাবই স্বতন্ত্র ছিল। আমি যখন প্রথম বাঁকিপুরে উপস্থিত তখন সে মণ্ডলীতে ভক্ত প্রচারক দীননাথ মজুমদার ভাই বলদেব নারায়ণ, ভাই ব্রজ গোপাল, ভক্ত প্রকাশ চন্দ্র, নগেন্দ্র নাথ, অপূর্ব্ব কৃষ্ণ, ডাঃ পরেশনাথ, ভ্রাতা দামোদর, ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ এবং আরও দুই চারিজন বর্ত্তমান ছিলেন। সে দলের মধ্যে এখন জ্যেষ্ঠ পরেশনাথ, ভ্রাতা দেবেন্দ্র নাথ এবং ভ্রাতা দামোদর শরীরে বর্ত্তমান। সে সময় নববিধানা-গত ব্রাহ্ম ভিন্ন অপর কাহাকে বেদীর অধিকার দেওয়া হয় নাই। এবার যাইয়া দেখিলাম নববিধান সংক্রান্ত সে স্বাতন্ত্র্য আর সংরক্ষিত হইতেছেনা। যাঁহারা নববিধানের নবত্ব স্বীকার করিতে এখনও পশ্চাৎপদ জানিনা কোন্ সমীচীন ভাবের উপর তাঁহাদিগকে বেদীর অধিকার দেওয়া হইতেছে। বেদীর স্বাতন্ত্র্য খৃষ্টবাদী পাশ্চাত্য ভূমিও রক্ষা করিতেছেন। সকল ধর্ম্মবাদই ব্রহ্মবাদ। একেশ্বরবাদী ইস্লামবাদ, খৃষ্টবাদ, বৈষ্ণববাদ, বৌদ্ধবাদ, শিখবাদ, সমস্তই একেশ্বরবাদে প্রণোদিত। বেদীর স্বাতন্ত্র্য উঠাইয়া দিলে এ দলকেও অধিকার দিতে হয়। জানিনা বেদীর স্বাতন্ত্র্য কেন এত সঙ্কটাপন্ন হইলেন।

মজঃফরপুর।
১৮।১১।২৭
প্রণত সেবক—শ্রীগৌরী প্রসাদ মজুমদার।

নববিধান প্রচারাশ্রম।

নববিধান প্রচারাশ্রম প্রেমিক বৈরাগীদিগের আবাস স্থান, কাকাবাবুর (স্বর্গীয় ভাই কান্তি চন্দ্র মিত্রের) সেবা ক্ষেত্র। অপ্রেমিক মণ্ডলীর ঘোর সাংসারিকতায় আজ কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত। মণ্ডলীর সেবার জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের সেবার জন্য মণ্ডলীর কেহই দায়িত্ব বোধ করেন না। তাঁহাদের সেবার ভার গ্রহণে কেহই ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। কাহার সহিত কি সম্বন্ধ কেহই বুঝিতে চেষ্টা করেন না কে কাহার আত্মীয় এ কথা কেহই মনে ভাবেন না। প্রেমময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা, তোমারই সম্বন্ধে যে সকলেই আত্মীয়, কেহ কারো পর নয়, সকলেই প্রাণের ভাই প্রাণের ভগিনী, এসব কথা কবে আমরা বুঝিব? এই সব কথা না বুঝিলে, অসম্মিলন অসদ্ভাব না ঘুচিলে, ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ হয় না, জগতে শান্তি সংস্থাপিত হয় না, মঙ্গলময়ের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ লাভ অসম্ভব। বিশ্বাস, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি কিছুরই আস্বাদন পাওয়া যায় না। "অসম্মিলনে হরি লীলা হয় কি সাধন।"

(নববিধান ট্রাক্ট হইতে উদ্ধৃত)

সংবাদ।

বারিপদা সংবাদ—বারিপদা (ময়ূরভঞ্জ) নববিধান মন্দিরে আজকাল স্থানীয় পুরুষ ও মহিলাগণ উপাসনা ও সংকীর্ত্ত-নাদীতে আগ্রহ সহকারে যোগদান করিতেছেন। ভ্রাতা নগেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "বারিপদার ব্যাপার দেখিয়া আমি

আশ্চর্য্য হইতেছি সাধারণ গৃহস্থ ঘরের উড়ীয়া মেয়েরা সমাজে আসিতেছেন। পুরুষ অপেক্ষা নারীদের আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়া অবাক হইতেছি। এ মন্দিরের প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ড মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীর হৃদয়ের গভীর ভাবরূপ মসলা দিয়া স্থাপিত হইয়াছে তাঁহার প্রাণের গভীর যোগ চিরদিনই থাকিবে। এখানে নবজাগরন আসিয়াছে"। নববিধান বিধাতার রাজ্য দিন দিন বিস্তার হউকইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

জন্মদিন—গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে পূর্ব্বাহ্ন ৮॥০ টায় প্রচারাশ্রম দেবালয়ের শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথ লাল সেনের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভক্তিভাজন ভাই প্যারী মোহন চৌধুরী উপাসনার কার্য্য করেন ভাই প্রমথ লাল সেন জীবনে নববিধানে ব্রহ্মলীলা উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন। ভাই অক্ষয় কুমার লধ শ্লোক সংগ্রহ ও আচার্য্যের প্রার্থনা "অমর জীবন" পাঠ করেন ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ অদ্যকার দিনে বিশেষ প্রার্থনা করেন। ঐদিন সায়ং ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক ভাইয়ের জন্মোৎসব সমারোহে সহিত সম্পন্ন হয়।

জন্মোৎসব—উক্ত ১৭ই ডিসেম্বর ময়ূরভঞ্জের ব্রহ্মনিষ্ঠ স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও বাহাদুরের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে ময়ূরভঞ্জের সদর টাউনস্থিত বারিপদা নববিধান মন্দিরে বিশেষ উপাসনা সংকীর্ত্তন ও অনাথ আশ্রমবাসীদের সেবা ইত্যাদী সম্পন্ন হইয়াছে। এবৎসর স্থানীয় অনেক সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী ও সাধারণ ব্যক্তিগণ জন্মোৎসবে যোগদান করিয়া ছিলেন। ঐদিন ব্রহ্মমন্দিরে সংকীর্ত্তনাদীর নেতৃত্ব ও উপাসনার কার্য্য ভ্রাতা নগেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় সুসম্পন্ন করেন। আমরা আশা করি এবার হইতে ঐ সময়ই বারিপদা নববিধান মন্দিরে সাম্বৎসরিকউৎসব হইবে। বর্ষার সময় উৎসব করা সুবিধা জনক নহে।

গত ২৯শে ডিসেম্বর সায়ংকালে মুঙ্গেরের এ ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস মিস্ মনিকা চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী অমিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনার কার্য্য সেবক অখিল চন্দ্র রায় সম্পন্ন করেন মেয়েরাই সঙ্গীত করিয়াছিলেন।

নামকরণ—বিগত ১৮ই ডিসেম্বর রবিবার পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতা ২৮নং ডিকসনস্ লেনে অমরাগড়ীর স্বর্গীয় যশোদা কুমার রায়ের তৃতীয় পুত্র বিলাত প্রত্যাগত ডাক্তার পূর্ণানন্দ রায়ের তৃতীয় নবকুমারের শুভ নামকরণ নবসংহিতানুসারে খুব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে, এই অনুষ্ঠানে ভাই প্রমথ লাল সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন, শিশুর নাম শ্রীমান্ নয়নানন্দ রাখা হয় জ্যেষ্ঠতাতের ইচ্ছাক্রমে অপর নাম প্রণবানন্দ হইয়াছে। এই শিশু বিগত ১৩৩৩ সালের ২৫শে মাঘ ইংরাজী ১৯২৭ ৮ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ২॥০টার সময় ভূমিষ্ট হইয়াছিল। মঙ্গলময়ী মা শিশু ও তাঁহার জননীকে আশীর্ব্বাদ করুণ।

শোক সংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে সিরাজগঞ্জ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন সভ্য শ্রীমৎ ত্রৈলোক্য নাথ সেন মহাশয় বিগত ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। সিরাজগঞ্জে নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনাবধি ইনি সমাজের উপাচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। যদিও ইনি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন না, তথাপি ইহাঁর অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগ ও বিশ্বাস ছিল। দরিদ্রতার মধ্যে কিরূপে সদানন্দ থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত ইনি প্রদর্শন করিয়াগিয়াছেন। ইনি নববিধান সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের প্রতি একান্ত ভক্তিমান ছিলেন। ইহাঁর অমায়িক স্বভাব সরল শিশুবৎ ভাব, এবং উপাসনানুরাগ আমাদের হৃদয়কে প্রীত করিত। মানাপমান ইনি তুল্য ছিলেন। সিরাজগঞ্জের অনেকেই ইহাঁকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। এইরূপ ভক্তবন্ধু হারাইয়া আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ এবং শোক সন্তপ্ত হইয়াছি। মা বিধান জননী তাঁহার এই ভক্ত সন্তানকে তাঁহার প্রেমক্রোড়ে স্থান দান করুন এবং ইহাঁর পরিবারের মঙ্গল বিধান করুন।

আশাকুটীর, টাঙ্গাইল। চিরদাস—শ্রীশশী ভূষণ তালুকদার।

আদ্যশ্রাদ্ধ—বিগত ১১ই অগ্রহায়ণ গিরিধিতে স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথ লাল সেন আচার্য্য ও ভাই অক্ষয় কুমার লধ এবং ভাইচন্দ্র মোহন দাস অধ্যেতার কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নীতি লাল ঘোষ প্রধান শোককারীর প্রার্থনা করেন, অমৃত বাবুর জ্যেষ্ঠ বধূমাতা শশুর মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিয়াছেন। এ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে স্থানীয় ও বিদেশীয় অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ যোগদান করিয়াছিলেন। এই আদ্যশ্রাদ্ধে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গ করা হইয়াছে।

কলিকাতায়—নববিধান প্রচার আশ্রম ৩১০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০৲, ভিক্টোরিয়া স্কুল ১০৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, ব্রাহ্ম রিলিফ ফণ্ডে ৫৲, নববিধান ট্রষ্ট ফণ্ডে ১০৲, অনাথ আশ্রম ৫৲, বিধবা আশ্রম ৫৲, নীতি বিদ্যালয় ৫৲, বালিগঞ্জ কসবা জাতীয় বিদ্যালয় ৫৲, বালীগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় ৫৲ টাকা।

গিরিধি—নববিধান সমাজ ১০৲, সাধারণ সমাজ ১০৲, বালিকা বিদ্যালয় ১০৲, পুস্তকাগার ৫৲, খৃষ্টান সমাজ ৫৲, সেবিকা সঙ্ঘ ৫ টাকা।

হাজারিবাগ নববিধান সমাজ ১০৲, মুঙ্গের নববিধান সমাজ ৫৲, ময়মনসিংহ নববিধান সমাজ ৫৲, বালেশ্বর নববিধান সমাজ ৫৲, দেওঘর কুষ্ঠাশ্রম ৫৲, কাশী সেবাশ্রম ৫৲, স্বর্গস্থ আত্মার স্বদেশের স্কুল ১০৲, গরিব পরিবার ৫৲ বৌদ্ধ সাধক ৪৲, মুসলমান সাধক ৪ টাকা। মোট—১৮৮ টাকা মাত্র।

এতদ্ব্যতীত—ভোজ্য ৪টা, ডিস ৪খানা, কাঁসার গ্লাস ১৪টা পাথরের গেলাস ৫টা, ছাতা ১টা, বিছানা ১জোড়া, বিছানা ১প্রস্থ বালাপোষ ১খানা, আলোয়ান ১খানা সাদা থান ১৭খানা, গৈরিক ১০খানা, আসন ১খানা, একতারা ১টা, খড়ম ১জোড়া, জীবন বেদ ৫খানা, ব্রহ্ম সঙ্গীত ১খানা, নবসংহিতা ১খানা।

আত্ম নিবেদন।

দেখিতে দেখিতে ধর্ম্মতত্ত্বের বৎসর শেষ হইল; এখনও নানা অসুবিধার মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব বিলম্বে বাহির হইতেছে, অনেক পুরাতন গ্রাহক আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন দেখাইয়া আমাদিগকে বিপন্ন করিয়াছেন। আমাদের ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া গ্রাহকগণ তাঁদের দেয় মূল্য প্রেরণ করেন ইহাই প্রার্থনা।

দয়াপ্রার্থী সেবক—শ্রীঅখিল চন্দ্র রায়। সহঃ সম্পাদক "ধর্ম্মতত্ত্ব"

Edited, on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C, 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৩ ভাগ | ১লা ও ১৬ই মাঘ, ১৩৩৪ সাল, ১৮৪৯ শক, ৯৯ ব্রাহ্মাব্দ। | বার্ষিক অগ্রিম ৩৲।
১ম।২য় সংখ্যা | 15th & 30th January. 1928.

প্রার্থনা।

মা উৎসব বিধায়িনি জননী, আবার স্বর্গের উৎসব লইয়া পৃথিবীতে তুমি অবতীর্ণ হইলে। স্বর্গে যে নিত্য উৎসব হইতেছে পৃথিবীতে সেই উৎসবেরই সমীরণ প্রবাহিত করিতে আসিয়াছ। মলয় পর্ব্বতে সর্ব্বদা বসন্ত সমীরণ প্রবাহিত হয়, কিন্তু পৃথিবীতে তাহা যখন বহমান হয়, তখন পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে কতই উল্লসিত করে, কতই স্নিগ্ধ ও বিমোহিত করে। তেমনি যখন পৃথিবীতে উৎসবের সমীরণ প্রবাহিত হয়, তখন সত্যই পৃথিবী নবজীবনে সঞ্জীবিত হয়, নব উল্লাসে উল্লসিত হয়, নবানন্দে আনন্দিত হয়। তাই ব্রহ্মোৎসব আমাদের জীবন কেশব জীবনে পরিণত করিবার জন্যই সমাগত। নববিধানের উৎসব বিশেষ ভাবে আমাদের নবজীবন দানের উৎসব, নবজন্ম দানের উৎসব। এই উৎসবে আমরা মা তোমার নবভক্তের সঙ্গে নবশিশু হইয়া নিত্য নবজীবন যাপন করিব এই জন্যই তুমি উৎসব লইয়া আসিয়াছ। যদি এই উৎসবে আমরা পরিবর্ত্তিত নবজীবন প্রাপ্ত না হই আমাদের উৎসব কেমনে সার্থক হইবে। আশীর্ব্বাদ কর যদি তোমার স্বর্গের অমরবৃন্দের সঙ্গে তোমার উৎসব সাধন এবং সম্ভোগ করিবার জন্য আবার উৎসব আনিলে, যেন তোমার যথার্থ অভিপ্রায় আমাদের জীবনে পূর্ণ হয়, যেন আমরা এবার তোমার উৎসব করিয়া নবশিশুদল হইয়া তোমার নববিধান পূর্ণ করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রার্থনাসার।

হে দীনবন্ধু, উৎসবের রাজা, কেবল বাহ্যাড়ম্বরে ঘুরিতে দিও না, প্রত্যেককে শুদ্ধ কর উৎকৃষ্ট জীবন দাও। উৎসবের সময় মা কালীর রূপ ধর, ধরে নিকৃষ্ট জীবন সংহার কর। উৎসবে যেন অশুদ্ধ লোক অশুদ্ধ থেকে না যায়।

হে দয়াল হরি, হৃদয় বৃন্দাবনের শ্রীনাথ তুমি, তোমাতে আমাদিগকে আর একটু টানিয়া লও। বন্ধুগণ উৎসবে আসিয়াছেন, বাহিরের মজা লুটিলেন বাহিরের উৎসব সম্ভোগ করিলেন। অন্তরের অন্তরে কি নববৃন্দাবন স্থাপন করিতে পারিলেন?

দয়াসিন্ধু, তোমার এই লোকগুলি মধুকরের দৃষ্টান্তে যেন চলে, গোলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয় যেন। মা উৎসব উপলক্ষে একবার তোমার কাছে সকলে আসে, আর একটু মধু খেয়ে পালায়, কিন্তু ঐ গোলাপে চির গোলাপী হওয়া আর হয় না। মা তোমার মাদক সেবন করিতে

করিতে নেশা হলে, তখন আর গোলাপ থেকে মুখ সরান যায় না। পাপ করা তখন অসম্ভব হয়। হরি, সুধা পান করে যেন অচেতন হই। ব্রহ্মের কাছে বসে থাকিতে থাকিতে তখন ঠিক নেশা হয়। কাল ভ্রমর সুন্দর হয় তার গোলাপি রং হয়। সুন্দরীর কাছে বসে তার বর্ণ সুন্দর হয়। দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরূপে ডুবে গেলাম। আমি খালি জল তুমি সরবৎ। আমার জল তোমাতে ঢালিলাম তোমার জল আমাতে ঢালিলাম, ঢালিতে ঢালিতে আমিও মিষ্ট সরবৎ হয়ে গেলাম।

শ্রীহরি, বেদের ব্রহ্ম, উপাসনা আর কি? তোমার জলেমিশে এক হওয়া। উপাসনা আর কি রং পরিবর্ত্তন। উপাসনায় আমার লোহাটা তোমাকে স্পর্শ করে সোনার রং হয়েগেল মা, এই ভিক্ষা চাই।

৮ই জানুয়ারী।

[সম্মুখে অমরধাম আমাদের গম্যস্থান]

হে সত্য, হে পূর্ণ, অনন্ত সত্ত্বায় ঢাকিয়াছ বিশ্ব প্রকাশ করিল, তোমার এ স্বরূপ উজ্জ্বলরূপে তোমার এই নব বিধান। কি তেজ! সব সত্য সবসত্য এ বিধানে। ভীমরবে নিনাদিত হইয়াছিল এ বিধানের জন্মবার্ত্তা। ভক্তজীবন তোমার মুখে "জয়ী" আশীর্ব্বাদ পাইয়াছেন, কে অস্বীকার করিবে সে জীবন! অতীতের সে ঘন রব ক্ষীণ হইয়াছে, বলিয়া কি বলিব, "বিধান কল্পনা, ভক্ত জীবন অস্থায়ী"? ঐ যে ভবিষ্যত আসিতেছে প্রভু ভীম গরজনে কাঁপিতেছে হিয়া। কে করিবে সত্যকে অস্বীকার, এযে তোমার সত্যের অংশ এ বিধান এ ভক্তজীবন। তাই আজ গাই "সম্মুখে অমরধাম আমাদের গম্যস্থান"।

অমরধাম আমাদের দেশ বাড়ী, জন্মস্থান ও গম্যস্থান হে নিরাকার দেবতা, কে দেখালে এ জড়রাজ্যে তোমার এ চিণ্ময়রূপ? কে শুনালে তোমার নিরাকার কণ্ঠস্বর? কোথায় আজ যাইতাম প্রভু, যদি তোমার পুত্রকে দিয়া তুমি আজ নিরাকার রাজ্যের সংবাদ এমন করিয়া না শুনাইতে, আমরা যে জড়রাজ্যকে সর্ব্বস্ব জানিয়া হাহাকার করিয়া বেড়াইতাম। আমাদের কি আশার কথাই বলিলে, কি মুক্তির সংবাদই দিলে! আমরা তাই গাইতেছি "সম্মুখে অমরধাম আমাদের গম্যস্থান"।

অনন্তদেব, তুমি আমাদের কি দেবতা? সূর্য্য, চন্দ্র, গগন, পবন তোমার বন্দনা করে আমার মত ক্ষুদ্র জীব ও তোমার পূজায় অধিকার পাইল? ঘরে বসিয়া সংসারের ভিতর থাকিয়া তোমাকে ডাকিতেছি! এ অধিকারের সংবাদ কাহাকে দিয়া দিলে? অনন্ত, অসীম তোমার পুত্রকে পাঠাইয়াই যে জানাইলে, "ছোট বড় হবে নীচ উচ্চ হবে" তোমার পূজায়। তুমি যে সর্ব্বব্যাপী যেখানে তুমি সেখানে তোমার ভক্ত। অনন্তের পথে চলেছি; বুকে আশা লয়ে, আর গাইতেছি "সম্মুখে অমরধাম আমাদের গম্যস্থান"।

প্রেমময়, এত ভালবাস, এত দয়া তোমার। পাপীর ক্রন্দন কি তোমাকে এত অস্থির করিল যে প্রেম বক্ষের পুত্ররত্ন পাঠালে এ ভবে? তোমার দয়া কেমন তার দৃষ্টান্ত দেখালে ভক্তের স্নেহ ঢালিয়া দিয়া। সাধু সাধ্বী যুগে যুগে তোমার চরণ পূজার অধিকার পাইয়াছেন, এ যুগে একি নূতন লীলা নূতন রূপ! বলিতেছ "কেউ রবে না বাকি, পাপী, তাপী স্বর্গে যাবে সশরীরে"। এত দয়া, এত করুণা, তাই আজ পাপী ও গায় "সম্মুখে অমরধাম আমাদের গম্যস্থান"।

হে অদ্বিতীয় দেব, কোথায় গেল শাস্ত্র, মন্ত্র, কোথায় গেল অতীত ভবিষ্যত; সব মিলিল তোমার এ বিধানে! একি লীলা করিলে, আমার মত দুর্ব্বল, মূর্খ, পাপীও এত সহজে তোমাকে পাইবে! একবার যে মন প্রাণ দেহ, এক করিয়া তোমার পদারবিন্দ বক্ষে ধরে তাহার সকলই লাভ হয়! তোমার চরণে সবার মিলন! বিধান পদ্ম চির প্রস্ফুটিত সকল সৌন্দর্য্য সকল সৌরভ এই পদ্মে, ইহকাল পরকালে মিলন এই পদ্মে! পাপীর ও অধিকার এ পদ্মের শোভা সম্ভোগ করিবে এযে ভক্ত জীবন, এ জীবন পদ্মে যে কেবল মিলন কেবল মিলন। এক দেবতা তুমি আমাদের, এক ভক্তজীবন, আমাদের শাস্ত্র। আমরা যে মিলন রাজ্যের যাত্রী তাই গাই "সম্মুখে অমরধাম আমদের গম্যস্থান"।

পুণ্যময় এত সৌন্দর্য্য প্রিয় তুমি। তোমার যে সব সুন্দর। ভালবাস তুমি পবিত্রতা, পুণ্য। পৃথিবীতে প্রকৃতির ভিতর তোমার সৌন্দর্য্য, ফুল, ফল, জল, আকাশ সকলেই তোমার রূপ প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু ভক্ত জীবনে কি সৌন্দর্য্যই তুমি দেখালে! সুন্দর দেবতা, ভাগবতী তনু কি তাহাও যে দেখাইলে। আর কি নিরাশ

হব প্রভু, সশরীরে স্বর্গের শোভা দেখিয়াছি, বিশ্বাস ভরে তাই গাই "সম্মুখে অমরধাম আমাদের গম্যস্থান"।

আনন্দ, তুমি কি পূর্ণানন্দ! তবে কেন এ ভীষণ ৮ই জানুয়ারী আনিয়াছ? এত ক্রন্দন, এত বেদন, এত হাহাকার লইয়া কেন এ দিন আসিল ধরায়। ভক্ত যে বলেছেন তুমি আনন্দ। জানিলাম প্রভু, তুমিই আনন্দ। শেষে কেবল আনন্দ। ভক্তের হাসি তুমি, ব্রহ্মানন্দের আনন্দ তুমি। ভক্ত হেসেছিলেন ভেসেছিলেন, তোমার আনন্দ স্রোতে। সেই আনন্দধামের দ্বার উন্মুক্ত যে আমাদের জন্য এত স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন তাই আজ প্রাণভরে গাই "সম্মুখে অমরধাম আমাদের গম্যস্থান"।

সেবিকা—মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী।

ব্রহ্মোৎসব—নবজন্মোৎসব।

শ্রীমৎ আচার্য্য দেব বলিলেন "উপাসনা আর কি রংপরিবর্ত্তন। সুন্দরীর কাছে বসে কাল ভ্রমর সুন্দর হয় আর বর্ণ সুন্দর হয়।"

বাস্তবিক এই পৃথিবীর পাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত জীবকে শুদ্ধ, শুভ্র, সুন্দর করিবার জন্য এবং নিত্য-সুখে সুখী করিবার জন্যই এই উপাসনা। উৎসবের অবতরণও তাহারই জন্য।

প্রকৃতিতে যেমন যখন মানুষ শীতে কম্পিত হইতেছিল, আকাশের বসন্ত সমীরণ আসিয়া সে শীতের কম্পন হইতে মানবকে মুক্ত করিল এবং নবভাবে তাহাকে উৎফুল্ল করিল, তেমনি স্বর্গের উৎসব আসিয়া সংসারের দীন দুঃখী পাপ শৈত্যে ক্লিষ্ট জীবদিগকে স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ করে, নব উৎসাহে, নব জাগরণে, নব জীবনে সঞ্জীবিত করে।

কেন না উৎসব বাস্তবিক পৃথিবীতে স্বর্গের মিলন। স্বর্গের ঈশ্বর স্বর্গের দেব দেবীদিগকে লইয়া যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, এবং পৃথিবীর জীবদিগকে তাহাদের সঙ্গ সম্ভোগ করিতে দেন, তখনই যথার্থ উৎসব হয়।

এই জন্যই সঙ্গীতাচার্য্য গাহিলেন, "চল ভাই যাই সবে, মহা মহোৎসবে অমরধামে যোগবলে"। অমরদলে যোগবলে মিলনই উৎসব।

এক্ষণে যাঁহারা শুদ্ধাত্মা দেবাত্মা তাঁহারই ত অমর। পাপই মৃত্যু। এই মৃত্যু হইতে যাহারা মুক্ত হইয়াছেন তাঁহারাই অমর। তাঁহাদের সঙ্গ সহবাস বিশুদ্ধ বাতাসের ন্যায় যে শুদ্ধতাপ্রদ, স্বর্গীয় বিশুদ্ধ জীবনপ্রদ, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

উপাসনার অর্থও ব্রহ্মের নিকট উপবেশন। যিনি পবিত্রতার আকর তাঁহার নিকট যথার্থ উপবেশন করিলে তাঁহার পবিত্রতার প্রভাবে পাপ জীবন পরিবর্ত্তিত না হইয়া কি পারে। তাই ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "উপাসনা আর কি, রং পরিবর্ত্তন", যাহাদ্বারা পাপের কালিমা পরিবর্ত্তিত হইয়া সৌন্দর্য্যে পরিণত হয়, তাহাই উপাসনা।

উৎসব আর কি এই উপাসনার আরো উচ্চ অবস্থা। বিশেষ ভাবে মা যখন সমুদয় অমর ভক্ত সন্তানগণকে লইয়া আমাদিগকে তাঁহাদিগের সঙ্গে উপবেশন করিতে অধিকার দেন, তখনই ত উৎসব হয়।

বনের পশুদিগকে যাহারা শীকার করে, তাহারা যেমন পোষা পশুদিগকে সঙ্গে লইয়া বন্য পশুদিগকে আকৃষ্ট করে এবং বশ করে তেমনি স্বর্গের মা যিনি পৃথিবীর পাপী সন্তান দিগকে তাঁহার বাধ্য সন্তান সরল পবিত্র শিশু করিবার জন্যই তাঁহার অমর শিশুদলকে লইয়া এই উৎসবে বিচরণ করেন।

অগ্নি স্পর্শে যেমন কয়লার মলিনত্ব দূর হয় এবং তৃণ কুটাও অগ্নিময় হয় তেমনি মা ও তাঁহার অমর সন্তানগণের পবিত্রতার অগ্নির স্পর্শে পাপীদিগকে পরিবর্ত্তিত অগ্নিময় করিবার জন্যই উৎসব আনয়ন করেন।

তাই ব্রহ্মোৎসব যথার্থ আমাদিগকে পরিবর্ত্তিত নবজীবন নবজন্ম দিবার জন্যই সমাগত। ব্রহ্মোৎসব কেবল বাহিরের আড়ম্বর নয়, ব্রহ্মোৎসব কেবল ব্রহ্মের মহিমা গান ও মহিমা প্রচার নয়, কিন্তু তাঁহার প্রভাবে বিশুদ্ধ জীবন নূতন জীবন নূতন জন্ম লাভ করাই যথার্থ ব্রহ্মোৎসব। পাপ জীবন ক্ষয় করিয়া পাপ জন্ম পরিহার করিয়া স্বর্গীয় দ্বিজত্ব অমরত্ব নবশিশু জন্ম যাহাতে লাভ হয় তাহাই আমাদিগের উৎসব।

আচার্য্য বলেন "যেখানে উৎসব, সেই খানেই নূতন"। যখন কোন বাড়ীতে উৎসব হয় তখন বাড়ীতে নূতন রং দেওয়া হয়, নূতন ভাবে তাহাকে সজ্জিত করা হয়। নূতন আনন্দে নূতন উৎসাহে, নূতন বাদ্য বাজনার শব্দে গৃহ আনন্দের বেশ ধারণ করে।

তাই উৎসবের অর্থই নূতন। এই জনাই নববিধানের উৎসব বিশেষ ভাবে পুরাতনকে নূতন করিবার জনা পাপী অশুদ্ধকে বিশুদ্ধ নবজীবন প্রাপ্ত মার নবশিশু করিবার জন্যই সমাগত।

আমরা যখন ব্রহ্মকে আরতি করিয়া অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া উৎসব আরম্ভ করি, তাঁহার প্রভাবে তাঁহার অমর সন্তানগণের সঙ্গ সহবাসে, বাস করিয়া যেন যথার্থ পরিবর্ত্তিত বিশুদ্ধ নবজীবন লাভ করিতে পারি এবং আমরা যাহাতে নবজন্ম লাভ করিয়া মার নবশিশুদল হইতে পারি মা আমাদিগকে ইহাই আশীর্ব্বাদ করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ধর্ম্মের গণ্ডী।

প্রবাহিত নদীর জল যদি পুষ্করিণীতে আনিতে চাও পুষ্করিণীর বাঁধ কাটিয়া দাও। আকাশের মুক্ত বাতাস যদি ঘরের ভিতর বসিয়া সেবন ও সম্ভোগ করিতে চাও, ঘরের দরজা জানালা উন্মুক্ত করিয়া দাও। তেমনি ঈশ্বরের কৃপার স্রোত যদি লাভ করিতে চাও আমিত্ব পুরুষকারের বাঁধ কাটিয়া দাও। স্বর্গের বিধানের সু বসন্তের সমীরণ যদি সম্ভোগ করিতে চাও, আত্মাভিমান সম্ভূত ধর্ম্মের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও। বুদ্ধি ও মতের গণ্ডী যেখানে অনন্ত ধর্ম্মবিধানের মুক্ত বাতাস আসেনাত সেখানে।

জীবন্ত নববিধান নিত্য নূতন।

নববিধান জীবন্ত ধর্ম্মবিধান, জীবনের বিধান। জীবিত বৃক্ষের যেমন নব নব বৃদ্ধি হয়, তাহাতে নব নব পুষ্প পত্র পুষ্পের উদ্গম হয়, মৃত বৃক্ষের তেমন হয় না। স্রোতস্বতী যেমন ক্রমাগত সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়, বদ্ধ জল তেমন নয়। তেমনি জীবন্ত ঈশ্বরের ধর্ম্মবিধান চির জীবন্ত এবং এই জন্যই ইহা নিত্য নূতন। তাই নিত্য নূতনত্বই নববিধান। নববিধান কেবল নবযুগের বিধান বলিয়া যে নূতন বিধান তাহা নহে। নিত্য নবজীবন, নব দর্শন, নব শ্রবণ, নব যোগ, নব ভক্তি এবং নব নবজীবনের উন্নতি অভিব্যক্তিপ্রদ বলিয়া নববিধান নববিধান। ইহা কেবল মত, বুদ্ধি, শাস্ত্র সংস্কার বা ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে নিবদ্ধ নহে।

নববিধানের একত্ব।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ধর্ম্ম সাধকগণ ধর্ম্মসাধন ব্যক্তিগত সাধন জানিয়া নিজ নিজ আত্মোন্নতির জন্য নিজ নিজ পরিত্রাণ লাভের নিমিত্তই ধর্ম্মসাধন করিয়াছেন। কেবল আত্মোন্নতি সাধনই ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশ্য, ইহা মনে করিয়া কেহ বা মনে কেহ বা বনে ধ্যানে ধর্ম্মসাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহারপর "একাকী বাহলে পথে নাহি পরিত্রাণ" এই মন্ত্র যখন ধর্ম্মসাধকগণ শুনিলেন, তখন দলবদ্ধ হইয়া ভাই ভগ্নী মিলিয়া পরস্পরের সহযোগে ধর্ম্ম সাধনে আকাঙ্খিত হইলেন। তখন আর ব্যক্তিগত নির্জ্জন সাধনে কেবল চলিল না। কাজেই ধর্ম্মসাধকগণ পরিবার এবং দলে আবদ্ধ হইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ব্যক্তিগত নির্জ্জন সাধন এবং পরিবার ও দলবদ্ধ স্বজন সাধন দুইয়ের সমন্বয়ে "নববিধানের" নূতন সাধন প্রবর্ত্তিত।

এই সাধনে ব্যক্তিগত সাধনের "আমি" মণ্ডলীগত সাধনের 'আমরা' একীভূত, ব্যক্তিগত সাধনে অহংকৃত পুরুষকার বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কা। পরিবার গত এবং মণ্ডলীগত সাধনের ধর্ম্মহীন বাহ্য আড়ম্বরের ও সম্ভাবনা। এই দুই "নববিধান" সাধনে তিরোহিত হইয়াছে। এখানে আমি আমার নাই, আমি এবং আমরা দৃঢ়রূপে একজনে নিমজ্জিত। এক সদল অখণ্ড মানবত্ব লাভই নববিধান সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। "আমি আমার ভাই এক"। ভাই ছাড়া আমার স্বাতন্ত্র্য পুরুষত্ব নাই। একত্বেই জীবন, একত্বেই সাধন, একত্বেই স্বর্গত্ব একমেবাদ্বিতীয়মের পূজা ও প্রেরণা লাভ। হারমোনিয়মের বাজনা একটা রিডে হয় না, তেমনি একত্ব বিনা নববিধান যন্ত্র বাজে না। কোন স্থান শূন্য হইলে যেমন আকাশের বায়ু আসিয়া তাহা পূর্ণ করে তেমনি আমাদের প্রত্যেকজনের "আমি" নাই হইলে তবে পবিত্র আত্মার নিশ্বাস আমাদিগকে নিশ্বসিত করে।

পাপবোধ।

রোগ গোপন করিলেই রোগ বাড়িয়া যায় ও মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে। রোগ ধরাপড়িলেই তাহার আরোগ্য হইবার উপায় হয়। পাপও আত্মার রোগ। পাপ যত গোপন করিয়া পুষিবে, তত পাপ আরো বৃদ্ধি হইবে এবং তাহাতে আত্মার মৃত্যু অবিলম্বেই আনিবে। পাপ স্বীকার করিয়া যত তাহার জন্য অনুতাপ করিবে তত তাহা অনুতাপ অশ্রুতে ধৌত হইয়া যাইবে। এই নিমিত্ত নববিধানাচার্য্য আপনাকে পাপীর সর্দ্দার বলিয়া স্বীকার করিলেন ও পাপের সম্ভাবনাতেও ছট্ ফট্ করিতেন।

আমরা পাপী হইয়াও পাপ স্বীকার করিতে চাই না, এবং তাহার জন্য অনুতাপ করা দূরে থাক, পাপ গোপন করিয়া সর্ব্বদাই সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে চাই। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার সময় আমরা মুখে আপনাদিগকে পাপী বলি সত্য, কিন্তু তাহা অনেকটা মৌখীক, কেননা যদি কেহ আমাদের কোন পাপ দোষ দুর্ব্বলতার কথা দেখাইয়া দেন তখনি আমরা রাগিয়া তাহাকে অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হই। আবার আমাদের পাপ থাকিতেও অনেক সময় জানিয়া শুনিয়াও আত্ম প্রবঞ্চনা করি, আমরা অন্যের অপেক্ষা সাধু হইয়াছি মনে করিয়া আপনাদিগকে সাধু বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যস্ত হই। ইহাই আমাদের পতনের কারণ। ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মের সন্তান নামই ব্রাহ্ম সমাজের পতনের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আচার্য্য আক্ষেপ করিয়া বলিলেন "আমি ইঁহাদের লইয়া পারিলাম না আমার মত যদি পাপী পাইতাম তাহা হইলে পারিতাম" এবং নিজের সম্বন্ধেও বলিলেন "আমি পাপী বলিয়া পুণ্যাত্মা হইতে চাই না, আমি কালো ছেলে মার কাছে দৌড়ে যাচ্ছি"। সত্যই যদি আপনাদিগকে আমরা কালো বলিয়া বিশ্বাস করিতাম ভাল হইবার জন্য মার কাছে দৌড়িয়া যাইতে ব্যাকুল হইতাম। পাপ বোধের জ্বালা যদি অনুভব করিতাম রোগ মুক্ত হইবার জন্য

ছট্ ফট্ করিতাম। আমরা সাধু হইয়াছি, ব্রাহ্ম হইয়াছি, এই আত্ম প্রবঞ্চনাতেই আমাদের উন্নতির পথ রোধ করিয়া ফেলিতেছি। কবে আমরা যথার্থ পাপী বলিয়া আপনাদিগকে স্বীকার করিয়া পাপীর সর্দ্দারের দল হইব।

—৹—

নববিধান সঙ্ঘ।

"অমিশ্র বিধান গ্রহণ" সম্বন্ধে শ্রীনববিধানাচার্য্য প্রার্থনায় বলিলেন "হে নববিধানের রাজা, আমার যদি বিচার হয়, আমি বলিতে পারিব না এ সমুদয় আমারই। আমি বলিব এ সমুদয় ইহাঁদেরই। ইহাঁরা বলিতে পারিবেন ইহাঁরা স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাবে চলিয়াছেন ধর্ম্ম-সাধন করিয়াছেন। দুই এক বিষয়ে মত লইয়াছেন, কিন্তু স্বাধীন ভাবেই সব করিয়াছেন সেই জন্য এত অমিল মতভেদ। এক বিধি এক আদর্শ গ্রহণ করেনা বলিয়াই অনেক বিবাদ বৈলক্ষণ্য। দশজন কারিকরে এই নববিধান গড়িয়াছেন। ক্রমাগত যার মনে যে ছাঁচ আছে সেই রকম সে করিতেছে। দয়াময় কি হইল? আমার জিনিষ বলে আমি স্বীকার করিতে পারিতেছিনা। গোড়ার নক্সা যে আমার তাতে কেন অন্য রং মিশাইলেন? আমার আদর্শ বদলে দিলেন কেন? গরীবের আদর্শটা পৃথিবীতে রইল না যে। কাপড়ে রিপু করিতে তালি দিতে আমি আসি নাই। আমি যে একখানা নূতন কাপড়ের আগা গোড়া করিতে আসিয়াছি। তবে কেন পাঁচ জনে আমার কাজের সঙ্গে গোলমাল করিলেন' পাঁচরকম মত মিশাইলেন। পরমেশ্বর, পবিত্রাত্মা সম্ভূত এক ভাব জাত, সুজাত, সুকুমার নববিধানকে এনে দাও। তোমার সত্য বজায় থাকিবে, পৃথিবী জানিবে যথার্থ নববিধান কি"।

বাস্তবিক যে নববিধান সূর্য্য একদিন সমস্ত জগতের অন্ধকার দূর করিয়া সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করিবে এবং সর্ব্বত্র গৃহীত এবং পূজিত হইবে, আমরা সেই বিধান সূর্য্যের উদয় প্রথম দেখিলাম। যে নববিধান সমুদয় ধর্ম্মকে নবজীবন দিয়া সমস্ত জাতিকে বাঁচাইবে এবং সকলকে এক অখণ্ড মানব অঙ্গে গ্রথিত করিয়া স্বর্গের ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ করিবে। আমরা সেই বিধানের আশ্রয়ে সর্ব্বাগ্রে স্থান পাইলাম।

সেই বিধান প্রবর্ত্তক শ্রীব্রহ্মানন্দের পবিত্র সঙ্গ সহবাস ও সম্ভোগ করিলাম, এবং তাঁহার মুখ বিনিসৃত ব্রহ্ম-প্রেরিত বাণী শ্রবণেরও অধিকার পাইলাম। কিন্তু হায়! আমরা সে বিধান গ্রহণের পূর্ণ সাক্ষ্য দান করিতে পারিতেছি কই? নববিধান সম্বন্ধে এই মণ্ডলী মধ্যে কতই যে মতভেদ চলিতেছে, কতই ভেজাল মেশাল ভাব ইহার মধ্যে সঞ্চার করিবার ভাব আসিয়াছে, কতই যে ইহার উচ্চ মতকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং আচার্য্য-দেব তাঁহার পূর্ণ আদর্শ গ্রহণ সম্বন্ধে যে আক্ষেপ করিলেন তাঁহারই সত্যতা, যে অক্ষরে অক্ষরে ও কার্য্যতঃ আমরা সপ্রমাণ করিতেছি ইহাকি আমরা অস্বীকার করিতে পারি?

তিনি অন্যত্র প্রার্থনায় বলিলেন "আমরা ব্রাহ্ম এই কথা বলিলে অনেক লোক পাই, আমরা নববিধান বাদী বলিলে তার চেয়ে কম লোক পাই। ইহাতেও কথাতে অনেকের মিল হয় কিন্তু ভাবে অনেক অমিল। আমরা সকলেই বলি নববিধান মানি, কিন্তু একজনের নববিধান আর একজনের নয়, একজনের ঈশ্বর আর একজনের নয়।" ইহাও কি সত্য নয়?

যথার্থ এখন যেন আমাদের একজনের নববিধান আর এক জনের নয়, একজনের কেশব আর একজনের নয়, একজনের মত আর একজনের নয়, এই ভাবই আমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। আমরা আপনাদিগকে নববিধানবাদী বলিয়া স্বীকার করিয়াও কতই যে ইহার অপমান করিতেছি তাহা কি আমরা স্বীকার করিব না? এইজন্য নির্ব্বন্ধচিত্তে আমাদের এই কাতর নিবেদন যে আচার্য্য গ্রহণ সম্বন্ধে এবং নববিধান বিশ্বাস সম্বন্ধে, ইহার প্রচার এবং সাধন সম্বন্ধে যে সকল মতভেদ উপস্থিত হইতেছে, তাহা আপনোদনের জন্য অবিলম্বে বর্ত্তমান মণ্ডলীর প্রেরিত প্রচারকগণ এবং নেতা ও নেত্রীগণ সমবেত হইয়া এক নববিধান সঙ্ঘ আহ্বান করুন। এবং নববিধানের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে এবং ইহার সাধন সম্বন্ধে যাহাতে আমাদের মধ্যে একতা সংস্থাপিত হয় তাহার সুব্যবস্থা করুন।

এই প্রস্তাব গ্রহণে যাঁহারা সম্মত তাঁহারা আসুন বিশেষভাবে আচার্য্যদেবের পুস্তক সকল প্রার্থনাযোগে অধ্যয়ন করি এবং তাঁহার ভাবের অনুবর্ত্তীতায় নববিধান সাধন দ্বারা সঙ্ঘের জন্য প্রস্তুত হই।

আচার্য্যদেব বলিয়াছেন তিনি নববিধানের নক্সা। মায়ের হুকুমে আঁকিয়াছেন। আমাদিগকে এক্ষণে সেই নক্সার অনুরূপই নববিধানের অট্টালিকা গঠন করিতে হইবে। ইহাই কি আমাদিগের দায়িত্ব এবং জীবনের কার্য্য নয়?

স্বর্ণকার যেমন গহণা নির্ম্মানের পূর্ব্বে তাহার একটি ছাঁচ তৈয়ারী করে, এবং সেই ছাঁচে ঢালাই করিয়া গহনা নির্ম্মাণ করে, তেমনই ব্রহ্মানন্দ-জীবন মায়ের হাতে গঠিত নববিধানের ছাঁচ, এই ছাঁচে ঢালাই হইয়া আমাদিগকে নববিধানের পরিবার ও দল গঠন করিতে হইবে। অন্যথা হইবে না। সময় আসিয়াছে যখন এ সম্বন্ধে আমাদের আর উদাসীন থাকিলে চলিবেনা, এজন্য সমবেত চেষ্টা করিতে হইবে আর কাল বিলম্ব করিলে হইবে না। এ সম্বন্ধে যদি কেহ কিছু সুপারমর্শ দিতে চান ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিলে কৃতার্থ হইব।

দীন সেবক।

নববিধানবিষয়ক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মানুষের সঙ্গে মানুষের শক্রতা ঘটিলে যাহা সাংঘাতিক নয় তাহা সাংঘাতিক বোধ হয়। জীবন্ত ধর্ম্ম মানবপ্রকৃতির মধ্যে নানা আকার ও নানা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোথাও বা মহাবিজ্ঞান, কোথাও মহাভাব, কোথাও মহাকীর্ত্তি, কোথাও দেশাচার সমাজ সংগঠন ইত্যাদি। নানা প্রকার বৈচিত্র্য মধ্যে যে ঐক্য সমন্বয় আছে তাহাই লাভ করা আমাদের সাধনের বিষয় এবং আদর্শের সিদ্ধি। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সাক্ষাৎ সম্মিলন ইহাই ভবিষ্যতের ধর্ম্ম, সর্ব্ব জাতি ও সর্ব্ব ধর্ম্মের অবলম্বনীয় ও উদ্দেশ্য। সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বকালীন পূজ্য পুরুষগণ আমাদের পরমাত্মীয়, তাঁহাদের সঙ্গে নিত্য সহবাস হইবে; তাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদের অধিকৃত ঐশ্বর্য্য হইবে। তাবৎ মানবজাতীয় উন্নতি আমাদের নিজ উন্নতির আদর্শ হইবে। সর্ব্ব প্রকার উচ্চজ্ঞান, উচ্চনীতি, উচ্চস্বাধীনতা, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাব আমাদের উপার্জ্জন ও সম্ভোগের বিষয় হইবে। সার ধর্ম্ম বলিতে যেখানে যা বুঝায় সে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইব। বিজ্ঞানে ও বিশ্বাসে স্বাভাবিক সামঞ্জস্য, সাংসারিক বিহিত কর্ত্তব্য এবং যোগ বৈরাগ্য মধ্যে সামঞ্জস্য, সভ্য রীতিনীতির সঙ্গে ধর্ম্মনীতির সামঞ্জস্য, মানব জীবনের সর্ব্ববিভাগের সামঞ্জস্য দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করিবে। আমার নিজের জীবন এই সামঞ্জস্য ও শান্তিলাভ করিতেছে। কে আমাদের গতি রোধ করে, কে আমাদের ভাব বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিতে পারে? এ সম্বন্ধে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ একীভূত। হে মঙ্গলময়, আমরা এই সতেজ সবল স্বাভাবিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তোমার অনন্ত অখণ্ড আত্ম পরিচয়ের অধিকার পাইলাম। তুমিই ধন্য!—আশীষ।

—•—

নববিধানের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা।

প্রাপ্ত।

[১]

আচার্য্য কেশবচন্দ্র (অন্ত্যবিবরণ) এর অংশ, পৃষ্ঠা ২৮১।— ১১ই ফাল্গুন, ইংরাজী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে শ্রীনববারে নববিধানকে সুদৃঢ় করিবার বিষয়ে এইরূপ কথোপকথন হয়।—"বর্ত্তমান সময়ে নববিধানকে স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে। যাহাতে উহা প্রাচীন ব্রাহ্মমণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হইয়া তন্মধ্যে বিলীন হইয়া না যায় তৎপক্ষে যত্ন করিতে হইবে। স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে গিয়া অনুদারতায় নিপতিত হইবার সম্ভাবনা, এ ভয় করিলে চলিবেনা। কেননা একদল বিপক্ষ দণ্ডায়মান হইয়াছে, যাহাদিগের উদ্দেশ্য অতি ভয়ানক। এখনই তাহারা * * * স্রোত প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। কালে এ দেশ এই স্রোতে ভাসিয়া যাইবে যদি আমরা সতীত্ব রক্ষক না হইয়া দাঁড়াই।"

ঐ বিষয়ে আমাদের কোন প্রাচীনবন্ধু লিখিয়াছেন,—"নববিধানের উপাদানে আপনারা গঠিত নববিধান আপনাদের অন্ন পান। নববিধানের গৃহে যদি দুইজন বিশ্বাসীলোক দাঁড়াইয়া থাকেন তাহাতেও আমাদের গৌরব। অন্য সমাজে অনেক লোক আছে আর আমাদের মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র সমাজ, সিন্ধুতে বিন্দুর মত মিসিয়া যাইবে। আমরাতো নববিধান ও নববিধান আচার্য্যকে দেখিয়া গেলাম কিন্তু আমাদের ভাবীবংশ নববিধান ও আচার্য্য সম্বন্ধে প্রতিবাদ সম্ভূত গরল পান করিতে থাকিবে। যদি অন্য দল মিলিতে চান তাহা হইলে নববিধানের অস্তিত্ব বিলোপ করিবার জন্য মিলিবেন।"

—•—

অষ্টনবতিতম মাঘোৎসব

প্রস্তুতি সাধন।

নববিধান নিত্য উৎসবের বিধান। মাঘোৎসব নববিধানের বিশেষ উৎসব। এই উৎসবই নববিধানের জন্মোৎসব। এই উৎসবের প্রস্তুতি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠার দিন হইতে আরম্ভ তাহারই নিদর্শন মাঘোৎসবের প্রস্তুতিতে। নববিধান বিশ্বাসীগণ যে যেখানে থাকুন ১লা জানুয়ারী নববর্ষ দিন হইতে প্রস্তুতি সাধন করিয়া মহোৎসবে যাত্রা করেন।

১লা জানুয়ারী নববর্ষ দিন। রাত্রি ১২টায় নববিধানাচার্য্যের আবাস প্রাঙ্গণ কমলকুটীরের ছাদের উপর নববিধানের সমন্বয় পতাকা উত্তোলন করিয়া উৎসবের প্রস্তুতি ঘোষিত হয়। এবারও প্রত্যূষে নবদেবালয় প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা সংকীর্ত্তন যোগে করা হয়। বেলা ৯টায় এইখানে এবং প্রচারাশ্রম দেবালয়ে রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্মরণার্থ বিশেষ উপাসনা হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনা ভাই প্রমথ লাল সম্পাদন করেন।

২রা জানুয়ারী প্রাতে "নববিধানের প্রতি" আচার্য্য ও প্রেরিতবর্গকে কৃতজ্ঞতা দান সম্বন্ধে বিশেষ উপাসনা প্রচারাশ্রমে হয়। সন্ধ্যায় আলোচনা হয়।

৩রা মাতৃভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্মরণ বিষয়ে উপাসনা আলোচনা এবং কীর্ত্তন হয়।

৪ঠা "গৃহের প্রতি" কৃতজ্ঞতা সাধন সম্বন্ধে উপাসনা হয়। মন্দিরে প্রসঙ্গ ও কীর্ত্তন হয়।

৫ই "শিশু সেবা"। বৈকালে ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ের সুপারিন্টেণ্ড কুমারী নির্ভর প্রিয়া দেবী বিশেষভাবে ছাত্রীদের সেবা করেন ও এই উপলক্ষে করাচির ডাঃ রুবেনের দলকে অভ্যর্থনা করা হয়। সন্ধ্যায় আলোচনা ও কীর্ত্তন হয়।

৬ই "ভৃত্য সেবা" প্রচারাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয় এবং ১৭ জন ভৃত্যের সেবা করা হয়।

৭ই "দীন সেবা"। সন্ধ্যায় আলোচনা ও কীর্ত্তন হয়,

৮ই প্রত্যুষে আচার্য্যের স্বর্গারোহণ প্রকোষ্ঠে নাম পাঠ হয়। ৯টায় নবদেবালয়ে উপাসনা হয়। অপরাহ্নে আলবার্ট হলে স্মৃতি-সভা ও বক্তৃতান্তে ভজন হয়। সন্ধ্যায় মন্দিরে ভাই প্রমথ লাল উপাসনা করেন উপাসনার পর হিন্দি ভজন হয়।

৯ই "মহাজনগণ"। প্রাতে প্রচারাশ্রমে উপাসনা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীনগেন্দ্র নাথ লাহার বাড়ীতে উপাসনা ও সংকীর্ত্তন হয়।

১০ই "জন হিতৈষীগণ"। প্রাতে প্রচারাশ্রমে উপাসনা ও সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে আলোচনা ও কীর্ত্তন হয়।

১১ই "উপকারীগণ"। প্রাতে উপাসনা ও সন্ধ্যায় মন্দিরে কীর্ত্তনাদি।

১২ই "বিরোধীগণ"। ভাই প্রমথ লাল উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় আলবার্ট হলে আলোক চিত্র যোগে শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন বক্তৃতা করেন।

১৩ই প্রাতে প্রচারাশ্রমে উপাসনা। সন্ধ্যায় মহিলাদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবী সম্পন্ন করেন। প্রচারাশ্রমে কীর্ত্তন হয়।

১৪ই প্রাতে প্রচারাশ্রমে উপাসনা হয়। সন্ধ্যায় গোলদিঘীতে সংকীর্ত্তন হয়। রাত্রে ব্রহ্মমন্দিরে কেহ কেহ সংকীর্ত্তনযোগে উপাসনা ও প্রার্থনা, পাঠাদি করিয়া জাগরণ করেন।

১লা জানুয়ারী হইতে ১৪ই পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে ৭৷৷০টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ভ্রাতা অনুকূল চন্দ্র রায় বিশেষ উপাসনা করেন।

শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে ও এই কয়দিন বিশেষ প্রাত্যহিক সাধন হয়। শিশুসেবা, ভৃত্যসেবা, দীনসেবাদি অনুষ্ঠিত হয়, এখানে ১৩ই আত্মার জন্য, ও ১৪ই চিত্তশুদ্ধির জন্য, বিশেষ সাধন হয়।

অন্যান্য স্থানে কোথায় কি ভাবে প্রাত্যহিক সাধন বিশেষ ভাবে হইয়াছে জানিতে পারিলে প্রকাশ করিব।

—০—

লক্ষ্ণৌ—অযোধ্যা ব্রাহ্মসমাজ।

১১ই মাঘে (২৫শে জানুয়ারী, ১৯২৮) বিবৃত :

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাত্তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবে এবং যে যে কর্ম্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।

এই শ্লোক দ্বারা প্রমানিত হইতেছে যে পুরাকালে আমাদের দেশে এমন জ্ঞানী লোক সকল ছিলেন যাঁহারা মনে করিতেন যে লোকে গৃহস্থ হইয়া সংসারিক জীবন যাপন করিয়াও ঈশ্বরে অনুরক্ত ও তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ অর্থাৎ সত্য অনুভব করিতে এবং ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারেন; সংসারীর পক্ষে এ অবস্থা অসম্ভব নয়। পূজনীয় আর্য্যগণের বংশ সম্ভূত আমরাও এইরূপ ব্রহ্মপরায়ণ গৃহস্থ জীবনকে আমাদের আদর্শ করিয়াছি। ইন্দ্রিয়গণের সহিত বাহ্য বস্তুর সংযোগ হইলে মানসিক উত্তেজনা হয়। যাহাতে এইরূপ উত্তেজনার অবকাশ অধিক না হয় এবং মন একান্তে তত্ত্বানুশীলনে রত থাকে এজন্য তত্ত্বানুরাগী সাধকগণের মধ্যে সংসার ত্যাগ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু এই পথ আশ্রয় করিয়াও যে সকল সমগ্র সত্য অর্জ্জন ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না তাহার দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ সন্ন্যাসীদের দেখিলে একথা সহজে বুঝিতে পারা যায়। যোগ-বাশিষ্ট বলিতেছেন, "নিজের যত্ন তত্ত্ব নিশ্চয় যোগে অবিবেক হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া, বলপূর্ব্বক উহাকে সৎশাস্ত্র ও সাধু পুরুষের অনুসরণে নিয়োগ করিবেক"। সত্যই ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশের ইহা প্রথম সোপান। ধর্ম্মের যে সকল মূল মন্ত্র আছে তাহাতে নিঃসংশয় হইয়া বিশ্বাস স্থাপন এবং যত্ন পূর্ব্বক মনকে অসৎ চিন্তা ও অসৎ কার্য্য হইতে আকর্ষণ করিয়া উহাকে সাধুসঙ্গ, ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ ও ঈশ্বরাধনায় নিয়োগ ভিন্ন প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভের অন্য পথ নাই।

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী চিরদিনই পৃথিবীতে বিরল। কঠোপনিষৎ বলিতেছেন, "অনেকে যাঁহাকে শ্রবণ করিতেও পায় না, অর্থাৎ অনেকের পক্ষে যাঁহার (ব্রহ্মের) বিষয়ে উপদেশ লাভ ও সুদুর্লভ যাঁহাকে শ্রবণ করিয়াও অনেকে জানিতে পারে না, তাঁহার বক্তা দুর্লভ। নিপুণ ব্যক্তিই ইঁহাকে লাভ করিতে পারেন। নিপুণ আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট জ্ঞাতাও দুর্লভ।" তবে কি ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষগণের পৃথিবীতে আসা বিফল হইয়াছে? না তাহা নয়। যেমন অস্পৃশ্য সমুন্নত তুষারাচ্ছাদিত গিরিবক্ষ্য ভেদ করিয়া সুশীতল জলধারা পৃথিবীর উপর প্রবাহিত হইয়া জীব সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করে তেমনি সেই সকল মহাত্মাগণের দেব চরিত্র মনুষ্য সাধারণের দেবভাবকে জাগরিত রাখিয়াছে। "হে স্বপ্রকাশ, পাপীজনবন্ধু ভক্তগণ তোমার অনুগ্রহে ভয়ানক ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া তোমার চরণতরণী ইহলোকে রাখিয়া গিয়াছেন।"—শ্রীমদ্ভাগবৎ।

কিন্তু ইহা বলিলেই সব কথা বলা হইল না। অন্তর্য্যামী পরমাত্মার শুভ প্রেরণা লাভ না হইলে মনুষ্য চরিত্রের কোন বিকাশ সম্ভব হয় না। সেন্টপল্ বলিতেছেন; In like manner the Spirit also helpeth our infirmity: for we know not how to pray as we ought; but the Spirit himself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.

(অনুবাদ) পবিত্রাত্মা আমাদের দুর্ব্বলতায় সহায় হন। আমাদের কিরূপে প্রার্থনা করা উচিত তাহা আমরা জানিনা। আমাদের অভাব কি তাহা পবিত্রাত্মা আমাদের মধ্যে জাগাইয়া

দেন; আমরা তখন অব্যক্ত কাতর স্বরে তাঁহার নিকট আমাদের প্রার্থনা জ্ঞাপন করি।

যেন পবিত্রাত্মাই জীবের হইয়া আপনার নিকট তাহার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। এইরূপে সাধক পূর্ণতা হইতে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হন। তাঁহার গোপনীয় পাপ সকল তাঁহার অন্তশ্চক্ষুর নিকট প্রকাশিত হয়, এবং ঈশ্বর প্রসাদে তাহা দূরিভূত হয়। অন্তরে প্রেম পুন্য জাগিয়া উঠে। হরি ভক্তিতে মন আর্দ্র হয়। ব্রহ্ম সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সাধক কৃতার্থ হন। ব্রহ্ম দর্শন মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক কার্য্য। যেমন শোক তাপাদি উদ্বেগ বিরহিত হৃদয়ে নদী, পর্ব্বত ও উদ্ভিদাদি শোভিত মনোহর প্রকৃতি দর্শন করিলে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ হয় ব্রহ্মদর্শন ও কতক সেইরূপ অবশ্য ব্রহ্ম দর্শন বলিলে ইহা অপেক্ষা আরও অনেক কথা বুঝায়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মদর্শন কোন অস্বাভাবিক শব্দ শ্রবণ বা আলোক দর্শন নয়।

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোহয় মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ কঠোপনিষৎ,

যেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না অর্থাৎ সূর্য্য ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারকা কিরণ দেয় না, এই বিদ্যুৎ সমূহ ও প্রকাশ পায় না। এ অগ্নি কোথায়? অর্থাৎ এই অগ্নি কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশ করিবে? সমুদয় বস্তু সেই দীপ্যমানেরই প্রকাশে অনু-প্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্ত পাইতেছে।

নির্ম্মল হৃদয় সাধকের নিকট তিনি প্রকাশিত হন। সাধক তাঁহাকে আপন ইন্দ্রিয়গণের ও মনের মূল শক্তি এবং সকল কারণের কারণ জানিয়া নিঃসংশয় হৃদয়ে সত্য স্বরূপ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া আপ্তকাম হন। অন্তরের প্রেমোচ্ছাসে শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি প্রেম পোষণ করেন। কেহ তাঁহার শত্রু নন, তিনিও কাহার শত্রু নন। সকল লোকেই ব্রহ্মদর্শন করে, কিন্তু অতি অল্প লোকে ব্রহ্মকে চিনিতে পারে। ইহা সাধন সাপেক্ষ। এবং ব্রহ্ম কৃপা হইতে লভ্য। "যাঁহাকে পরমাত্মা আত্মদর্শনার্থ বরণ করেন, তাঁহা দ্বারাই ইনি লভ্য; তাঁহার নিকটে তিনি স্বকীয় তনু অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ করেন।" কঠোপনিষৎ ১।২৩। ভাগবৎ বলিতেছেন, "শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রার্থ বোধযুপ্ত ভক্তি-যোগে যাঁহাদিগের হৃদয় নির্ম্মল হইয়াছে, তাঁহারা সেই নির্ম্মল হৃদয়ে ধ্যান পূর্ব্বক বৈরাগ্য পরিপুষ্ট জ্ঞানে সর্ব্বপ্রকার বিষয়াকর্ষণ পরিশূন্য ধীর হয়েন। আমরাও তোমার চরণপদ্ম সেই প্রকারে লাভ করিব। মনে হয় হিন্দু ধর্ম্মের অন্যতম আধ্যাত্মিক আদর্শ এই কয়টী কথার মধ্যে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষের উপর ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে। একথা যেন আমরা কখনও ভুলিয়া না যাই।

ধর্ম্মজীবনের দুই অংশ। এক অংশ ঈশ্বরের মধ্যে লুকাইত। তাহা ব্রহ্মদর্শন ও তাঁহার অশব্দবাণী শ্রবনেরত। করুনাময় ঈশ্বর পরীক্ষা বিপদের মধ্যে সাধককে সে বাণী শুনাইয়া আশ্বস্ত করেন, কখন বা কর্ত্তব্য পথে চালিত করেন, আবার কখন বা নূতন নূতন আদর্শ প্রকাশ করিয়া চরিত্রের পূর্ণতা সম্পাদন করেন। ধর্ম্মজীবনের অপরাংশ ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন থাকিয়া নিঃস্বার্থ প্রেমে জন সেবার রত হওয়া।

এ জীবনের মূল কথা এই ঈশ্বরের প্রতি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রেম ও তাঁহাতে আত্মসমর্পণ।

(অনুবাদিত) "সংগ্রাম নিকটতর হয়ে এসেছে। জীবন ও ঈশ্বরের মধ্যে এ সংগ্রাম। জীবন এবং তাহার যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহা সমর্পণ করিতে হইবে, নচেৎ পবিত্রাত্মা বলিতে-ছেন যে তাঁহার সহিত যোগ এবং তাঁহার সেবা করিবার অবসর তোমা হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে। ঈশ্বর যে পরিমানে জীবনের আরাম ও আবশ্যকীয় যাহা কিছু দিবেন ঠিক সেই পরিমানে হইবে, তাহার অধিক নয়। নিজের জন্য নিজে কিছু না রাখিয়া সকলই তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিতে হইবে। হে প্রভু, তোমার প্রতি সর্ব্বগ্রাসী প্রেম, আর কিছু নয়, এই সংগ্রামের মিমাংসা করিতে পারে। দেশ, জীবন, মরণ অনন্তজীবন, তোমার প্রতি ভালবাসার উপর নির্ভর করিতেছে। তোমার সন্তানদিগকে তোমাকে ভালবাসিতে শিখাও"। (Heart Beats)

লক্ষ্ণৌ। শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসু।

প্রেরিত পত্র।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক মৎ প্রেরিত পত্র খানি ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রের এক পার্শ্বে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

১৬ই অগ্রহায়নের ধর্ম্মতত্ত্বে আমাদের নববিধান বিশ্বাসী বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগ মোহন দাস মহাশয়ের বহু গবেষণা ও গভীর চিন্তা প্রসূত সুদীর্ঘ পত্র বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিলাম। আমার এই ক্ষুদ্র পত্রের প্রবেশ দ্বারে আমি দাস মহাশয়ের বহুদর্শিতা, অতীতের অভিজ্ঞতা ও তাঁহার প্রেমাভিষিক্ত হৃদয়ের আবেগ ও আকাঙ্খার ভূয়সী প্রসংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি কনিষ্ঠ হইলেও বরিষ্ঠ ও নমস্য। তাঁহার সুদীর্ঘ ও সমীচীন পত্র আমাদের সকলেরই অধীতব্য। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের মিলন সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। আমার পঞ্চ সপ্ততি বর্ষের অভিজ্ঞতায় এ সম্বন্ধে যাহা নিবেদ্য তাহাই নিবেদন করিতেছি। প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজে এক নিগূঢ় ও অপোরক্ষ সত্য বর্ত্তমান। বাহিরের বিষয়ের অনেক সমাজের অনেক ভাবের মিল থাকিতে পারে। কেবল বিভক্ত ব্রাহ্মসমাজের ভিতর যে মিল বর্ত্তমান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে সে মিল অন্যাধিক অন্য ধর্ম্মসমাজের সঙ্গেও দেখা

যায়। এমন তরু ও পুষ্প দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের বাহ্যিক আকারে অনেক মিল কিন্তু ভিতরে মজ্জাগত বস্তুতে পার্থক্য আছে। লক্ষ্যের একতায় মিলন। প্রত্যেক মধু মক্ষিকা একই লক্ষ্য লইয়া পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে প্রবেশ করিতেছে। পুষ্প নানা জাতীয় কিন্তু অন্বেষণকারী মধু মক্ষিকা ভিন্ন জাতীয় পুষ্প হইতে পুষ্প রস সংগ্রহ করিয়া মধুচক্রে তাহা এক অভিন্ন বস্তুতে পরিণত করিতেছে। ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেইরূপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ভক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস, গিরিগুহাবাসী পাহাড়ী বাবা, ভক্ত খৃষ্ট বাদী ডল্ ও ইসলাম বাদী জালাল্ প্রভৃতির সঙ্গে এমন এক স্থানে ও এক কেন্দ্রে মিলিলেন যে তাঁহাদের সঙ্গে এক আধ্যাত্মিক যোগ প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু Spiritual identity অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভাবের সমগ্র সামঞ্জস্য সম্ভব হইল না। তিনি সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের একটা Integrity প্রত্যক্ষ করিলেন। খৃষ্টবাদী, ইস্লামবাদী ও ও হিন্দু সকলেরই মধ্যে বিভক্ত ধর্ম্ম মন্দিরের স্বতন্ত্র Integrity অর্থাৎ আভ্যন্তরীন বিশেষত্ব আছে। কেশব চন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের এই Integrity রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভক্ত রামকৃষ্ণ প্রভৃতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক মিলনে মিলিত হইয়াও তাঁহাদিগকে ব্রহ্মমন্দিরের বেদীর আসনে বসিতে অনুরোধ করিতে পারেন নাই। আমার পূর্ব্বপত্রে বলিয়া আসিয়াছি যে এই Integrity রক্ষার জন্য তিনি তাঁহার ধর্ম্ম-পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথকেও ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দিরের বেদীতে উপবেশনের অনুরোধ করিতে পারেন নাই। আমাদিগের ও নববিধানাচার্য্যের সংরক্ষিত ও প্রতিপালিত Integrity কি আমাদের রক্ষনীয় নহে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের ভিত্তি মূল বৈদিক মন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত আর কেশব চন্দ্রের সমগ্র জীবনের সাধনা, আবেগ ও আকাঙ্খার উপর সার্ব্বভৌমিক ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ভিত্তি মূল কোথায়? ইহার ভিত্তি সেই ব্রহ্মানন্দের সাধনা প্রসূত নববিধানের প্রতিবাদ। যাঁহারা আদেশ বাদকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই তাঁহাদের নিকট নববিধান যে উপহাসের বস্তু হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। সমগ্র সাধু মহাজন ভক্ত আদেশ বাদের অনুবর্ত্তী। সিনাই পর্ব্বতে মূশা আদিষ্ট। মরুভূমিতে হজরত আদিষ্ট। শ্রীঈশা গালিলীর বেলা ভূমিতে আদিষ্ট। প্রত্ন ঋষিগণ হিমালয়ের গিরিগুহায় আদিষ্ট। কেশব চন্দ্র নববিধানে আদিষ্ট। আজ এই আদেশবাদ তত্ত্বে আসিয়া এক পুরাতন কথা মনে আসিল। যতদূর মনে আসিতেছে ১৮৯০ সালে যখন আমার সমস্তিপুর ভবনে আমি ও স্বর্গগত ভাই বলদেব উপস্থিত সেই সময়ে আমাদের কুটীরে আদেশ-বাদ বিরোধী সম্প্রদায়ভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক এম এ উপাধিধারী ব্রাহ্মবন্ধু আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের প্রসঙ্গ-স্থলে আদেশ-বাদের আলোচনা হয় এবং সেই আলোচনার মধ্যে সমাগত বন্ধু বলিলেন, "ঈশ্বরের কি মুখ আছে যে তিনি আদেশ করেন"? আমি ও ভাই বলদেব বন্ধুর উক্তিতে নীরব। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি আদেশ-বাদ, আর সাধারণ সমাজের ভিত্তি প্রতিবাদ। জানিনা দুই বিভিন্ন বস্তুর মিলনে কোন্ বস্তু আমাদিগের নিকট এক আধ্যাত্মিক কল্যাণে পরিণত হইবে। তিন সমাজের মিলন বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে ইহা এক দূরদর্শিতা সাপেক্ষ বস্তু। অক্ষুণ্ণ নববিধান ইহার মূলে বর্ত্তমান। নববিধানের অক্ষুণ্ণতা সর্ব্বথা দ্রষ্টব্য। বিশ্বাসীদিগের মিলনাকাঙ্ক্ষা এক স্বর্গীয় বস্তু। এ আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। সূর্য্যমুখী ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হইলেও তাহাদের লক্ষ্য এক। সকল জাতীয় সূর্য্যমুখীই সূর্য্যের দিকে চায়। ব্রহ্মমুখীন প্রাণ ব্রহ্মের দিকে। মিলনোন্মুখী প্রাণ মিলনের দিকে। এখন তিন সমাজের সেই অবস্থা দ্রষ্টব্য। মিলনের প্রশ্ন অনেক দূর আসিয়া পড়ে। আকাঙ্ক্ষিত মিলনের সম্বন্ধ পরস্পরের মধ্যে অধ্যাত্মযোগ। ভাবেতে, গতিতে ও উপাসনায় পরস্পরের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে। উপাসনার ভাব ও প্রণালীগত মিলনের প্রয়োজন। তাহার পর তিন সমাজের ধর্ম্মগ্রন্থের ভাব ও বিশ্বাসগত সামঞ্জস্যের প্রয়োজন। এই সমাজগত মিলনের ভিতর পরস্পরের মধ্যে বেদীর বিনিময় প্রশ্নও আসিয়া পড়ে। অধ্যাত্ম-যোগের ভিতর প্রত্যেক সমাজের উপাসক ও বেদীর ভেদ থাকিতে পারেনা। এক সমাজের উপাসক আর এক সমাজে আসিয়া বেদীর আসনে উপবেশনে অধিকারী। উপাসনা ও উপদেশও এক অভিন্ন ভাবে এক অখণ্ড মণ্ডলীর প্রাণকে স্পর্শ করিবে। নববিধান সমাজ চিরদিনই রাজা রামমোহন ও শ্রীমন্ মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথকে ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়া আসিতেছেন। "Give to Ceasar what is Ceasar's" নববিধান এ নীতি কোন দিন ভুলেন নাই। আমরা নববিধানবাদী ও নববিধানাচার্য্যের অনুগামী শিষ্য। তিন সমাজের মিলনে আমাদের যে ভক্তি কোন অংশে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহাও ভাবিবার বিষয়। আমাদের ভিতরে উপরোক্ত ধর্ম্মপিতা পিতামহদ্বয়ের সম্বন্ধে অচলা ভক্তি বর্ত্তমান, সেইরূপ অপর সমাজ হইতে শ্রীমান্ব্রহ্মানন্দের প্রতি সেইরূপ ভক্তি প্রার্থনীয় ও বাঞ্ছনীয়। সে অবস্থা না হইলে এ মিলন এক অভিধানের শব্দে পরিণত হইবে। আমরা আমাদের পারিবারিক ও আনুষ্ঠানিক জীবনে "নবসংহিতা" পালন করিয়া আসিতেছি। সে নবসংহিতার অক্ষুণ্ণতা আমাদের বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। কোন সমাজ হইতে এই সংহিতা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ভাব আসিলে আমাদের মিলনের উপর ভয়ানক আঘাত পড়িবে। সংহিতার প্রয়োজনীতা কে অস্বীকার করিবেন? বিধাতার পরিবার ও বিধাতার নিয়মে সমাজ গঠনের জন্য প্রত্ন ভারতের মনু ও পরাশরাদি বড় বড় সংহিতাকারক আসিয়াছেন। সময়ের প্রয়োজন বিধায়ে ভারত সমাজের ঊনবিংশ সংহিতা পর পর আসিয়াছে। ইউনিটেরিয়ান ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও নবসংহিতার অনুকরণে এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। বিধাতা আপনার বিধান স্বয়ং রক্ষা করেন। তাঁহার সূর্য্য কোন দিন পশ্চিমাকাশে উদিত হইল

না। তাঁহার সৌর জগত তাঁহার বিধানে আবহমানকাল হইতে এক অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে চলিয়া আসিতেছে।

তাহার পর আমাদিগকে আরও একটী গুরুতর বিষয় ভাবিতে হইতেছে। আমরা নববিধান (New Revelation) দেখিয়া আসিয়াছি। তাহা না হইলে আরও ভিন্ন ভিন্ন একেশ্বরবাদীর দলেও আমাদের পথ উন্মুক্ত ছিল। এই তিন সমাজের মিলনের ভিতর নববিধানের অক্ষুণ্ণতা রক্ষিত না হইলে আমাদের সমক্ষে এক সঙ্কটের অবস্থা বর্ত্তমান। নববিধান ও নববিধানাচার্য্য অক্ষুণ্ণ না থাকিলে আমাদের ভাবি বংশ কোন্ বস্তু ধরিয়া চলিবেন? তাঁহাদের সম্মুখে যদি এ আদর্শ জাগ্রত না থাকে তাহা হইলে আমাদের নববিধানের অস্তিত্ব জলমগ্ন তরীর মত কোন অতলস্পর্শ স্থানে বিলীন হইয়া যাইবে। ভাবী বংশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। আমরা নববিধান দেখিয়া আসিয়াছি। আমরা এক প্রকার চলিয়া যাইতে পারিব, কিন্তু ভাবি বংশ আমাদের পরিবারে আসিয়াও নববিধান শূন্য অনাথের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে।

শ্রদ্ধাস্পদ দাস মহাশয় লিখিয়াছেন যে আমরাও নববিধানের মধ্যে ও সময়ে সময়ে পরস্পর মিলিতে পারি না। অবশ্য এ কথা সত্য। সূর্য্যমুখী সময়ে সময়ে বায়ু বিতাড়িত হইয়া সূর্য্যের বিপরীত দিকেও গিয়া পড়ে; কিন্তু বায়ুর প্রশমাবস্থায় সূর্য্যের দিকেই ফিরিতে থাকে। আমরা সময়ে সময়ে মতদ্বান্দ্বিতার ভিতরে স্থান ভ্রষ্ট হই বটে, কিন্তু আমাদের নববিধানোন্মুখিতা বিধাতার প্রসাদে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, আমরা কেহই নববিধান ছাড়িতে পারি নাই।

তাহার পর বলিতে আসিলাম যে শ্রদ্ধাস্পদ দাস মহাশয় তাঁহার পত্রে কুচবিহার বিহারের উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য স্বর্গগত ভক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার তাঁহার রচিত "Life and Teachings of Keshub Chunder Sen" পুস্তকে এ বিবাহকে ঠিক্ আদর্শ বিবাহ বলিয়া বিবৃত করিতে পারেন নাই। বিধাতার বিধানে যে অনুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হয় তাহাই প্রচলিত নিয়মে আদর্শ বলিয়া পরিচিত হয়। আচার্য্য দেবের তিরোধানের অল্প দিন পরেই খুব সত্বরতার সহিত এই গ্রন্থ লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বিবাহের সম্মুখে যে উচ্চতর আদর্শ আসিয়া পড়িয়াছিল আমি এই পঞ্চসপ্ততি বর্ষে আসিয়া বলিতেছি যে সে আদর্শ প্রমাণের জন্য একা ব্রহ্মানন্দই দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। পৃথিবীর ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত ও তরঙ্গ তুফানের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিধাতার ইচ্ছা আর আদেশ পালনের মহা আদর্শ দেখাইতে কেশবচন্দ্র পৃথিবীর সমক্ষে দাঁড়াইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যাকেও বিধাতার চরণে অঞ্জলি দিলেন। বল দেখি ভাই, তোমার আমার আদর্শ কোথায় লাগে। সেণ্ট পলের স্থান লোক সমাজে নিন্দা ও নির্যাতনের, মধ্যে হিমালয় যদি ভীষণ ঝঞ্ঝাতাড়িত [illegible] আঘাত বহন করিতে না পারিতেন হিমালয়ের আদর্শ [illegible]

শ্রদ্ধাস্পদ দাস মহাশয় তিন সমাজের মধ্যে আদান [illegible] ও বিবাহের আদান প্রদানে মিলনের কথা লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানে সভ্যতার যুগে এ মিলনের বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কেবল ব্রাহ্মসমাজে কেন এখন হিন্দু সমাজেও এরূপ মিলন আংশিক রূপে দেখা যায়। এই বিবাহ ভূমিতেও দেখা যাইতেছে উপবীত ধারী হিন্দুও সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলমানের বাড়ীতেও আহার পানে দ্বিধাশূন্য হইয়া উদারতা প্রকাশ করিতেছেন। এই বিবাহে শালগ্রাম পুরোহিত লইয়া হিন্দুর ভিতরেও অসবর্ণ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ভিতর কেবল তিন সমাজের মধ্যে বিবাহের আদান প্রদান চলিতেছে তাহা নহে। হিন্দু খৃষ্টীয়ান ও মুসলমান পরিবারেও আদান প্রদানের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের কোন সম্ভ্রান্তা বিদুষী বঙ্গ মহিলা তাঁহার পুত্রের বিবাহে মুসলমান পরিবারেও প্রবেশ করিয়াছেন। এ সভ্যতার যুগে সামাজিকতার দ্বার দিন দিন উন্মুক্ত হইতেছে। আশাকরি ডাক্তার দাস মহাশয় এ দাসের নিবেদন সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন।

মজঃফরপুর।
১৮।১১।২৭
} প্রণত সেবক—শ্রীগৌরী প্রসাদ মজুমদার।

উপেক্ষা না গ্রহণ।

আমি সেবক মণ্ডলীতে প্রবেশ জন্য গত ১২৯৩ সালে নিম্নলিখিত আবেদন করিয়াছিলাম "আমি পবিত্রাত্মার দ্বারা পরিচালিত হইয়া অদ্যকার শুভদিনে নববিধান জননীর শ্রীপদে আমার সমস্ত জীবনের ভার অর্পণ করিলাম। * * * নরনারীর সেবা করিয়া যেন কৃতার্থ হইতে পারি, মা আমার সহায় হউন"।

উপরুক্ত আবেদন পত্রের সঙ্গে সঙ্গে এ জগতের সহিত বৈষয়িক সম্বন্ধ ছেদন করিয়াছি এবং নববিধান জননীর সুবিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে এই দীর্ঘকাল সেবকের ন্যায় যথাসাধ্য সেবা ব্রত রূপ মহাপরিত্রাণপ্রদ ব্রত পালন করিতে যত্নবান আছি। এই প্রায় ৪০।৪১ বৎসরকাল নানা প্রকারের পরীক্ষার গুরুভার বহন করিয়া আমার কি লাভ হইল? পরীক্ষাক্ষেত্রে শত্রু, মিত্র, আত্মীয় ও অনাত্মীয়, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। কিন্তু ভাবের ভাবুক পথের পথিক খুবই কম পাইয়াছি।

যে অহৈতুকী নিঃস্বার্থ সেবা জীবনের লক্ষ্য, তাহা হইতে বার বার ভ্রষ্ট হইলেও জীবন্ত দেবতা কিন্তু এ জীবন নিজের হস্তে রাখিয়া অপূর্ব্ব খেলা খেলিতেছেন। যাহাই হোক আমি নিজে অযোগ্য হইলেও প্রাণ খুলিয়া ইহাই বলিতে বাধ্য যে যাঁহারা যথার্থ বিধান সাধক ও মার আদেশে যাঁদের জীবন দিন দিন মার মনের মত গঠিত হইতেছে, জগতের জন্য যাঁদের প্রাণ অস্থির ও ধর্ম্মবিধানকে জয়যুক্ত করিতে যাঁরা সতত আত্মবলী দিয়াছেন ও দিতেছেন, এই সুদীর্ঘ জীবনের পথে তাঁহারা যথার্থই এ পাপীর বন্ধু ও সহায়। তাঁদের ও তাঁদের জীবন্ত মার নিকট এ ভৃত্যানুভৃত্য গৃহীত ও আদৃত।

আবার যাঁদের বাহিরের সম্পদ আছে, সমাজের খ্যাতি আছে, উপাধি আছে, ধন ঐশ্বর্য্য ও পদ গৌরব আছে, এমন অনেকের সেথায় আমি উপেক্ষিত হইতেছি। এই যে গ্রহণ বা উপেক্ষা, অনন্ত জীবন পথে আমার এই দুইটীই সম্বল। কারণ যতই উপেক্ষিত ও পদদলিত হই ততই নিজের দিকে দৃষ্টি পড়ে এবং মার মনের মত হইবার জন্য প্রাণ আকুল হয়। ধন্য মা নববিধান জননী। তিনি এ দাসকে কঠিন হইতে কঠিনতর পরীক্ষায় ফেলিয়া অশ্রু অভিসিক্ত সন্তানকে যেমন মা প্রেমাবেগে কোলে তুলিয়া লন তেমনি করিয়া কোলে লইয়া স্বর্গের আসল দুগ্ধ পান করাইয়া কৃতার্থ করিতেছেন এবং দিন দিন ভক্তবাঞ্ছিত স্বর্গের দুর্লভ ধন, যে অকিঞ্চনা ভক্তি তাহাই দিতেছেন। তাই বলি মা! "জীবনে মরণে হোক তোমার ইচ্ছার জয়"।

উপেক্ষিত।

—•—

শ্রদ্ধাঞ্জলী।

আজ এক বৎসর গত হইল এই দিনে আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ (কাকাবাবু) স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র মুখার্জ্জি মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। এই দিন বড় পবিত্র ও গম্ভীর এবং স্মরণীয় দিন। পরলোকগত সাধু আত্মার মঙ্গল ইচ্ছা নিয়ত আমাদের পথ প্রদর্শন করিতেছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি এবং সেই বিশ্বাসে আজ আমরা তাঁহার পারলৌকিক দিনে মিলিত হইয়া ভগবৎ চরণে উপবিষ্ট হইয়াছি। যিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন তিনি এখানকার ব্রাহ্ম মণ্ডলীর বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্খী এবং তাঁহারই হাতের গঠিত এই মণ্ডলী। তাঁহার মঙ্গল ও শুভ কামনাকে এই ভাগলপুর ব্রাহ্ম মণ্ডলী চিরদিনই স্মরণ করিবেন ও তাঁহার পারলৌকিক দিনে শ্রদ্ধাঞ্জলী দিবেন। কিন্তু সুধু স্মরণে তাঁহার আত্মার তৃপ্তি হইবে না, তিনি যাহা চাইতেন তাহা যদি আমরা কাজে না করিতে পারি। যেরূপ ভক্তি অনুরাগের সহিত তিনি পূজা উপাসনা করিতেন ও যেরূপ ভক্তি যোগে উৎসবাদিতে পমত্ত হইতেন সেইরূপ ভক্তি ভাবে যদি আমরা তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে তাঁহার অদেহী আত্মা তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন এবং আমরা প্রত্যেকে তাঁহারই মত ধর্ম্মানুরাগী কর্ম্মানুরাগী ও সেবানুরাগী হইতে পারিব। মণ্ডলী পরিচালক শূন্য হইয়া যেন পথ ভ্রান্ত না হয় সে দিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল এবং সেই জন্য তিনি শেষ জীবনে ভাগলপুর ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতে চাহিতেন না, রুগ্ন অবস্থায় শত অসুবিধা স্বত্বেও, এখানে অবস্থান করিয়া, তিনি দেখাইয়া গেলেন, কিরূপে ব্রাহ্ম সমাজকে রক্ষা করিতে হয়। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মণ্ডলীর হিত চিন্তা তাঁহার মনের চিন্তা ছিল, সকল ভগবদ্ ভক্ত সাধকগণের মানব হিতৈষণার এই একই প্রণালী। সেই ব্রহ্মানুরাগী দল, যে দল ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থায় আত্মীয় স্বজন গৃহ দ্বার ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা যে নানা নির্য্যাতন সহ্য করিয়া সমাজ ভুক্ত হইয়া ব্রহ্মানুরাগী হইয়াছিলেন সেই জন্য ঐ দলের প্রত্যেক জন এই সমাজ সেবায় ও রক্ষায় নিজেদের অর্থ সামর্থ্য দান করিয়া শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া স্বর্গগামী হইলেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এমন একটী জীবন আমরা দেখিলাম যে জীবনে যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞানের সামঞ্জস্য সাধন হইয়াছিল, সে জীবনের সৌরভে আজ ভাগলপুর মুগ্ধ, সে জীবন স্মরণেও চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত, সে দেহের তিরোধানে আজ কত হৃদয় সন্তপ্ত।

আজ আমরা তাঁহার অদেহী আত্মাকে আমাদের অন্তরের সহিত শ্রদ্ধাঞ্জলী দান করি। তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া তাঁহার মনোমত কার্য্য করিতে সকলে সচেষ্ট থাকিতে পারি এই একান্ত প্রার্থনা।

৯ই জানুয়ারী, ভাগলপুর। সেবিকা—নির্ম্মলা বসু।

—•—

সংবাদ।

জন্মোৎসব—গত ১৮ই নবেম্বর "পুরী রামকৃষ্ণ" লাইব্রেরী হলে নববিধানাচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়। লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিমন্ত্রণে স্থানীয় অনেকগুলী গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা সমবেত হন। ভাই প্রিয় নাথ মল্লিক উপাসনা করেন ও নবভক্ত শ্রীকেশবচন্দ্র ও পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের পরস্পর নিগুঢ় ধর্ম্ম মিলন কাহিনী বিবৃত করিয়া আত্ম নিবেদন করেন। একজন যুবা কয়েকটী সঙ্গীত করিলে মহিলাদের মধ্যেও একজন সঙ্গীত সংকীর্ত্তন করেন।

গত ১৯শে নবেম্বর পুরী "জগন্নাথধাম" নামক আবাসেও প্রাতে শ্রীকেশবের জন্মোৎসব উপলক্ষে উপাসনা হয়। তাহাতে স্থানীয় অনেকগুলী বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েকজন শিষ্য যোগদান করেন। উপাসনান্তে সকলকে "মিঠাইয়ের দানা" বিতরণ করা হয়। এই দিন পুরীর বালিকা বিদ্যালয়েও নবশিশুর জন্ম কথা বলা হয়।

গত ২১শে নবেম্বর ৫ই অগ্রহায়ণ শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে নবজন্মোৎসব সুগভীর ভাবে সম্পন্ন হয়। এখানে অনেকগুলী মহিলা উৎসাহের সহিত যোগদান ও প্রীতি ভোজন করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এক এক ভক্তের জন্মোৎসব হইয়াছে, কিন্তু ভক্তগণ মানবের শীরস্থানীয়। মাতৃগর্ভ হইতে সন্তানের শীরদেশ প্রসব হইয়া যদি সর্ব্বাঙ্গ প্রসূত না হয় সন্তান মাতৃগর্ভেই মৃত হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গসহ সন্তানের মস্তক প্রসব হইলেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সন্তান ভূমিষ্ট হয়। নববিধানের নবভক্ত আপনার অঙ্গে যেমন ভক্তদিগকে শীর ভূষণ করিয়াছেন তেমনি সমগ্র পাপী মানব মণ্ডলীকেও আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং নববিধানের নবভক্তের জন্ম সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন মানব সন্তানের নবজন্ম। নবভক্ত ব্রহ্মানন্দের জন্ম তাই সকল ভক্তের সহিত সমুদয় মানবের নব জন্ম লাভ। ইহাই

এই উৎসব উপলক্ষে বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়। অপরাহ্ণে "নিত্য কালী বালিকা বিদ্যালয়ের" শিশু কন্যাদিগকে নবশিশুর জীবন কাহিনী বলিয়া উপদেশ ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

আচার্য্যের স্বর্গারোহণ—গত ৮ই জানুয়ারী নববিধানাচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের তিরোভাব দিন উপলক্ষে শান্তিপুর ব্রহ্ম মন্দিরে বিশেষ সভাধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অজিত কুমার স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত কিরণ কান্ত পাল বি, এ, মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দোপাধ্যায় বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে সংকীর্ত্তন হয়। পরে শ্রীযুক্ত দেবানন্দ প্রামাণিক বি, এ, "কেশবচন্দ্র" প্রবন্ধ পাঠ করেন। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে আরও অনেকে কিছু বলেন। জীবন বেদ হইতে শ্রীযুক্ত অজিত কুমার স্মৃতিরত্ন "শিষ্য প্রকৃতি" পাঠ করেন। শেষে সভাপতি মহাশয় তেজস্বিনী ভাষায় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা বড়ই প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় খুব সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন। বিধান প্রচারক দলও ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দিরের চূড়ার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দের অতুল গৌরবময় মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া ছিলেন। সভায় শান্তিপুরের বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

শোক সংবাদ—আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বাসী বন্ধু কাঁথি নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপীন বিহারী শাসমল ও বীরেন্দ্র নাথ শাসমলের মাতা শ্রীমতী জ্ঞানদাময়ী দেবী গত ৯ই জানুয়ারী সোমবার প্রাতে ৫॥০টার সময় কলিকাতা ১০নং মনোহর পুকুর রোড, কালীঘাটে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁর ৭৬ বৎসর বয়ক্রম হইয়াছিল। কাঁথিতে তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠাণ করিবার জন্য ভাই প্রমথ লাল সেন অহুত হইয়া ছিলেন।

"নিমতলা" প্রতিষ্ঠা—শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ ভাবে আচার্য্য দেবের আত্মত্যাগ সাধনের জন্য ও সদেহে অদেহী হইয়া নির্ব্বাণ সাধনের জন্য একটি নিম বৃক্ষের তলায় প্রার্থনাযোগে এক বেদী প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এখানে সন্ধ্যায় ধ্যানাদি সাধন হয়।

ভ্রম সংশোধন—এই সংখ্যার যে প্রথম প্রার্থনায় "জীবন কেশব জীবনে" শব্দের স্থানে "জীবনকে নবজীবনে" পড়িতে হইবে।

শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রম।

বাগনান ডিঃ হাওড়া (বি, এন, আর) নববিধানের সাধন আশ্রম। নববিধান বিশ্বাসী বা নববিধান সাধনার্থী কোন ভদ্র পরিবার যদি ধর্ম্ম সাধনার্থ বা স্বাস্থ্য সাধনার্থ এখানে আসিয়া অধিবাস করিতে ইচ্ছা করেন স্থান পাইতে পারেন। এখানকার জল বায়ু স্বাস্থ্যকর, পানীয় জলের জন্য সুন্দর টিউব ওয়েল আছে, হাই স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় আছে, চিকিৎসালয় আছে, উপাসনাদি সাধন ভজনের উপযোগী সুব্যবস্থা আছে। ডেলী প্যাসেঞ্জার হইয়া বাগনান হইতে সহস্রাধিক ব্যক্তি কলিকাতায় আসিয়া কাজ করেন এমন কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি ও ইচ্ছা করিলে সপরিবারে আশ্রমে বাস করিতে পারেন; তাহা হইলেআশ্রম সেবিকাকে পত্র লিখিবেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব নববিধানের মুখপত্র। নববিধান শ্রীদরবার দ্বারা পরিচালিত। একতা সমযোগিতা শ্রীদরবারের মূল মন্ত্র। "দশে মিলে করি কাজ তবেই হবে স্বর্গরাজ" ইহাই নববিধান। নববিধানের স্বর্গরাজ্য আনিতে হইলে বা নববিধানের কোন কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে, দশে মিলে কাজ না করিলে কখনই তাহা হইতে পারে না। ধর্ম্মতত্ত্বকেও যথার্থ নববিধানের মুখপত্র রূপে পরিচালন করিতে হইলে শ্রীদরবারের ভাইদের সহিত নববিধান বিশ্বাসী পরিবারস্থ সকল ভাই ভগ্নীগণের সমযোগিতা এবং সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। তাই কেহবা প্রবন্ধ লিখিয়া, কেহবা সংবাদ দিয়া, কেহবা প্রুফ সংশোধন করিয়া, কেহবা অর্থ সাহায্য করিয়া, কেহবা গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া সমবেত সাহায্য দানে ইহাকে রক্ষা করেন ও ইহার উন্নতি বিধান করেন ইহাই সবার নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা। ভারপ্রাপ্ত পরিচালকদিগের দোষ, ত্রুটী, অপরাধ ক্ষমা করিয়া যাহাতে এই দশের কাজ নববিধানের কাজ প্রত্যেকের কাজ মনে করিয়া করিতে পারি তাহারই চেষ্টা করি আসুন।

—•—

নিবেদন।

ধর্ম্মতত্ত্বের নূতন বৎসর পড়িল, এখনও নানা অসুবিধার মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব বিলম্বে বাহির হইতেছে। অনেক পুরাতন গ্রাহক মহাশয় এখনও আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন। গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট প্রায় ৮০০৲ টাকা এখনও বাকি। আমাদের ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া গ্রাহকগন অনুগ্রহ করিয়া তাঁদের দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের জীবন রক্ষার উপায় করেন ইহাই প্রার্থনা।

দয়াপ্রার্থী সেবক—শ্রীঅখিল চন্দ্র রায়। সহঃ সম্পাদক "ধর্ম্মতত্ত্ব"

Edited, on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

—•—

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলতীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৩ ভাগ | ১লা ও ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল, ১৮৪৯ শক, ৯৯ ব্রাহ্মাব্দ। | বার্ষিক অগ্রিম ৩্।
৩য়া৪র্থ সংখ্যা | 14th & 29th February. 1928.

প্রার্থনা।

হে মাতঃ জননী যখন তুমি প্রকৃতির ঈশ্বর রূপে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট উপলব্ধ হইয়াছিলে, তাঁহারা চন্দ্রে সূর্য্যে আকাশে বাতাসে জলতে অগ্নিতে তোমার আবির্ভাব অনুভব করিয়া তোমার পূজা করিয়াছেন। যখন তুমি পরমাত্মা রূপে প্রকট হইয়াছ, তখন তাঁহারা তোমাকে ধ্যানে জ্ঞানে যোগে আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বা সেরূপ ধ্যানে জ্ঞানে যোগে উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য সাধন ভাবিয়া তোমার রূপ মূর্ত্তিতে কল্পনা করিয়া বা মৃত্তিকায় গঠন করিয়া পূজা করিতে আকাঙ্খিত হইয়াছেন। কেহবা তোমার ভক্তদিগকে তোমার অবতার মনে করিয়া তাঁহাদিগের চরণে ভক্তিপূজা অর্পণ করিয়াছেন। এইরূপ কেহ তোমাকে অজ্ঞাত অজানিত আত্মারূপে কেহবা প্রকৃতিতে প্রকাশিত প্রকৃতরূপে, কেহবা মানবে অবতীর্ণ কিম্বা বাহ্য মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষীভূত মনে করিয়া তোমার পূজা করিয়াছেন। এই সকল প্রকার পূজাই অল্প বিস্তর মানবের পুরুষকার সাধ্য সম্ভূত। তাই তুমি বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধানে জীবন্ত চিন্ময়ী মাতৃরূপে আত্ম প্রকাশ করিয়াছ। মানবের সাধ্য সাধনায় তোমাকে সত্যই দুঃসাধ্য মনে হয়। তুমি স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করিয়া দেখা না দিলে কেহ তোমাকে সত্য রূপে দেখিতে পায় না। তুমি আত্মজ্ঞান দিয়া দিব্যজ্ঞান না দিলে কেহ তোমাকে জানিতে পারে না। উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহে মা যেমন নিজে শিশুকে স্তন্য মুখে দিয়া স্তন্য পান করিতে শিক্ষাদেন এবং তদ্দ্বারা শিশুকে সবল ও পরিপুষ্ট করান সেমনি তুমি নিজ কৃপা গুণে তোমার ভক্তি সুধা পান করাইয়া তোমার প্রত্যক্ষ পূজা অর্চ্চনা প্রার্থনা না করাইলে আমরা তাহা করিতে পারি না, আমাদের নিজ জ্ঞান বুদ্ধিতে পুরুষকারে তোমাকে পাওয়া যায় না, এইটী সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিয়া আমরা যাহাতে তোমার পূজা প্রার্থনা করি এবং প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন পিপাসায় পিপাসিত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে পারি তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

—০—

প্রার্থনাসার।

হে সুন্দর! তোমার প্রকৃতি চিরকালই মানুষকে ভুলাইয়া আসিয়াছে। যুগে যুগে সকল ভক্তকেই তোমার প্রকৃতি মুগ্ধ করিয়াছে। প্রকৃতি চিরকালেই সুন্দর। তোমার হস্তে রচিত এই সৃষ্টি তোমার ভাবুকদের কাছে চিরকালই নূতন। তোমার প্রকৃতি যুগে যুগে ভক্ত চিত্তকে হরণ করিয়াছে। এ যুগে কি তাহা হইবে না? হে হরি, তোমার প্রকৃতি আমাদের নিকট চির মধুময় হউক।

আমরা যেন বার্দ্ধক্যে পড়িয়া নাবলি আর প্রকৃতি সতীর শোভা ভাল লাগে না।

প্রেমিক, আমাদিগকে প্রেমিক কর। রসিক আমাদিগকে রসিক কর। ভাবুক, আমাদিগকে ভাবুক কর। সুন্দর আমাদিগকে সুন্দর কর। তোমার রসপূর্ণ সৃষ্টি যেন আমাদিগের নিকট নীরস না হয়। যদি তোমার অনুগ্রহে শিবাগারে আসিলাম, তবে শিব ভবনে শিব সৌন্দর্য্য দেখিয়া যেন মন মধুময় হয়। চারিদিক পবিত্র চারিদিক সুন্দর ইহা দেখিয়া মনকে যেন প্রেমিক ও পবিত্র করিতে পারি। গিরি নদ নদী নির্ঝর সুন্দর তোমার মহিমা কীর্ত্তন করুক। তোমার নিষ্কলঙ্ক সৃষ্টি দেখিয়া যেন তোমাকে সাধন করিতে পারি। "প্রকৃতির সৌন্দর্য্য"।

—•—

নববিধানের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী।

শ্রীনববিধানাচার্য্য প্রার্থনায় বলিলেন "সমুদয় ধর্ম্ম পূর্ণ হবে নববিধানে। পৃথিবীর সব আশা ভরসা ইহাতে পূর্ণ হইবে। বেদ বেদান্ত পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রে যা কিছু বলা হইয়াছে তা সিদ্ধান্ত হইবে এই নববিধানে। যত ভক্ত যত উপদেশ দিয়াছেন তার পূর্ণতা হবে তোমার এই নববিধানে।" সত্যই নববিধানই পূর্ণ ধর্ম্ম বিধান। যুগে যুগে যত ধর্ম্ম বিধান একাল পর্য্যন্ত জগতে আবির্ভূত হইয়াছে সে সকলের পূর্ণতা সম্পাদনের জন্যই নববিধান সমাগত।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে পূর্ণ ধর্ম্মের এক এক অঙ্গ বা এক এক ভাবের মাত্র স্ফুরণ হইয়াছে, সেই সকল অঙ্গের বা ভাবের পূর্ণ সমাবেশ এই নববিধানে।

কোন ধর্ম্ম বিধানে ঈশ্বরের একত্ব, কোন বিধানে ব্যক্তিত্ব বা পিতৃত্ব, কোন ধর্ম্ম বিধানে যোগ, কোন বিধানে জ্ঞান, কোন বিধানে ভক্তি, কোন বিধানে কর্ম্ম, কোন বিধানে নির্ব্বাণ, কোন বিধানে নামগান ইত্যাদী এক এক বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু এই সকল সাধনা একীভূত করিয়া পূর্ণ ধর্ম্ম সাধনের বিধি প্রবর্ত্তনের জন্যই নববিধানের আগমন।

যেমন সাধন, তেমনি জীবনের আদর্শও এক এক বিধানে ব্রহ্ম-প্রেরিত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক এক এক মহাপুরুষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকার সম্মিলনে যে পূর্ণ আদর্শ তাহাই নববিধানের জীবনাদর্শ।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোন এক বিধানেত ধর্ম্মের পূর্ণভাব বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল বিধানই আংশিক বিধান। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধানই সকল অংশ বা সকল অঙ্গকে একদেহে গ্রথিত করিয়াছেন, এই নিমিত্তই নববিধান নামে ইহা অভিহিত।

নববিধান পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোন এক বিধানের পুনরাবৃত্তিও নয়। সেইজন্য কোন পূর্ব্ব বিধানের পূর্ব্ব অভিধানেও ইহা সমকারূপে অভিহিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত প্রাচীন "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামেও এই সার্ব্বজনীন পূর্ণ ধর্ম্ম বিধানকে প্রকৃতরূপে আখ্যায়িত করা যায় না। বিশেষ ভাবে এইজন্যই ইহাকে "নববিধান" নাম দেওয়া হইয়াছে, কারণ ইহা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে নূতন ধর্ম্ম বিধান।

ইহার নববিধান নাম আরো এই জন্য যে ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল ধর্ম্ম বিধানকে নব জীবন দান করিতে সমাগত এবং কেবল ধর্ম্ম বিধান কেন সমস্ত ধর্ম্ম, সমস্ত সত্য, সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত ভক্ত, সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান এবং মানবকে নূতন জীবন দানে সঞ্জীবিত করিবার জন্যই এই বিধান। এমন কি স্বয়ং ঈশ্বরকেও নবভাবে নিত্য জীবন্ত ভাবে প্রতিপন্ন করিতে এই নববিধান প্রেরিত। ইহাঁর প্রভাবে কিছুই মৃত থাকিবে না, স্বর্গ এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলকেই নবজীবন প্রদান করিতে নববিধান আসিয়াছেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে যেমন ধর্ম্মের এক এক অঙ্গ গঠিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই সকল অঙ্গকে এক দেহে মিলিত করিয়া তাহাতে নূতন জীবন সঞ্চার করিতেই নববিধান অবতীর্ণ।

ব্রাহ্মসমাজ রূপ মাতৃগর্ভে এই বিধান পূর্ণাবস্থা সম্পন্ন হইয়া যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল তখনই ইহা নববিধান নাম প্রাপ্ত হইল। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা নববিধানের মাতৃগর্ভাবস্থা।

শিশু যতদিন মাতৃগর্ভে থাকে সে কালেকি তাহার নাম করণ হয় না। তখন হইতে তাহার জীবন কাল গণনা করা হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর তাহার নাম করণ হয় এবং তখন হইতে তাহার জীবন কাল গণনা করা হয়। তাই ব্রাহ্মসমাজের শত বার্ষিকী লইয়া এত আন্দোলন হইতেছে, নববিধান বিশ্বাসীর পক্ষে সে আন্দোলনে আন্দোলিত হইবার কিছুই নাই।

ব্রাহ্মসমাজের তিন স্তরই, নববিধানের মাতৃগর্ভাবস্থায়

যে গঠন হয় ব্রাহ্মসমাজের তিন স্তর নববিধানের গঠনের সেই তিন স্তর। শিশু যেমন মাতৃগর্ভে ভ্রূণ হইতে ক্রমে হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিপুষ্ট হয়, তাহার পর পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন হইলে এবং চক্ষু ফুটিলে মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হয়। তেমনি সার্ব্বজনীন যুগধর্ম্ম নববিধান ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের পুরাতনবিধানের ধর্ম্মাঙ্গ সকল ব্রাহ্মসমাজ রূপ গর্ভে নবজন্ম গ্রহণ করিয়া ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রক্রীয়া যোগে পবিত্রাত্মার শক্তি প্রভাবে পরিপুষ্ট হইয়া যখন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পূর্ণ বিধান রূপে অভিব্যক্ত বা ভূমিষ্ট হইল তখনই নববিধানের অভ্যুত্থান হইল। এই অভ্যুত্থান দিন হইতেই আমরা ইহার প্রকৃত জীবনের দিন গণনা করিব।

মানব শিশু মাতৃগর্ভে দশ মাস দশ দিন ধরিয়া পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু শিশুর বয়সে সে দশমাস দশদিন কেহই কখনও গণনার মধ্যে আনে না। নববিধানের পক্ষে ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশ বৎসর সেইরূপ আমরা মনে করি।

এক্ষণে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যেমন ইহার স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া আপনাকে নববিধানে নিমজ্জিত করিয়াছেন তেমনি সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ যদি আপনাদের ভিন্নতা স্বতন্ত্রতা বা আমিত্ব ত্যাগ করিয়া নববিধানই পুরাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণ পরিনত বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলেই সত্য স্বীকার করা হইবে, কারণ নববিধানেই সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃত প্রস্তাবে নিমজ্জিত। মা ইহাতে সকলকারই বিশিষ্টতা আদৃত এবং স্বীকৃত। অবশ্য তাহা করিয়া যথার্থ সম্মিলন সাধন পূর্ব্বক যদি আমরা নববিধানের পঞ্চাশৎ বার্ষিক সম্পাদন করিতে পারি তাহা হইলে নিশ্চয়ই জগতের মৃত ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িকতা ও জড়বাদে নবজীবন সঞ্চার হইবে এবং আমরাও নববিধানের নববিশ্বাস, নব-প্রেমেও মহাসম্মিলনে সম্মিলিত হইয়া পৃথিবীকে এক অখণ্ড ধর্ম্ম-বিধানের নবালোক দর্শনে ও নবধর্ম্ম, জীবন লাভে ধন্য হইতে দিতে পারিব। নববিধান জননী আমাদিগকে তাঁহার পবিত্রাত্মার প্রেরণা দানে সেই আকাঙ্খায় আকাঙ্খিত করুন ও তাঁহার সত্য বলে বলীয়ান করুন।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

প্রাণস্য প্রাণম্।

মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার এতাধিক নিগূঢ় যোগ এবং তিনি উহার এত নিকটে যে তাহার মধ্যে কোন ব্যাবধান আসিতে পারেনা। তাঁহার সহিত আমার যথার্থ যোগ বা সম্বন্ধ না বুঝিয়া কল্পনা বা মোহ বশতঃ যতই অন্যকে আপনায় বোধে নিকটে ভাবি উহা ততই মধ্যে ব্যবধান স্বরূপে দণ্ডায়মান হয়। সুতরাং হৃদয়ের প্রেমভক্তি সংজ্ঞে ধাবিত না হইয়া পবিত্র থাকিতে পারেনা; প্রেম ইতর বস্তুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মলিন অপবিত্র উচ্ছিষ্ট হইয়া যায়, ঐ উচ্ছিষ্ট প্রেম প্রেমময়ের নিকট গ্রহণীয় হয় না।

—

আপৎশূন্য পথ।

তাঁহাকে প্রাণের প্রাণস্বরূপ জানিলে সুতরাং মধ্যে কোন ব্যবধান আসিতে পারে না। এইরূপে তাঁহাতে প্রাণ মন সমর্পন করিয়া তাঁহাতে প্রেমভক্তি অপন করিয়া তাঁহার মধ্য দিয়া সংসারে ঐ প্রেম প্রবাহিত হইলেই যথার্থ পথে প্রেমভক্তির গতি হয়।

শ্রীফকির দাস রায়।

—

নববিধানের উৎসব।

যে উৎসব আসে আবার যায় সে উৎসব নববিধানের উৎসব নয়। প্রকৃতিতে বসন্ত কাল আসে এবং চলিয়া যায়, তেমনই যদি উৎসব আসে এবং জীবনে তাঁহার কোন স্থায়ী ফল সঞ্চার না করে তাহা হইলে সে উৎসব বাহিরের আড়ম্বর মাত্র, যথার্থ উৎসব সাধন করিলে জীবনে তাহার প্রভাব সঞ্চারিত হইবেই হইবে।

—

ব্রহ্মসমাগম না ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা।

হিন্দুর বাড়ীতে যখন কোন অনুষ্ঠান বা উৎসব হয়। তিনি তখন এক এক দেবমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া গঠন করে ও তাহার পূজা করেন, আবার একদিন দুইদিন কিম্বা তিন দিন পরে সে দেবমূর্ত্তি জলে বিসর্জ্জন দিয়া উৎসব সমাপন করেন। তাই উৎসব বা পার্ব্বণ তাঁহার সাময়িক অনুষ্ঠান মাত্র হইয়া থাকে। ব্রহ্মোৎসবও অনেকের পক্ষে এই ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের সময় উপাসনা, প্রার্থনা, কীর্ত্তনাদি কতই অনুষ্টিত হইল, কিন্তু উৎসব ফুরাইলে আর সে উৎসাহ নাই, সে উদ্যম নাই, উপাসনা-দিতে তেমন জীবন্ত ভাব নাই। ইহাকি নিতান্তই আক্ষেপের বিষয় নয়? কল্পনার দেব দেবীর পূজা যাহারা করে তাহাদের পক্ষে ইহা শোভা পায়। কিন্তু জীবন্ত নিত্য ব্রহ্মের যাঁহারা উপাসনা করেন তাহাদের পক্ষে এরূপ হওয়া কখনই উচিত নয়। কেননা তদ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় ব্রহ্মও অন্যান্য কল্পনার দেবতার ন্যায় আসেন ও চলিয়া যান। ব্রহ্মসমাগম হয় কিন্তু তিনি যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত

নিত্য বিদ্যমান ইহা প্রমাণ হয় না। তাই আচার্য্য বলিলেন "ব্রহ্মসমাগম নয় ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা চাই"। উৎসবে তিনি যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত ইহাই যদি আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি, তবেই উৎসব সাধন আমাদের সার্থক হইয়াছে।

কেমনে আমরা মার হইব?

নববিধানাচার্য্য বলেন "যে তোমাকে জানে বা তোমাকে ভালবাসে সেই যে তোমার তাহা নয়। যে তোমাতে বাস করে, বিচরণ করে এবং নিত্য জীবন যাপন করে সেই তোমার। হে ঈশ্বর!" সত্যই কেবল ঈশ্বর আছেন ইহা জানিলে হয় না কিম্বা ঈশ্বরকে ভালবাসি ইহা বলিলেই হয় না। তাঁহাকে জীবন্ত ব্যক্তি রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সত্তায় সত্তাবান তাঁহার প্রকৃতিতে প্রকৃতি সম্পন্ন, তাঁহার স্বরূপ স্বভাব বা চরিত্রে চরিত্র যাঁর তিনিই তাঁর। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচে না, জীব যেমন বাতাস ছাড়া জীবিত থাকিতে পারেনা, তেমনি ঈশ্বর ছাড়া যাঁর প্রাণ বাঁচেনা সেই ব্যক্তিই তাহাতে বাস করে, বিচরণ করে এবং নিত্য জীবন যাপন করে।

শিখ ধর্ম্ম।

"শিখ" শব্দের মৌলিক অর্থ শিক্ষার্থী, শিষ্য। শিখ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা নেতাগণ তাই গুরুরূপে সম্মানিত, প্রেরিত ধর্ম্মনেতাগণ গুরু আর অনুবর্ত্তীগণ সকলেই শিষ্য বা শিখ। তাঁদের শাস্ত্রের নাম গ্রন্থ সাহেব। এই গ্রন্থে ঈশ্বরের বাণী প্রত্যাদিষ্ট গুরুবাক্য লিপিবদ্ধ। তাই তাহা অভ্রান্ত ব্রহ্মবাক্য বলিয়া পূজিত। শিখগণ গুরুদিগকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া সম্মান করেন, কিন্তু তাহাদিগকে ঈশ্বর স্থানীয় মনে করেন না। গ্রন্থে ঈশ্বর বাক্য লিপিবদ্ধ এই বিশ্বাসে ইহাকেই পূজা করেন। শিখ ধর্ম্ম অপৌত্তলিক একেশ্বর বাদের ধর্ম্ম। তথাপিও ক্রমে ক্রমে ইহার ভিতর কতক কতক কুসংস্কার আসিয়া জড়িত হইয়াছে। যাহা হউক ইহার মধ্যে যে ঈশ্বর বাণী বা প্রত্যাদেশের প্রতি অটল বিশ্বাস ইহা নববিধান বিশ্বাসী মাত্রেরই গ্রহণীয়। আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থ অন্য কিছুই নাই ঈশ্বরের মুখবিনিসৃত প্রত্যাদেশই আমাদের অভ্রান্ত গ্রন্থ অভ্রান্ত বেদ। শিখ বা শিক্ষার্থী হইয়া চির শিষ্য প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বাণী অনুসরণ করিয়া আমরা চলিব অন্যথা আমাদের গতি নাই। প্রেরিত নেতা উপদেষ্টা কিম্বা যাহার ভিতর দিয়াই ঈশ্বর বাণী আসুক না কেন, আমরা গুরুস্থানীয় মনে করিয়া সম্মান দিব। আমাদের অভ্রান্ত গুরু এক ব্রহ্ম। তবে তিনি যখন যাহার ভিতর দিয়া কথা কহেন তাঁহারাও আমাদের সম্মানার্হ বিনীত শিক্ষার্থী হইয়া সকলকার নিকট হইতেই উপদেশ ও শিক্ষা লইতে হইবে।

সংযম-বিষয়ক।

(প্রেরিত ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার লিখিত)

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আত্মনির্ব্বাণ ও সর্ব্বোচ্চ নিষ্কলঙ্ক স্বভাব হওয়া বোধ হয় এখনও স্পৃহার বিষয় হয় নাই, সুতরাং এ স্পৃহা উল্লেখে ক'জনের সহানুভূতি পাইব? এ দেশে যা কঠোর তপস্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ আমি তাহা সাধন করি নাই। কোন কোন লোক সে সাধন করেছেন দেখেছি, তার ফলাফলও দেখেছি। ইচ্ছা পূর্ব্বক অস্বাভাবিক কষ্ট বহন করিলেই মানুষ যে সংযমী নামের যোগ্য হয় তা মনে করি না। তবে ভোগ বিষয়ে চিত্ত-শৈথিল্য ধর্ম্ম-জীবনের বিরোধী, ইহা স্বীকার করি, এবং ঊর্দ্ধ হইতে প্রেরিত যে যাতনা তাহা অকিঞ্চনভাবে বহন করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় ও মুক্তিযোগ লাভ হয় ইহাও সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি।

হে ধ্রুবজ্যোতির্ম্ময়, হে নিষ্কলঙ্ক নির্ব্বিকার, এ স্বভাবে সকল ইন্দ্রিয় সমান প্রবল তবে নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতার জন্য এত অনিবার্য্য প্রয়াস কেন দিলে? লোমকূপের ন্যায় যার চরিত্রে লক্ষ ছিদ্র, যার কৃতদোষের ও দোষের সম্ভাবনা গণনা হয় না, সে কি এ সমস্ত পাপ অতিক্রম করিয়া যেমন নির্দ্দোষ হইয়া সংসারে আসিয়াছিল, ততোধিক পবিত্র হইয়া তোমার দিব্য আলয়ে পুনঃপ্রবেশ করিতে পারিবে? নিরাশ অন্তরে আমি যতবার এই প্রশ্ন করিয়াছি, তোমার মুখে একই উত্তর—শতবার একই উত্তর পাইয়াছি। যখন আকুল আরাধনায় প্রেম ও পুণ্য সরোবরে মগ্ন হও, তখন হে আত্মন্ তোমার কি অবস্থা হয়, তখন তুমি পাপী না নিষ্পাপ, তখন তুমি স্বর্গে না মর্ত্ত্যে? যখন সাধু সাধ্বীগণ নিষ্ঠাভক্তিতে তোমার চারিদিকে বসিয়া ধ্যান প্রার্থনায় শুদ্ধচিত্ত ও দেবতুল্য আকার ধারণ করেন, তাঁহাদের সহবাসে ও সংস্পর্শে তোমার অবস্থা কিরূপ হয়—অপবিত্র না পবিত্র, স্বর্গীয় না সাংসারিক? ইহা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে সে অবস্থায় আদর্শ জীবন লাভ করি, সদ্যমুক্তি সম্ভোগ করি। কিন্তু এ সাময়িক অবস্থাকে নিত্য অবস্থায় পরিণত করিবার জন্য যে সাধন তাহাই কঠিন, প্রায় অসাধ্য। সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয় ও তজ্জনিত উত্তেজনাকে যে ব্যক্তি একেবারে পরাজয় করিতে যায় সে একটীকেও আয়ত্ত করিতে পারে না। প্রতিজনের অন্তরে একটী কি দুইটী বিশেষ প্রবৃত্তি প্রবল। প্রথমতঃ তাহাকে আক্রমণ করিবে; সেই প্রবলকে অবলম্বন করিয়া নানা অপ্রবল প্রবৃত্তি রাজত্ব করে। কারণ রিপুপ্রবৃত্তি বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন নহে, মূলে একই পদার্থ। তাহাকে ত্রিগুণ-জড়িত প্রকৃতিই বলি, মায়া মোহ অবিদ্যাই বলি; প্রলোভন পাপই বলি মূলে একই কথা। এই বিচিত্র অখণ্ড মানব প্রকৃতি নানা অবস্থায় নানা রিপু প্রবৃত্তি নামে উক্ত হয়, এবং দুই একটী বিশেষ পাপ ও পাপের জাগ্রৎ সম্ভাবনারূপে চরিত্র মধ্যে কার্য্য করে। যে রাগী, তম-প্রধান, অভিমানী ও অবোধ, সে উত্তেজিত হইলে অবকাশ ও অবস্থা অনুসারে কখনও বিদ্বেষী, বা কুটিল, বা দৌরাত্ম্যকারী, বা যথার্থ-

আচ্ছা ভাই তুমি পৃথিবীর সকল দেশীয় ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা কর তাঁহারা যেমন ক্ষুধা বোধ করেন তেমনি পূজায় অভাব বোধ করেন কি না। তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন যে আহারের সময় যেমন ক্ষুধায় কাতর হইয়া খাইবার জন্য দৌড়িতে হয় সেইরূপ আহ্নিক পূজার সময় হইলেই মন ব্যস্ত হইয়া উঠে আর যেমন দুই এক দিন আহার না করিলে শরীর দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইয়া পড়ে, পূজা বিনা আত্মারও অবস্থা ঠিক্ সেই প্রকার হয়। সাধু ভক্তেরা বাস্তবিক ঈশ্বর আরাধনার জন্য লালায়িত হন এবং এক দিনও উহা বন্ধ করিতে পারেন না। তোমার যে সেরূপ ব্যবস্থা হয় না সে কেবল তোমার আত্মার বিকৃত ও অসুস্থ অবস্থার জন্য। কিছু দিন না খাইলে অথবা জ্বর হইলে যেমন শরীর বিকৃত হয় এবং ক্ষুধাবোধ হয় না, আবার জ্বর ছাড়িয়া গেলে নিয়মিত সময়ে প্রতিদিন খাইতে খাইতে যেমন ক্ষুধার উদ্রেক হয়, সেইরূপ তুমি যদি আত্মার বিকার ঘুচাও এবং কয়েকদিন নিয়ম মত আহ্নিক পূজা দ্বারা আত্মাকে পুষ্ট কর, অচিরে দ্বিগুণ ক্ষুধা বোধ হইবে, এবং ঐ পূজা এত আবশ্যক ও উপাদেয় মনে হইবে যে এক দিনও উহা ছাড়িতে পারিবে না।

মানুষ আবশ্যক বলিয়া যে আহার করে তাহা নহে, ভাল সামগ্রী খাইলে সুখও হয়। ঈশ্বর পূজাতে সেইরূপ আনন্দ অনুভব হয়। রোজ রোজ অন্ন খাই বলিয়া কি আমাদের ভাতে অরুচি হয়? পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত খাইলে খুব তৃপ্ত হয়। প্রতিদিন পূজা করিলে তাহার সঙ্গে এমন নূতন নূতন ভাব আইসে যে পূজা করা একটী আনন্দের ব্যাপার হইয়া উঠে এবং ক্রমে উহাতে বিলক্ষণ লোভ জন্মে। যদি একথার প্রমাণ চাও ভাই তুমি নিজে কিছুদিন পূজা করিয়া দেখ। আমি নিশ্চয় বলিতেছি ভক্তের সঙ্গে দয়াময় জগদীশ্বরকে ডাকিতে ডাকিতে তুমি শেষে মোহিত হইয়া পড়িবে, তোমার চক্ষু হইতে আনন্দ ধারা পড়িবে, এবং শরীর মন সুখসাগরে ডুবিবে। শেষে আহ্নিক পূজা ছাড়া দূরে থাকুক, কখন্ পূজার সময় আসিবে, কখন্ পিতার কাছে বসিয়া আনন্দের সহিত ডাকিবে, তাহার প্রতীক্ষায় থাকিবে। ঈশ্বরকে ডাকিলে তোমার চরিত্র ভাল হইবে, তোমার পাপ অকল্যাণ সব কাটিয়া যাইবে, তোমার সংসারে সুশৃঙ্খলা হইবে, লোকের প্রতি তোমার দয়া হইবে, তুমি সাধু ও সচ্চরিত্র হইয়া সপরিবারে সবান্ধবে সুখে জীবন যাপন করিবে।

ভাই আর বিলম্ব করিও না। আগামী কল্য হইতেই আহ্নিক পূজা আরম্ভ কর। আজি ঘরে গিয়া সঙ্কল্প কর, যে যত দিন বাঁচিবে প্রতিদিন অন্ততঃ একবার ভক্তির সহিত জগদীশ্বরকে ডাকিবে। প্রথমে কেবল দুই পাঁচটী কথা বলিয়া আরম্ভ কর, যথা—"হে জগদীশ্বর আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে পতিত পাবন তুমি আমাকে দয়া করিয়া পাপতাপ হইতে উদ্ধার কর।" প্রতিদিন নিয়মিত রূপে প্রাতঃকালে এই কয়েকটী কথা বলিয়া ঈশ্বর পূজা করিবে। পরে কি করিতে হইবে তাহা জানিতে পারিবে।

ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব।

"ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব" ইহাই সকল ধর্ম্মের সারতত্ত্ব। প্রাচীন ধর্ম্মবিধানে সাধকগণ যখন ঈশ্বরকে প্রকৃতির ঈশ্বর বা পরমাত্মা পরব্রহ্ম জিহোভাদি অভিধানে সম্বোধন করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে স্রষ্টা, পাতা, পিতা বলিয়া স্মরণ মনন করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী বিধানে সাধকগণ যখন ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করিলেন, তখন হইতেই বিশেষভাবে ঈশ্বরের সহিত মানবের যে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ ইহা পরিস্ফুট ভাবে উপলব্ধি হইল। এবং ঈশ্বরের সম্পর্কে যে সকল মানব পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে সংবদ্ধ ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

কিন্তু কার্য্যতঃ এই তত্ত্ব অনুষ্ঠিত বা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত কই হইয়াছে? এই মত অবশ্য সাম্প্রদায়িক ভাবে কতক পরিমাণে যে অনুসৃত হয় নাই তাহা বলিতে পারিনা।

যখন উপদেষ্টা বলিলেন, "বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভ্রাতৃ স্বরূপ" তখন হইতে এক এক সম্প্রদায়ের বিশ্বাসীগণ কতক পরিমাণে সমবিশ্বাসীদিগকে ভ্রাতৃভাবে শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহাও কতকটা মতগত বা বাহ্য অনুষ্ঠানগত, প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব উদারভাবে সম্যকরূপে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

এই জন্যই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধান ধর্ম্মের এই সারতত্ত্ব, নিগূঢ় তত্ত্ব পূর্ণভাবে, সার্ব্বজনীন ভাবে, অসাম্প্রদায়িক ভাবে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব আংশিকভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে সাধিত হইয়াছে, সত্য, কিন্তু পূর্ণ ভাবে তাহা হয় নাই।

ঈশ্বরের একত্ব এবং জীবন্তত্ব মত শাস্ত্রে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কার্য্যতঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

নববিধান তাই বলেন মতে ঈশ্বর এক কিম্বা তিনি জীবন্ত ইহা বলিলে হইবে না। প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে জীবন্তরূপে দর্শন করিতে হইবে এবং তিনি যে একজন সবারই হৃদয়ের ধন ইহা জীবন্ত বিশ্বাসে উপলব্ধি করিতে হইবে।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী সকলেই ঈশ্বর এক বলেন, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন, তাই হিন্দু যাঁহাকে ঈশ্বর বলেন, মুসলমান তাঁহাকে বলেন না, মুসলমান যাঁহাকে বলেন খ্রীষ্টান তাঁহাকে বলেন না, সেই জন্য মতে এক ঈশ্বর মানিলেও, ভাবে বিশ্বাসে তাঁহারা এক ঈশ্বর মানেন না এবং এই জন্যই তাঁহাদিগের মধ্যে এত ধর্ম্মবাদ।

তেমনই মানবের ভ্রাতৃত্ব তাঁহারা মতে স্বীকার করিলেও আপনাদের সম্প্রদায়ের বাহিরে যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগের সহিত ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারেন না।

এখনই বর্ত্তমানে যাঁহারা একেশ্বরবাদী বলিয়া আপনাদিগকে

পরিচয় দেন, তাঁহারাও নিজ নিজ ভাব বা বিশ্বাসমত ঈশ্বর কল্পনা করিতেছেন, এই নিমিত্তই তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরের যথার্থ পিতৃত্বও প্রতিষ্ঠিত হইতেছেনা এবং মানবের ভ্রাতৃত্বও প্রকৃতভাবে স্থাপন হইতেছেনা।

এই মতভেদ সম্প্রদায় ভেদ বা ভ্রাতৃ বিচ্ছেদের মূল কারণ ঈশ্বরের যথার্থ একত্ব এবং এক পিতৃত্ব অস্বীকার।

তিনি কেবল এক ঈশ্বর নন, তিনি একই ঈশ্বর, "একমেবা দ্বিতীয়ম্।" "লা এলাহি এল্ এল্ লা।" তিনি একই, তিনি বই তিনি নাই।

হিন্দুরও যিনি মুসলমানেরও তিনি, খৃষ্টানেরও তিনি বৌদ্ধেরও তিনি। তোমারও ঈশ্বর যিনি, আমারও তিনি একই, এইটী বিশ্বাস করিব। সবারই সেই একই পিতা একই মাতা, একই জন্মদাতা একই জ্ঞানদাতা পরিত্রাতা। আমার তোমার কল্পনা সম্ভূত যে দেবতা সে তিনি নন, এইটী প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিলে তবে যথার্থ ঈশ্বরকে একই ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করা হয় এবং সবার একই পিতা বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ ও স্বীকার করা হয়।

এই একই পিতাকে বা একই মাতাকে যথার্থ পিতা মাতা বলিলে, তবে মানবকে সেই একই পিতামাতার সন্তান সন্ততি বলিয়া স্বীকার করা হয় এবং তাহা হইলেই আমরা মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হই।

এই জন্য আচার্য্য বলিলেন "তুমি আমার মা তুমি আমার ভায়ের মা। এক হরির পূজা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। সমস্ত ভক্ত নয়ন এক জায়গায় পড়ুক; সকলের এক পিতা এক বন্ধু, কজনেরই এক ঈশ্বর, সবে এক, এক বলিতে বলিতে সমুদয় ভক্ত মণ্ডলী একখানি হয়ে যাবে।"

বাস্তবিক এই ভ্রাতৃত্বের মূলেও এই এক পিতৃত্ব। একেতেই মিলন। এই এক ঈশ্বরকে সত্য প্রত্যক্ষ ভাবে এক পিতা বলিয়া বিশ্বাস এবং গ্রহণ কর যথার্থ ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধেও মানবের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই যে আমরা ভাইকে ভাই বলিয়া প্রকৃত ভালবাসিতে পারিনা কিম্বা বিশ্বাস করিতে পারিনা ইহার মূল কারণ আমরা ঈশ্বরকে যথার্থ ভালবাসিনা বা ঈশ্বরকে প্রকৃত বিশ্বাস করিনা। যদি ঈশ্বরকে ভালবাসি ভাইকে তাঁহার সন্তান বলিয়া ভালবাসিবই বাসিব। তাঁহার যাহা কিছু সকলই তাঁহার ও আমার। তাঁহার ভালবাসার পাত্র যে, আমরাও ভালবাসার পাত্র সে, এই বলিয়া ভালবাসিব। তাহা যদি না করি তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকেই ভালবাসি না, ইহাই কি প্রমাণ হয় না? এই জন্যই ঈশ্বর বলেন "যে দৃশ্যমান্ ভাইকে না ভালবাসে সে অদৃশ্য আমাকে যে ভালবাসে কেমনে বুঝিব?"

এইরূপ ভাইকে যদি বিশ্বাস না করি কেমন করিয়া বলিব আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি। প্রকৃত ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিলে ভাইকে বিশ্বাস না করিয়া পারি না। কারণ যিনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবেন তাই যখন ঈশ্বর বিশ্বাসী জীবন্ত ঈশ্বরের প্রভাব ভাইকে কখনই অবিশ্বাসের কাজ করিতে দিবেন না। ঈশ্বর স্বয়ং যখন তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া বিশ্বাসী দলভুক্ত করিয়াছেন, আমি কেননা বিশ্বাস করিব?

এই ভাবে সকল ভাইকে ভালবাসিলে ও বিশ্বাস করিলেই যথার্থ ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঈশ্বরের পিতৃত্বে প্রকৃত বিশ্বাস করিলেই মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপায় হয়। এবং সেই একই ঈশ্বর সর্ব্ব মানবের একই পিতা বলিয়া পূর্ণ বিশ্বাস করিলেই সর্ব্বমানব একই ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে সংবদ্ধ ইহা বিশ্বাস হইবে এবং জগতে যথার্থ ঈশ্বরের এক পিতৃত্ব এবং মানবের অখণ্ড ভ্রাতৃত্ব স্থাপন হইবে। নববিধান বলেন ভাই ভাই এক দেহের অঙ্গ। ইহা সত্যরূপে বিশ্বাস করি ভ্রাতৃত্ব নিশ্চয়ই জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

—•—

সংক্ষিপ্ত আরাধনা কীর্ত্তন।

(মার উক্তি)

(ওরে) এইত আমি আছি,
চেয়ে দেখ্না আমার পানে,
হবি চির জীবী
আমার কোলে প্রেম স্তন্যপানে।

ওরে আমা বই তোর আর কেহ নাই।
থাক্না সোনার চাঁদ হয়ে
আমার পুণ্য নিকেতনে।

যাবে সব দুঃখ পাবে নিত্য সুখ
থাক্বি সদানন্দে ব্রহ্মানন্দ
নবশিশু সনে।

ধ্যানে ধরি আমায় যোগে হওনারে লয়,
হবি মূর্ত্তিমান নববিধান
লভি নবজীবনে।

অসত্য হতে নেযাবো সত্যেতে,
অন্ধকার হতে নেযাবো জ্যোতিতে।
ঐ মৃত্যু হতে যাবো লয়ে
সে অমৃত ধামে।

আমি সত্য স্বরূপ প্রকাশিয়ে রূপ
করবো রক্ষা তোদের সদা
(আমার) অপার দয়া গুণে।

—•—

নূতন কীৰ্ত্তন।

স্বর্গীয় ভক্ত হরিসুন্দর বসুর রচিত।

[১]

আমার উঠিতে শ্রীহরি, বসিতে শ্রীহরি,
আমি শ্রীহরি করিব সার।
শ্রীহরি তন্ত্র, শ্রীহরি মন্ত্র,
শ্রীহরি গলার হার হে,
আমার নয়নের অঞ্জন করিব শ্রীহরি,
শ্রীহরি মাথার মণি হে।
হরি বলয় কঙ্কণ, বসন ভূষণ,
হরি ধনে হব ধনী হে।
শয়নে স্বপনে, তন্দ্রা জাগরণে,
শ্রীহরি প্রাণের প্রাণ হে,
হরি পদরজ, ভোজন আমার,
চরণামৃত পান হে।
স্বদেশে বিদেশে, গৃহে পরবাসে,
শ্রীহরি প্রহরী সম হে,
বিপদে সম্পদে, হরষে বিষাদে,
শ্রীহরিই গতি মম হে।
আমার দেহ মন প্রাণ, আত্মীয় স্বজন (দারা সুত ধন)
শ্রীহরি করুণা কণা হে,
হরি পদতলে, সকল সঁপিয়ে,
ভুলে যাব আপনা হে।
আঁধারে আলোকে, ইহ পরলোকে,
সজনে নির্জ্জনবনে হে,
সাগর তরঙ্গে, ভূধর অঙ্গে,
স্থান শ্রীহরির চরণে হে।

—•—

[২]

ও যে অন্তরে পরে তোমার প্রেমের হার,
ওরে কাজ কি তার মণি মুক্তা হেমের হার;
প্রেম পারাবার কতদিনে আর, আমি পরবো সেই
পেমের হার হৃদয়ে আমার।
(তোমার) চরণ সেবন করে, হস্তের ভূষণ হবে,
এ পাপী জনার,
কবে নাম শ্রবণ ভূষণ হবে কর্ণের আমার।
(তোমার) দয়াময় নাম কীর্ত্তন, আমার রসনার ভূষণ,
কবে হবে হে!
কবে নয়নের ভূষণ হবে দর্শন তোমার।

[৩]

এবার ডুবিলাম ডুবিলাম প্রাণারাম সাগরে।
এযে সাগর নয় অমৃতের আধার,
ইহার ঢেউ লেগে প্রাণ শান্ত করে।
প্রেমনীরে ডুব দিয়ে আর কিছুই দেখিনা,
সুধা সিন্ধু-নীরে করি সন্তরণ,
সুধা মাখা বিশ্ব সংসারে;
এ সুখ বর্ণন কি হয় বচনে,
ইহার স্মরণে দুনয়ন ঝরে।
কোথায় গেল সংসারের কোলাহল,
আশার প্রলোভন ষড় রিপুর বল,
আমার প্রাণ হল শীতল;
এসেছি এখানে যাব না'ক আর,
খুঁজিয়া পেয়েছি, আনন্দ ভাণ্ডার,
হেথা নাই অন্ধকার।
এবার অমর হব এমনি রব,
দয়াল হরির চরণ ধরে।

—•—

"মা আমাদের আমরা মায়ের।"

শ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণ ও শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীকেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম সম্বন্ধ অতি নিগূঢ়। তাঁহারা দুইজনে একই সময়ে আপনাদিগের বিশিষ্ট ধর্ম্ম জীবন জ্যোতিতে বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। এখন দুইজনেই অমরলোকে। তাঁহাদের অনুবর্ত্তীগণের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গ লাভে ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেই পরলোকে তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাদিগকে দর্শন করেন নাই তাঁহাদের সংখ্যাই এখন অধিক। শিষ্য প্রশিষ্যগণ, আপনাপন গুরু বা আচার্য্যকে কল্পনা যোগে কতই বাড়াইতে প্রয়াসী হন, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীকেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম জীবনের প্রকৃত তথ্য না জানিয়া ভাব প্রধান শিষ্যদিগের অতিরঞ্জিত বর্ণনায় অনেকেই বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। এই জন্য ঘনিষ্ট ভাবে তাঁহাদিগের উভয়ের পবিত্র সঙ্গ করিয়া ঈশ্বরালোকে যাহা উপলব্ধি করিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করা সমুচিত মনে করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ পল্লীগ্রামে পূজারী ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্য পাঠশালাতে তখন যেমন শিক্ষা হইত, তেমন শিক্ষাও তাঁহার ভালরূপ হয় নাই। দুঃস্থ অবস্থা বশতঃ রাঁধুনী ব্রাহ্মণের কাজ করিতে আসিয়া পূজারী ব্রাহ্মণের সহকারীরূপে দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়ীতে স্থান প্রাপ্ত হন। এবং সেইখানেই তাঁহার ধর্ম্ম সাধনে সিদ্ধিলাভ হয়।

হিন্দু পৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদি করিতে করিতে তিনি হিন্দু সংস্কার অনুসারে কঠোর সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার নিজমুখে

শুনিয়াছি, এমন কঠোর কষ্টসাধ্য সাধনক নাই যাহা তিনি অনুসরণ করেন নাই। কঠোর বৈরাগ্য তপ জপ পূজা পাঠ যাহা করিবার তাহাত করিয়াছেনই, আবার মল মূত্র আহার পান, "টাকা মাটী মাটী টাকা" বলিয়া অর্থের মায়া ত্যাগ, যোগের বিভিন্ন প্রক্রীয়া ইত্যাদি সাধনেও তৃপ্ত না হইয়া যেখানে যে ধর্ম্মের যে সাধকের নাম শুনিতেন, অমনি পাগলের মত তাঁহারই কাছে ছুটিতেন, তাঁহারই নিকট উপদেশ লইতে চেষ্টা করিতেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুদিন ধর্ম্মোন্মাদগ্রস্ত হইয়া ধর্ম্মসমাধি ও সিদ্ধিলাভে ধন্ত হন। হিন্দুধর্ম্মানুসারে সাধন-সিদ্ধ যাহাকে বলা যায়, তাহা তিনি হইয়াছিলেন আমরা মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিব।

তিনি তীব্র বৈরাগ্যে, সরল পবিত্র বাল্যস্বভাবে, অকিঞ্চনা ভক্তিতে এবং ধর্ম্মোন্মত্ততায় সিদ্ধ।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবনে ভক্তি উন্মত্ততার ভাবের বিবরণ যাহা আমরা পাঠ করিয়াছি, তাহারই প্রতিচ্ছায়া আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখিয়াছি। শ্রীগৌর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, পাণ্ডিত্য ভুলিয়া মূর্খ হইয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ শাস্ত্রতত্ব কিছুই অধ্যয়ন করেন নাই, কিন্তু শাস্ত্র শুনিয়া বা নিজউদ্ভাবণী শক্তি বলে কতই শাস্ত্র তত্ব সহজে ব্যাখ্যান করিতেন। তিনি নিরক্ষর মূর্খ হইয়াও সহজ জ্ঞানে শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের অভিমান কিছুই ছিলনা।

অপরদিকে শ্রীকেশবচন্দ্র রাজধানী কলিকাতার ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন. বিদ্যালয়ে অধিক শিক্ষালাভ নাকরিলেও ইংরাজী শিক্ষায় ও বাগ্মীতায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। কখনই কোন প্রকার কৃচ্ছ্র কষ্টসাধ্য সাধনের পথ অবলম্বন করেন নাই। আপনা হইতে জীবন্ত ঈশ্বরের প্রেরণায় দৈববাণী শুনিয়া ঈশ্বরের নিকট একটু একটু সহজ সরলভাষায় প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করেন, তাহার পর আত্মজ্ঞানে মহাপাপ বোধ মনে অনুভব করেন, পাপকে মন হইতে ত্যাগ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হন, ক্রমে সংসারের বিলাস বাসনা কামনা ত্যাগে কৃতসংকল্প হন, তাহার পর স্বাধীন ভাবে প্রত্যক্ষ বিবেক বাণীকে ঈশ্বর বাণীরূপে অবলম্বন করেন, তাহারপর ভক্তি ও যোগের সঞ্চার হয়,পরে নিজ প্রকৃতি নির্ণয়ে দীনতা সাধনে চির শিষ্যভাব ও সর্ব্বকার্য্যে জয় লাভ করেন। এবং ক্রমে নববিধানের নব সমন্বয় ধর্ম্ম ইত্যাদী একে একে স্বাভাবিক ভাবে বিনা আয়াসে একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাবলে জীবনে সাধন করিয়া, স্বভাব-সিদ্ধ প্রত্যাদিষ্ট সমন্বয়াচার্য্যপদে স্বয়ং ঈশ্বর কর্ত্তৃক তিনি নিয়োগ লাভ করেন। পাশ্চাত্য জগতে তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষী "Greatest Man India has ever produced" বলিয়া স্বীকৃত ও সম্মানিত।

শ্রীকেশব আপনার সম্বন্ধেও প্রার্থনায় বলিয়াছেন "আমরা প্রথমে ব্রাহ্ম হইলাম। তাহার পর ঈশা মুষার প্রতি একটু একটু ভক্তি হইল। তাহার পর ভক্তি আরও অনেক দূর গড়াইল। ক্রমে দেখি যে একটী সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন বিধান। আমরা পুকুরে স্নান করিতে করিতে আসিয়া দেখি এক মহাসমুদ্র। আমাদের আপনার ইচ্ছায় কিছুই হয় না।"

বাস্তবিক একমাত্র বিধাতার প্রেরণাই তাঁহার জীবনের সকল উন্নতি ও সিদ্ধির মূল। তাই তিনি নির্ভয়ে বলিলেন, "আমরা মার হাতে গঠিত সুতরাং শ্রীকেশব জীবন বর্ত্তমান যুগে স্বয়ং মার হাতে গঠিত সমন্বয়াদর্শ মানব জীবন। বিনা আয়াসে বিনা কষ্টসাধ্য পুরুষকার সাধনায় এ জীবন সহজে সিদ্ধ। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও ইহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন "কেশব চাপরাশ নিয়ে এসেছেন"।

কেশবের দল কেমন করিয়া নিরাকার ঈশ্বরকে দর্শন করেন তাহা জানিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া তিনি কেশবের সহিত পরিচিত এবং মিলিত হন এবং প্রথম দেখা শুনাতেই পরস্পরকে চিনিয়া যেন মনিকাঞ্চন যোগে যুক্ত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পৌত্তলিক পন্থাবলম্বনে কঠোর পুরুষকার সাধনায় সিদ্ধ। শ্রীকেশবচন্দ্র সহজ জ্ঞানে ঈশ্বর-প্রেরণায় সমন্বয় সাধনায় সিদ্ধ। কিন্তু দেখিয়াছি উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে নাচিতে একই মার জয় ঘোষণায় গাহিয়াছেন, "মা আমাদের আমরা মায়ের"।

তুমি কি পূজা কর ?

[শ্রীমৎ আচার্য্যদেব লিখিত।]

তুমি কি আহ্নিকপূজা কর না ? তুমি নাকি সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও ঈশ্বরের নাম লও না ? কি আশ্চর্য্য! প্রকৃত হিন্দু যাঁহারা তাঁহারা দিনের মধ্যে তিন সন্ধ্যা স্তব করেন; মুসলমান ধার্ম্মিকেরা পাঁচবার নমাজ পাঠ করেন; খৃষ্ট ভক্তেরা দুইবার ভজনা করেন। কিন্তু তোমাকে একবারওতো পূজা করিতে দেখা যায় না। তুমি হয়তো এই কথা বলিবে, "আমার সময় নাই। প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান আহারাদি করিয়া তাড়াতাড়ি কার্য্যালয়ে আসিতে হয়, আবার সমস্ত দিন খাটিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সংসারের কর্ম্ম একটু দেখিতে হয়, অবকাশ কিছুই থাকে না, পূজা কখন করিব ?"

তাই এটি মিথ্যা ওজর। কেননা পূজার জন্ম তোমাকে দুই ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা দিতে বলিতেছি না। প্রত্যহ পাঁচ মিনিট কি দিতে পার না ? ভক্তির সহিত ঈশ্বরকে পাঁচ মিনিট ডাকিলে যথেষ্ট ফল হয়। তোমার এ যুক্তি তবে কাটিয়া গেল। তোমার অপর যুক্তিটীও অসার। তুমি বল আমার পূজা করিতে কিছুমাত্র ইচ্ছা হয় না, আবশ্যকতাও বোধ হয় না। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে খাইবার ইচ্ছা হয় বলিয়া খাই, টাকা উপার্জ্জনের ইচ্ছা হয় বলিয়া টাকার চেষ্টা করি; কিন্তু আহ্নিক পূজার স্পৃহা হয় না, সুতরাং তাহা করি না। রোজ রোজ যে একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে চুপ করিয়া বসিয়া ঈশ্বরকে ডাকিব, এরূপ তো প্রবৃত্তি হয় না, হইলে করিতাম।

বন্দনা।

জয় ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-নন্দন পিতা,
ব্রহ্মানন্দ-নবশিশুর মাতা
জয় জয় নববিধান বিধাতা।
জয় সত্য সারাৎসার জ্ঞানের আধার,
অনন্ত প্রেমময় পিতা মাতা,
এক অদ্বৈত, অপাপবিদ্ধ
আনন্দময় শান্তিদাতা।
জয় জয় নববিধান বিধাতা।
তব ধ্যানে জ্ঞানে দর্শন শ্রবণে
দাও নবজীবন জীবনদাতা,
নমি তব চরণে মিলি জনে জনে,
হে জগবন্দন পরম দেবতা।
জয় জয় নববিধান বিধাতা।

ফকিরী লও।

প্রাপ্ত।

নবভক্ত বলিলেন "হে দীনজন পরিত্রাতা, তুমি এই চাও প্রত্যেক মানুষ ফকির হবে। ঐ মায়ার রজ্জু কাটিতে বলিতেছ" সত্যই কি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ন্যায় আমরা সংসারের যাবতীয় বন্ধন কাটীয়া সন্ন্যাসী ফকির হইয়া চলিয়া যাইব? তাতো যুগ-ধর্ম্মের অভিপ্রায় নয়। সংসার ছাড়িব না, মা বাপকে চক্ষের জলে ভাসাইব না, প্রিয়তমা পত্নীকেও কাঙ্গালিনী করিব না অথচ ফকির হইব কিরূপে? সাধারণ লোকে বলেন "হয় সংসারী না হয় ফকিরী"। এই কঠোর বৈরাগ্য ও ত্যাগের সহিত প্রেম ও পুণ্যমূলক মহাযোগের সামঞ্জস্য কিসে সমাধান হইবে? বর্ত্তমান সময়ে আর অন্য উপায় যে আছে তাহা কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে রাজী নন্। অথচ এই যুগের পরিত্রাণপ্রদ নববিধান ধর্ম্মে, বিধানজননীর আদেশ "নরনারী তোমারা বিশ্বাসী ও প্রেমিক হইবে, কিন্তু অন্তরকে বৈরাগ্যে পূর্ণ রাখিয়া মহাযোগে যুক্ত হইবে" পিতা মাতার সহিত পুত্র কন্যার প্রকৃত যোগ আত্মিক, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত যোগ প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক। বন্ধুর সহিত বন্ধুর যোগ বিশুদ্ধ ভালবাসাও আত্মত্যাগমূলক। আমরা যতই এই জড় জগতের সহিত জড়ীভূত হই, ততই সংসারাসক্তি ও মোহ আসিয়া আমাদিগকে সংসারের অতল জলে ডুবাইয়া দেয়। কিন্তু যতই আমরা ভিতরের সমস্ত বিকার বিকৃতিকে বৈরাগ্যের অসিদ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করি, ততই যথার্থ আত্মিক বা পবিত্র জীবন লাভের অধিকারী হই। এইরূপ আত্মার প্রতি আত্মানুরাগী হইয়াই প্রথমে আমরা এ সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু নিজের আমিত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আমাদিগকে সংসারের অতলজলে ডুবাইয়াছে। এই দুরাবস্থায় কাতর হইয়া অনুরাগী সাধক গাহিলেন, "এবার অথাদ সলিলে ডুবে মরি:শ্যামা" সত্যই পরমব্রহ্ম নিত্য কল্যাণদাতা পরমেশ্বর আমাদিগকে তাঁর মনের মত করিয়া গঠন করিতে চান, কিন্তু আমাদের অন্তর্নিহিত পাপ প্রবৃত্তি আমাদিগকে তাঁর হাতে সকল ভার দিতে দেয় না, তাই ভিতরে ভিতরে যেমন তাঁর সহিত চাতুরী করি, তেমনি বাহিরেও ভাই ভগিনীদিগকে ঠকাইতে গিয়া ধর্ম্মের ভান করিয়া আত্মপ্রবঞ্চিত হই। সেই জন্য অকিঞ্চন ভক্ত বলিলেন "কই, কোন একটী সামান্য পাপও তো অসম্ভব হইল না? সমস্ত চরাচর দুর্ম্মতি যে পূর্ণ মাত্রায় আমাদিগকে অধিকার করিয়াছে" যিনি সত্যই আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের ভিতরের দুর্ব্বলতাগুলি পরিহার করিতে যত্নবান্ হইয়া সরল ও কাতর অন্তরে পরমদেবতার কৃপাভিক্ষা করেন, নিশ্চয়ই তাঁর জীবন পবিত্র ও মধুময় হয়। আমরা অনেক সময় আত্ম-বঞ্চনা করি ও বৃথা ধর্ম্মাভিমানে স্ফীতবক্ষ হই, কিন্তু ধর্ম্মের নিগূঢ় পথে আত্মবঞ্চনা চলে না। সম্পূর্ণরূপে তৃণাপেক্ষা নীচ ও বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু না হইলে স্বর্গের দুর্লভ ধন যে বৈরাগ্য ও অকিঞ্চনা ভক্তি কেহ লাভ করিতে পারে না। তাই এই বৃদ্ধ বয়সে পাপের জ্বালায় জ্বলিতেছি ও বিশ্বরাজ্যের চাতুরী ও আত্মবঞ্চনাপূর্ণ ব্যাপার দেখিয়া দিন দিন হতভম্ব হইতেছি এবং প্রাণটা মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে, "হায়, হায়! কি হইল, কি হইবে"। সেই জন্য ভক্তের কাতরতাপূর্ণ সংকীর্ত্তনটী গাইতে ভাল লাগে, "মা ব'লে কাঁদি সকলে আয়, তোরা আয় আয়, মা বিনা আমাদের আর নাহি যে উপায়"। কিন্তু এত অশ্রু বর্ষণ ও নিরাশার মধ্যে ও চিরসন্তাপহারিনী জননী মাঝে মাঝে দেখা দিয়া প্রেমাঞ্চলে এ দীনের চক্ষের জল মুছাইয়া বলিতেছেন, "বাছা রে, তুইতো ফকিরের অনুগামী, তোকে মাতৃগর্ভে ফকিরী দিয়াছি তাই বাহিরেও পথের কাঙ্গাল নাচের ভিখারী করিয়াছি।"

এস্থলে আমাদের উপায় কি, আমারা ফকিরী লইয়া ঘর ছাড়িয়া বনে যাইব, না নববিধানের উচ্চ আদর্শ যে সংসারে অনাসক্ত হইয়া যথার্থ পবিত্র প্রেমে ভাই ভগিনীর সহিত মিলিত হইয়া এই যুগের পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্ম সাধন করিয়া ধরায় স্বর্গ সম্ভোগ করিব? চারিদিকে যেরূপ ধর্ম্মহীনতা ও বিলাসিতা, উপাসনা বিমুখতা তাহাতে অন্ততঃ এক দল যথার্থ প্রেমিক ও ফকির দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চকণ্ঠে বিধানের মহানবার্ত্তা ঘোষণা ও সচ্চিদানন্দময় শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনে প্রমত্ত না হইলে, এই দুর্দ্দিন ঘুচিবে না। তাই এই অযোগ্য ভৃত্যানুভৃত্যের মিনতি ও প্রার্থনা, ভাই ও ভগিনীগণ! আপনারা আত্মচিন্তা করিয়া বিধান-জননীর দিব্যালোকে আপন আপন গন্তব্য পথ স্থির করুন ও মণ্ডলীর ও দেশের জন্য মা ভক্তচিত্তহারিণীর মহান্ আদেশ পালন করুন। মা! যদি ফকিরী দেওয়াই তোমার অভিপ্রেত হয় তবে নববিধানের নূতন আদর্শে এক দল যথার্থ ফকির স্বর্গ হইতে

প্রেরণ করিয়া এই ধরার ঘোরতর বিলাসিতা এবং দুরাচার ও ধর্ম্ম-হীনতা দূর কর ইহাই ভৃত্যানুভৃত্যের প্রার্থনা।

অযোগ্য ফকির অনুগামী।

—•—

অষ্টনবতিতম মাঘোৎসব।

১লা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারী, রবিবার, সায়ংকালে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারদেশে "মা আনন্দময়ীর শ্রীমন্দিরে চল ভাই যাই সকলে" এই মধুর সঙ্গীতটী গাহিতে গাহিতে সাধকদল শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন। ভাই প্রমথলাল সেন বেদী হইতে সংক্ষিপ্ত উপাসনার পর বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, "জয় মাত, জয় মাত, নিখিল জগৎপ্রসবিনী আরতির সংকীর্ত্তনটী গাহিতে গাহিতে দীপযোগে আরতি হয় ও আচার্য্যকৃত মাঘোৎসবের আরতির প্রার্থনাটী সুগভীরভাবে পঠিত হইলে মত্ততার সহিত সংকীর্ত্তন হইয়া অদ্যকার কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। অদ্য সায়ংকালে বহুসংখ্যক নরনারী আরতিতে যোগদান করেন।

২রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী, সোমবার, প্রাতে প্রচারাশ্রম দেবালয়ে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনার কার্য্য করেন, অপরাহ্ণে গোলদিঘীতে সংকীর্ত্তন ও প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়। প্রথমে সন্ন্যাসী সত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক যোগ নববিধানে উভয়ের সাধনার মিলন বিষয়ে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ নববিধানের শুভবার্ত্তা এবং বন্ধুবর অনুকূলচন্দ্র রায় নববিধানের ক্রম বিকাশ ও সেবক অখিলচন্দ্র রায় নববিধানে নববিধান জননীর মাতৃরূপে প্রকাশ, বিষয়ে বক্তৃতা করেন। অনেকগুলি শ্রোতা এই সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা আগ্রহের সহিত শুনিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় কমলকুটীর নবদেবালয়ের সম্মুখে আর্য্যনারীগণ কর্ত্তৃক নিশান বরণ হয়।

৩রা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী, প্রাতে প্রচারাশ্রম দেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন, অপরাহ্ণে হেদুয়া তলা উদ্যানে প্রকাশ্য বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন, প্রথমে সন্ন্যাসী সত্যানন্দ নববিধানের শুভবার্ত্তা ও তৎপরে ভ্রাতা প্রেমেন্দ্রনাথ রায় আবেগপূর্ণ অন্তরে শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনে ধর্ম্মসমন্বয় ও তাঁতে সমস্ত সাধু ভক্তদিগের শুভ সম্মিলন বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা করিয়া নববিধানের মহিমা প্রচার করেন।

৪ঠা মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী, প্রাতে নববিধান প্রচারাশ্রম দেবালয়ে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে বিডন পার্কে প্রথমে সংকীর্ত্তন ও পরে সন্ন্যাসী সত্যানন্দ যথার্থ বিশ্বাস True Faith নামক হিন্দি পুস্তক হইতে কিছু পাঠ করিয়া ঐ বিশ্বাস সম্বন্ধেই হিন্দিতে কিছু বলেন, তৎপরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ অন্তর্জগতে ঈশ্বর দর্শন ও সেবক অখিলচন্দ্র রায় আমরা বিশ্বমাতার ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় বাস করিতেছি, সুতরাং আমরা নিরাপদেই আছি বিষয়ে, ভ্রাতা অনুকূলচন্দ্র রায় আচার্য্যের "নারী উদ্ধার" বক্তৃতাটী পাঠ করেন। অদ্য সায়ংকালে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে করাচির প্রেমদাস ডাক্তার কবেন, কুমারী পার্ব্বতী ও কুমারী গোমতী প্রভৃতি সহ হিন্দিতে ভজন করেন।

৫ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী, প্রাতে প্রচারাশ্রম দেবালয়ে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনার কার্য্য করেন, অপরাহ্ণে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা, প্রথমে সন্ন্যাসী হিন্দিতে যথার্থ বিশ্বাস নামক পুস্তক হইতে কিছু পাঠ করিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্বন্ধে ও বাবু অনুকূলচন্দ্র রায় নববিধান ও ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বসু নববিধান জগতের ধর্ম্ম ও সেবক অখিলচন্দ্র রায় নববিধানের সার্ব্বজনীন প্রেম সম্বন্ধে কিছু বলেন। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক সভা হয়, ডাক্তার ডি, এন, ব্যানার্জ্জি সভাপতির কার্য্য করেন।

৬ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী, প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। সায়ংকালে ঐ মন্দিরেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতি সভায় ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী সভানেত্রীর কার্য্য করেন। উক্ত সভায় প্রথম বক্তা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা এই পত্রিকার স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

(ক্রমশঃ)

সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব।

(প্রাপ্ত)

১৫ই মাঘ, রবিবার—এই দিন প্রাতঃকালের উপাসনায় শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেন বেদীর কার্য্য করেন। অদ্যকার প্রাতঃকালীন উপাসনা উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, পাঠ ও আচার্য্যের প্রার্থনা সমস্ত এক নূতন আকারধারণ করে।

আরাধনায় একেবারে নূতন মূর্ত্তিতে ব্রহ্ম আপনাকে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, সত্য স্বরূপের আরাধনায় তিনি যেন কোন শব্দ ও মন্ত্রোচ্চরণের উপর আপনাকে আপনি বদ্ধ রাখেন নাই, আপনাকে আপনি ঢেলে দিতেছেন, সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ উচ্চারণ করিবার আর অপেক্ষা তাঁর যেন সহ্য হইতেছিল না, সব প্রকাশের মহাপ্লাবনের ভিতর ফেলে দিয়ে আপনি কত সত্য তাহা বিরাট প্রকাশের ভিতর দেখিতে দিলেন, আর চিবিয়ে চিবিয়ে এক একটী স্বরূপ উচ্চারণ করে আমাদের আরাধনা, যেন দূরে ফেলে দিয়ে, তিনি যে প্রচণ্ড ঝড় তাই দেখিতে দিলেন। যেমন বাহিরের জগতে প্রবল প্রভঞ্জন, কোথাকার জিনিষ মুহূর্ত্তে কোথায় নিয়ে তুলে ফেলে, সমুদ্রের জাহাজ মাটিতে এসে পড়ে, পলকে প্রলয়ের দৃশ্য হয়, এই বাহিরের উপমা দিয়ে অন্তর-র্জগতের ব্রহ্মপ্রকাশের ঝড় কিরূপে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন, একটু মাত্র বলা যেতে পারে, উপমা সত্যর সম্যক্ প্রকাশ, প্রকাশ করিতে পারে না। কত কি চূর্ণ হবে, কত কি নূতন সৃষ্টি হবে কে

বলিতে পারে, এই নূতন ঝড়ের আত্মপ্রকাশের ভিতর সব পড়ে গেছে, আমি সশরীরে পড়ে গেছি, যখন আমার এই অবস্থা দেখ্‌লাম, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনুষ্যজাতি পড়েছে দেখ্‌লাম, সকলে স্বীকার করুক আর নাই করুক, একদিন সকলে স্বীকার করবে, কেবল কি মনুষ্যজাতি এই ঝড়ের ভিতর পড়েছে, সমস্ত জীব ও জড় জগৎ পড়েছে, ইহা এক সম্পূর্ণ নূতন দৃশ্য, নববিধানে মার নূতন প্রকাশ, সব নূতন করে দেখা গেল, পৃথিবী নূতন, বিশ্ব নূতন, জীব, প্রাণী, মানুষ সব নূতন। এই নবীন রূপ ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়েছিলেন। পৃথিবী এ দর্শন আগে কখন দেখে নাই কেবল তাঁর একলার জন্য নয়, কিন্তু তোমার আমার, সব ক্ষুদ্র পাপীদের জন্য, কেবল যে এখন আমরা অধিকার পেয়েছি এই নবীন রূপ দেখবার, তা নয়, আমরা দেখিতে আরম্ভ করেছি, এই আরম্ভের শেষ কোথায় জানি না, এবারকার বিধান আমাদের মত পাপীর উদ্ধারের জন্য, প্রত্যেকে সাক্ষ্য দিতে হবে, নবীন দর্শনে ভাবান্তর হবে, রূপান্তরিত হয়ে যাব, যাচ্ছি, যত রূপান্তরিত হব, তত তাঁর সঙ্গে মিলিব, তাঁকে আত্মস্থ করিতে শিখিতে আরম্ভ হইল, নবশিশু মার কোলে, আমরা সকলে নবশিশুরদল হইতে আরম্ভ করেছি, এই দল পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বাস করিবে, তার সন্ধান আজ লাভ করিতে শিখিলাম, আমি নবশিশুর ভিতর, তুমি নবশিশুর ভিতর, আমরা পরস্পরে নবশিশুতে এক। একদিন এই দলের প্রবল প্রতাপ, পৃথিবী জানিবে, সেইদিন আগতপ্রায়, নববিধান জয়ী করিবার জন্য আমাদের এ পৃথিবীতে আসা, এবার কেহই স্বর্গের আনন্দ ভোগ করিতে পাবে না, যদি না আমরা এই মহা সমন্বয়ের জীবনে জীবিত হই, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি যে সম্প্রদায় মত উচ্চশ্রেণীর সাধক থাকুন না কেন, কেহ হয়তো খুব যোগী, কেহ খুব বৈরাগী, কেহ খুব খ্রীষ্টভক্ত, খুবকর্ম্মী, খুব ভক্তবৈষ্ণব, এক এক সম্প্রদায়ের, সেই সম্প্রদায়ের উন্নত সাধক সকলেই পাষাণ সমান, সমন্বয়ের আনন্দ ও স্বর্গ কি তাঁরা জানে না তাঁরা যে আনন্দ ভোগ করেন সে পাষাণের মত কঠিন, নববিধানের যে আনন্দ সব মিলনে ভোগ হয়, মার নূতন প্রকাশের ভিতর নবশিশুর আনন্দ তাঁরা কেহই আস্বাদন করেন নাই, এই নূতন আনন্দের কাছে তাঁদের আনন্দ প্রস্তরবৎ, সকলকে এই নূতন আনন্দের ভূমিতে আসিতেই হবে। খৃষ্টানকে, মুসলমান বিশ্বাসীদের সঙ্গে, মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে, বৈষ্ণব খৃষ্টানদের সঙ্গে ও সকলে পরস্পরের সঙ্গে মিলে সকলের সঙ্গে যে নৃত্য ও আনন্দ ভোগ, সেই সশরীরে স্বর্গ ভোগ ও নবশিশুর ভিতর একত্র মিলন, পৃথিবীতে এই আনন্দে মত্ত হয়ে, মার কোলে নবশিশু হয়ে নববিধানকে, ভক্তকে ও মাকে আমাদের ভিতর এই প্রলয় ঝড়ের মতন, দাবানলের মতন আসিতে দেখি ও দেখাই, ঐ মহা আনন্দে যে মহা শান্তি, তাই আজ পৃথিবী, ভারত, বঙ্গদেশ পাইবার জন্য ক্রন্দন করিতেছে।

পাঠ, পলের সাক্ষ্য দান, তিনি ঈশাকে কি ভাবে গ্রহণ করিলেন, তাহারই বিশদ ব্যাখ্যা হইল, আচার্য্যের নিবেদন হইতে নববিধানের প্রকাশে, সব এক হয়ে গেল ব্রাহ্মনাম ও ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মধর্ম্ম খোসার মত পড়ে রহিল, নববিধান সব গ্রাস করিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ আর রহিল না, সব নববিধানের ভিতর পড়িল। আচার্য্যের প্রার্থনায় তন্ময়ত্ব বিষয় প্রকাশ পাইল। নবশিশুতে রূপান্তর হতে হয়, কেমন করে আমরা মায়ের সঙ্গে, নবশিশুর ভিতর তন্ময় হয়ে প্রত্যেকে নবশিশু হয়ে যাব।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়।

সংবাদ।

নামকরণ—বিগত ১৭ই মাঘ ৩১শে জানুয়ারী ঢাকুরিয়া প্রবাসী শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র কুণ্ডুর দ্বিতীয় নবকুমারের নামকরণ নবসংহিতানুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে, সেবক অখিলচন্দ্র রায় এই শুভানুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশু বিজনকুমার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, এই শিশু বিগত ২১শে শ্রাবণ (১৩৩৪) ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। শিশুর মাতৃস্থানীয়া ঢাকা নিবাসী শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা প্রার্থনাপূর্ব্বক শিশুর মুখে অন্ন প্রদান করেন। মঙ্গলময়ী মা শিশু ও তাহার ভাই ভগিনী পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার, ৩৩।১এ ল্যান্সডাউন রোড ভবনে শ্রীমান্ আতরচাঁদ বাত্রার শিশু পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করিয়াছেন ও শিশুর নাম কুমার-দত্ত চাঁদ দিয়াছেন। বিধানজননী শিশু ও তার পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভ দীক্ষা—বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২২শে মাঘ, রবিবার, প্রাতে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ময়ূরভঞ্জের মহারাজকুমার শ্রীমান্ ধ্রুবেন্দ্রচন্দ্র ভঞ্জ দেওর ও কুমারী জয়ন্তী দেবীর নববিধানে দীক্ষানুষ্ঠান খুব গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী দীক্ষার্থী ও দীক্ষার্থিনীকে আচার্য্য ভাই প্রমথলাল সেন মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। রাজকুমার ও রাজকুমারী উভয়ে ইংরাজী নবসংহিতা হইতে দীক্ষার প্রতিজ্ঞা পাঠ করেন। পূর্ব্বযুগে কপিলাবস্তুর ভাবি রাজা কুমার রাহুলকে সন্ন্যাসী বুদ্ধদেব স্বয়ং মস্তক মুণ্ডন করাইয়া নির্ব্বাণ মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া পথের কাঙ্গাল করিয়াছিলেন। আর এই নববিধানের যুগে স্বয়ং মহারাণী তাঁর একমাত্র স্নেহের পুত্তলী পুত্র কন্যাকে নববিধানের বিজয় নিশানতলে উপস্থিত করিলেন, এই দৃশ্য বাস্তবিকই স্বর্গীয়, দীক্ষার শেষে মহিলাগণ মধুরস্বরে গাহিলেন, "দাও মা সাজায়ে দীন সন্তানে বিবিধ রতনে দেহ মন নববিধানে"।

নববিধানতত্ত্ব শিক্ষা—নববিধানের তত্ত্ব শিক্ষার উদ্দেশ্যে নববিধানের পুস্তক সকল পাঠের জন্য কয়েকজন যুবা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে প্রতি শনিবার শাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

সেবা ও শিক্ষা—আমাদের অমরাগড়ীর ভাই ফকিরদাস রায়ের স্থাপিত জয়পুর উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বারা ঐ প্রদেশে বিগত ৪৮ বৎসর কাল শিক্ষা বিস্তার হইতেছে। বর্ত্তমান

সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য ভালরূপ চলিতেছে না। সেইজন্য বিদ্যালয়ের কয়েকটী পুরাতন ছাত্র (যাঁরা এখন বিশেষভাবে গণ্যমান্য এবং সমাজে পরিচিত তাঁরা) উৎসাহের সহিত ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। প্রায় দেড় বৎসর কাল চেষ্টা করিয়া ঐ সকল যুবক বন্ধুদের সাহায্য ও সহায়তায় ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় প্রায় ৬০০৲ শত টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয় গৃহটী অর্দ্ধেক রকম মেরামত করাইয়াছেন। ভক্ত ফকির দাসের বংশধর ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ যদ্যপি ঐ বিদ্যালয়ের প্রতি দৃষ্টি করেন তাহা হইলে বিদ্যালয়টী আচরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। যেখানে সমবেত চেষ্টা ও আত্মত্যাগ সেস্থলে নিশ্চয়ই ভগবৎকৃপা বর্ষিত হইবে।

বারিপদা হইতে ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—এবারে এক নূতন উৎসব করা গেল, শিবরাত্রিতে সমস্ত রাত উপবাস ও জাগিয়া থাকিয়া উপাসনা ধ্যান ও পাঠে কাটান গেল। সেবকের নিবেদন হইতে 'হিমালয়ের গাত্রোত্থান ও উদাসীনব্রহ্ম' ব্রহ্মগীতোপনিষদ হইতে যোগতত্ত্ব পাঠ করা হয়। ভাবের উপযোগী সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন করা হয়। বালেশ্বর হইতে গোবিন্দ ও সাধুকে সাহায্য করিবার জন্য আনাইয়াছিলাম। কতকগুলি নারী উপবাস করিয়া ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন ছিলেন। ধ্যানের গাঢ়তা অতি আনন্দপ্রদ হয়েছিল।

লণ্ডনে মাঘোৎসব—শ্রীমৎ আচার্য্য-পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্রের উদ্যোগে লণ্ডনের এসেক্সহলে মাঘোৎসব উপলক্ষে গত ২১শে জানুয়ারী ডাঃ টিউডর এক সম্মিলন হয়। জোন্স এবং নির্ম্মলচন্দ্র বক্তৃতা করেন। পরদিন অর্থাৎ ২২শে লিণ্ডসে হলে, ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র উপাসনা করেন।

শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে মাঘোৎসবের বিশেষ বিশেষ সাধন হইয়াছিল। ১১ই মাঘের দিন, বাগনান ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ উপাসনা হয়।

আদ্যশ্রাদ্ধ—বিগত ২৭শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী, কাঁথি আটিলাগড়ীস্থ ভবনে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ও যোগীন্দ্রনাথ শাশমলের মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে সমারোহে সম্পন্ন হয়। আমাদের প্রিয়তম গায়ক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সময়োপযোগী সঙ্গীত করেন, যে সমস্ত দ্রব্যাদি ও অর্থ দান করা হইয়াছে তাহার বিবরণ পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। মঙ্গলময় বিধাতা পরলোকগতা মাতৃ আত্মাকে স্বর্গে অমরবৃন্দের এক পার্শ্বে স্থান দান করুন ও তাঁর ইহলোকস্থ সন্তান ও আত্মীয়গণকে আশীর্ব্বাদ করুন।

পরলোকগমন—আমরা শুনিয়া সন্তপ্ত হইলাম করাচী নববিধান সমাজের প্রাচীন সাধক শ্রীসেণ্ট হাসামট্রাই ও মাঙ্গালোর ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন সভাপতি স্বামী ঈশ্বরানন্দ রাও সাহেব পরমজননীর ক্রোড়ারোহণ করিয়াছেন। স্থানীয় বন্ধুগণ উভয়ের স্মরণার্থ প্রকাশ্য সভা করিয়া শোক প্রকাশ করেন।

আচার্য্যের স্বর্গারোহণ—লক্ষ্ণৌ অযোধ্যা ব্রহ্মমন্দিরে ডাঃ পি, চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গত ৮ই জানুয়ারী আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণ স্মরণে সভা হইয়াছিল। ডাঃ মিস্ ইনোনা এবো, ডাঃ ভি, শিবরাম, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বসু এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মিঃ সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যদেবের জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক—বিগত ৫ই জানুয়ারী সায়ংকালে বাঁকিপুর পুরন্দরপুর মহল্লায় শ্রীযুক্ত দামোদর পালের বাটীতে স্বর্গীয় অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে সেবক অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা ও দামোদর বাবু সঙ্গীত ও ভগিনী হেমলতা চন্দ সকাতরে প্রার্থনা করেন। "নববিধানে অটল নিষ্ঠা" বিষয়ে প্রার্থনাটী পঠিত ও স্বর্গস্থ আত্মারও জীবনের বিশেষ ভাব নববিধানে অটল নিষ্ঠা বিষয়ে কাতর প্রার্থনা হয়। নববিধান প্রচারাদিতে ব্যয় করিবার জন্য স্বর্গীয়ভ্রাতা অপূর্ব্বকৃষ্ণ প্রায় ৯০০০৲ নয় হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্তকোন স্থানে তাঁর স্মৃতিরক্ষা হয় নাই। অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাবুর উইলের একজিকিউটারগণ এই মহান্ কার্য্যের প্রতি মনোযোগী হয়েন এই আমাদের অনুরোধ। আমরা জানি স্বর্গীয় অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মহাশয় যাঁহাদের হস্তে উক্ত মূলধন দিয়াছেন তাঁহারা নববিধানে নিষ্ঠাবান্। দাতা যেমন অহৈতুকী ভাবে সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তেমনি একজিকিউটারগণও তাঁকে ইহলোকে সঞ্জীবিত রাখিতে যত্নবান্ হইলে তাঁহাদের যথাযথ কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইবে।

সাম্বৎসরিক—বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারী, রাজা দীনেন্দ্রনাথ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে কুমারী নির্ভরপ্রিয়ার পিতৃদেব স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। নির্ভরপ্রিয়ার মাসীমা শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র ও মাতা শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ সকাতরে প্রার্থনা করেন। ভগিনী চিত্তবিনোদিনী স্বামী বিয়োগের কিছুদিন পরে, একমাত্র পুত্র দীর্ঘকাল নিরুদ্দেশ হওয়ায় শোকে তাপে জর্জ্জরিত আছেন, সে দিন তিনি শোকাশ্রু বিগলিত প্রাণে প্রার্থনা করেন। মঙ্গলময়ী মা, তাঁর আশ্রিত কন্যাগণের একমাত্র সান্ত্বনা হউন।

নিবেদন

ধর্ম্মতত্ত্বের নূতন বৎসর আরম্ভ হইয়াছে, এখনও নানা অসুবিধার মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব বিলম্বে বাহির হইতেছে। অনেক গ্রাহক মহাশয় আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন। গ্রাহক মহাশয়দিগের কাহারও কাহারও নিকট আমাদের চারি, পাঁচ বৎসরের মূল্য বাকি, অবশ্য আমরা আশা করিতে পারি যে আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া গ্রাহকগণ, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁদের দেয় মূল্য শীঘ্র প্রেরণ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের জীবনরক্ষার উপায় করিবেন।

দয়াপ্রার্থী সেবক—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়
সহঃ সম্পাদক—"ধর্ম্মতত্ত্ব"।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিহীন হইবেই হইবে। সে যদি শান্ত, অক্রোধ হইয়া আত্মগরিমাকে খর্ব্ব করে, অন্ততঃ বাহিরে চাপিয়া চলে, তবে সেই সঙ্গে অন্য প্রকার শত দোষকে দমন করিতে পারিবে। কিন্তু যাহা দমন করা প্রয়োজন তাহা ভুলিয়া গিয়া, যাহা অপ্রয়োজন, কি তত প্রয়োজন নয় তাহা জয় করিবার চেষ্টায় যদি সে বলক্ষয় করে, তার কি গুরুতর কি লঘুতর কোন রিপুই সংযত হয় না। যে বিলাসী, দৈহিক ভোগের দাস, যে সাংসারিক উন্নতিকে ধর্ম্মোন্নতি অপেক্ষা গুরুতর মনে করে, সে কবে কোন প্রবল লোভে পড়িয়া পশ্বাচার করিতে প্রবৃত্ত হইবে তার ঠিক কি? তার পক্ষে সামান্য সাদাসিধে আচার ব্যবহার ইহাই বিধি। হে মহাপ্রকৃতি, তুমি ভিন্ন ভিন্ন রিপুকে এক সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছ, একটী বিশেষ রিপুর অন্তর্গত করিয়াছ, সেই বিশেষকে ছেদন করিলে আর আর অনেগুলি অসৎপ্রবৃত্তিকে ছেদন করা হয়। এক দুর্দ্দান্ত "মার"কে বধ করিয়া সিদ্ধার্থ সকল রিপুর উপর জয় লাভ করিলেন। অদীর্ঘ তপস্যান্তে এক দুরন্ত "সয়তান"কে বিমুখ করিয়া ঈশা সমস্ত প্রলোভনকে জয় করিলেন। কিন্তু পরমার্থদর্শী লোক ইহাও বুঝিতে পারেন যে তোমা রচিত কোন রিপু প্রবৃত্তি মূলে পাপজনক নহে; কেবল যখন মানুষ তাহা লইয়া আত্ম চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করে তখনই পাপের উৎপত্তি হয়। আমি সেই প্রকাণ্ড আত্ম-সংহারব্রত কেবল স্বীয় বলে প্রতিনিয়ত পালন করিতে পারি নাই। কিন্তু তবে কেন তোমা হইতে বারংবার এই নিশ্চয় অঙ্গীকার শুনি যে মরণের পূর্ব্বে আমি সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করিবই করিব। নিরপরাধী হইয়া তোমার সংসারে এসেছিলাম; কেবল নিরপরাধকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ মনে করি না; তোমার দিব্য সন্তান ঈশা তুল্য বিজেতা হইয়া স্বধামে চলিয়া যাইব। তোমার দ্বারে সম্পূর্ণ শুদ্ধ-চরিত্রতা অন্বেষণ করিয়া শ্রান্ত ও অক্ষম হইয়াছিলাম; কিন্তু পরিশেষে তোমা দত্ত প্রেম শক্তি লাভ করিয়া সে অপূর্ণতা পূর্ণ হইতেছে, সে পুণ্যস্পৃহা চরিতার্থ হইতেছে।

"আশীষ"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সত্যধর্ম্মের মূলমন্ত্র।

(মহর্ষির স্মৃতিসভা)

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর গত ২০শে জানুয়ারি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন—

ভগবানকে সমুদয় হৃদয় দিয়া প্রীতি করিবে এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে; ইহাই হইল তাঁহার প্রকৃত উপাসনা। এইরূপ উপাসনার দ্বারাই আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। সত্যধর্ম্মের এই মূল সত্য ভারতবাসীর নিকট, হিন্দু জাতির নিকট নূতন নয়—বহু শত শতাব্দী পূর্ব্ব অবধিই ভারতের ঋষিরা আমাদিগকে সত্যধর্ম্মের এই অমোঘ মূল মন্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নানা ধর্ম্মবিপ্লবের কারণে, নানা সমাজবিপ্লবের গোলযোগে, নানা রাষ্ট্রবিপ্লবের তাড়নায় সেই মন্ত্র আমাদের চক্ষের অন্তরালে কোথায় যে গিয়া পড়িয়াছিল আমরা বহুকাল যাবৎ তাহার কোনও সন্ধান পাই নাই; সুতরাং আমরা তাহাকে হৃদয়ে যথাযথরূপে ধরিয়া রাখিতে পারি নাই, অন্তরে তাহাকে পোষণ করিতে পারি নাই। তাই সেই মহামন্ত্র অধুনাতন ভারতবাসীর প্রাণে সম্যক জাগ্রত হইতে পারে নাই, ভালরূপ ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু সেই অক্ষয় অমোঘ মহামন্ত্র মরিবার পদার্থ নয়—উহা অমৃতস্বরূপকে পূজা করিবার উপকরণ—অজর অমর মহামন্ত্র।

বহুশতাব্দী পরে, রাজা রামমোহন রায় সেই মহামন্ত্রের সন্ধান লাভ করিয়া তাহার উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক পুণ্য ১১ই মাঘের দিনে এই পুণ্য দেশে তাহাকে পুনরায় সযত্নে প্রোথিত করিলেন। তাঁহার পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—আজ যাঁহার তিরোভাবের দিন—সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঐ মহামন্ত্রের মূলে অমৃতরস সেচন করত উহাকে সযত্নে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিলেন। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—সকল সত্যধর্ম্মের মূল ঐ মহামন্ত্রকে এই পুণ্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার কারণেই জনসাধারণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে ঋষিপদে বরণ করা সার্থক হইয়াছে। তাঁহার প্রাণপণ যত্নে ঐ মহামন্ত্রকে রক্ষা করিয়া পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার ফলেই আজ প্রায় শতাব্দী পরে উহা মহামহীরুহে পরিণত হইয়া কেবল বঙ্গদেশকে নয়, কেবল ভারতভূমিকে নয়, কিন্তু সমগ্র জগতবাসীকে আহ্বান করিয়া ফল ও আশ্রয় দিতে উদ্যত হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উহাকে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা ঐ মহামন্ত্রকে আমাদের জীবনের প্রতি বিভাগেই প্রয়োগ করিবার অবসর পাইতেছি, এবং প্রয়োগ করিয়া তাহার সুফল ও সাফল্য প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি।

এই মহামন্ত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্য্যকারিতার ফলেই ভারতবাসী বুঝিয়াছেন এবং প্রচার করিতে পারিতেছেন যে, স্বাধীনতা—সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতাই মানবের জন্মগত অধিকার। ভগবানের সঙ্গে যিনি প্রত্যক্ষ যোগ উপলব্ধি করিবেন, তিনি তো স্বভাবতই আপনাকে ভগবানের বশে আনিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও নিজের বশে আনিবেন—তাঁহার পক্ষে পরবশ্যতা, কোনও বিষয়ে পরের অধীনতা অসহ্য। এই কারণেই সংসারের সর্ব্ববিধ পরাধীনতার হস্ত হইতে যতদূর সম্ভব মুক্তি পাইবার উদ্দেশ্যে প্রকৃত সাধুসন্ন্যাসীগণ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। ভগবানকে উপলব্ধি করিয়া প্রীতি করিবার সঙ্গে পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য বুঝিয়া নব্যযুগে ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতাই মানবের চরম লক্ষ্য। ভগবৎ পূজার ঐ মহামন্ত্রের ভিত্তিতে, সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্ম-

বশং সুখং—পরবশ যাহা কিছু সে সকলই দুঃখের কারণ—স্বাধীনতার এই মহাসূত্র ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, একমাত্র ভগবানই আমাদের প্রভু আমরা একমাত্র তাঁহারই দাস। দাসত্ব করিতে হয়, সমস্ত হৃদয় দিয়া তাঁহারই দাসত্ব কর—সে দাসত্বের বিনিময়ে মুক্তি লাভ করিবে। নিজের সর্ব্বস্ব যদি নিবেদন করিতে চাও, তবে সকল স্বাধীনতার একমাত্র উৎস, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের একমাত্র আকর ভগবানেরই চরণে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া দাও—সেই সর্ব্বস্ব নিবেদনের বিনিময়ে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে।

ভারতবাসীর অন্তরে বাহিরে ব্রাহ্মসমাজ ভগবানের সঙ্গে মানবের প্রত্যক্ষ যোগের ঐ মহামন্ত্র এদেশে নবযুগে সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বতোভাবে প্রচার করিবার ফলেই ভারতবাসীর চক্ষু হইতে অজ্ঞানের মসীলিপ্ত পর্দ্দা খসিয়া গেল—নবযুগের ভারতবাসী বুঝিতে পারিল যে, কি বিজ্ঞান, কি প্রজ্ঞান, কি সাংসারিক জ্ঞান, কি ব্রহ্মজ্ঞান, কাহারও কোন প্রকার জ্ঞান অর্জ্জনের পথ কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণ বল, শূদ্র বল, স্ত্রীলোক বল, বা তথাকথিত নিম্নজাতি বল, কাহাকেও বেদ বল, স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র বল বাইবেল বল, আর কোরাণ বল, কোনও কিছু হইতে সত্য লাভ করিবার পথে, জ্ঞান অর্জ্জন করিবার পথে কেহই বাধা দিতে পারে না—কাহারও বাধা দিবার অধিকারই নাই। ঐ মহামন্ত্রের উদার তম ভিত্তিতে দাঁড়াইয়াই নবযুগে ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বপ্রথম এই মহাসত্য ঘোষণা করিতে সাহস করিলেন যে, জ্ঞান অর্জ্জনের পথে, ভগবানকে লাভ করিবার সুপ্রশস্ত উন্মুক্ত রাজপথে চলাচল করিবার সকলের সমান অধিকার—সেখানে স্ত্রীপুরুষের ভেদ নাই, উচ্চনীচের ভেদ নাই। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সত্য ঘোষণায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরই হস্ত বিশেষ ভাবে প্রকাশিত।

ভগবদুপাসনার ঐ মহামন্ত্র প্রচার করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল হইতেছে এই যে, নবযুগে ভারতবাসী উহারই ভিতর দিয়া ভগবানের সঙ্গে মানবের প্রত্যক্ষ যোগের সন্ধান লাভ করিল। আমরা বারম্বার বলিতেছি এবং চিরকাল বলিব যে, এই মহামন্ত্র কোন নূতন পদার্থ নয়—ইহা চিরপুরাতন সত্য। পুরাকালে ভারতের ঋষিরা এই সত্যই বলের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের উপদেশ কার্য্যত অনুসরণ করিয়া ভারতবাসীগণ উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিবার অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে শতবিধ বিপ্লবের ঘাতপ্রতিঘাতে ভারতবাসী ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের সেই সরল সত্য ভুলিয়া গিয়া সত্যের অপভ্রংশ সমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রকৃত সত্য ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মের বহিরাবরণ লইয়াই হিন্দুসমাজ পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। তদানীন্তন শাস্ত্রজ্ঞানহীন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের প্ররোচনায় হিন্দুসমাজ কথামালার সেই একচক্ষু হরিণের ন্যায় শুধু সম্মুখ হইতেই আঘাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং পূর্ব্বাবধি সঞ্চিত ধর্ম্মের সেই সমস্ত বহিরাবরণ বা খোসার উপরেই আত্মরক্ষার জন্য নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিল। এদিকে অপর তিন দিক হইতে প্রলয়ের অগ্নি সমগ্র হিন্দুসমাজকে গ্রাস করিবার জন্য যে ঘনাইয়া আসিতেছে, সেদিকে তাহার কোন লক্ষ্য ছিল না। বলিতে কি, ধর্ম্মের সেই সমস্ত খোসাও ক্রমে শুষ্ক ও মলিন হইয়া সমাজবিধ্বংসী সেই প্রলয়াগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে উদ্যত হইয়াছিল। তখন অযথা পৌরহিত্য, অযথা গুরুবাদ প্রভৃতি স্বাধীনতার মূলোচ্ছেদক অন্যায় মতামত সকল ভারতবাসীর মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজকে মরণের পথে টানিয়া লইয়া চলিতেছে। ভারতবাসী নিজের জানত ও অজানত স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়া পরাধীনতার পিচ্ছিল পথে দ্রুতগতিতে নামিয়া চলিল। কিন্তু ভারতভূমি পুণ্য ভূমি—হিন্দুর জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ ভগবানের প্রিয় ধর্ম্মক্ষেত্র। তাই ভারতভূমি পরাধীনতার চরম সীমায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই স্বাধীনতার জন্য কাতর প্রার্থনা তাহার অন্তর ভেদ করিয়া ভগবানের চরণে সমুত্থিত হইল; মৃত্যুর কবলে সম্পূর্ণ পড়িবার পূর্ব্বেই তাহার কাতর কণ্ঠ ভেদ করিয়া অমৃতবিন্দুর জন্য প্রার্থনা ভগবানের কর্ণে প্রবেশ করিল। ভগবানের নিকট হইতে সেই কাতর প্রার্থনার উত্তর সাড়া পাইয়া ভারতবাসী আশ্বস্ত হইল।

সেই কাতর প্রার্থনার উত্তরে ভগবৎপ্রেরিত হইয়া রাজা রামমোহন রায় ১১ই মাঘের শুভ দিনে পবিত্র ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপিত করিয়া সত্যধর্ম্মের সুমঙ্গল শঙ্খধ্বনি সজোরে নিনাদিত করিলেন। সেই শঙ্খধ্বনি শুভক্ষণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন ভারতবাসীর সেই কাতর প্রার্থনার উত্তরেই ভগবৎ-প্রেরিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়াই সত্যধর্ম্মের এবং তাহারই অপরিহার্য্য অনুষঙ্গী সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার মূল প্রকৃত ভগবদুপাসনার উৎস উৎসারিত করিয়া দিলেন। সেই উৎসের অনুসরণে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী* প্রভৃতি কত শত ব্রহ্মগতপ্রাণ ভক্ত আসিয়া ভারতে ব্রহ্মোপাসনার বন্যা বহাইয়া দিলেন। সেই বন্যা আমাদের অন্তরে যে জাগরণ আনিয়া দিয়াছিল, সেই জাগরণের ফলে আমরা জানিয়াছি যে, ভগবান আমাদের প্রত্যক্ষ পিতামাতা, এবং তাঁহার সঙ্গে আমাদের যোগবন্ধন নিত্য প্রেমের বন্ধন। আমরা বুঝিয়াছি যে সেই যোগ-বন্ধন প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কৌপীন ধারণ বা বহুবৎসর ধরিয়া কৃচ্ছ্রসাধন সহকারে গিরিগুহায় বা গভীর অরণ্যে বাস অপরিহার্য্য নয়। আমরা বুঝিয়াছি যে সেই যোগবন্ধন গৃহের মধ্যে, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের স্নেহপ্রেম, দয়াদাক্ষিণ্য, ভক্তিশ্রদ্ধা প্রভৃতির মধ্যে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়। আমরা বুঝিয়াছি যে, বিপদের

*আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী স্থলে আচার্য্য শব্দের পরিবর্ত্তে "পণ্ডিত" শব্দ সংযোজিত হইল।

সহঃ সম্পাদক ধর্ম্মতত্ত্ব।

কশাঘাতের মধ্যেও, দুঃখকষ্টের কঠোর তাড়নার মধ্যেও সেই যোগবন্ধন ভগবানের আশীর্ব্বাদের আকারে দেখা দেয়।

পবিত্র ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া, রামমোহন রায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্রহ্মপরায়ণ ভক্তদিগের জীবনের মধ্য দিয়া, এই মহাসত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে যে ভগবান আছেন--মঙ্গলবিধাতা ভগবান আছেন এবং একমাত্র তাঁহারই উপাসনাতে আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল। আজ আমরা দেখিতেছি—সেই ধ্বনিরই প্রতিধ্বনির উপর প্রতিধ্বনি বিশ্বজগতের আকাশকে স্তরের পর স্তর মুখরিত ও স্পন্দিত করিয়া তুলিতেছে। ঐ মহাসত্যের উপর দাঁড়াইয়া জগতবাসীকে আমাদের ইহা বলিবার অধিকার আছে যে, এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা, পাতা ও নির্ব্বহর্তা, মঙ্গলময় ও মঙ্গলবিধাতা ভগবান আছেন ইহাতে নিঃসংশয় হও। তিনি আমাদের প্রত্যক্ষ পিতামাতা, ইহা স্থির জানিয়া শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগসাধনে অগ্রসর হও। আত্মার ভিতরে তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা কর এবং সর্ব্বত্র তাঁহার পরিচয় পাইয়া আপ্তকাম হও। তাঁহাকে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত জানিয়া, সর্ব্বত্র তাঁহারই রাজ্য প্রসারিত জানিয়া সম্পূর্ণ নির্ভর হও। বিস্ফারিতনেত্রে প্রভাতের সূর্য্যকিরণরঞ্জিত এবং নিশীথের জ্যোৎস্নাধবলিত ও অগণ্য নক্ষত্রখচিত আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার সত্যস্বরূপ উপলব্ধি কর। মুদিতনেত্রে আত্মার অন্তরে তাঁহার জ্ঞানস্বরূপ ও শুদ্ধস্বরূপ দর্শন কর এবং তাঁহার পরিপূর্ণ অনন্তস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হও।

আজ যাঁহার নামে এই সভা আহূত হইয়াছে, তাঁহার জীবনকে আদর্শ করিয়া নিজের জীবনকে সংগঠিত করিতে চাহিলে আত্মোন্নতিকে, প্রত্যেকের নিজ নিজ আত্মার উন্নতিসাধনকে, ভগবানের চরণে প্রত্যেকের আত্মবিসর্জ্জনকেই আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মের পরিসমাপ্তি বা চরম লক্ষ্য বলিয়া আলিঙ্গন করিতে হইবে। আমরা যখন সেই প্রাণের দেবতাকে সমুদয় হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিতে পারিব ; যখন বলহীনের ন্যায়, দুর্ব্বল ভীরু ও কাপুরুষের ন্যায় সকল পরাধীনতার মূল মিথ্যারাশির বোঝা মস্তকে বহন করিয়া ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া থাকিবার পরিবর্ত্তে সেই সত্যস্বরূপের চরণে মিথ্যারাশি বলিদান করিয়া সরল হৃদয়ে নির্ভীকচিত্তে দাঁড়াইতে পারিব ; শত বাধাবিঘ্ন সহস্র দুঃখশোকের সম্মুখেও যখন ভগবানের মঙ্গলস্বরূপে নির্ভর করিয়া তাঁহার আদেশ জানিয়া নিজের কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইতে পারিব, তখনই দেখিতে পাইব যে, সত্যপালনে দৃঢ়ব্রত ভীষ্মদেবের মুখে যে অমানুষিক স্বর্গীয় প্রভা ক্রীড়া করিয়াছিল, কর্ত্তব্যকর্ম্মসাধনে পাণ্ডবগণের হৃদয়ে যে অপার্থিব বল ও তেজ সমুদ্ভূত হইয়াছিল, আমাদেরও হৃদয়ে সেই অপার্থিব বল ও তেজ আসিবে, আমাদেরও মুখে সেই দিব্য প্রভা নামিবে। এই সভায় উপস্থিত বন্ধুগণ যদি নিষ্কামভাবে সত্যপালনে এইরূপ দৃঢ়ব্রত হয়েন, কর্ত্তব্য পালনে যদি এইরূপ নির্ভীকহৃদয়ে অবতীর্ণ হয়েন, তবেই তাঁহাদের এখানে আসার ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে, এই সভা সার্থক হইবে এবং সেই মহাপুরুষের আত্মার যথার্থ তর্পণ সাধিত হইবে ; তবেই আমরা দেশের মলিনতা বিদূরিত করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা সহজেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব।

উপসংহারে, যে মহাপুরুষের পরলোকগত আত্মার তর্পণোদ্দেশে আমরা এখানে সবান্ধবে সমাগত হইয়াছি, তাঁহার প্রাণের কথা অন্তরে ধারণ করিয়া গীতার এই উৎসাহবাণী উচ্চারণ করিয়া পরস্পরকে উৎসাহিত করিতে চাই—

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥

ভগবানের উপর সমস্ত কর্ম্মফল সন্ন্যস্ত করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হও ; মায়াবশীভূত হইও না এবং শোকতাপ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হও।

কোচবিহারে নগর সংকীর্ত্তন।

বাঙ্গলা ১২৯৭, বৈশাখের প্রারম্ভে কোচবিহারাধিপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের নিমন্ত্রণে উপাচার্য্য ভাই ফকির দাস রায় মহাশয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ এবং শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে কোচবিহার যাত্রা করেন। নিরূপিত দিবসে কলিকাতা শিয়ালদহের ষ্টেশনে অপরাহ্ণ ৪টার মেল ট্রেণে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহারা পথি মধ্যে কয়েকটা নদী পার হইয়া পর দিবস বেলা প্রায় ১০টার সময় মোগলহাট ষ্টেশনে অবতরণ করেন। নিকটস্থ নদীর পরপারে রাজাশ্রমে উপাসনা ও ভোজনাদি সমাপন করিয়া তাঁহারা অশ্বযান যোগে অপরাহ্ণ ৪টার সময় রাজবাটীতে উপনীত হয়েন। ভক্তযাত্রীগণের অবস্থান এবং ভোজনাদির জন্য রাজবাটীর যে প্রকার ব্যবস্থা তাহা অতীব সুন্দর এবং যথার্থ রাজোচিতই বটে। কিন্তু ভোজনাদির যে প্রকার ব্যবস্থা তাহাতে তৎপ্রতি যথোপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিতে হইলে ভোজন ক্রিয়াতেই সমস্ত দিন সহজে অর্পিত হইতে পারে। তন্মধ্যে একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম যে ঐরূপ রাজ ঐশ্বর্য্যের ভিতর দিয়া শত প্রহরীর দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া বৈরাগ্যানুচর "কপি শাক" প্রভৃতি কেহ কেহ রাজপ্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরিদ্র ভক্তদিগকে বিশেষ প্রীতি দান করিত। বুঝিলাম অতুল প্রভাবশালী শ্রীনববিধানের মাহাত্ম্য জন্যই ঐরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। ধন্য শ্রীনববিধান!

কলিকাতা হইতে যে সমস্ত "প্রেরিত" মহাশয় এবং সাধক তথায় গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা মহানন্দে উৎসবক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। দীনাত্মা যাহারা ছিল মা আনন্দময়ী তাহাদিগকেও আপন গৃহে ডাকিয়া লইলেন। উৎসব-দিবস অতি অপূর্ব্বভাবে

যাপিত হয়। পরদিবস নগর সংকীর্ত্তনের মহাসমারোহ। এ রূপ নূতন অপূর্ব্ব দৃশ্য আর কখনও নয়নগোচর হয় নাই। "প্রেরিতগণ" সাধকগণ, আচার্য্যদেবপুত্রগণ, এবং রাজ অমাত্যবর্গ সকলে সমবেত হইয়া যথা'বধি কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সম্মুখে নানা ভূষণে ভূষিত, সুরঞ্জিত হস্তীগণ "নববিধান" অঙ্কিত উড্ডিয়মান পতাকা পৃষ্ঠে গ্রহণ করিয়া গম্ভীর পদবিক্ষেপে অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল মহারাজ-কুমার এবং কুমারীগণ উপযুক্ত ভূষণে ভূষিত হইয়া হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন সকল চক্ষুই সেই অতুল ঐশ্বর্য্যদ্যোতক বিচিত্র শোভা সন্দর্শনে মুগ্ধ প্রায়। এমতাবস্থায় কিয়দ্দূর গমন করিলে পর, যখন কৌপীনধারী, মুণ্ডিত মস্তক প্রেমাশ্রুবিগলিত প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ "হরি হরি" ধ্বনি করিয়া ঊর্দ্ধবাহু ভুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে আশ্রিত দলে মিলিত হইলেন, তখন তাঁহার দেবদ্যুতি প্রকাশক শ্রীমূর্ত্তি সমুদায় নয়ন প্রাণকে যেন বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া হরি-নাম সুধা সাগরে নিমগ্ন করিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে এ দীনাত্মার নয়নাগ্রে এক মহা ঘোর সংগ্রাম হইয়া গেল। স্পষ্টতই দৃষ্ট হইল, রাজসিক ভাব চলিয়া গেল, সভ্যতা, ভদ্রতা পার্থিব ভাব সমুদায় যেন আত্মরক্ষার দায়ে সভয়ে লুক্কাইত হইল, জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ হস্তি পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া নাচিতে নাচিতে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিলেন, মহারাজ ভূপ বাহাদুরও দূরে অবস্থিতি করিতে না পারিয়া সেই দেব-সন্ন্যাসীর দলে মিলিত হইলেন। তখন রাজা, প্রজা, পণ্ডিত, মূর্খ, সভা-সুদীন সকলেই সকল প্রকার ব্যবধান বিস্মৃত হইয়া এক অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলেন। শত শত লোক মনবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। পাগলের দলে মিলিয়া সকলেই পাগলের সঙ্গে পাগল হইলেন। মধুর হরি নামের উচ্চ নিনাদে নগর পূর্ণ হইল, প্রেমিকের প্রিয় মৃদঙ্গের সুগম্ভীর ধ্বনিতে রাজ-প্রাসাদও বিকম্পিত হইল। পরিশেষে বিরাম জন্য ভীমবলশালী রাজ-দূত হস্তিগণ স্বস্থানে প্রস্থান করিল কিন্তু ভক্তের মত্ততা হ্রাস হইল না। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নৃত্যগীত ও কীর্ত্তনের ধ্বনিতে রাজপ্রাসাদ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, অন্তঃপুর হইতে রাজেশ্বরী শ্রীমতী সুনীতি দেবীও স্বীয় সহচরীগণ সঙ্গে মহানন্দে শঙ্খধ্বনি করিয়া সেই আনন্দকে দ্বিগুণিত করিতে লাগিলেন। ধন্য নববিধান, তোমার প্রভাবে সকল ব্যবধান তিরোহিত হয়। ক্ষুদ্র মানবও হরিনামানন্দ রস পানে পরিতৃপ্ত হয়। এই মহাসংকীর্ত্তনে আমাদের উপাচার্য্য মহাশয়ও মার হস্তে গৌর প্রেম-প্রসাদ ভোজনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

"অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত"

চিন্তা-কণিকা

ইহলোক পরীক্ষা এবং প্রস্তুতির স্থান। একটী সন্তান ভূমিষ্ট হইল তৎসঙ্গে সঙ্গে (এমনকি তৎপূর্ব্বেও) যাহা তাহার জীবন রক্ষার জন্য, উন্নতির জন্য কল্যাণের জন্য প্রয়োজন তাহা যথাসময়ে প্রদত্ত হইতে লাগিল। মাতাপিতা-বিত্তাধন স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিশেষে একটী সুন্দর সংসার সেই সন্তান লাভ করিল। পার্থিব বিভব পিতামাতা পরমেশ্বরের শ্রীচরণ সমীপে অতি সামান্য বিষয়। সামান্য বস্তুতে যাহারা যথার্থ বিশ্বাস রক্ষা না করে তাহাদিগকে মহৎবস্তু প্রদত্ত হয় নাই। অল্পে বিশ্বাস নষ্ট করিলে অধিকে বিশ্বাস রক্ষা করিবে ইহা হইতে পারে না। এমতে পার্থিব ধন সম্পদ আত্মীয় স্বজন প্রাপ্ত হইয়া যাহারা সেই ধন সম্পদাদি প্রদাতা পরমেশ্বরকে ভুলিয়া যায় তাহারা তাহাদিগের ঐ মোহান্ধ অবস্থায় হরিপাদপদ্ম লাভে বঞ্চিত থাকে। তাহাদিগের নিকটে স্ত্রী পুত্র পরিপূর্ণ সংসার শ্মশান তুল্য দুঃখের স্থান হয়। কিন্তু যে ভাগ্যবান ব্যক্তিরা ঐ সমস্ত সম্পদ দাতা ভগবানের শ্রীপদেই লুটাইয়া পড়ে ঐ অবস্থায় তাঁহারই লীলা ও করুণা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়, কৃপাময় কৃপাকরিয়া তাহাদিগকে অভয় পদ দান করেন। এইরূপে ভগবানের আবির্ভাবে এবং সহযোগে সংসার তাহাদের নিকট মধুময় হয়। এমতে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের পরীক্ষা। শিশু আত্মা ভগবৎ প্রসাদে যথার্থ বিশ্বাস রক্ষা করিয়া তাঁহার শ্রীপদ লাভ করিয়া ইহ সংসারেই স্বর্গ সুখের কিঞ্চিৎ আস্বাদন করিয়া অনন্তকাল অনন্ত সুখ সম্ভোগের জন্য প্রস্তুত হয়।

বীজ যথাকালে অঙ্কুরিত হয়। কালক্রমে এক অংশের গতি অধোদিকে এবং অপরাংশের গতি ঊর্দ্ধ দিকে। কিছুকাল যত্নে রক্ষিত হইলে হিংস্র জন্তুদিগের অত্যাচার অতিক্রম করে কিন্তু পরে প্রবল ঝটিকার উপদ্রব আসিয়া সময় সময় ভয়ানক রকমে আন্দোলিত করে। এইরূপ আন্দোলনে যতই শিকড়ের গতি নিম্নদিকে হয় ততই বৃক্ষ মূল সুদৃঢ় হইতে থাকে। এবং যাই বৃক্ষ সুদৃঢ় এবং বলবত্ন হয় ততই শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া পত্র পুষ্প ফলে সুশোভিত এবং পূর্ণ হইয়া নানাপ্রকার নানাজীবের উপকার সাধন করে। সেইরূপ ধর্ম্ম বিশ্বাস জীবনে পরিণত হইলে নানাপ্রকার অত্যাচারে বিপদ পরীক্ষার অধীন হয়। এইরূপ পরীক্ষায় যদি সে জীবনে নির্ভরশীলতা হৃদয়ভেদ করিয়া আত্মার অন্তরতম স্থানে প্রাণের মূলে প্রাণ স্বরূপে যুক্ত না হয় তবে বিপদ পরীক্ষায় পড়ে, কিন্তু তদ্বিপরীতে জীবন সুদৃঢ় এবং গম্ভীর হয়। ঊর্দ্ধদিকে মানব সমাজের প্রতি প্রেমবিস্তার। এই প্রেম নানাভাবে নানাদিকে বিস্তারিত। মূলশিকড় ভিতর দিকে যতই যায় ততই বৃক্ষ সতেজ সুতরাং নানা শাখা প্রশাখায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া জীবের সেবার জন্য ফল, ফুল ও ছায়া দান করে
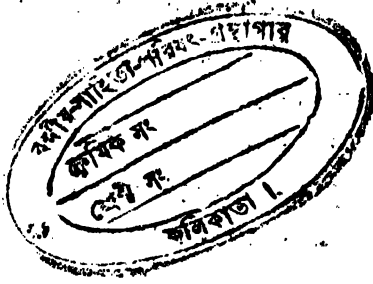
"কাঙ্গাল দাস"

Reg. No. C. 87.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৩ ভাগ। ৯ম।১০ম সংখ্যা।
১লা ও ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক, ৯৯ ব্রাহ্মাব্দ।
15th & 30th May. 1928.
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে প্রেমময়ি জননি, যদি দয়া করিয়া তুমি নবধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার ও সাধনের নূতন ব্যবস্থা করিলে, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার ইচ্ছানুরূপ কর্ত্তব্য পালনে আমরা সক্ষম হই। তোমার নববিধান মিলনের বিধান, প্রকৃত মিলন বিনা ত এ বিধান সাধন হয় না। অতএব আমাদের পরস্পরের সহিত সেই মিলন সম্পাদন কর, যদ্দারা আমরা সকল প্রকার ভিন্নতা, স্বতন্ত্রতা, 'আমি' 'আমি' পরিহার করিয়া একই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রূপে মিলিত হইয়া তোমার নিয়োজিত কার্য্য সাধন করিতে পারি। আমাদের সবার একই মা তুমি, তোমার আলোক একই আলোক, সেই আলোকে আমাদিগকে পরিচালিত কর, আমাদের মতগত সকল প্রকার ভিন্নতা তিরোহিত হউক। আমরা এক-মন এক-পথাবলম্বী হইয়া ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ হই এবং তোমার একই বিধানতত্ত্ব প্রচার করি। আমাদের মধ্যে যত কিছু অনৈক্য আছে, দূর কর এবং প্রকৃত সদ্ভাবে ও ভ্রাতৃ-প্রেমে মিলিত কর, যেন আমরা ঐকমত্যে সকল কার্য্য সাধন করি এবং জীবন দ্বারা তোমার নববিধানকে গৌরবান্বিত করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

প্রার্থনাসার।

পরমেশ্বর, এই ভিক্ষা, এক-শরীর এক-প্রাণ কর। সকলে এই ঘরে বসে একখানা মানুষ হই। একখানাই গড়াইতে গড়াইতে উত্তর পশ্চিমে, পূর্ব্ব দক্ষিণে যাইবে। এদের বুঝিতে দাও যে, এখানে কেউ আমি আর আমরা হতে পারে না, সব এক। পাঁচজন মানুষ যেন না দেখি। এরা এক শরীরের অঙ্গ, যিনি যেখানে প্রচার করেন, সেই এক পুরুষ করেন। যোগ-চক্ষে দেখতে দাও, তুমি এক, আমরা এক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

নববিধান কি ও কেমনে তাহা লাভ হয়?

আমরা নববিধান নববিধান বলিতেছি, কিন্তু নববিধান কি এবং কেমনে তাহা লাভ হয়, আমরা কি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি ও তৎসাধনে নিরত হইতেছি?

আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া জ্ঞান-বিচার এবং পুরুষকার সাধন দ্বারা আত্মোন্নতি যতদূর করিতে পারি, তাহা করিতে হয় ত চেষ্টা করিতেছি এবং তাহাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মনে করিতেছি। কিন্তু তাহার পরেও যে কিছু আছে, তাহা কই তেমন আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি?

জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বলিয়া আমরা যাহা বুঝি, তাহাই আমরা লাভ করিতে চাই, এবং তাহাই পাই; তাহার উপর যদি কিছু থাকে, তাহা পাইব কেমন করিয়া?

এই জন্যই নববিধানাচার্য্য বলিলেন, "ইহা(?) ব্রাহ্মসমাজের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পারিল, নববিধানের আরম্ভে আর পারিল না।"

বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যাহা, তাহার উপরে নববিধান। মহর্ষিদেব আত্ম-জীবনীতে তাঁহার নিজের ৪৫ বৎসরের কার্য্য-বিবরণ উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "ইহার পর কেশবের আমল।"

এমনই ব্রাহ্মসমাজের সাধন আমলের পর নববিধানের আমল।

নববিধান কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নয়; নববিধানের প্রকৃত অর্থ নবজীবন। পুরুষকার সাধনে ইহা লভনীয় নয়। জন্মদাতার দান নবজীবন। তাহা লাভ করা আমাদের চেষ্টায় হয় না। [illegible]নদাতা ব্রহ্মের কৃপায় হয়।

পৃথিবীতে মানুষের দৈ[illegible]ক জন্ম প্রথমে হয়, তাহার পর কর্ম্মসাধন, তাহার পর মৃত্যু হইয়া থাকে। এই মৃত্যুর পর যে জন্ম, তাহাই নবজন্ম, তাহাই নবজীবন।

নববিধানে তাই অগ্রে মৃত্যু, তাহার পর কর্ম্ম, তাহার-পর জন্ম।

আমি, আমার পুরুষকারের মৃত্যু হইলে তবে নববিধানের নব জন্ম বা নব জীবন লাভের উপায় হয়। সুতরাং আমিত্বের মৃত্যু নববিধানের জীবন লাভের সোপান।

সম্পূর্ণরূপে এই আমিত্বের মৃত্যু ইহলে, আমি নাই, আমি কিছুই নই, কোথায় আমার 'আমি পাখী', সে উড়িয়া গিয়াছে, এই অবস্থা যথার্থ উপলব্ধি হইলে, আমি শূন্য হইলে, তবে পবিত্রাত্মা সেই স্থান অধিকার করেন এবং তাহা অধিকার করিয়া তাঁর প্রত্যাদেশে বা পরিচালনায় পরিচালিত করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধন করান এবং তাহারই ফলে যে মাতৃ-শিশু-জন্ম লাভ হয়, তাহাই নববিধানের নবজন্ম বা নবজীবন।

আচার্য্য তাই বলিলেন, "নিজের হাতে ধর্ম্ম যার, তার কু প্রবৃত্তি অহং ফিরিয়া আসিবেই, আপনার হাতে ধর্ম্মের চাবি নাই যার, তারই অবস্থা নিরাপদ।"

এই অবস্থা হইলে, ঈশ্বর করান, তাই করি, তিনি বলান, তাই বলি, তিনি চালান, তাই চলি, তাঁহাতেই বাঁচি, থাকি, জীবন যাপন করি, ইহাই নববিধানের নবজীবন।

অতএব সম্পূর্ণরূপে আমিত্বের বিনাশ হইলে, তবে এই জীবন লাভ হয়। আমি, আমার পুরুষকারের সাধন থাকিতে, কিছুতেই এই নববিধানের নব জীবন লাভের সম্ভাবনা নাই।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধান সকলেরও উদ্দেশ্য ও সাধনা প্রধানতঃ আমিত্ব-বিনাশ। শিবের শব-সাধন, শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ সাধন, শ্রীঈশার ক্রুশারোহণ, শ্রীচৈতন্যের বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস সকলই আমিত্ব-নাশের সাধন।

এই সকল সাধনে মানবের আমিত্ব শূন্য বা নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হইলে তবে নববিধানের নব-জন্ম সহজে জন্মদাতার কৃপায় লাভ হয়। নববিধান তাই সহজে নবজীবনে জীবন যাপন। অতএব যথার্থ নববিধান লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমিত্বের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে এবং সেই মৃত্যুর পর ব্রহ্মকৃপাবলে সহজে যে নবজন্ম বা নবজীবন লাভ হইবে, তাহাই নববিধান। শিশু যেমন আপন অচেষ্টায়, কেবল মার কৃপায় জন্মলাভ করিয়া, মার দ্বারাই লালিত, পালিত, রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়, নববিধানের সাধকেরও সেই অবস্থা। শিশুকে আর নিজ কষ্ট-সাধ্য সাধনে পুষ্ট হইতে হয় না, তেমনি নববিধানের ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সাধন মার কৃপা-সাধ্য সহজ সাধন, তাই নববিধান-ভক্ত মার কোলের নবশিশু।

প্রার্থ্যতত্ত্ব।

যথার্থ মিলন।

মানুষের আকার, প্রকার, রূপ, রং ভিন্ন, তাহার মন, মত, ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই বিভিন্ন। তাই পৃথিবীতে একজনের চেহারা আর একজনের সঙ্গে মেলেনা, একজনের মত, ইচ্ছা, রুচি, ধর্ম্ম কর্ম্ম অন্যের সঙ্গে মেলেনা। কিন্তু যখন মানুষের মৃত্যু হয় এবং দেহ ভস্মীভূত হয়, কাহার কোন্ ভস্ম, তাহার আর ভিন্নতা বুঝা যায় না। এমনই মানুষের আমিত্বের মৃত্যু হইলে, মানুষ-আত্মস্থ হইলে, এক পরমাত্মার সহিত মিলনে সবাই এক হন। এইজন্য পৃথিবীতে ভক্তদের মধ্যে ধর্ম্ম-মতের ও সাধনের যে ভিন্নতা ছিল, স্বর্গে তাঁহারা এক মার কোলে সকল ভিন্নতা ভুলিয়া এক মহামিলনে মিলিত হইয়া রহিয়াছেন।

নব সমীরণ।

যতক্ষণ আকাশের বাতাস না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পাখা নাড়িয়া বাতাস খাইবার চেষ্টা করা যায়। শুদ্ধ আকাশের বাতাস যেখানে বয় বা অকূল সাগরের সমীরণ যেখানে প্রবাহিত হয়,

সেখানে কি চেষ্টা করিয়া হাতে পাখা নাড়িয়া বাতাস খাইতে হয়? নববিধানের মুক্ত সমীরণ স্বর্গীয় অনন্ত প্রেমের সমীরণ, ইহা সাধন-সাপেক্ষ বা আয়াস-লব্ধ নহে।

ধর্ম্ম-সমন্বয়।

শ্রীকেশবাচন্দ্রের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন বলেন, "কিরূপে বিধাতা আপন অধিকার লাভ করিবেন? ধর্ম্ম-সমন্বয় দ্বারা। এই ধর্ম্ম-সমন্বয় আমরা কিরূপে করিতে পা'রব? প্রত্যাদেশ দ্বারা। প্রত্যাদেশ কিরূপে হইবে? আত্ম-বিসর্জ্জন দ্বারা। মনকে খালি করিলেই প্রত্যাদেশ হইবে। সক্রেটিস বলিয়া দিতেছেন, 'বল, আমি কিছুই জানিনা,' তৎক্ষণাৎ মন অহঙ্কারশূন্য হইল। শাক্য বলিতেছেন, 'হৃদয়ের রিপু সকলকে জয় কর', তৎক্ষণাৎ হৃদয় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য শূন্য হইল। ঈশা বলিলেন, 'পিতাকে স্বীয় ইচ্ছা সমর্পণ কর। বল, আমার ইচ্ছা নহে, তোমারই ইচ্ছা।' তৎক্ষণাৎ আত্মা স্বেচ্ছাচার-শূন্য হইল। যখন মন এইরূপে শূন্য হয়, তখন পবিত্রাত্মা ভগবান্ আপনি আসিয়া সাধকের হৃদয় অধিকার করেন। তখন সে একেবারে আত্মেচ্ছা শূন্য। আর সে আপনি কথা কহে না, আপনি দেখেনা, আপনি শুনে না, আপনি কার্য্য করে না। ভগবান্ অন্তর অধিকার করিয়া ভক্তকে সকল বিষয়ে পূর্ণ করেন। ভক্ত তখন ভগবানের চক্ষু দিয়া ভগবানকেই দেখেন। কোন স্থান আর ভগবৎ-শূন্য নহে, কোন ঘটনা আর নিরীশ্বর নহে, কোন দেশ আর ভগবদ্বর্জ্জিত নহে, কোন শাস্ত্র আর মনুষ্য-কল্পিত নহে। পৃথিবী বিধাতায় পূর্ণ।"

শ্রীকেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ।

দল।

যখন শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত পরিচিত হন, তখন কেশবচন্দ্রের জমাট দল, রামকৃষ্ণের একমাত্র ভাগ্নে হৃদয় ভিন্ন কেহই সঙ্গী বা দল ছিলনা। তিনি তখন দলেরও বড় পক্ষপাতী ছিলেন না।

তখন একবার বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন "যখন নদীর স্রোত বন্ধ হয়ে যায়, তখনই দল বাঁধে।"

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে নিজকে তুলনা করিয়া একবার বলিয়া ছিলেন, "তুমি ত বটগাছ, তোমার ডাল পালা কত, কত পক্ষী এসে তোমার উপর আশ্রয় নেয়, কত জীব জন্তু তোমার তলে ছায়া পায়, আর আমিত একটা (ষাঁড়া) অফলা তাল গাছ, আপনি কোন রকমে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছি।"

আর একবারও বলেন, "তুমিত একখানা ষ্টীমবোট জাহাজ, আপনিও ঝক্ ঝক্ করে চলেছ, আবার কত গাধা বোটকেও টেনে নিয়ে চলেছ। আর আমিত একটা কলার মান্দাস, কোন রকমে আপনি যাচ্ছি, একটু ভার পড়লে টুপ করে ডুবে যাই।"

এই সকল উক্তির দ্বারা বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়, কখনও তিনি আশা করেন নাই যে, তিনি দল করিবেন কিম্বা তাঁহার আবার দল হইবে। অথবা কেশবের দল দেখিয়া তাঁহারও একটি দল হয়, এরূপ সাধ হইত কি না, বলা যায় না। যাহা হউক, তিনি যে প্রথমে দলের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহার প্রথম উক্তিতেই বিলক্ষণ বুঝা যায়।

কিন্তু কালে কেশবের দল ক্রমে ক্রমে ছোট হইল। কেশব নিজেই বলিলেন, "গায়ক যেমন সা রে গা মা ক্রমে সুর চড়ায়, এমনই সাধনের সুর যত চড়িল, ততই দলের লোক কমিতে লাগিল, ক্রমে যাও আছে, তাও থাকিবেনা।" আরো "আমরা 'ব্রাহ্ম' বলিলে অনেক লোক পাই, 'নববিধান' বলিলে ছোট দল, তাতেও তাবের ঘরে খুব কম লোক।" শেষে বলিলেন, "ষোল আনা বিশ্বাসী একজন দেড়জন থাকিলেই যথেষ্ট।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াছেন, "এ চাল হাটে, বিকাইল না।" অর্থাৎ তাঁহার উচ্চ ধর্ম্মমত কেহই গ্রহণ করিল না।

অপর দিকে পরমহংস রামকৃষ্ণের দল এখন কতই বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি ত দল চান নাই, তাঁহার দল হইবে কখনও আশাও করেন নাই। কিন্তু রামকৃষ্ণের নাম লইয়া রামকৃষ্ণের উপাসক-দল ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ দত্ত আমাদের সঙ্গে শ্রীকেশবচন্দ্রেরই দলে ছিলেন। তিনি যখন কেশবের দল ছাড়িয়া পরমহংসের শিষ্য হইলেন, তখন হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের দল বাঁধিবার সূত্রপাত হইল এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহারই প্রভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের দল এত প্রসারিত হইয়া পড়িল।

কিন্তু শ্রীকেশবচন্দ্র তাঁহার নিজ নামে কোন দল গঠন করিতে কখনও প্রয়াসী হন নাই। তিনি আপনাকে দলের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া নববিধানের দলই চাহিয়াছেন এবং পূর্ণ নববিধানে বিশ্বাসী দলই তাঁহার দল, ইহাই স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষত সাম্প্রদায়িকতা বিনাশ করিতে যে নববিধান আসিয়াছে, তাহাতে কোন সঙ্কীর্ণ দল থাকিতেই পারে না। যে দল সকল সত্য, সকল প্রেম, সকল পবিত্রতার আধার, সেই অদৃশ্য দল, যাহা সময়ে সমগ্র মানব-পরিবারকে এক অখণ্ড পরিবারে পরিণত করিবে, তাহাই শ্রীকেশবের দল।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কথোপকথন।

স্বর্গে।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

[৭]

আমার প্রেরণ কালে, শ্রীহরি মোর কপালে,
লিখেছিলা নবীন আদেশ।

"অন্ত সাধুদের মত, নহ তুমি সুনিশ্চিত,
তুমি পাপী জেন সবিশেষ॥
আমারে সর্ব্বস্ব জেনে, পূজ মোরে কায়মনে;
জগতের নরনারীগণে—
মোর কাছে ডাকি আন, সকলেই মোরে যেন,
সর্ব্বস্ব ব'লিয়া সদা মানে॥
জগতের পিতা মাতা, আমি বন্ধু পরিত্রাতা,
আমি রাজা আচার্য্য বান্ধব।
নরনারী সমুদয়, মোর পুত্র কন্তা হয়,
মোর প্রিয় পরিবার সব॥
আমি পবিত্রাত্মা হ'য়ে, রয়েছি সব হৃদয়ে,
বিবেকেতে বলি বাণী জীবে।
শুনিলে আমার কথা, দূরে যাবে সব ব্যথা,
আমি দিব দরশন সবে॥
একমাত্র ব্রহ্ম আমি, উপাস্য সর্ব্বস্ব স্বামী,
মোর বাণী সর্ব্বশাস্ত্র-সার।
এই বাণী যেন ধরি, চলে সব নরনারী,
লভিবেক বাণীতে উদ্ধার॥
জীব সঙ্গে সদা আমি, থাকিতে দিবস যামী,
আমি পিতা মাতা সবাকার।
জগতের নারীনর, ভগ্নী ভ্রাতা প্রিয়তর,
সবে ল'য়ে এক পরিবার॥
তুমি মানবেরে লয়ে, প্রেমেতে প্রমত্ত হয়ে,
রচ ভবে প্রেম-নিকেতন।
সমগ্র পৃথিবী তরে, বিধান ঘোষণা ক'রে,
স্বর্গরাজ্য করহ স্থাপন॥
আমারে সকল হতে, ভালবাস বিধিমতে,
অত্যাসক্ত কর পরিহার।
নরনারী সমুদয়ে, ভালবাস প্রাণ দিয়ে,
মোর প্রেম করহ প্রচার॥
পৌত্তলিক পূজা ধ্যান, অভ্রান্ত শাস্ত্রের মান,
মধ্যবর্ত্তী আর ব্যবধান।
এ বিধানে নাহি রবে, সকল মানব পাবে,
শিশু প্রায় মোর কোলে স্থান॥
সৎ সাধু-পদতলে, শিষ্যভাবে প্রেমে গলে,
বসি তুমি তাঁদের জীবন।
করহ গ্রহণ নিত্য, হও তাঁহাদের ভক্ত,
সব ভক্ত করি সম্মিলন॥
ভক্ত রূপ প্রেমহার, দাও জীবে উপহার,
সব ভক্ত হোক একাকার।
সত্যে সত্যে ভেদাভেদ, অপ্রেম হিংসা বিচ্ছেদ,
নাশ প্রিয় সন্তান আমার॥
যুগে যুগে আমি যত, করেছি বিধি প্রেরিত,
একটি ধর্ম্মের অঙ্গ সবে।
ধর্ম্মের নানা মুরতি, অংশের দিব্য প্রকৃতি,
প্রকাশিত হইয়াছে ভবে॥
তুমি সে সকল ল'য়ে, এক গুচ্ছে বাঁধ গিয়ে,
একীভূত করে তাহাদেরে।
এক ধর্ম্ম এক শাস্ত্র, এক আমি গুরু সত্য,
এই তত্ত্ব ঘোষ প্রেমভরে॥
সমস্ত জগত মাঝে, যাহে শান্তি সদা রাজে,
নরনারী লভে সম্মিলন।
এ ধরণী স্বর্গ হয়, লভয়ে মোর আশ্রয়,
এই বার্ত্তা করহ ঘোষণ॥
আমি যে বিশ্ব-জননী, অনন্ত প্রেমের খনি,
ক্ষমাশীল জীবে দয়াবান।
এ তত্ত্ব সাধন কর, জীবের সন্তাপ হর,
সুখী কর সবাকার প্রাণ॥
সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়, কর পুত্র সদাশয়,
প্রেম পুণ্যে করহ মিলন।
যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান, বৈরাগ্য সমাধি ধ্যান,
জয়যুক্ত হোক অনুক্ষণ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময়, হউক আমার জয়,
প্রেমরাজ্য স্থাপহ ধরায়।
ইহাই ভব নিয়তি, বিশ্বাস প্রেম ভকতি,
দিলাম তোমারে সমুদয়॥"
ঈশ্বরের হেন উচ্চ নিয়োগ লইয়া।
আসিলাম পৃথিবীতে দীনাত্মা হইয়া॥
বিশ্বাস বিবেক আর বৈরাগ্য ভূষণে।
সাজাইয়া দিলা হরি এই পাপী জনে॥
বলিলেন প্রাণ মাঝে তিনি দয়া করে।
"আমি তোর শাস্ত্র বিধি গুরু এ সংসারে॥
আমার চরণে কর প্রার্থনা নিয়ত।
সকল অভাব তোর হবে দূরীভূত॥"
ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব করি তাঁর বাণী শুনি।
চলিতে লাগিনু আমি দিবস যামিনী॥
ক্রমে ব্রহ্ম-পদে প্রাণ করিনু অর্পণ।
ব্রহ্মের সমাজে যোগ দিলাম তখন॥
মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ পুত্রবৎ মোরে।
দিলেন আদরে স্থান সমাজের ক্রোড়ে॥
ব্রহ্ম-জ্ঞানে ব্রহ্ম-ধ্যানে ব্রহ্মানন্দ-রসে।
ব্রহ্মের দর্শন আর তাঁহার পরশে॥
দিন দিন এ জীবন হল সমুন্নত।
বিশ্বাস পুণ্যেতে প্রাণ হল বিভূষিত॥

মহর্ষি ঈশার দিব্য চরিত্র সুন্দর।
আকর্ষণ করিলেক আমার অন্তর॥
ঈশ্বরের পিতৃভাব জীবের ভ্রাতৃত্ব।
শিখিলাম তাঁর কাছে হয়ে ভক্তি-যুক্ত॥
খুলে গেল হৃদয়ের কবাট আমার।
বুঝিলাম সব সাধু প্রেরিত পিতার॥
আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাধু মহাজন।
তাঁহাদের প্রচারিত সত্য মহাধন॥
গ্রহণ করিতে হবে প্রাণের ভিতর।
সব সত্যে হইবেক সমান আদর॥
জাতিভেদ সম্প্রদায় যত ক্ষুদ্র মত।
প্রাণ হতে একেবারে হল অপগত॥
বিশ্বাসের মহারাজ্য হল প্রকাশিত।
মণ্ডলী ভারতবর্ষী হল প্রতিষ্ঠিত॥
ব্রহ্মের পবিত্র ধর্ম্ম করিতে প্রচার।
সব ধর্ম্ম হতে সত্য করিতে উদ্ধার॥
সব সাধু ভক্তে করি সমান আদর।
মিলনের সূত্রপাত করিতে সত্বর॥
এক পরিবার রূপে সব ব্রাহ্মগণে।
বাঁধিবারে ঈশ্বরের প্রেমের বন্ধনে॥
নূতন মণ্ডলী হল বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত।
ভারতে নূতন জ্যোতিঃ হল উদ্ভাসিত॥
ঈশ্বর করুণা করি এ দাসের সনে।
সম্মিলিত করিলেন ভক্ত ব্রাহ্মগণে॥
উমানাথ কান্তিচন্দ্র প্রতাপ মহেন্দ্র।
কেদার অঘোর সাধু, গৌর গোবিন্দ॥
আর কত মহোৎসাহী ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ।
মোর সনে ব্রহ্ম-কার্য্যে লভিলা মিলন॥
এই সব বন্ধু লয়ে জীবের সেবায়।
ঢালিয়া দিলাম প্রাণ ব্রহ্মের কৃপায়॥
কি খাইব কি পরিব, স্ত্রী পুত্র কেমনে।
পালন করিব আমি সংসার-কাননে॥
এ সকল চিন্তা আমি দিয়া বিসর্জ্জন।
যৌবনে ব্রহ্মের পদে লইনু শরণ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ তালুকদার
আশাকুটীর, টাঙ্গাইল।

মাতৃ-তর্পণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দিবস সন্ধ্যায় সুরধুনী পানে পুনঃ ধীরে ধীরে যায়,
মন্দির মাঝে, বাল গোপালের মুরতি দেখিতে পায়।
দাঁড়াল আবার, হেরিয়া রমণী যশোদা নয়ন-মণি,
বক্ষে ধরিয়া জুড়াবে কি হিয়া তোমারে অমৃত খনি।
তাই হোক তবে এস হে গোপাল ভাঙ্গা বুকে এস মোর,
করুণা করগো তাপিতের প্রতি মুছাও নয়ন লোর।
শিশুহারা যত মানবী জননী তোমারে লইয়ে বুকে,
হোক তিরপিত, দুঃখ যাউক, মগ্ন হউক সুখে।
একি এ! পাষাণ মূরতি পরাণ পাইল মানবী মায়ের ডাকে,
ওই না গোপাল মৃদু কলস্বরে মধুহাসে ডাকে মাকে?
ন'মল জননী আবার আবার, গল-লগ্নী-কৃতবাসে,
জীবন্ত সেই গোপাল মূরতি কোলেতে তাহার হাসে।
ফিরিয়া পেয়েছে শিশুরে আবার গোপাল আপনি এসেছে নেমে,
মানবী মায়ের দুঃখ ঘুচাইতে জন্ম লইয়ে মরত ধামে।
আবার আবার নমিল সে নারী যশোদা-চরণ 'পরে,
আপন শিশুরে আমারে দিলি মা, নমি তোরে বারে বারে।
শিশুরে যতনে বক্ষে ধরিয়া বসনে ঢাকিয়া তারে,
ঘরে লয়ে তারে সাদরে সাজায়ে চুমে মুখে বারে বারে।
হেথায় সবাই ভয়েতে আকুল, যশোদা-তনয়ে কে নিল হরে?
কে সরাল হায় দেবতা-প্রতিমা, বজ্র হানিল নিজের শিরে।
দিগ্ দিগন্তরে ছুটিল সকলে খুঁজিয়া আনিতে সে বাল-গোপাল,
পূজারী বসিয়া উপবাসে কাঁদে, ফুকারিয়া ডাকে গোপাল গোপাল।
হোথা শিশু পেয়ে নবীনা জননী চলিল দেখিতে শিশু ভিখারীর।
পারে যদি আহা করিতে কিছু করিবে সে দান আর্ত্ত রমণীর।
কুটীর ভিতরে একি এ দৃশ্য! রমণী কেন গো সংজ্ঞা-হারা,
শিরোদেশে তার একি এ মূরতি? পাষাণে গঠিত বালক পারা?
শিশু কোথা গেল? নাহিত এখানে? পলকে বুঝিল সকলি হায়,
মায়ের হৃদয় বাছার দুখেতে কি কঠিন ত্যাগ করিয়া যায়।
দারিদ্র্য-পীড়নে অধীরা রমণী যশোদা-প্রতিমা মায়ের কোলে,
রাখিয়া আপন আদরের ধন, হরণ করিল বাল গোপালে।
জীবন্ত শিশু ফেলিয়া আসিয়া দেবতা মায়ের দ্বারে,
গোপাল মূরতি লইয়া মানবী কভু কি বাঁচিতে পারে?
প্রাণ টুকু তাই তার বুঝি ওই গোপালের পদতলে,
নিবেদিয়া দিয়া, জুড়ায়েছে জ্বালা, কঠিন মর্ত্ত্যতলে।
যশোদা জননী সে মানব শিশু দিয়াছে আর এক দুঃখিনী মায়,
সেই শিশুকোলে ওই হের কাঁদে দাঁড়ায়ে রমণী বালিকা প্রায়।
গোপাল মূরতি ফিরে গেল পুনঃ যশোদা মায়ের কোলের কাছে,
ভীখারীর দেহ জীবন্ত হোল মর্ত্ত্যজনের শাপের মাঝে।
ফিরে গেল সেই নবীনা জননী বক্ষে তাহার শিশু হাসি মুখ,
জুড়াল ভগন দগধ হৃদয় ভরিল তাহার দীর্ণ বুক।
তিনটি জননী, তিনরূপে তারা আপন শিশুরে করিল সেবা,
জননী তুমি মূর্ত্তিমতী দেবী, তোমার মতন জগতে কেবা।

শ্রীশান্তিসুধা রায়।

ভাই বৈকুণ্ঠ নাথ বৈকুণ্ঠধামে।

(২০শে মে ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক কর্ত্তৃক বিবৃত)

আমাদের নববিধান-পরিবারে ইদানীন্তন মৃত্যুর প্রকোপ যেন কিছু অধিক হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম এই বিধান-ক্ষেত্রে আহূত হইয়া ছিলেন, একে একে তাঁহারা ত সকলেই স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। আবার তাঁহাদের পরবর্ত্তী যাঁহারা, তাঁহারাও আর এ দেহ-পুরবাসে কয়জনই অবস্থান করিতেছেন।

ঠিক যে সময়ে আমিত্বের মৃত্যু-সাধনই নববিধানের নবজীবন লাভের এক মাত্র উপায় বলিয়া আমরা ব্রহ্মমন্দিরে আলোচনা করিতে ছিলাম, সেই সময়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই বৈকুণ্ঠ নাথ দৈহিক মৃত্যু আলিঙ্গন করিয়া, যেন এই দৈহিক জীবনের মৃত্যু-সাধন কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহারই শিক্ষা দিবার জন্ত অমরলোকে যাত্রা করিলেন।

ব্রহ্মানন্দ প্রার্থনায় বলিলেন, "আমরা মার হাতে গঠিত"। "আমরা তোমার গঠিত, তোমার দ্বারায় প্রতিপালিত, তোমা কর্ত্তৃক শিক্ষিত ও দীক্ষিত, এই কথা যেন পৃথিবীকে বুঝাইতে পারি।"

বাস্তবিক, ভাই বৈকুণ্ঠ নাথ যেন এই প্রার্থনার প্রমাণ দিয়া আপনার জীবন-বেদ আমাদের জন্ত রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

তাঁহার আত্মজীবনী, বোধ হয়, অনেকেরই হস্তগত হইয়াছে; তাহাতে তিনি অতি সুস্পষ্ট রূপেই তাঁহার জীবনে বিধাতার জীবন্ত লীলার পরিচয় দিয়াছেন।

তিনি ময়মনসিং জেলার এক সম্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মাতার তিনি প্রথম সন্তান। শিক্ষালাভের জন্ত প্রথম বয়সে ময়মনসিংহের উচ্চবিদ্যালয়ে তিনি প্রেরিত হন। তখন সেখানে ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন। তাঁহারই প্রভাবাধীনে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বৈকুণ্ঠ নাথ আস্থাবান হন। ক্রমে সাধু অঘোর নাথের প্রভাবে পড়িয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই জন্ত যথেষ্টই তাঁহাকে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। গৃহ হইতেও বিতাড়িত হন। কিন্তু অনাহার ও নানাপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াও নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্ম-সাধনে নিরত হন।

ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া কার্য্য করিবার সঙ্কল্প প্রথম হইতেই তাঁহার প্রাণে বদ্ধমূল হয় এবং জীবনে যখনই যে কার্য্য করিতেন, প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ না করিয়া করিতেন না। তাঁহার একটী বালবিধবা ভগ্নী অগ্রজের ধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী হইয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত আসিতে চান। সমুদয় আয়োজন ঠিক করিয়া ভাই তাঁহাকে আনিতে গেলেন, ভগ্নীও আসিতে প্রস্তুত, এমন সময়ে বৈকুণ্ঠ নাথ প্রার্থনা করিতে গিয়া যেই নিষেধ শুনিলেন, আর সে দিন তাঁহাকে আনিলেন না। কিছুদিন পরে যখন স্পষ্ট আদেশ পাইলেন, তখনই আনিলেন।

এইরূপে ক্রমে বিধাতার আদেশেই ভাই বঙ্গচন্দ্রের সহযোগি-রূপে প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিলেন এবং নারী-সহযোগ বিনা ধর্ম্ম-সাধন হয় না, এইরূপ বাণী শ্রবণ করিয়া বালবিধবাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন।

তিনি বিদ্যালয়ে মাত্র এন্‌ট্রেন্স ক্লাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন, কিন্তু ঈশ্বর-প্রেরণায় বহুদিন ধরিয়া "বঙ্গ-বন্ধু", ইংরাজী "হট" পত্র এবং এই "ধর্ম্মতত্ত্বের" সম্পাদকতা কি দক্ষতার সহিত করিয়াছেন। তিনি অনেক দিন শ্রীদরবারের সম্পাদকের কার্য্যও করেন।

সাধনশীলতা তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষণ। ধ্যান ও যোগ সাধনের জন্ত সময়ে সময়ে নির্জ্জন প্রদেশে এবং পার্ব্বত্য স্থানে গমন করিয়া সাধন ভজন করিতেন। অর্থাভাব সত্বেও যখন যেখানে গমনাগমন করিবার প্রেরণা প্রাণে অনুভব করিতেন, কখনই সঙ্কল্প-সাধনে বিরত হইতেন না। আশ্চর্য্য বিধাতার কৃপা, কতই অলৌকিক রূপে তিনি তাঁহার অর্থাভাব মোচন করিয়াছেন। অদম্য উৎসাহে তিনি নবধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

পত্নী-বিয়োগের পর ৪টী কন্তাকে লইয়া এবং মণ্ডলীর সহানুভূতি হইতে সময়ে সময়ে বঞ্চিত হইয়াও, ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৃপাগুণে একে একে সৎপাত্র সকল যেন অচেষ্টায় পাইয়া, তিনটী কন্তাকে তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার বিবাহিত কন্তাগণ সকলেই এখন সম্পন্ন অবস্থায় অবস্থিত। বিবাহিত একটী কন্তা তাঁহার রোগের অবস্থায় পরলোকে গমন করিয়াছেন। কনিষ্ঠ কন্তাটী এখনও অবিবাহিত আছেন। তাঁহাদের সকলকে আমরা অন্তরের শোক-সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

ভাই বৈকুণ্ঠনাথ যদিও দেহ-পুরবাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আত্মা আমাদের সঙ্গে চিরদিন অবস্থিতি করিবে, ইহাই আমরা বিশ্বাস করি। আমরা যেন তাঁহার দেব চরিত্রের, অনুসরণ করিয়া তাঁহার আত্মার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা অর্পণ করি।

ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রচারক শ্রীমদ্ বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ।

(১)

নববিধানের আদরের ধন,
ব্রাহ্মসমাজের কিরীট-ভূষণ,
ভক্তদল মাঝে সেবক-রতন,
বৈকুণ্ঠের নিধি, বৈকুণ্ঠ তুমি;
প্রথম যৌবনে আপন জীবন,
শ্রীহরির পদে করি সমর্পণ,
বিষয়ের সুখ করি বিসর্জ্জন,
করিলে আশ্রয় সত্যের ভূমি॥

(২)

সুঠাম সুন্দর তব কলেবর,
বিশ্বাস বিনয়ে মন মনোহর,
বিবেকে চরিত্রে ধর্ম্মের অমর,
তোমা হেন ভক্ত কোথায় আর?

ঈশ্বরের তুমি পবিত্র সন্তান,
ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের তুমি শ্রেষ্ঠ দান,
নূতন বিধানে দৃষ্টান্ত মহান্,
তব গুণে মুগ্ধ প্রাণ আমার॥

(৩)

যোগ-অনুরাগী সাধন-তৎপর,
অল্পভাষী সাধু বিশ্বাসি-প্রবর,
নীরব কর্ম্মীর আদর্শ সুন্দর,
সর্ব্বজন-প্রিয় বৈকুণ্ঠ নাথ;
পবিত্রাত্মা তব প্রাণের ঈশ্বর,
তাঁহারি আদেশে ওহে ভক্তবর,
চলিতে জীবনে তুমি নিরন্তর,
দাস-ভাবে মাতি দিবস রাত॥

(৪)

সাধু অঘোরের প্রিয় অনুগামী,
তাঁহারি মতন যোগ-ভক্তি-কামী,
তাঁহারি মতন ক্ষুদ্র ছবি খানি,
নূতন বিধানে চরিত্র তব;
নীরবে করিতে সেবা অনুক্ষণ,
নীরবে করিতে প্রেম বিতরণ,
নীরবে সহিতে যাতনা ভীষণ,
নীরবে বিধান পালিতে সব॥

(৫)

হরি-দরশনে ব্যস্ত অনিবার,
তাঁরি কথা শুনি জীবন তোমার,
তাঁহারি বিধান করিয়া প্রচার,
বিশ্বাসের জয় দেখালে ভবে;
মাটীর মতন স্বভাব তোমার,
গুরুজনে ভক্তি বাধ্যতা অপার,
অহঙ্কারহীন শুদ্ধ ব্যবহার,
নূতন বিধানে দেখালে সবে॥

(৬)

দয়াময় হরি এ পাপ জীবনে,
মিলাইয়া মোরে প্রেমে তোমা সনে,
করিলা কৃতার্থ কত নিশিদিনে,
সে কথা বলিতে পারিনা আর;
ধন্য দয়াময় যিনি এ জীবন,
নূতন বিধানে করিলা গঠন,
দেখাইলা প্রেম পুণ্যের মিলন,
অসার সংসারে দেখালে সার॥

(৭)

এবে কার্য্য তব হইয়াছে শেষ,
যাও আর্য্য যাও, আপনার দেশ,
ভুলি রোগ শোক যাতনা অশেষ,
আনন্দে বিহর মায়ের কোলে;
যেখানে আছেন ভক্ত সাধুগণ,
ব্রহ্মানন্দ আদি প্রেমিক সুজন,
যথা বহে নিত্য শান্তি-সমীরণ,
তথা থাক তুমি ভকত-দলে॥

(৮)

সাধ হয় প্রাণে তোমার মতন,
হরি-পদে প্রাণ করি সমর্পণ,
নীরবেতে সাধি যোগ প্রেমধন,
হেরি জননীরে শিশুর মত।
করোহে প্রার্থনা এ অধমতরে,
করো আশীর্ব্বাদ এ দীন জনেরে,
যেন যোগ ভক্তি এ পাপ অন্তরে,
তোমার মতন ফুটে নিরত॥

(৯)

দাও হরি দাও অধম সন্তানে,
বৈকুণ্ঠের মত দীনতা এ প্রাণে,
তাঁহারি সুন্দর চরিত্র-ভূষণে,
সাজাও দাসেরে করুণা করে।
জানিনা করিতে ভক্তের আদর,
ক্ষম অপরাধ করুণা-সাগর,
ভক্তসনে দাও মিলায়ে সত্বর,
জীবনে চরিত্রে বিশ্বাসে মোরে॥

বিধান-নৈমিষারণ্য, আশাকুটীর, টাঙ্গাইল। } চিরদাস :— শ্রীশশিভূষণ তালুকদার।

ভাই বৈকুণ্ঠনাথের "আমার জীবন কথা" হইতে উদ্ধৃত।

সঙ্কল্প।

১। পিতার সহিত জীবনের দৃঢ়যোগ সংস্থাপন করিব।

২। পিতার অনুসরণ করিব। তিনি সমুদয় নরনারীকে প্রেম করেন, আমি পবিত্র প্রেমের সহিত সকলের সঙ্গে ব্যবহার করিতে যত্ন করিব।

প্রতিজ্ঞা।

১। আমি কোনও বিষয়ে বড়, এ অহঙ্কার মনে আসিতে দিবনা।

২। কঠোর বাক্যে কাহাকেও আঘাত করিব না।

৩। চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে আমি অনুগত জনের ন্যায় থাকিব।

৪। ভ্রাতাদের প্রসন্নতা লাভের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিব।

—•—

সিদ্ধার্থ গৌতম।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শাক্যসিংহ পুনরায় বর্ষাঋতুতে চালিয় গ্রামে মাসত্রয় বাস করিয়া শ্রাবস্তিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে কপিলবস্তুর ন্যগ্রোধ বনে গিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করেন। তথায় মহানাম নামে তাঁহার অপর এক খুল্লতাত পুত্র পিতা শুদ্ধোদনের রাজত্বের অধিকারী হইয়া রাজকার্য্য করিতেন, তাঁহার সুমধুর উপদেশ শুনিয়া ঐ ব্যক্তি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিলেন। আর বংশের মধ্যে কেহই উত্তরাধিকারী রহিল না।

এখান হইতে আলবী হইয়া রাজগৃহে আবার কিছুদিন বিহার করতঃ বেণুবনবিহারে চারিমাস অতিবাহিত করেন। তথায় একদিবস তিনি দেখিলেন যে, এক শিকারী ব্যাধ জাল বিস্তার করিয়া এক মৃগ ধরিয়াছে। বুদ্ধদেব বড় দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন, ঐ মৃগকে পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া এক তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। ঐ ব্যাধ তৎক্ষণাৎ ক্রোধে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিল, কিন্তু উহা ধ্যানাবস্থায় সংজ্ঞাহীন শাক্যের শরীর স্পর্শ না করিয়া ভূপতিত হইল। অতঃপর ঐ ব্যাধ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। শাক্য তখন ধ্যান ভঙ্গ করিয়া তাহাকে দয়া ও প্রেমের কথা বলিতে লাগিলেন। উহারা সপরিবারে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নীচ বৃত্তি পরিত্যাগ করিল। তৎপরে তথাগত শ্রাবস্তিতে গিয়া আবার কিছুকাল বিশ্রাম করেন।

প্রথমে বুদ্ধ স্বয়ং ভিক্ষার্থ দ্বারে দ্বারে যাইতেন, কিন্তু শেষে বয়োধিকত্ব বশতঃ তাহা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার এক শিষ্য তাঁহার জন্য ভিক্ষা করিয়া আনিত। কিন্তু এ ব্যক্তি তাহাতে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া স্বীয় গুরুদেবকে বড় অবমাননা করিত। ইহা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য জানিয়া শাক্য অতঃপর আনন্দকেই তাঁহার নিতান্ত অনুগত সঙ্গী করিলেন। আনন্দ ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন।

কিছুকাল পরে দূরতর স্থান ভ্রমণের ইচ্ছা হওয়াতে শাক্যসিংহ দক্ষিণ প্রদেশ পর্য্যটন করিয়া আসিলেন। রাজগৃহ ও শ্রাবস্তি এই দুই বিহার তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল; অধিকাংশ সময় তিনি এই দুই বিহারে প্রবাস করিতেন।

রাজগৃহে তাঁহার এক শিষ্য দেবদত্ত তথায় রাজা বিম্বসার-তনয় অজাতশত্রুর সহিত মিলিত হইয়া তৎসাহায্যে এক বিহার নির্ম্মাণ করতঃ এক স্বতন্ত্র দল সংস্থাপন করিতে উদ্যত হয়। দেবদত্ত আনন্দের সহোদর ও শাক্যের আত্মীয় ভ্রাতা। গৌতম বেণুবন বিহারে আছেন শুনিয়া দেবদত্ত তাঁহারই নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল; আমার অধীনে স্বতন্ত্র সন্ন্যাসাশ্রম স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি এবং আপনার বৈরাগ্য-প্রণালী অপেক্ষা আমি কঠিনতর শাসন-প্রণালী ও পবিত্রতানুসারে সন্ন্যাসীদিগকে পরিচালিত করিতে অভিলাষ করি। কিন্তু তিনি তাহার কথায় সম্মতি না দেওয়াতে দেবদত্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহিভাবে চলিয়া গেল।

কথিত আছে, ঐ দুষ্টমতি দেবদত্তের কুমন্ত্রণায় অজাতশত্রু পিতা বিম্বসারকে হত্যা করিয়া মগধের রাজ-সিংহাসন অধিকার করেন। সুগত যতদিন জীবিত ছিলেন ঐ হতভাগ্য পাপমতি তাঁহার জীবন-নাশের জন্য তিন বার প্রয়াস করে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তিনি বর্ষার সময় যখনই এই বেণুবনবিহারে আসিতেন, তখনই ঐ দুষ্ট শিষ্য তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে অবমাননা করিত।

শাক্য বলিলেন, "নির্ব্বাণ-প্রার্থীর পক্ষে বাহ্য বৈরাগ্য-সাধনে এত কঠোরতায় উপকারিতা নাই। আধ্যাত্মিক পবিত্রতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও সাধন নিতান্ত কর্ত্তব্য।" ইহাতে দেবদত্ত অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া গেল, এবং শেষে নিজে এক স্বতন্ত্র আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া কতকগুলি সন্ন্যাসী ও শ্রমণদল গঠন করিয়া কিছু দিন ধর্ম্ম-সাধনের ভাণও করে, প্রচারও করে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ইহার লীলা সংবরণ করিতে হইয়াছিল।

বোধিসত্ত্ব প্রায় ৪৪ বৎসর প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি সমুদয় মগধ, অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থান এবং দাক্ষিণ দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বৎসরের মধ্যে আটমাস পর্য্যটন করিতেন ও চারিমাস একস্থানে পর্ণ কুটীরে অবস্থিতি করিয়া উপদেশ দিতেন। বর্ষাকালে চাতুর্ম্মাস্যের সময় গ্রামস্থ লোকেরা প্রায় উপদেশ শুনিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিত, সেই অবকাশে খুব মধুর বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিতেন।

অনন্তর তিনি সর্ব্বশেষে বৈশালীতে সমাগত হন। আত্মদৃষ্টি সহকারে উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে। এই বিবেচনায় একদিন তথায় সমুদয় অর্হৎ, স্থবির, ভিক্ষু, শ্রমণ ও শ্রাবকদিগকে সমবেত করিয়া এই উপদেশ দিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা কর, সাধন কর, পূর্ণ হও, নির্ব্বাণ লাভ কর। যে ধর্ম্ম আমি প্রকাশ করিলাম, তাহা ইতস্ততঃ প্রচার কর। এই পবিত্রতা ও নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম যেন চিরস্থায়ী হয়, শত শত নর নারী সুখী ও কল্যাণের জন্য ইহাতেই যেন নিত্যকাল স্থিতি করে। দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে শান্তি বিস্তার ও দুঃখ অবসান করিতেই যেন এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, অল্পদিনের মধ্যেই তথাগত ইহলোক হইতে অবসৃত হইবেন। মাসত্রয়ের ভিতর তাঁহার মৃত্যু হইবে। আমার বয়স পূর্ণ হইয়াছে, জীবনের কার্য্যও শেষ হইয়াছে, শরীর অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমি এখন তোমাদিগকে রাখিয়া যাইতেছি, এখন তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লইতে চাই। ভিক্ষুগণ, অনুরাগী ধ্যান-পরায়ণ ও পবিত্র হও, প্রতিজ্ঞা ও ব্রতপালনে দৃঢ়তর হও, স্বীয় হৃদয়ের প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখ। যে অনুরাগের সহিত এই ধর্ম্মের অনুসরণ ও সাধন করিবে, সেই জীবন-সাগরে পার হইবে এবং দুঃখ হইতে নিস্তার পাইবে।"

স্থবিরগণ তাঁহার শেষোক্তি শুনিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। পরে গম্ভীর-প্রকৃতি সুগত একান্তে নিকটে কাশ্যপকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "দেখ, তোমার সহিত আমি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিব, তোমাতে আমি এবং আমাতে তুমি, এইভাবে উভয়ে উভয়ের মধ্যে নিত্য অবস্থান করিব, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া সকলের পরিচালক হইয়া থাকিবে।" কাশ্যপ তখন নিতান্ত দীনভাবে প্রেমের সহিত তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিলেন। এইরূপে শ্রীবুদ্ধ আধ্যাত্মিকযোগ স্থাপন করিয়া বিচ্ছেদ-জনিত ক্লেশ হইতে শিষ্যদিগকে মুক্ত করিলেন।

অনন্তর তিনি বৈশালী হইতে কুশীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে পাবাগ্রামে চণ্ড নামে নীচ জাতির গৃহে আতিথ্য-সৎকার গ্রহণ করিলেন। ঐ ব্যক্তি আত্মবৎ সেবা করিবে বলিয়া শূকরের মাংস ও অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার ভিক্ষার এই এক প্রধান নিয়ম ছিল যে, দাতা যাহা দিত, তাহাই আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন। কিন্তু সন্ন্যাসী বলিয়া কেহই তাঁহাকে মাংসাদি আহার করাইত না। তবে তাঁহার কোন স্পষ্ট নিষেধও ছিল না। চণ্ডের সেই মাংস অন্ন গ্রহণ করিয়া শাক্যসিংহ কিঞ্চিৎ পীড়াগ্রস্ত হইলেন; উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন; পথে যাইতে যাইতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, চলচ্ছক্তি রহিত হইল, তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। পরে কুকুষ্টা নদীতীরে উপবেশন করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিলেন। আনন্দ জল পান করাইয়া তাঁহাকে কতকটা সুস্থ করিলেন। পরে নদীতে অবগাহন করিয়া তিনি বরং সবল হইয়া বেশ আরাম পাইলেন। এইরূপে বিশ্রাম লাভ করিয়া তিনি কুশী নগরের নিকটবর্ত্তী উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া তিনি বেশ বুঝিলেন যে, মৃত্যু তাঁহার আসন্ন। তখন তিনি শান্তমনে ভাবিতে লাগিলেন যে, চণ্ডের প্রদত্ত আহার্য্য আমার এই সাংঘাতিক পীড়ার কারণ। এই ভাবিয়া তিনি আনন্দকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি চণ্ডকে বলিও যে, তোমার জন্মান্তরে বিশেষ পুরস্কার লাভ হইবে; কারণ তোমারই অন্নে সিদ্ধার্থ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। পৃথিবীতে দুই ব্যক্তি তাঁহার হিতকারী বন্ধু, সুজাতা ও চণ্ড। সুজাতার প্রদত্ত অন্নে বোধি প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে জীবন রক্ষিত হইয়াছিল, আর চণ্ডের ভিক্ষাতে ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন।" সুগত চণ্ডের প্রতি কি অপার ক্ষমা, দয়া ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন, পাছে তাহার হৃদয় দুঃখিত হয়, তজ্জন্য কত সান্ত্বনা ও মধুর বচনে প্রবোধ দিলেন। তিনি জীবন ও মৃত্যু দুই সমান ভাবে নিরীক্ষণ করিতেন। অন্তিম কাল আগত ভাবিয়া প্রিয় শিষ্য আনন্দকে কাছে বসাইয়া, তিরোভাব হইলে কিরূপে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধি হইবে, তাহার বিশেষ বিবরণ বলিয়া দিলেন। অপিচ ভিক্ষুকী রমণীগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, দেখ, ইহাদের মধ্যে শুদ্ধতা ও বৈরাগ্য যাহাতে প্রবল থাকে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিবে। স্থবিরগণের সহিত সন্ন্যাসীদিগের সম্বন্ধ ও ব্যবহার বিষয়েও অনেক গম্ভীর কথা আনন্দকে শেষ উপদেশ দিলেন। নারী শিষ্যদিগের সম্বন্ধে তিনি যে সকল নিয়ম ও সাধন নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা যেন বিশেষরূপে প্রতিপালিত হয়। স্থবির ও ভিক্ষু সকল যেন তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, ইহার একটি নিয়মও যেন অন্যথা না হয়, তিনি দৃঢ়রূপে এ বিষয়ে সাবধান করিয়াছিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া আনন্দ নিতান্ত ভগ্নোদ্যম ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। আনন্দ অতিশয় কোমল-প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন, এবং শাক্যের প্রিয় ও অনুগত ছিলেন, তাঁহার জীবন ও উপদেশ আনন্দের হৃদয়ে যেন অনন্ত ভাবে মুদ্রিত হইত। তিনি গুরুর প্রত্যেক কথার অনুসরণ করিতে যত্নবান ছিলেন।

আনন্দ নির্জ্জনে গিয়া রোদন করিতেছেন শুনিয়া, গৌতম তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা ও নির্ব্বাণের আশা দিয়া বলিলেন, "আনন্দ আমি ত তোমার সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে অনেকবার বলিয়াছি। দুঃখিত হইও না, বিলাপ করিও না। আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, আমরা অত্যন্ত প্রিয়তম ও সুখকর বিষয় হইতেও বিচ্ছিন্ন হইব? আনন্দ, তুমি আমার সহিত অনেক দিন হইতে আছ, আমার অতিশয় প্রিয় নিকটস্থ, তুমি সেবা, দয়া, চরিত্র, ধ্যান ও কথায় আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ। তুমি নিয়ত সৎকার্য্য করিয়াছ, এখন সাধনে দৃঢ় ও অধ্যবসায়ী হও, তবে অজ্ঞানতার শৃঙ্খল যে জীবনতৃষ্ণা, তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।" অতঃপর অপরাপর শিষ্যের প্রতি চাহিয়া আনন্দের দয়া ও আত্মদৃষ্টি উল্লেখ করিয়া উপদেশ দিলেন।

যে দিন তিনি এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিবেন, তাহার পূর্ব্ব রজনীতে কুশীনগরস্থ সুভদ্র নামে এক দার্শনিক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দ এই ভয়ে ব্রাহ্মণকে গুরুদেবের নিকট যাইতে নিষেধ করিলেন, পাছে অনেকক্ষণ কথোপকথনে রোগ বৃদ্ধি হয়। বুদ্ধদেব জানিতে পারিয়া সুভদ্রকে নিকটে ডাকিলেন এবং মুক্তি ও নির্ব্বাণ বিষয় বিশদরূপে বর্ণন করিলেন। অষ্ট প্রকার পবিত্রতা সাধনের মার্গও বুঝাইয়া দিলেন। নির্ব্বাণের প্রথম শুদ্ধি ও অন্তে প্রেম, এই শেষ কথা বলিয়া তিনি তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন। সুভদ্র তাঁহার এই উপদেশে ঐ নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

ভগবান শাক্যসিংহ ক্রমে দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি আনন্দ প্রভৃতি ভিক্ষু ও স্থবিরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা মনে করিও না যে, আমার কথা নিঃশেষিত হইল, গুরুদেব ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন, আর আমাদের কেহই নাই। আমার প্রচারিত ধর্ম্ম উপদেশ ও সাধন প্রণালী তোমাদের চির উপদেশার্থ নেতা হউক। ভিক্ষুগণ, এই সময় তোমাদের কাহারও কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তবে বল। ধর্ম্ম বা মার্গে অথবা সাধুতার বিষয়ে প্রশ্ন থাকিলে মীমাংসা করিয়া লও, আর আমার সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হইবেনা। এখন শেষ অবস্থা।"

কিন্তু সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তিনি মনে করিলেন, ইহারা নির্ব্বাণের চরম সাধনে উপনীত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি স্নেহ ও প্রেম বশতঃ সেই মৃত্যুশয্যা হইতে পুনরায় বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! আমার শেষ উপদেশ, সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, অতএব নির্ব্বাণ-কামনায় যত্নশীল হও।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন, একেবারে সংজ্ঞা-রহিত হইলেন।

সুগত বহু শিষ্য-পরিবেষ্টিত হইয়া অশীতি বৎসর বয়সে শুক্ল পক্ষে বিশাল শাল তরুতলে কুশীনগরে স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার অদর্শনে ও বিচ্ছেদে সাধারণ ভিক্ষুগণ অস্থির হইয়া পড়িলেন। অতঃপর সকলে সুস্থির হইয়া চন্দন কাষ্ঠের চিতার উপর তাঁহার মৃতদেহ নববস্ত্রে আবৃত করিয়া স্থাপিত করিলে মহাকাশ্যপ ও অপরাপর পঁাচশত ভিক্ষু উহা তিনবার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার চরণ বন্দনা ও স্তব স্তুতি করিয়া চিতা প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। অসার নশ্বর শরীর ক্ষণেকের মধ্যে ধ্বংস হইয়া ভস্মাবশেষ হইল। ভিক্ষু-সমূহ সেই ভস্মরাশি ধাতুময় পাত্রে পূর্ণ করিয়া সুগন্ধ পুষ্প তদুপরি আচ্ছাদিত করত নৃত্য গীত করিতে করিতে নগর মধ্যে আনয়ন করিলেন। উহা তথায় মহাসম্মানের সহিত সপ্ত দিবস রক্ষিত হইল। পরিশেষে তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি খণ্ড রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অলকাপুর, রামগ্রাম, উৎদ্বীপ, পাওয়া এবং কুশীনগর, এই আট স্থানে প্রোথিত করিয়া তদুপরি আটটি স্তূপ নির্ম্মিত করা হইল। বুদ্ধদেবের প্রতি লোকের এতাদৃশী ভক্তি ও অনুরাগ হইয়াছিল যে, সেই সময়ে তাঁহার দন্ত ও কেশাদি লইয়া বহুব্যয় করিয়া তাহা সংরক্ষণ জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল মন্দির বিশেষ বিশেষ তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

(গিরিধি নববিধান-মন্দিরে সাম্বৎসরিক সভায় পঠিত)

আজ কেশবের তিরোধানের দিন। আজ গিরিধিতে আপনাদের সঙ্গে এই উপলক্ষে সম্মিলিত হয়ে আমি যে কি আনন্দ অনুভব করছি, তা কথায় ব্যক্ত করতে পারব না। আমার এমন শক্তি নাই যে, আপনাদের হৃদয়ের স্পন্দনের সহিত আমার বিক্ষিপ্ত মনটিকে এক সুরে বেঁধে নিই। আমার শরীর ও মন এ সময়ে একবারেই অবসন্ন। তবু আপনাদের আহ্বানে আজ এসেছি, আপনারা যাঁকে ভালবাসেন, আমি যাঁকে ভালবাসি, তাঁহার কাছে শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করবার জন্য।

কেশবের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জীবনের যে নিকট সম্বন্ধ, তাহাই আজ আপনাদের কাছে টানিয়া আনিয়াছে। দেব-মন্দিরে আপনাদের সঙ্গে তাঁকে দর্শন করব, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর আমার কি হতে পারে! আজ আপনারা তাঁর পূজার জন্য একত্রিত হয়েছেন। আমার পূজাও আজ আপনাদের সঙ্গে কেশবকে জানাব। কেশবের কাছ থেকে আমি উহার অনুরূপ শিক্ষাই পেয়েছি। মহাপুরুষদের পূজা তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় কথা বলে আমার মনে হয়। তিনি বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মহাপুরুষদিগকে স্মরণ করে, পূজা করে, তাঁদের সঙ্গ লাভ করে, নিজের ধর্ম্ম-জীবনকে মহিমান্বিত করিয়াছিলেন। তিনি মহাপুরুষদের সঙ্গ এতই ভালবাসিতেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁর একটা দুর্নাম রটিয়া গিয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, মৌলিকতা তাঁর কিছুই ছিল না, তিনি পরের কাছে ঋণ করে ধর্ম্ম-জীবন ও ধর্ম্ম-সমাজ গঠিত করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিতে পারি না। কেশব যে নিজের জীবনে মহাপুরুষদিগকে আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন ও তাঁদের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া দেশ বিদেশে প্রচার করতে পেরেছিলেন, ইহা তাঁহার জীবনের এক মস্ত গৌরবের কথা। আমার মনে হয়, সৎসঙ্গের আকর্ষণ আমাদের প্রত্যেককে নিশিদিন আধ্যাত্মিক জগতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। যদি ঈশা, মূষা, মহম্মদ, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাজনদিগের আকর্ষণ অনুভব না করিলাম, তাহা হইলে ইহলোকে আর কাহার আকর্ষণ অনুভব করিব? আমার নিজের জীবনের একটা কথা বলি। কেশবের সহিত যখন আমার পরিচয় হয় নাই, তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় অতৃপ্ত হয়ে নিজের মনে লিখিয়াছিলাম—বল দেখি, ভাল ঘরটী কোথায়? যথায় যত আদরের ধন, যে ঘরেতে জেগে রন, তাঁদের সঙ্গে মিলন হইবে, বল দেখি, ভাই, কোন্ বেলায়? তারপর কেশবের সঙ্গ-লাভের পর আমি অনেকবার অনুভব করেছি—খ্রীষ্টের নিকট যাইবার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে, কেশব আমার সঙ্গে গিয়াছেন। ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে শ্রীবুদ্ধের চরণে প্রণাম জানাইয়াছি, কেশবকে আমার সাথী বলিয়া অনুভব করেছি। যখন যে ভাবে যাঁহার পূজা করিয়াছি, কেশব আমাকে ছাড়েন নাই। আমার এই ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা আজ আপনাদের কাছে বলবার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু শুধু এই কারণে বলছি যে, কেশবের মহাপুরুষদিগের সঙ্গ করিবার অভিলাষ আজও মিটে নাই। সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সহিত, সকল ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তির সহিত তিনি অনন্তকাল ধরিয়া মিলিত থাকিতে ইচ্ছুক। তিনি নিজে যেমন তাঁর বড় ভাইদের ভালবেসে পরিতৃপ্ত হোয়ে ছিলেন, আজ আমার মনে হয়, তাঁকেও আমরা সেই ভাবে ভালবেসে পরিতৃপ্ত হব। তবে কি কেশবকে মহাপুরুষদের আসনে বসাইয়া তাহার অসম্মান করিলাম? আমি আপনাদের সত্য বলিতেছি, সম্মানে অথবা অসম্মানে তাঁর কিছু যায় আসে না। ভালবাসার ধর্ম্মই হচ্ছে সম্মান করা এবং অসম্মান করা। কেশবকে যেদিন অসম্মান করি, সেদিন তাঁকে আরও কাছে পাই। তাঁর সঙ্গে যদি বিরোধ না থাকবে, তাহা

হইলে তাঁর সহিত মিলিত হইব কেমন করিয়া? আপনারা বলবেন, এ কেমনতর কথা? আমি বলি, কেশব যদি এইরূপ মিলনের প্রত্যাশী না হইতেন, তাহা হইলে তিনি প্রত্যেকের ধর্ম্ম-জীবনে স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্ত আদেশ কেন দিলেন? তিনি ত নিজের মুখেই বলিয়াছেন, "গুরু আমি নই—অপরকে দাস করিবার চেষ্টা করি নাই। চিরকাল শিখিয়াছি, চিরদিনই শিক্ষা করিতে প্রস্তুত। আমার দলে যদি পঞ্চাশ জন লোক থাকেন, তবে পঞ্চাশ প্রকার। সত্য সাক্ষী, চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী, অধীনতা এখানে নাই। একশত লোক যদি এখানে আসিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা স্ব স্ব প্রধান। প্রত্যেককেই আমার সম্বন্ধে ইহাই স্বীকার করিতে হবে, আমি চলিয়া গেলেও প্রত্যেকে ইহা স্বীকার করিবেন।" তাই বলি, কেশব ইহাই জানেন যে, আমরা তাঁকে স্বাধীন ভাবে ভালবাসব, কিন্তু সেটা যেন আমাদের হৃদয়ের খাঁটী ভালবাসা হয়। তার মধ্যে তরঙ্গ থাকবে, আর সেই লহরগুলি ইহলোক অতিক্রম করে কেশবধামে, যেখানে কেশব তাঁর ধর্ম্ম-গোষ্ঠী লইয়া একত্রে বাস করিতেছেন, সেইখানে পৌছিবে। আবার সেখান হইতে নূতন হাওয়ায়, নূতন চক্রান্তে আমাদের এখানে বহিয়া আসবে, ব্রহ্মমন্দির পবিত্র হইবে, কেশবের ভক্তগণের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইবে।

জানি না কেন, আমি কেশবের সহিত একটা ব্যক্তিগত সম্বন্ধের প্রয়াসী। আপনারা বলবেন, এটা আমার কল্পনা। হউক আমার কল্পনা, আমি ইহলোক ও পরলোকের ব্যবধান বুঝি না। আমি তাঁকে ভালবাসি, তিনি যেখানেই থাকুন, তিনি আমার; আর তাঁর যদি জোর থাকে, তিনিও আমাকে কাছে কাছে রাখুন। কেশবের সঙ্গে এইরূপ অনন্ত লীলার জন্ম আর কেউ এত প্রস্তুত নহেন। আমি আপনাদের বলছি, কেশব নিজ জীবনে এই প্রকার লীলা অনেকবার করেছেন; আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন—ছাড়াছাড়ি হইয়াছে—আবার মিলন হইয়াছে। পারিবারিক বন্ধন ছেড়ে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাড়ী যে দিন উপস্থিত হলেন, সে দিন তিনি পারিবারিক দেবতার কোল হইতে সমগ্র দেশের ভাগ্য-বিধাতার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। তারপর জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আকর্ষণ অনুভব করিয়া যে দিন একলাটী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠানের জন্ত পৃথক হইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন, সে দিনও তাঁর পাশে কয়েকটা মহাপ্রাণ একত্রিত হোয়েছিলেন। তারপর তাঁরাও নিজেদের জীবন প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া যখন আত্মহারা হইলেন, কেহবা কেশবের সঙ্গে রহিলেন, কেহবা রহিলেন না। কেশব কিন্তু তৃপ্তি ও অতৃপ্তির ভিতর দিয়া তাঁদের সান্নিধ্য নিজের জীবনে সর্ব্বদা অনুভব করেছেন। শুনেছি, তাঁর কোন বিশেষ বন্ধু যদি অনুপস্থিত থাকিতেন, মাসের পর মাস কেশব নিজের পূজার দক্ষিণে তাঁর জন্ত একখানি আসন ছাড়িয়া রাখিয়া নীরবে তাঁর উপস্থিতি স্বীয় অন্তরে উপলব্ধি করিতেন। কেশব নিজের ধর্ম্ম-জীবনে এই ব্যক্তিগত সম্বন্ধকে সর্ব্বোচ্চস্থান দিয়াছিলেন। তাই তখনকার ব্রাহ্মসমাজে একটা প্রাণ ছিল, ব্যথা ছিল, সকলের হৃদয় সকলের জন্য বাজিয়া উঠিত। আমার মনে হয়, সেই ব্যক্তিগত সম্বন্ধে যদি কেশবকে আবার প্রত্যেকে বাঁধিয়া লই, তাহা হইলে আমরা পরস্পরের সহিত বাঁধা পড়িয়া যাইব। আমাদের জাতীয় শক্তি বাড়িবে, আধ্যাত্মিক জীবনেও আমরা অগ্রসর হতে পারব।

আমার কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করে বলি। আমি বিশ্বাস করি, কেশবকে ভালবাসিলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ হইবে। ব্রাহ্মসমাজে আরও কয়েকজন মুনি ঋষিদের আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু তাঁদের সম্যকভাবে কাছে পেতে হলে কেশবের সঙ্গে যাইতে হইবে। রামমোহন দেবেন্দ্রনাথকে কেশব যে ভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাহাই আমার নিকট তাঁদের যথার্থ পরিচয়। জানিনা, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন রামমোহন কোন দিন দেখিয়াছিলেন কি না। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের যে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কত দূর অনুমোদন করিতেন, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার কথা। তবে এ কথা সত্য যে, রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথকে কেশব যে ভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়ে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার ফলে আজ রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথকে বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই দেশবাসীর চক্ষে আরও পরিস্ফুট করে তুলেছেন। কিন্তু এ কথা সত্য নহে কি যে, কেশব এ কাজে সর্ব্বপ্রথম? কেশব না আসিলে তাঁদের পূজা এমন ভাবে হইত কি? যাহা অগ্রবর্ত্তীদিগের সম্বন্ধে সত্য, তাহা কেশবের পরবর্ত্তীদিগের পক্ষেও সত্য বলে আমি মনে করি। কেশবের জীবনের সহিত পরবর্ত্তী আচার্য্যদিগের ধর্ম্ম-জীবন অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক যখন ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস রচনা করবেন, আমার মনে হয়, তিনি কেশবকে লইয়া আরম্ভ করিবেন, পরে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের উল্লেখ করবেন ও পরিশেষে কেশবের পরবর্ত্তী যুগের ঋষিদিগের কথা লিপিবদ্ধ করিবেন। আমার এই Perspective যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আপনারা নিশ্চয়ই আমার সহিত একমত হইবেন, কেশবকে ভালবাসিলে ব্রাহ্মসমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইবে; যাঁরা পূর্ব্বে গিয়েছেন, যাঁরা পরে এসেছেন ও আসিবেন, সকলের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠতার যোগ আমাদের পক্ষে সহজ হইবে।

আর একটী কথা বলিব। অনেকে বর্ত্তমান কালে বলিতেছেন, পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া কি হইবে, ধর্ম্ম সাধনের প্রয়োজন কি? তাঁরা বলেন, আমাদের সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য, দেশের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির জন্ত চেষ্টা করা। কথাটা শুনতে খুবই ভাল, কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব, তাহা বুঝি না। মানব-ধর্ম্ম-সমাজে লিখিত আছে, সকল দেশেই দুইটী বিশেষ শক্তি আছে, ব্রাহ্মণশক্তি, ও ক্ষত্রিয় শক্তি। এই দুই শক্তির দ্বারাই দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল। এই দুই শক্তির হ্রাস হইলে দেশের অধঃপতন।

আমাদের দেশ বাহুবলের পক্ষপাতী নয়। তাই আমাদের প্রধান সহায় ব্রাহ্মণশক্তি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক চেতনা। উহার সাহায্যে রাষ্ট্রীয় জীবনে নব জাগরণ উপস্থিত হইবে, এবং রাষ্ট্রীয় উন্নতি না হইলে সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও সম্ভব হয় নাই; জানিনা আমাদের দেশে হইবে কি না। তবেই দেখা যাইতেছে যে, সকল উন্নতির মূলে আত্মজ্ঞান, আধ্যাত্মিক শক্তির ও পরব্রহ্মের পূজা। কেশব একথা আমাদের বারবার বলিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া তিনি সমাজের কল্যাণ, দেশের মঙ্গল ও জগতের হিতের জন্য সর্ব্বদাই প্রার্থনা করতেন। সেইরূপ প্রার্থনার শক্তি ও আকাঙ্ক্ষা এবং তাহার অনুরূপ অন্তর বিধাতা দিবেন নাকি? আমি আপনাদের অনেক কষ্ট দিলাম। অথচ কেশবের কাছে আমার যে শেষ কথা, তাহা এখনও বলা হয় নি। আজ তাঁর তিরোভাবের দিন পরলোকের দিকে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে। কেশব বলিতেন, পরলোক দূরে নয়। যে ফুল এখানে ঝরে, সেখানে গিয়ে সৌরভ বিলায়। যে সঙ্গীত এখানে ফুরায়, তাহার সুর সেখানে প্রতিধ্বনিত হয়। যে নদীর জল এখানে শুখায়, সেখানে সে মন্দাকিনীর পূত সলিলে পরিণত হয়। আমাদের অন্তরের ভক্তি ও ভালবাসা, যাহা আমাদের চিত্তকে এখানে উদ্বেলিত করে তুলেছে, ইহারও রূপ, রস ও গন্ধ কেশবের চরণ প্রান্তে নিশ্চয়ই পৌছিবে। কেশব তাঁর ব্রাহ্ম-সমাজকে রক্ষা করুন, তাঁর দেশবাসীর জন্য আশীর্ব্বাদ করুন, জগতের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-তৃষ্ণা প্রবলতর করুন। আজকের দিনে আমরা তাঁকে প্রণাম করে, আলিঙ্গন করে বলব, তোমার সাধুতা আমাদিগকে দাও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর।

৮।১।২৮ শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ময়ূরভঞ্জরাজ পূর্ণচন্দ্র।

(২রা মে বারিপদা নববিধান মন্দিরে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের আত্ম-নিবেদন)

পুণ্যশ্লোক আদর্শ-চরিত্র প্রজারঞ্জক বৈরাগ্য-জীবন শ্রীমন্ মহারাজ শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের দৈব দুর্ব্বিপাকে অকাল তিরোধান-শোক ভুলিতে না ভুলিতে কি আকস্মিক বজ্রশেল আমাদিগকে শোকাহত এবং চূর্ণ বিচূর্ণ করিল। এই সেদিন আমরা মহারাজ শ্রীশ্রীরাম-চন্দ্রের শিশু কুমারদ্বয় ঠিক লবকুশের ন্যায় মাতা শ্রীমতী সুচারু দেবীর নিকটে কি আনন্দে বিচরণ করিতেছেন দেখিলাম। আর আজ কি শুনি! হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রের ন্যায় বোম্বাই নগর হইতে নিদারুণ শোক-সংবাদ আসিল, শ্রীমন্ মহারাজা পূর্ণচন্দ্র আকস্মিক ভাবে ইহলীলা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

শোকের পর শোকদগ্ধা সেই সন্তান-বৎসলা রাজমাতা শ্রীমতী সুচারু দেবী, পতি-শোকদগ্ধা শ্রীমতী মহারাণী দেবী, পরম স্নেহার্দ্রহৃদয় পিতৃব্য সুদাম চন্দ্র রাউত রাও সাহেব, অভিন্নহৃদয় সহোদর শ্রীমন্ প্রতাপ চন্দ্র ও কনিষ্ঠ ধ্রুবেন্দ্র চন্দ্র এবং সমগ্র রাজ-পরিবার ও অমাত্যবর্গ এবং সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের প্রজাবর্গ আজ কি গভীর শোকে আচ্ছন্ন। রাজ-পরিবার গতকল্য গভীর শোকাশ্রুতে মহারাজ পূর্ণচন্দ্রের আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়া রাজোচিত প্রণালীতে সম্পন্ন করিয়াছেন, আজ দীন দুঃখী প্রজাবর্গের সহিত মর্ম্মবেদনা অনুভব করিয়া আমরা এই পবিত্র নববিধান-মন্দিরে তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্পণের জন্য সমাগত।

বাহ্যিক উদ্যোগ আয়োজন আমাদের কিছুই নাই, যদ্দ্বারা আমরা পরলোকগত প্রিয় মহাত্মার আত্মার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধার্পণ করিতে পারি। ভাবিয়া ছিলাম, শ্রীযুক্ত-নন্দন রাজ্যের ন্যায় শ্রীশ্রীরামচন্দ্র-নন্দন পূর্ণচন্দ্র দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এই ময়ূরভঞ্জ-রাজ্যকে পিতৃদেবের আদর্শানুসারে সমুন্নত করিবেন। কিন্তু হায়, কে জানিত, তাঁহাকে মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে স্বকার্য্য শেষ করিয়া স্বধামে চলিয়া যাইতে হইবে! এই অল্পকাল মধ্যেই তিনি কি এই রাজ্যের এবং সমগ্র দেশের কল্যাণ সাধনা কম করিয়াছেন? তাঁহার শিক্ষা ও সাধনা ধন্য। তাঁহার ন্যায় পিতৃ-মাতৃভক্ত এমন কে? পিতার আদর্শ জীবন এবং অভিলষিত কার্য্য-সাধন তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ ব্রত ছিল। শৈশবে মাতৃহীন হইয়া মা সুচারু দেবীর স্নেহে তিনি এতই মুগ্ধ যে, এই মা সুচারু দেবীর প্রীতি সম্পাদন করাই যেন তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য ছিল। শারীরিক অসুস্থতা যখনই তিনি অনুভব করিতেন, তখনই শুশ্রূষা লাভের জন্য মা সুচারুদেবীর কাছেই দৌড়িয়া যাইতেন এবং যথার্থ শিশুর ন্যায় তাঁহার আদেশ অক্ষুণ্ণরূপে পালন করিয়া সুস্থ হইতেন ও স্বাস্থ্যলাভ করিতেন। কিন্তু হায়! এই দারুণ শেষ ব্যাধির সময় কেন তিনি এ মার নিকটে গিয়া সুস্থতা লাভের সুযোগ পাইলেন না? মার শোক-দগ্ধ প্রাণে এ শেল যে অসহনীয় রহিল।

রাজ-পরিবারের উচ্চগৌরব চিররক্ষিত হয় এবং ময়ূরভঞ্জরাজ্য অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যের মধ্যে উচ্চতা লাভ করে, ইহা তাঁহার প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়াই, যাই কি না যাই ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও, ভারতীয় রাজন্যবর্গের সমিতিতে সুদূর বোম্বাই নগরে গমন করেন।

প্রজাবর্গের কল্যাণার্থ যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, অকুণ্ঠিত-চিত্তে তাহা সম্পাদন করিতেন। এই ময়ূরভঞ্জে বৈজ্ঞানিক প্রথানুসারে যাহাতে এখানকার খনিজ পদার্থের আবিষ্কার হয় ও তদ্দ্বারা রাজ্যের অর্থ-সংস্থানের উন্নতি হয় এবং যাহাতে প্রজা-বর্গের সুচিকিৎসা, স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান ও জলাভাব ইত্যাদি দূরীভূত হয়, তাহার জন্য শেষ পর্য্যন্ত কতই যত্ন করিয়াছেন। দরিদ্র মৃত কর্ম্মচারীদিগের বিধবাগণ আজীবন যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তাহার জন্য অকুণ্ঠিতভাবে অর্থ-সাহায্য-দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দীন দরিদ্রগণকে অকাতরে অর্থ দান করিতেন। কেবল তাহাই নহে, শুনিয়াছি, কেহ তাঁহার সম্মুখে চক্ষের জল ফেলিলে

তিনি নিজে ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এতই তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয় ছিল যে, তাঁহার নিকট সাহায্য-প্রার্থী হইয়া কাহাকেও কখনও বিমুখ হইয়া ফিরিতে হয় নাই।

লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহে অর্থদান করিতে তিনি সদাই মুক্তহস্ত। কটক রেভেন্স কলেজে এক লক্ষ টাকা দান করিয়া বৈজ্ঞানিক ইন্‌ষ্টেলেসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উৎকল সাহিত্য-পরিষদের গৃহনির্ম্মাণের সমুদয় ব্যয় তিনি বহন করিয়াছেন। আমার ক্ষুদ্র বাগনান হাই স্কুলের জন্যও যত কাঠ লাগিবে, তাহা দিবার হুকুম দিয়াছেন। এই নববিধান-মন্দিরের ভূমি-খণ্ডটী তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের পদানুসরণে চিরদিনের মত নিষ্কর করিয়া দিয়াছেন। এখানকার সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার সমান দয়া ছিল। হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান সকল সম্প্রদায় তাঁহার নিকট হইতে সমান কৃপালাভ করিয়াছেন।

বৃটিশ-রাজভক্তি এবং স্বদেশ-হিতৈষণা তাঁহার কতই উচ্চ ছিল। ভারতের গৌরবার্থ বিগত মহাযুদ্ধের সময় তিনি সৈনিকের কার্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন এবং ঐ মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ-রাজকে একটি এরোপ্লেন দান ও অর্থ-সাহায্যার্থ বহু টাকার ওয়ার লোন লইয়াছিলেন।

নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়, তাঁহার যেমন উচ্চ মন এবং অগ্নিময় উৎসাহ ছিল, শারীরিক স্বাস্থ্য তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু আপন স্বাস্থ্য অপেক্ষা প্রজাদের সেবা করিতেই তাঁহার আত্মত্যাগ ছিল। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া, এ দেশের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ না হওয়াতে, তিনি বিলাত গমন করেন; কিন্তু সেখানকার অধিক-ব্যয়সাধ্য চিকিৎসায় বিশেষ ফল না পাইয়া, প্রজাবর্গের অর্থ অনর্থক ব্যয় হইতেছে ভাবিয়া, অচিরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, এবং চিকিৎসকগণ অপেক্ষা জীবনের রক্ষক একমাত্র বিধাতাকে জানিয়া, অকুতোভয়ে বিশ্বাসী বীরের ন্যায় তিনি ঈশ্বরের চরণে জীবনের সকল ভার অর্পণ করেন।

এমন বিশ্বাসী বীর, প্রজাবৎসল রাজা মাতৃভক্ত সন্তান, ময়ূরভঞ্জ রাজ-পরিবারের গৌরবাকাঙ্ক্ষী, স্বদেশ-হিতৈষী আত্মাকে আমরা অকালে হারাইয়া কতই গভীর শোক-সন্তপ্ত। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, অমরাত্মাগণের মৃত্যু নাই। সকলেই জানেন, রাজা কখনো মরেন না, "The King never dies."।

রাজা ঈশ্বর-প্রেরিত, তিনি কেবল জড়রাজ্যে রাজত্ব করিবার জন্য আসেন না; তিনি মনোরাজ্যে, প্রাণরাজ্যে রাজত্ব করিতেই বিধাতা-কর্ত্তৃক নিয়োজিত। তাই আমরা প্রার্থনা করি, আমাদের প্রিয়তম পূর্ণচন্দ্র যদিও দেহরাজ্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার দিব্য চরিত্রের প্রভাবে, তাঁহার এই ময়ূরভঞ্জের পরিবারে পরিবারে এবং সমগ্র উড়িষ্যায়, বঙ্গে ও ভারতে যেন যথার্থ পূর্ণচন্দ্ররূপে চির প্রতিভাত হন।

মা বিশ্বজননী পূর্ণচন্দ্রের দিব্য আত্মাকে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে, শ্রীব্রহ্মানন্দ, শ্রীশ্রীরামচন্দ্র সঙ্গে চিরজীবিত করিয়া রাখুন, ইহাই আমাদিগের সন্তপ্ত হৃদয়ের একান্ত প্রার্থনা।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী গীত হয়:—

নূতন সঙ্গীত।

চল চল মন চল যাই এখন
যথায় রাজন্ করেছেন গমন,
ত্যজি দেহ গেহ, ছার মায়া মোহ,
পূর্ণচন্দ্র এখন নির্ব্বাণে মগন।
(এ পূর্ণচন্দ্র এখন নির্ব্বাণে মগন)
আর কেন রব মোরা এ মরলোকে,
পাপ তাপ প্রলোভনে, বিষয় রোগে শোকে;
(এই ইন্দ্রিয়-গ্রামে আর রব না রব না,
এই দেহ-পুরবাসে আর রব না রব না)
যাই সেই লোকান্তরে অমর লোকপুরে,
(যথা) ব্রহ্মানন্দ সনে সে রাজর্ষি-নন্দন।
(শ্রীরাম-নন্দন)
কোথায় শ্রীরামচন্দ্র, কোথা হায় পূর্ণচন্দ্র,
কাঁদে মৌরভঞ্জ প্রজাবৃন্দ;
(হায় হায়রে—শোকে কাতর হয়ে)
এই মিলে মার কোলে, নবশিশু-দলে—
আছি লভি মোরা অমর জীবন।
নূতন বিধানে কারও নাহিক মরণ,
অমৃত-সোপান এ যে দেহের মরণ,
(আর ভয় নাই ভয় নাই) (ভবপারে যেতে)
এক মরণে মরিয়ে, আমিত্ব নাশিয়ে,
মার কোলে পাই নূতন জীবন।
(ভাই ভাই সবে মিলে)
(ইহ পর এক হয়ে) (প্রেমে গলে)

—•—

সংবাদ।

নববিধান আশ্রম ও প্রচার-কার্য্যালয়—ভারতাশ্রম স্থগিত হইলে প্রচারকগণের মঙ্গলবাড়ীতে নিজ নিজ গৃহাশ্রমে বাস ও একত্রে নবদেবালয়ে উপাসনা-সাধনের ব্যবস্থা হয়। প্রচার-কার্য্যালয় অন্যত্র হয়। যাঁহারা বিপত্নীক বা অবিবাহিত, তাঁহারা আচার্য্য-ভবনের একটি প্রকোষ্ঠে একত্রে বাস করিতেন। আচার্য্যদেবের তিরোধানের পর প্রচারকগণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও আচার্য্য পরিবারের সহিত বিচ্ছেদ হইলে, প্রধানতঃ তিন জন প্রচারকের উদ্যোগে ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে প্রচার আশ্রম ও প্রচার-কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। এত দিন সেই ভাবেই চলিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি ভক্তিভাজন প্রেরিত স্বর্গগত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতি সৌদামিনী দেবী প্রতাপচন্দ্রের স্মৃতি-

রক্ষাকল্পে অনূ্ন চল্লিশ সহস্র টাকা মূল্যের, ৮৪নং অপার সার্কুলার রোডস্থিত শান্তিকুটীর, জীবিত কালের ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য মাত্র ১২ হাজার টাকা ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক-মণ্ডলীর নববিধান আশ্রম স্কীমের জন্য সংগৃহীত টাকা হইতে গ্রহণ করিয়া ট্রষ্টীদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। "নববিধান আশ্রম স্কীমের" উদ্দেশ্য সকল সফল করিবার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে শান্তিকুটীরে করা হইবে, ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সম্প্রতি শান্তিকুটীরে যাবতীয় ব্যবস্থার স্থানাভাব বশতঃ "নববিধান প্রচার আশ্রম" স্থাপিত হইয়া কয়জনের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে নববিধান প্রচার কার্য্যালয় রক্ষা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ভাই প্রমথলাল সেন এই আশ্রমের ও প্রচারক-পরিবারদিগের ভরণপোষণাদির ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভাই অক্ষয়কুমার লধ প্রচার-কার্য্যালয়ের ভার লইয়াছেন। এই নূতন ব্যবস্থায় ভগবান্ মণ্ডলীর মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিন।

ধর্ম্মতত্ত্ব—ধর্ম্মতত্ত্বের সুপরিচালনের উদ্দেশ্যে শ্রীদরবার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, এখন হইতে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ও ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ ইহার সহযোগী সম্পাদক, ভাই অক্ষয় কুমার লধ কার্য্য-সম্পাদক (Managing Editor) এবং ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় সহকারী হইবেন। সমযোগিতাই নববিধানের বিশেষ সাধন। মা বিধান জননী এই সমযোগ সাধন সফল করুন। ভ্রাতৃমণ্ডলীও ধর্ম্মতত্ত্বের উন্নতি বিধানে সহায়তা দানে কৃতার্থ করুন। ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্য, প্রবন্ধ, চিঠি পত্রাদি শ্রীযুক্ত ভাই অক্ষয় কুমার লধ, ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় অনুগ্রহপূর্ব্বক সকলে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

পরলোকগমন—আমরা গভীর শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে নিম্ন লিখিত পরলোকগমন সংবাদ গুলি প্রকাশ করিতেছি :—

ময়ূরভঞ্জের প্রিয়দর্শন মহারাজা শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেও বোম্বাই নগরে ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের অধিবেশনে গমন করিয়া, আকস্মিক ভাবে গত ২১শে এপ্রিল দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ ও প্রজাসাধারণের পক্ষ হইতে আধ্যাত্মিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পাদন জন্য বারিপদা নববিধান-মন্দিরে, গত ২রা মে সন্ধ্যায় বিশেষ উপাসনা হয়। এই অনুষ্ঠানে মহারাজের ভক্তি ভাজন খুল্লতাত রাউত রায় সাহেব ও রাজপরিবারস্থ কয়েকজন, কলিকাতার ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ এবং প্রায় দুইশত নরনারী প্রজাবর্গ যোগদান করেন। ভ্রাতা নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহে অনুষ্ঠানটী অতি সুগম্ভীরভাবে সম্পন্ন হয়। ভ্রাতা অখিল চন্দ্র রায়ের সহিত ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক তথায় গমন করেন, ভাববিহ্বলচিত্তে উপাসনা করেন। তাঁহার প্রদত্ত আত্মনিবেদন স্থানান্তরে দেওয়া গেল।

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ, কলিকাতায়, ৪৪নং নিউ থিয়েটার রোডস্থ মধ্যম জামাতা ডাঃ নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে, আমাদের পরম ভক্তি-ভাজন নববিধান-প্রচারক শ্রদ্ধেয় ভাই বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ বহুদিন যাবৎ নানাবিধ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আনন্দময়ী জননীর শান্তিক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার শান্ত বিশ্বাসী যোগযুক্ত জীবন পৃথিবীর রোগ, শোক, দুঃখ, তাপ, দৈন্য সহ্য করিয়া, জীবনে শ্রীহরির জয় ঘোষণা করিয়া, এখন অমরধামে ব্রহ্মানন্দদলে মিশিয়াছে। জামাতা ও কন্যাগণ শেষ কয়েক বৎসর অকাতরে তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন ও পরম দেবতার শুভ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন।

গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ, কলিকাতায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র শশী গুপ্তের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে তাঁর পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাসকলকে তাঁহার অনন্ত প্রেমবক্ষে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীস্থ আত্মীয় স্বজনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ৪৪নং নিউ থিয়েটার রোডস্থ ডাঃ নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে, স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষের দৌহিত্রগণ, শ্রীযুক্ত ডাক্তার শৈলেন্দ্র ভূষণ দত্তের, শ্রীযুক্ত ডাঃ নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও অধ্যাপক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রগণ মাতামহদেবের পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস কীর্ত্তন করেন, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন, শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী শাস্ত্র পাঠ করেন। বড় দৌহিত্র শ্রীমান্ বিনয় শেখর দত্ত প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন।

গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার, পূর্ব্বাহ্নে, ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম-পল্লীতে পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের গৃহে স্বর্গীয় নববিধান-প্রচারক ভাই বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ মহাশয়ের পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরানন্দগুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় শ্রীমান্ সুরেন্দ্র নাথ জীবনী পাঠ করিলে, শ্রীনাথ বাবু ও তাঁহার পত্নী প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে স্বর্গগত আত্মার তৃপ্তির জন্য তাঁহার প্রিয়তমা কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী চন্দ নিম্নলিখিতরূপে দান করিয়াছেন :—

কলিকাতা—নববিধান প্রচারাশ্রমের প্রচারকদিগের আহার ও পথ্যের জন্য-১০৲ টাকা, সাধনাশ্রমের পরিচারকগণের আহার ও পথ্যের জন্য-১০৲ টাকা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য ফণ্ডে ৫৲ টাকা।

ঢাকা—নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের আহার ও পথ্যের জন্য-১০৲ টাকা, অনাথ ব্রাহ্ম ধন ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা।

স্থানীয়—নববিধান প্রচারাশ্রম ২৲ টাকা, ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ ২৲ টাকা, ময়মনসিংহ রামকৃষ্ণ মিশন ২৲ টাকা, অন্ধ আতুরদিগের জন্য ৪৲ টাকা। মোট ৫০৲ টাকা।

গত ২০শে মে, রবিবার, পূর্ব্বাহ্নে ৪৪নং নিউ থিয়েটার রোডে,

স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান তাঁহার কন্যাগণ সম্পন্ন করেন। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন।

গত ২৪শে মে, বৃহস্পতিবার, পূর্ব্বাহ্ন ৭॥০টায়, ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, প্রচার-কার্য্যালয়স্থ দেবালয়ে স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান শ্রীদরবারের পক্ষ হইতে শ্রীদরবারের উপস্থিত সভ্যগণ সম্পাদন করেন। মণ্ডলীর পুরুষ মহিলা মধ্যে কেহ কেহ যোগদান করিয়াছিলেন। ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লধ শ্লোক পাঠ ও ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের জীবনী হইতে অংশ বিশেষ পাঠ করেন, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ঢাকার মণ্ডলী সম্পর্কে আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠ করেন। উপাসনার পর কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠানটী বেশ গম্ভীরভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই দিনে ঢাকায়ও বিধানপল্লীস্থ দেবালয়ে প্রাতে উপাসনা এবং সন্ধ্যায় আর্ম্মাণিটোলাস্থ নববিধান-মন্দিরে স্মৃতিসভা হয়।

শুভ বিবাহ—গত ২৯শে বৈশাখ, বালেশ্বরে, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বিশালের দ্বিতীয় কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী শোভার সহিত, কাঁথি নিবাসী শ্রীযুক্ত মুরারি মোহন মাইতীর পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সরোজ কুমার মাইতীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ, ২৪।১এ হরিশ মুখার্জ্জি রোডে, শ্রীযুক্ত ডাঃ উপেন্দ্রনাথ বসুর কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ভক্তি সুধার সহিত, স্বর্গীয় শরদিন্দু বিশ্বাসের কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ অমলেন্দু বিশ্বাসের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ, দক্ষিণ ব্যাটরায়, ৫৩নং কালী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লেনে, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার দাসের তৃতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ীর সহিত, কাঁথি নিবাসী স্বর্গীয় কৃপাসিন্ধু জানার পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

ভগবান্ এই সকল নব দম্পতিকে স্বর্গের আশীর্ব্বাদ দান করুন।

জন্মোৎসব—গত ২২শে মে রাজর্ষি শ্রীরামমোহনের জন্মদিন স্মরণার্থ এবং ২৪শে মে মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিন ও ২৭শে মে প্রত্যুষে শ্রীদেবেন্দ্র নাথের জন্মদিন স্মরণার্থ নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। ২৪শে মে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেও বিশেষ উপাসনা হয় এবং আশ্রম-গৃহ পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা হয়।

নামকরণ—গত ২৫শে মার্চ্চ, ৬৮/২A গড়পার রোডে, শ্রীযুক্ত মনোগতধন দের শিশু পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। শিশুকে "সুনীলকুমার" নাম প্রদান করেন। ভগবান শিশুকে ও তাহার পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। প্রচার ভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

জাতকর্ম্ম—গত ৩১শে মার্চ্চ, হাওড়ায়, ৫৩নং কালী-প্রসাদ বানার্জ্জির লেনে, শ্রীমান্ ধীরেন্দ্র কুমার দাসের নবজাত শিশু পুত্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। শিশুটী গত ৬ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার, রাত্রি ১২টা ৫২ মিনিটের সময় জন্মগ্রহণ করে। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতা মাতাকে অশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ৪৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

পারলৌকিক—গত ২৭শে মে, ভক্তিভাজন প্রেরিত-প্রবর স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্রের স্বর্গারোহণ দিনে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর উদ্যোগে শান্তিকুটীরে বিশেষ উপাসনা হয়, অধ্যাপক শ্রীমান্ নিরঞ্জন নিয়োগী উপাসনা করেন। ভক্তিভাজনীয়া শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী ও ভগ্নী হেমলতা দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ২৯শে মে, শ্রীকেশবানুজ স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে তাঁহার কৃষ্ণভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন এবং ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভ্রাতা রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর বিশেষ ভক্তিভাবে প্রার্থনা করেন।

গত ২৮শে মে, ভ্রাতা হাজারীলাল ভড়ের সহধর্ম্মিণীর স্বর্গগমন দিন স্মরণে ভাই অক্ষয়কুমার লধ প্রচার আশ্রমের দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা করেন। কন্যা শ্রীমতী সরলার প্রচার ভাণ্ডারে দান ২৲টাকা।

গত ৮ই মার্চ্চ, স্বর্গগত ভাই কেদারনাথ দের সাম্বৎসরিক দিনে 6/2 Ward's Institution Streetএ ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। প্রচার ভাণ্ডারে শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দে ২৲ ও শ্রীমতী হেমলতা চন্দ ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৩শে মার্চ্চ, কাশীপুরে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখার্জ্জির সাম্বৎসরিক দিনে উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ১৫৲, আতুর আশ্রমে ৫৲, অনাথ আশ্রমে ৫৲, কুষ্ঠাশ্রমে ৫৲, কালা বোবা স্কুলে ৫৲, অন্ধ স্কুলে ৫৲, সেবাসদনে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ২৬শে মে, শনিবার, মঙ্গলপাড়ায়, ৮০নং অপার সার্কুলার রোডে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার রায়ের শিশু পুত্রের মৃত্যু উপলক্ষে উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

গত ১৮ই মে, ফরিদপুরে, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসুর গৃহে, তাঁহাদের পূজনীয় পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে, প্রাতে বিশেষ উপাসনা হয় এবং সন্ধ্যায় সাধু সনাতনের জীবন সম্বন্ধে "কথকতা" হয়। উভয় কার্য্যই শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কিশোর গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। উপাসনার কার্য্য অতি গম্ভীর ভাবে সুসম্পন্ন হয়।

তিনি অতি মর্ম্মস্পর্শী উপদেশ প্রদান করেন। তাঁর উপদেশের সারাংশ এই যে, "স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের জীবন একটী অতি সুন্দর ও উচ্চ আদর্শ জীবন। যদি আমরা আদর্শের জন্য দূরে না গিয়ে তাঁর জীবনকে লক্ষ্য করে জীবন গড়তে চেষ্টা করি, প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম অতি উচ্চ শ্রেণীর ছিল। তার এক কণিকা লাভ করিতে পারিলেও আমাদের জীবন ধন্য হবে।" এই অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু এবং শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী দাস কলিকাতা হইতে তথায় গিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে স্বর্গগত ভাই কালীনাথ ঘোষের পরিবারের সাহায্যার্থ ৪৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ৩০শে এপ্রিল, ১৭ই বৈশাখ, ১৭এনং বিপ্রদাস ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্তের গৃহে, তাঁহাদের স্বর্গগতা মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনার কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে ৩৲ টাকা দান করিয়াছেন।

উৎসব—গত ১৫ই মে, মঙ্গলবার, সিঙ্গিয়া যোগাশ্রমের বার্ষিক উৎসব হয়। পূর্ব্বাহ্নের উপাসনা ভাই গোপালচন্দ্র গুহ সম্পন্ন করেন। "সর্ব্বস্ব ঈশ্বরচরণে সমর্পণ করিলে তিনিও সর্ব্বস্ব হইয়া সাধককে আপনার চরণাশ্রিত দাসরূপে গ্রহণ করেন," এই ভাবে আত্ম-নিবেদন করা হয়। তৎপরে প্রীতিভোজন হয়। স্বর্গগত সাধক পদ্মলোচন দাসের শিক্ষা ও ভাবাধীন সিঙ্গিয়া গ্রামের নরনারী অনেকে এবং বালেশ্বর হইতে কয়েকটী ধর্ম্মবন্ধু এ বেলার অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষেপে উপাসনা করিলে নগর-কীর্ত্তন বাহির হয়। গ্রামের মধ্যস্থলে প্রাচীন সাধক শ্রীযুক্ত বরদা কান্ত বর্দ্ধন কিছু বলেন। কীর্ত্তনের দল আশ্রমে ফিরিয়া যোগী সাধক স্বর্গীয় পদ্মলোচন দাসের সমাধি প্রদক্ষিণ করিয়া খুব ভাবের সহিত কীর্ত্তন করেন, তৎপর প্রীতি-ভোজন হয়।

গত ৩১শে চৈত্র, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায়, বাঁ্যাটরা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। অনেকগুলি ভাই ভগ্নী যোগদান করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে প্রীতিভোজন দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করা হয়। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত বাণীবন ব্রাহ্মসমাজের ঊনত্রিংশত্তিতম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ১২ই ও ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তথায় পশ্চিম বঙ্গ ব্রাহ্ম-সম্মিলনী হইয়াছে।

নববিধান-জননীর কৃপায় বিগত ৪ঠা ফাল্গুন হইতে ৮ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ষট্‌চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে জয়পুর ফকিরদাস হাই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে শিক্ষক ও ছাত্রদিগের পরস্পরের প্রতি গুরুতর কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ, উষাকীর্ত্তন ও ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে সংকীর্ত্তন ও আলোচনাদি দ্বারা প্রচার করা হইয়াছে। ৬ই ফাল্গুন, রবিবার, দুই বেলা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা এবং জমাট সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। এক দিবস শ্মশানে ধ্যান ও কীর্ত্তন এবং প্রার্থনা হয়। এই উৎসব-কার্য্য সম্পাদন জন্য কলিকাতা হইতে সন্ন্যাসী সত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাস অমরাগড়ী গিয়াছিলেন। সেবক অখিলচন্দ্র রায় উৎসবের বিশেষ বিশেষ উপাসনাদিতে মা বিধান-জননী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

সেবা—গত ১৩ই মে, রবিবার, সন্ধ্যার পর বালেশ্বর ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ সামাজিক উপাসনার কার্য্য করেন। "অদ্ভুত নবধর্ম্ম সাধন" শীর্ষক আচার্য্যদেব কৃত প্রার্থনা পঠিত হয় এবং তদবলম্বনে উপদেশ প্রদত্ত হয়।

ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক গত বৈশাখ মাসে কুচবিহারে উৎসব উপলক্ষে গমন করিয়া, উৎসবের কার্য্য সম্পাদন করিয়া, ময়ূরভঞ্জের মহারাজার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে গত ১লা মে ময়ূরভঞ্জে গিয়া, মহারাজার আত্মার প্রতি সাধারণ প্রজাবর্গের পক্ষ হইতে শ্রদ্ধাপর্ণের জন্য স্থানীয় নববিধান-মন্দিরে ২রা মে বিশেষ উপাসনা করেন। ময়ূরভঞ্জের নূতন মহারাজা শ্রীমান্ প্রতাপ চন্দ্রের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে গত ৩রা মে বিশেশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া বিশেষ উপাসনা করেন এবং পরদিন মহারাজা শ্রীমান্ প্রতাপচন্দ্রকে চন্দন ধান্য দূর্ব্বা ও পুষ্পমালা দিয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক অভিনন্দন করেন। ভ্রাতা অখিল চন্দ্র রায় ও ভ্রাতা নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহযোগিতা করেন, এবং একটী নবরচিত সঙ্গীতও করেন। মহারাজা অভিনন্দন গ্রহণ করিয়া, ভাবে গদগদ হইয়া বলিলেন, "ঈশ্বর যদি এ মহাভার অর্পণ করিলেন, তিনি যেমন করে করাবেন তেমনি করে যেন করতে পারি, যেমন করে চালাবেন তেমনি করে যেন চলতে পারি, তিনিই আশীর্ব্বাদ করুন এবং আপনারাও আশীর্ব্বাদ করুন।"

নবদেবালয়—নববিধানাশ্রম শান্তিকুটীরে স্থানান্তরিত হইবার পর হইতে এই আশ্রমের অধিবাসী ভ্রাতৃগণ প্রতিদিন প্রাতে ৭টায় ও রবিবার ৮টায় নবদেবালয়ে নিয়মিতরূপে দৈনিক উপাসনা করিতেছেন। মঙ্গলপাড়ার কেহ কেহ ও বাহিরের কেহ কেহ যোগদান করিতেছেন। শ্রীমৎ আচার্য্য দেব শেষ দেহপাত করিয়া যে নবদেবালয় যাঁহাদের জন্য কত আশা করিয়া কতই প্রাণের আবেগে প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাঁহাদের সকলেরই তীর্থ-সাধনে আকাঙ্ক্ষিত হওয়া কি উচিত নয়?

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৬৩ ভাগ। ১১শ সংখ্যা।
১লা আষাঢ়, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক, ৯৯ ব্রাহ্মাব্দ ।
15th June. 1928.
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ ।

প্রার্থনা ।

মা, আমাদিগকে জাগ্রত কর। যে ধর্ম্মের মর্ম্ম এখনও বড় বড় পণ্ডিত বুঝিতে পারিতেছেন না, যে ধর্ম্ম একদিন সমস্ত দেশ, সমস্ত জাতিকে নবজাগরণে জাগ্রত করিবে, নবজীবনে সঞ্জীবিত করিবে, নব পরিত্রাণ-দানে সমুন্নত করিবে ও সমগ্র জগৎকে এক পরিবারে মিলিত করিবে, সেই মহাধর্ম্মবিধানের আশ্রয়ে সর্ব্বপ্রথমে কেন আমাদিগকে আনিলে, কেনই বা আমাদিগকে তাহা প্রচার ও প্রদর্শন করিবার ভার দিলে ? আমরা যখন আপনাদের চরিত্র, অবস্থা, জীবন পর্য্যালোচনা করি, দেখি, যথার্থই আমরা কিছুতেই এত বড় উচ্চ ধর্ম্মের উপযুক্ত নই। কিন্তু, মা, তুমিই ত আমাদিগকে এই পথে আনিয়াছ, এই গুরুভার আমাদিগের মাথায় চাপাইয়াছ। তুমি বিনা অভিপ্রায়ে ত এ কাজ কর নাই। তুমি যেমন জেলেমালাদের ডাকিয়া আনিয়া, তোমার প্রিয় পুত্রের সঙ্গে মিলিত করিয়া, একবার ঈশার বিধান প্রচার করাইয়াছিলে, জগাই মাধাইকে মাতাইয়া হরিনাম প্রচার করাইয়াছিলে, এবারেও যদি তেমনি আমাদের স্থায় নিতান্ত অক্ষম, অধম, পাপ-প্রবণ, মহাপাপী, সবার অপ্রিয়, অজ্ঞান জনদের দ্বারা তোমার নববিধান প্রচার করাইবে মনস্থ করিয়া থাক, তবে তাই কর। অসম্ভব সম্ভব কর। আমরা যে কত পাপী, কত অনুপযুক্ত, ভাল করিয়া বুঝিতে দাও। আমাদিগের দায়িত্ব কি, কার্য্য কত উচ্চ, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে দাও, এবং তোমার অসম্ভব-সম্ভবকারিণী শক্তি ও কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে দাও। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা নিতান্ত পাপী, অনুপযুক্ত, দুর্ব্বল, মৃতপ্রায় হইলেও, তুমিই তোমার অনন্ত কৃপাগুণে আমাদিগকে জাগ্রত করিয়া, আমাদিগের পাপজীবন হইতে তোমার নূতন মানুষ বাহির করিয়া, তোমার নববিধান প্রচার ও প্রদর্শন করাইবে, ইহা যেন সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

নববিধান কাহার জন্য ?

শ্রীঈশা বলিলেন, "আমি পুণ্যাত্মা সাধুদের জন্য আসি নাই, আমি পাপীদের জন্য আসিয়াছি।"

বাস্তবিক পাপী জনের পরিত্রাণের জন্যই যুগধর্ম্ম-বিধানের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। নববিধানও তাহারই জন্য আসিয়াছেন। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যই ঔষধ, সুস্থ ব্যক্তির ঔষধে কি প্রয়োজন ? তেমনি পাপ-ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যে, ধর্ম্মবিধানের অবতারণা তাহারই জন্য; যাঁহার পাপ-রোগ নাই, যে ব্যক্তি সাধু সিদ্ধ, তাঁহার ত ধর্ম্ম করতলন্যস্তই আছে, তিনি কেন বিধাতার বিধানের উপর আপন পরিত্রাণ নির্ভর করিতে

যাইবেন? এইরূপ যাঁহাদের পাপ নাই, পুণ্যবান্ সাধু বলিয়া আপনাদিগকে মনে করেন, তাঁহাদিগের জন্য বাস্তবিক বিধান নয়। কারণ, তাঁহারা যে বিধাতার বিধান অপেক্ষা, আপনাদিগের পুরুষকার-বলেই ধর্ম্মলাভে আকাঙ্ক্ষিত।

এইজন্য প্রথম যুগের ব্রাহ্মসমাজস্থ অনেকেই আচার্য্যদেবের পাপ-বোধের তত্ত্ব অনুমোদন করেন নাই এবং আধুনিক ব্রাহ্মদিগের মধ্যেই বা কয়জন তেমন আপনাদিগের পাপ স্বীকার করিতে চান?

সত্যই আমরা যেন মনে করি, আমরা হয় ত পাপী ছিলাম, এখন আর পাপী নই, সাধনবলে ধর্ম্মবলে আমরা পুণ্যাত্মা হইয়াছি। তাই আপনাদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবে পাপী বলিতে চাই না, কিম্বা যদিও উপাসনার সময় বিনয় বশতঃ বলি, "আমরা মহাপাপী", কিন্তু কেহ আমাদিগকে পাপী বলিলেই আমরা ক্রোধান্বিত হইয়া পড়ি, এবং তাহাকে অভিসম্পাত করিতেও কুণ্ঠিত হই না। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, আমরা আপনাদিগকে পাপী বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত এবং যথার্থ আমাদের সে আত্ম-দৃষ্টি খুলে নাই, যাহাতে আমরা আমাদের অন্তরের পাপ-প্রবণতা দেখিতে পাই। আমরা আত্মবিস্মৃত।

পাপ কি? আচার্য্যদেব বলিলেন, "পাপের সম্ভাবনাই পাপ, পাপ পাপ করিবার ইচ্ছা," "পাপ অবিশ্বাস" "পাপ 'আমি' বলা", এইরূপ সূক্ষ্ম-ভাবে পাপ-গণনাই যথার্থ পাপ-বোধ। সে পাপবোধ যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ আমরা কেমনে বিধানবিশ্বাসী হইব?

আমরা নববিধান স্বীকার করিয়াও যে যথার্থ নববিধান-বিশ্বাসী হইতে পারিতেছি না, ইহার প্রধান কারণ, আমাদিগের এই প্রকৃত আত্ম-দৃষ্টি ও পাপবোধের অভাব। এই পাপবোধ বিনা জীবন হয় না। রোগ ধরা না পড়িলে কেমনে ঔষধের ক্রিয়া হইবে?

প্রকৃত পাপের সম্ভাবনাই যাহার পাপ, আপনাকে যথার্থ মহাপাপী বলিয়া তাহারই বোধ হইবে, এবং সেই পাপের সম্ভাবনা নিবারণের জন্য দিন রাত্রিই তাহার প্রাণ ছটফট করিবে। বিধাতার কৃপাবিধানের জন্য তাহার প্রাণ আকুল হইবে, প্রাণগত প্রার্থনা হইবে এবং প্রার্থনার ফললাভে শান্তি হইবে। পাপ আছে যার, সেই তাহা হইতে মুক্তি চায়, যার পাপ নাই, সে তাহা চাহিবে কেন? পাপ হইতে মুক্তিই ত বিধান।

এইজন্য আমাদের মনে হয়, আমরা ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানগত ধর্ম্ম লইয়াই তুষ্ট হইতেছি, নববিধানের জীবনগত ধর্ম্মের জন্য আমরা তেমন আকাঙ্ক্ষিত হইতেছি না, এবং তাই আমরা তাহা লাভ করিতে ও জীবনে প্রদর্শন করিতে পারিতেছি না।

আচার্য্যদের জীবনবেদে স্পষ্ট বলিলেন, "তোমাদের মনে হয়, পাপী ছিলাম, পাপী নাই, এখন সাধু হইয়াছি। নববিধানের দিকে দৃষ্টি নাই।"

এই কারণেই তিনি আরো আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "বন্ধুরা বলেন, আমি সাধু, আমি বলি, আমি পাপী। যত আমি আমার পাপ বুঝি, ইঁহারা আপনাদের সাধুতা বুঝুন। আমার চরিত্র আমি বুঝি, আমার মত মানুষ আমার কাছে আসিল না বলিয়া আমি পারিলাম না এবার। আমার মত পাপী কয়জন আমার কাছে আসিলে তাহাদের লইয়া আমি কাজ করিতে পারিতাম। আমি আমাকে পাপী বলিয়া জানি, ইহাতে যে কল্পনার রং দেওয়া তাহা নহে। এ কথা ঠিক। এজন্য আমার সঙ্গে মিলিবে না কাহারও। আত্মগ্লানির রথে ইঁহারা উঠিবেন না। ২৫ বৎসর পরে এত পাপের আলোচনা ইঁহারা শুনিতে চান না। আমি যত দিন আমার মত পাপী না পাই, আমার কাজ করা হইবে না। যাহাদের পাপ নাই, লোভ নাই, যাহারা কল্যকার জন্য ভাবে না, যাহারা সাধু, তাহাদের সঙ্গে আমার মত বিষয়ী সংসারী যে, তাহার সঙ্গে মিলিবে না। আমি যদি আমাকে খুব নীতি-পরায়ণ, খুব সাধু না বলি, ইহাদের সঙ্গে মিলিবে না।"

এক্ষণে এই উক্তির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদিগের ইহাই কি কর্ত্তব্য নয় যে, আচার্য্যদেব যে ভাবে আপনাকে পাপীর সর্দ্দার বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং পাপবোধে সম্পন্ন হইয়া পাপের সম্ভাবনাকেও পাপ বোধ করিলেন, আমরাও আপনাদিগকে তাঁহারই সঙ্গের সঙ্গী পাপী মনে করিয়া, তেমনি ব্যাকুল অন্তরে অনন্ত উন্নতির আকাঙ্ক্ষী হই এবং তদ্দ্বারা এই সার্ব্বজনীন নববিধান-ধর্ম্ম জীবনে প্রতিফলিত করিয়া ধন্য হই। রোগ স্বীকার করিলে তবে রোগ হইতে আরোগ্য লাভ হয়, পাপী বলিয়া আত্ম-বোধ যথার্থ লাভ করিলে তবেই আমরা নববিধানের নবজীবন পাইতে সক্ষম হইব।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব।

ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্যদেব বলেন, "ব্রাহ্ম-সমাজের এখন যে অবস্থা, তাহাতে ইহাকে ঈশ্বরের সমাজ বলা যায় না। ইহা ঈশ্বরের ভাবী ধর্ম্ম-মণ্ডলীর অতি বিদ্রূপাত্মক ছায়াচিত্র।"

ডাকা ও দেখা।

বাড়ীতে ডাক্তার ডাকে কখন, রোগ হয় যখন। ডাক্তার আসেন কখন, রোগ প্রবল যখন। পাপ-রোগ-বোধ না হইলে তেমনি আত্মার চিকিৎসক ঈশ্বরকে কেহ ডাকেও না, যথার্থ পাপ-বোধ না হইলে তাঁহার দর্শনও পাওয়া যায় না। মুখের ডাকায় তিনি আসেন না, প্রাণের বেদনা অনুভব হইলেই অন্তর্যামী দেখা দেন।

অপরকে ভাল করার উপায়।

রোগ-চিকিৎসার প্রধান উপাদান সহানুভূতি। যে চিকিৎসক সহানুভূতি দেখাইতে না পারেন, তিনি কখনই চিকিৎসা-সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। অপরের দোষ দুর্ব্বলতা নিরাকরণ করিতে হইলেও প্রাণগত সহানুভূতি চাই। সহানুভূতি বিনা কাহারও দোষ অপরাধ পাপ নিবারণ করা যায় না। উপদেশ ও শাসন অপেক্ষা ব্যাকুল প্রার্থনাই অন্যকে সংশোধিত করিবার প্রধান উপায়।

পাপ ও অবিশ্বাস।

অগ্নিতে সামান্য তৃণখণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া তাহার সংযোগে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত হয়। চরিত্রের অগ্নি অতি দীনহীন ব্যক্তিতেও প্রজ্বলিত হইলে, তাহার সংস্পর্শে সাধুদল সংগঠিত হয়। তবে কালো কয়লাতে যেমন শীঘ্র অগ্নি স্পর্শ করে, কঠিন লৌহবৎ ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডে তেমন আঁচ ধরে না। যে আপনাকে যথার্থ পাপী জানিয়া পরিত্রাণার্থী হয়, তাহার জীবন যেমন সাধু-চরিত্রের অগ্নিস্পর্শে পরিবর্ত্তিত ও অগ্নিময় হয়, অবিশ্বাসীর জীবনে তাহা স্পর্শও করেনা।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কথোপকথন।

স্বর্গে।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

প্রকৃত বিশ্বাস তত্ত্ব বলিলাম ভবে।
প্রকৃত বিশ্বাস-গ্রন্থ অর্পিলাম সবে॥
সঙ্গতে হইল শুদ্ধ নীতির প্রকটন।
মুঙ্গেরে আসিল ভক্তি অতি সুশোভন॥
শেষে নববিধানের হইল প্রচার।
মহাযোগে সমুদায় হল একাকার॥
অপার করুণা করি যোগভক্তি-বিধি।
প্রকাশিলা এ জীবনে করুণা-বারিধি॥
ব্রহ্ম-উপনিষদেতে হইল বিবৃত।
অন্য উপদেশ কত হল নিবেদিত॥
যে লীলা করিলা হরি এ পাপ জীবনে।
জীবন-বেদেতে তাহা ব্যক্ত হল ক্রমে॥
মণ্ডলীর সুশাসন তরে ভগবান্।
নবীন সংহিতা এক করিলা বিধান॥
উপদেশ বক্তৃতায় নানা গ্রন্থ-যোগে।
সেবিলাম ব্রাহ্মগণে সদা অনুরাগে॥
স্বর্গরাজ্য ধরাতলে করিতে স্থাপন।
করিলাম নিরবধি কত না যতন॥
প্রত্যাক্ষা যোগ-বন্ধনে নরনারী যত।
ব্রহ্ম সনে হয় যাহে নিয়ত গ্রথিত।
সর্ব্বেসর্ব্বা হন সেই হরিলীলাময়।
জীবগণ লয় তাঁর একান্ত আশ্রয়॥
জীবের সর্ব্বস্ব ধন এক ভগবান্।
সর্ব্বত্র আছেন তিনি নিত্য বর্ত্তমান॥
সুধু এক বলে তাঁরে মানিলে কি হয়?
হতে হবে ব্রহ্মগত ব্রহ্মপ্রেমে লয়॥
সর্ব্বত্র দেখিবে তাঁরে, তাঁর বাণী শুনি।
চলিবেন ব্রাহ্মগণ দিবস যামিনী।
পুরাতন বিধানেতে মানুষের কথা।
শুনিয়া যেমন জীব চলিত সর্ব্বদা॥
সেইরূপ এ বিধানে হরি গুরু হয়ে।
চালাবেন মানবেরে সকল সময়ে॥
মনুষ্যের রাজ্য শেষ হবে চিরতরে।
হইবে ধর্ম্মের জয় সংসার ভিতরে॥
ব্রহ্ম ইচ্ছা নরনারী করিয়া পালন।
সংসারে স্বরগ-ধাম করিবে স্থাপন॥
সব ধর্ম্ম পূর্ণ হবে নূতন বিধানে।
সব সাধুদের বাঞ্ছা পুরিবে ভুবনে॥
অপ্রেম অশান্তি পাপ থাকিবেনা আর।
ঐক্য শান্তি সমন্বয়ে পুরিবে সংসার॥
বিশ্বাস শুদ্ধতা প্রেম যোগ ভক্তি জ্ঞান।
নীতি সত্য সদাচার বিবেক বিজ্ঞান॥
সকলেই একীভূত হয়ে এ বিধানে।
আনিবেক জনগণে মায়ের চরণে॥

প্রমত্ত হইয়া সবে ব্রহ্ম-গুণ গাবে।
জগতের দুঃখ তাপ সব দূরে যাবে॥
নিরাকার ব্রহ্ম হয়ে জননী সবার।
মাতৃভাবে করিবেন জগৎ উদ্ধার॥
শিশুভাবে মাতৃকোল করিয়া আশ্রয়।
হইবেক নরনারী সদা নিরভয়॥
এই সব মহাতত্ত্ব করিতে ঘোষণ।
মায়ের আদেশে হল মোর আগমন।
আপনার ইচ্ছা রুচি বাসনা নিচয়।
করিলাম মাতৃপদে একেবারে লয়॥
মতভেদে ভ্রাতৃভেদ হবেনা কখন।
মতান্তরে ভাবান্তর রবেনা এখন॥
সমস্ত জগৎ ভরি মহাসম্মিলন।
ঘরে ঘরে করিবেক সদা বিচরণ॥
পূর্ব্ব পশ্চিমের হবে মিলন সুন্দর।
সংগ্রাম অপ্রেম স্বার্থ পলাবে সত্বর॥
ব্রহ্মের আদেশে দাস নব সমাচার।
দল সহ করিলেক জগতে প্রচার॥
কিন্তু দেখ খাটী ভাবে এ নববিধান।
লইলেক কয়জন হয়ে শ্রদ্ধাবান্॥
ব্রাহ্মদের মাঝে কেহ নিন্দে মোরে সদা।
কেহ প্রতিবাদ করি দেয় প্রাণে ব্যথা॥
কেহবা ব্রহ্মের বাণী ফেলিয়া সুদূরে।
আপনার বুদ্ধি মত চলে এ সংসারে॥
পৃথিবীর ধূলি মলা বিধানের সনে।
মিশাইয়া ম্লান কেহ করিছে বিধানে॥
মম অনুগামী বলে চিহ্নিত যাহারা।
বিধানের অনুগত নহেতো তাহারা॥
বিধানের মূল সত্য করি পরিহার।
মতামত লয়ে তারা ব্যস্ত অনিবার॥
ঈশ্বরের বাণী ত্যজি আমারে লইয়া।
টানাটানি করে তারা আসল ভুলিয়া॥
ঐক্য শান্তি সম্মিলন উদ্দেশ্য যাহার।
অশান্তি অপ্রেম ক্রোধ অনৈক্য দুর্ব্বার॥
নিরন্তর মণ্ডলীরে করিছে দহন।
জ্বলিছে মণ্ডলী মাঝে অপ্রেম আগুন॥
ব্রহ্মবাণী-শ্রবণের যন্ত্র সুমহান্।
ছিল শ্রীদরবার এক সাধিতে কল্যাণ॥
সেই দিব্য দরবার কেহ নাহি মানে।
সবে চলে স্বেচ্ছা মতে আপনার জ্ঞানে॥
মণ্ডলীতে ছিল যত ভাল প্রতিষ্ঠান।
একে একে হইয়াছে সব অন্তর্ধান॥

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সুন্দর।
বড়ই সাধের ধন মোর নিরন্তর॥
উপেক্ষায় সে সমাজ হতেছে শ্মশান।
কত অন্নলোক তাহে করে যোগদান॥
সাধনের তরে মতি দেখিনা তেমন।
প্রচারের তরে নাহি দেখি আকিঞ্চন॥
করিতে দেশের সেবা জীবে প্রেমদান।
আগ্রহ দেখিনা কারো, সবে ম্রিয়মাণ॥
বিষয়ে আসক্তি ঘোর পশেছে সমাজে।
এসেছে বিনাশ পাপ সাজি নানা সাজে॥
প্রকৃত বিশ্বাস-গ্রন্থে বিশ্বাসের তত্ত্ব।
জীবন-বেদেতে মোর প্রাণগত সত্য॥
নবসংহিতার দিব্য আদর্শ সুন্দর।
করেছেন জ্ঞানময় ব্যক্ত সুবিস্তর॥
ব্রহ্মের আদেশে কেহ সার মর্ম্ম তার।
আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেনাক আর॥
বাহ্যভাবে ব্যস্ত নববিধানী সকল।
মূল ছাড়ি শাখা পত্রে আসক্ত কেবল॥
ঈশ্বরের পিতৃ-মাতৃভাব মনোহর।
নরের ভ্রাতৃত্ব প্রেম ঐক্য নিরন্তর॥
এ সব সরল তত্ত্বে কারো দৃষ্টি নাই।
চারিদিকে দেখি সুধু মতের লড়াই॥
চরিত্রে বিশ্বাস ভক্তি হবে সপ্রমাণ।
প্রেমেতে লভিবে জীব স্বর্গরাজ্যে স্থান॥
কিন্তু তার প্রতি যেন কারো দৃষ্টি নাই।
সদা হেরি ভাই ভগ্নী সবে ঠাঁই ঠাঁই॥
মণ্ডলীর হেন দশা করি দরশন।
হয় সদা মম মন বিষাদে মগন॥
প্রেমময় শ্রীহরির চরণে নিয়ত।
করিছে প্রার্থনা আমি কত ভাবে কত॥
কিন্তু আমি কোন দিন হইনা নিরাশ।
ব্রহ্মের কৃপায় মোর অটল বিশ্বাস॥
"আশাচন্দ্র" নাম মোর দিয়াছেন হরি।
"সত্যমেব জয়তে" এই মন্ত্র স্মরি॥
ব্রহ্ম মার পদতলে আমি যে পড়িয়া।
করিবেন বিধি পূর্ণ করুণা করিয়া॥
মানবের বুদ্ধি আর কৌশল নিচয়।
সকলি অসার ভবে জেনেছি নিশ্চয়॥
একমাত্র ব্রহ্ম-কৃপা জীবের সম্বল।
ব্রহ্ম-কৃপা-গুণে হবে বিধান সফল॥
তাই ব্রহ্ম-কৃপা স্মরি কাতর অন্তরে।
প্রার্থনা করি হে যেন পিতার গোচরে॥

মোদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন তিনি।
হইবেক প্রেমে পূর্ণ স্বরগ মেদিনী॥
ওঁ ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং!

শ্রীশশিভূষণ তালুকদার
আশাকুটীর, টাঙ্গাইল।

স্বর্গীয়া শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবী।

[শ্রাদ্ধ বাসরে পঠিত]

আমার স্বর্গীয়া মাতা সাধ্বী মহালক্ষ্মী দেবী, প্রসিদ্ধ ধনী মতিলাল শীলের দেওয়ান শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। ইঁহাদের আদিম নিবাস তেলিনী পাড়া। মাতার ভাই ভগ্নীগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু বিনয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এখনও জীবিত। তাঁদের তেলিনীপাড়ার বাড়ী এখনও আছে। ১২৬৩ সালের ২৬শে পৌষ মাতা মহালক্ষ্মী দেবীর জন্ম হয়।

আমার মা যখন ৯ বৎসরের, তখন তাঁহার বিবাহ হয়। এ বিবাহে আমার মাতামহীর বিশেষ উৎসাহ ও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার মাতামহ আপত্তি করেন, কেননা আমার পিতা পিতৃমাতৃহীন, মাতুলানীর গৃহে পালিত, আর্থিক অবস্থাও কিছু ভাল ছিল না। অবশেষে প্রকৃতির জয় ও পুরুষের পরাজয় হয়। আমার মাতামহী যে সময়-বিবাহ স্থির করিলেন, তখন আমার মাতামহ মতিলাল শীলের কাহালগাঁওস্থ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে ছিলেন। এই সময় এই সংসারে একটী দুর্ঘটনা ঘটে। আমার মাতামহী কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন; আমার মাতা মাতৃহীনা হইলেন। আমার মাতামহ জগবন্ধু বাবুর আর তাঁহার স্ত্রীর সহিত দেখা হইল না। তবে তাঁহার স্ত্রীর মনের যে গভীর বাসনা—যাহাতে আমার পিতার সহিত আমার মাতার বিবাহ হয়, তাহা শীঘ্রই তিনি সম্পন্ন করিলেন। হিন্দু সমাজের প্রথা অনুসারে বিবাহের পর চার বৎসরকাল আমার পিতার সহিত মাতার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।

আমার পূজনীয় পিতা তখন Presidency Collegeএ পড়তেন এবং তৎপরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে Medical Collegeএ ভর্ত্তি হন। এই সময়ে আমার পিতা মাতার জীবনে অগ্নিময় পরীক্ষা আরম্ভ হয়। সে পরীক্ষার সূত্র আমার বাবার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষা। সে সময়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সমসাময়িক ব্রাহ্ম প্রচারকেরা কলিকাতায়, বঙ্গদেশে ও দূরদেশে এই নূতন ধর্ম্ম প্রচার এবং সেই সময়ের হিন্দু সমাজের ও হিন্দু ধর্ম্মের সংশোধনের চেষ্টা করিতে ছিলেন, আমার মা জন্মাবধি হিন্দু পরিবারে ও হিন্দু সমাজে থাকিয়া হিন্দু রীতি, হিন্দু নীতি, হিন্দু ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না। এই সুন্দর ব্রাহ্মধর্ম্মের উপরে সে সময়কার হিন্দুদিগের বড়ই ঘৃণা ছিল, তাঁরা ব্রাহ্মদিগকে কত উপহাস, কত নিন্দা করিতেন। যদি কেহ নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদিগকে কত রকমে নির্য্যাতন করিতেন। বাবা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে আসিয়া পৈতা ফেলিয়া দিলেন, সে জন্য তাঁহাকে সমাজচ্যুত ও গৃহচ্যুত হইতে হইল। মা তখন মেহেরপুরে আমাদের বাড়ীতে কয়েদীর মত বন্দী অবস্থায় অসহনীয় নির্য্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন। তিনি বড়লোকের মেয়ে, পিতার আদরের সন্তান, অনেক আদর যত্ন চিরদিনই পাইয়া আসিয়াছিলেন, কষ্ট, অভাব নির্য্যাতন কি তাহা জানেন নাই। মেহেরপুরের শ্বশুরালয়ের ও পিত্রালয়ের সকলে মার উপরে বড়ই বিরক্ত হইলেন। অবস্থা এইরূপ হইল যে, মা যেন কারাগারে। আর আমার বাবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ অবধি বন্ধ হইল। কিন্তু এই সকল অবস্থার মধ্যে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম কি তাহা পূর্ণ মাত্রায় না জানিয়াও, বাবার কাছে এই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য, গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য কি, তাহার আভাস পাইলেন।

এই কঠিন অবস্থার মধ্যে, এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে, তাঁর একটি মাত্র আলোকের ভরসা ছিল; সেটী বাবাকে পত্র লেখা ও তাঁহার পত্রোত্তর পাওয়া। মেহেরপুরের বাটীতে মাকে একেবারে একঘরে করা হইয়াছিল, কিন্তু মার সরল পরসেবা-পূর্ণ প্রকৃতি, আত্মত্যাগ ও পরদুঃখ-কাতরতায় তিনি কয়েকটি আত্মীয়ের ভালবাসা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। বাবা যখন Medical Collegeএর Junior পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন মেহেরপুরে মাঝে মাঝে যাইতেন। বাবার জীবনের একটী ব্রত ছিল, সেটী পরসেবা-ব্রত এবং এই সেবা তিনি যত জনকে পারেন করিতেন। সেই সময়ে মেহেরপুরে ভাল চিকিৎসক ছিল না। বাবা যখনই যেতেন, তখন চিকিৎসা দ্বারা ও সেবা দ্বারা মেহেরপুরের লোকের অনেক উপকার করিতেন; এই জন্য মেহেরপুরের লোকেরা একটু বাবার উপর সদয় হন ও বিদ্বেষ ভাব অনেক কমে যায়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাবা যখন Medical Collegeএর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাহার পূর্ব্বেই আমার জন্ম হয়। আমার মা আমার জন্মের সময়ের অবস্থা বিবরণ করিতে বড়ই ভালবাসতেন। মাকে একটি ছোট কুঁড়ে ঘর দেওয়া হয়, সেই ঘরে আগষ্ট মাসে জন্ম হয়। তখন ভরা বর্ষা, সে ঘরে খুব জল পড়ে। মা সমাজচ্যুত, কাহারও সহানুভূতি পান নাই। মা বলিতেন, সে কয়েক মাস কত অভাব, নির্য্যাতন, উৎকণ্ঠা ও ভয়ে কাটাইয়াছেন; এই সকলের মধ্যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে ও মঙ্গলময়ের উপরে বিশ্বাসে ও দিবারাত্রি প্রার্থনা করিয়া আশ্বাস ও উৎসাহ পাইতেন। মার কাছে শুনিতে পাই যে, আমার জন্মের পরে আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য পরিবারবর্গের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। সেই জলপ্লাবিত কুঁড়ে ঘরে আমাদের দুজনকে দেখিয়া তাঁহাদের মনে অনুকম্পা হয়, তাঁহারা আসিয়া পুরাতন বস্ত্র দান করিতেন এবং শৌচের কয়দিনের পরেই মাকে ও আমাকে বাহিরে আনিয়া ভাল ঘরে রাখিলেন। মার কথায় বুঝি যে, আমার জন্মের পরে তাঁহার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে, আর ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের শিক্ষায় বিশ্বাস অটল হইল,

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে যে গভীর আধ্যাত্মিকতা আছে, তাহা বুঝিলেন।

এই সময়ে বাবা ভাগলপুরে Practice করিতে যান এবং আমি যখন ১ বৎসরের, আমাকে ও মাকে লইয়া জ্যাঠা মহাশয় ভাগলপুরে আসেন। ভাগলপুরে আসা আমাদের সকলের জীবনের একটি সৌভাগ্যের মূল। সেখানে কয়েকজন ধার্ম্মিক ব্রাহ্ম মিলিয়া একটি ব্রাহ্মপল্লী সংগঠন করেন। এবং এখানেই আমরা সকলে ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকটতম সংস্পর্শে আসি। ভাগলপুরের ব্রাহ্ম-মণ্ডলী একান্ত সহৃদয়তা, আদর ও যত্নে আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। সেই মণ্ডলীর নেতা এবং অগ্রণী শ্রদ্ধাস্পদ নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের মিষ্ট সম্বন্ধ চিরদিন অক্ষুন্ন আছে। আমাদের বাড়ীর (অর্দ্ধবাংলার) উপাসনার গৃহে প্রত্যহ প্রাতে শ্রদ্ধাস্পদ ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয়ের উপাসনার সকলে যোগ দিতেন। এই সময় হইতে আমাদের পারিবারিক উপাসনার অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। এইখানে আমার অনুজ অকিঞ্চন কুমার, প্রশান্ত কুমার ও ভগ্নী হাসিনার জন্ম হয়। অন্যূন ১ বৎসরের মধ্যেই প্রশান্ত কুমারের মৃত্যু হয়। পুত্রশোকে মার পরলোকে বিশ্বাস আরও নিগূঢ় হয়। এই সময়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্র অন্যান্য প্রচারকদিগের সহিত প্রচারার্থ একবার ভাগলপুরে আসেন। ইহাদের সমাগমে ভাগলপুরের ব্রাহ্মগণের ও জনসাধারণের বড়ই উপকার হয়। আমি তখন খুবই ছোট। কিন্তু সে সময়ে যে সকল শিক্ষা ও ভাব দেখিয়াছিলাম ও কিঞ্চিৎ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা এখনও আমার জীবন-চিত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমার পিতা মাতা উভয়েই এই সময়ে বৈরাগ্য-জীবন ধারণ করেন। সে সকলও আমার স্মরণে আছে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বাবা আহূত হইয়া বাঁকিপুরে যান এবং বাঁকিপুরে ডাক্তারী প্র্যাকটিস্ করিবেন মনস্থ করিয়া সেখানে থাকিয়া যান। ইহার অল্পদিন পরেই আমাদের ভাগলপুরের বাড়ীতে চুরি হয়, ইহাতে মা যথাসর্ব্বস্ব হারান এবং তৎপরে আমরা সকলে বাঁকিপুরে আসি। বাঁকিপুরে আসিয়াই বাবার একটি ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রীযুক্ত কেদার নাথ রায়ের বাড়ীতে উঠি। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী আমাদের বড়ই যত্ন করেন। ইহার অল্পদিন পরেই আমরা সাধু প্রকাশ চন্দ্র রায় (মামাবাবু) ও সাধ্বী অঘোর কামিনী দেবীর (মামীমার) সহিত পরিচয় হয়। তাঁহাদের নিঃস্বার্থ, সরল, বিশ্বাসী জীবনে আমরা বড়ই আকৃষ্ট ও উপকৃত হই। কতদিন আমরা তাঁহাদের ও তাঁহাদের সন্তান সন্ততিদের সঙ্গে এক পরিবারের মতন থাকি। প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক সঙ্গে ব্রহ্ম-উপাসনা হইত। এই সময়ে আমাদের শারীরিক, মানসিক ও চরিত্রের আরম্ভ ও উন্নতি। ভগবৎ-কৃপায় এই সময়ে আমাদের জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রহ্মচরিত্র ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির জন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আবির্ভাব হয়। মা তাঁহাকে ধর্ম্মপিতা ও তাঁহার পত্নীকে ধর্ম্মমাতা বলিয়া গ্রহণ করেন। ইঁহাদের আমরা দাদামহাশয় ও দিদিমা বলিয়া জানি। দাদামহাশয় ও দিদিমা প্রায়ই বাঁকিপুরে আসিতেন। কখনও বা তাঁহার প্রিয় ব্রাহ্ম যুবক বন্ধুগণকে লইয়া আসিতেন। শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র নাথ সেন, প্রমথ লাল সেন, মোহিত লাল সেন, হীরানন্দ আদভানী সঙ্গে আসিতেন। এই সকলের মিলনে এক একবার মহোৎসব হইত। ইঁহাদের মধ্যে এখন একজন ছাড়া সকলেই স্বর্গত। একে একে কেবল আমরা নয়, ব্রাহ্মসমাজও তাঁহাদের হারাইলেন। আমার মা এই ধার্ম্মিক ব্রাহ্ম মহাত্মাদের কিরূপ শ্রদ্ধাভক্তিতে সেবা করিতেন ও আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা সেবা করিতে শিখাইতেন, তাহা আমাদের মনে উজ্জ্বল রহিয়াছে। ইহাই আমাদের জীবনের পত্তন। সে কি আনন্দের স্বর্গের মিলন। ইতিমধ্যে আমার দ্বিতীয়া ভগ্নী শ্রীমতী সুজাতা দেবীর জন্ম হয়। আমরা তখন দুই ভাই ও দুই ভগ্নী। দাদা-মহাশয় একবার বাঁকিপুরে আসিয়া আমাদের চারিজনকে একসঙ্গে দীক্ষিত করেন। সে দীক্ষায় যা উপদেশ দেন, তাহা আমার এখনও স্মরণে রহিয়াছে। বাঁকিপুরে থাকিতে আমাদের মা অনেক সৎকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। প্রথমে মামীমার নেতৃত্বে অঘোর-নারী-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। আমার মামীমা ও মা বড়ই ত্যাগী ছিলেন। নিজেদের সুখ স্বচ্ছন্দের কথা ভাবিতেন না। কাহারও কষ্ট দেখিলে, কি চক্ষে জল দেখিলে তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। পরসেবা তাঁহাদের ব্রত ছিল। এই অঘোর-নারী-সমিতি হইতে কত সেবা যে হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করা অসম্ভব। যখন আমার মামীমা স্বর্গস্থ হন, আমরা বড়ই শোকগ্রস্ত হই। তাঁহাদের যে মিলিত সৎকার্য্য ছিল, তাহা মা রাখিতে ও চালাইতে বিশেষ সচেষ্ট হন।

ভগ্নী হাসিনা দেবী অনেকদিন হইতে একটি কঠিন রোগে ভুগিতে থাকেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ সেন মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার বিবাহিত জীবন বড়ই সংক্ষেপ, অল্পদিন পরেই তিনি স্বর্গলাভ করেন। এটা আমাদের পরিবারের ঘোর দুর্ঘটনা। শোকে আমরা অবসন্ন হই, কিন্তু মা ও বাবার চরিত্রের দৃষ্টান্তে এবং এই ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে আমরা সান্ত্বনা পাই। হাসিনা দেবীর স্বর্গারোহণের কিছুদিন পরেই আমার শিক্ষার্থে বিলাত যাওয়ার কথা হয়। যাবার সময় মা আমায় এই কয়েকটী উপদেশ দেন—সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা করিবে, থিয়েটারে যাইবেনা, সুরা পান করিবেনা। আমি ফিরিয়া আসিয়া মাকে বলিয়াছিলাম, তাঁর আজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়াছি। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর আমি আরায় চাকুরী পাই। আমার বিবাহের পরে আমার স্ত্রী আশালতাকে লইয়া যখন আরায় যাই, আমার মা, বাবা ও মামাবাবু সেখানে আমাদের বাড়ীতে আসেন। সেখানে মা আমাদের এই কথা বলেন, বিবাহের মিলন মানে ধর্ম্মমিলন। তোমাদের বাবা আমার ধর্ম্মপতি, আমি তাঁহার ধর্ম্মপত্নী। তোমরাও ধর্ম্মপতি ও ধর্ম্মপত্নী হও। তোমাদের মিলন কেবল সংসারের মিলন নয়, আত্মার মিলন। প্রাতে

উপাসনার সময়ে মামাবাবু বলেন, এই তো স্বর্গ দেখিলাম। এ ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গ। এই সকল কথায় বোঝা যায়, ইঁহাদের চরিত্রে কত গভীর আধ্যাত্মিকতা ছিল।

কয়েক বৎসর হইতে মার শারীরিক অবস্থা ভাল থাকে নাই। কিন্তু তথাপি দুর্ব্বলতার জন্য কম্পিত হস্তে তিনি আমাকে প্রায়ই চিঠি লিখিতেন। এই সকল চিঠিতে কত গভীর ভাব। মার লেখাপড়া বেশী হয় নাই। যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন, সবই বাবার কাছে, ধর্ম্মবন্ধুদিগের কাছে, আর ধর্ম্ম-পুস্তকে। লেখাপড়া না শিখিয়া এত গভীর জ্ঞানী কি করিয়া হইয়াছিলেন, ভাবিয়া অবাক হই।

আমার কত কঠিন দুঃসময়ে তাঁর পরামর্শে কত আলোক পাইয়াছি। আমাদের ও পরের সেবার জন্য তিনি বড়ই কাতর হইতেন, নিজেকে ভুলিয়া যাইতেন। অসহ্য রোগ-যন্ত্রণায় তিনি মঙ্গলময়ের মঙ্গল অভিপ্রায়ে বিশ্বাস করিতে কখনও বিচলিত হন নাই। এই শেষ অসুখের সময়ে যখন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন, একদিন হঠাৎ আমায় বলিলেন, শুনিলাম, নাকি কে একটী ইংরেজ মহিলা হিন্দু মহিলাদের বিষয়ে অন্যায় ও অযথা কথা বলিয়াছে। সে আর আশ্চর্য্য কি? ইংরেজ মহিলা হিন্দু মহিলাদের চরিত্রের গাম্ভীর্য্য, আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, সেবা কি বোঝে? তাহাদিগের বোঝা অসম্ভব।

আমাদের মা আজ সংসার-মুক্ত, রোগ-যন্ত্রণা-মুক্ত হইয়া অমর জীবন লাভ করিয়াছেন। আজ আমরা মা হারা, আমাদের মনে গভীর অভাব, অন্তরে শোক। আমরা আগে আরও কত স্বজন প্রিয়জনদের হারাইয়াছি, মার সরল পবিত্র নির্ম্মল আত্মা সেই আত্মাদের সঙ্গে কত আশ্চর্য্য অজানিত সুখে মিলিত। জীবনতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব কি, তাহা আমরা জানিনা; কিন্তু মার শিক্ষায়, ধর্ম্মগুরুদিগের শিক্ষায়, আত্মীয়গণের শিক্ষায় আধ্যাত্মিক জীবনের যাহা কিছু উপলব্ধি হইয়াছে, তাহাতে এইটুকু বুঝি যে, স্বর্গ দূরে নয়, আর স্বর্গস্থ যাঁরা, তাঁরাও নিকটে। এই বিশ্বাসেই আমাদের সান্ত্বনা।

শ্রীকরুণা কুমার চট্টোপাধ্যায়।

নববিধানের প্রেরিত ভাই অমৃতলাল বসু।

(অমরাগড়ীর মণ্ডলীর সহিত যোগ)

বিগত ১৩৩৪ সালের ১লা ও ১৬ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপরে কিছু লিখিতেছি।

ভগবৎ-কৃপায় ও ভক্তের প্রার্থনার ফল স্বরূপ অমরাগড়ীর মণ্ডলীর উপাচার্য্য দীনভক্ত ফকির দাস রায়ের জীবনে দিন দিন বিশ্বাস, অকিঞ্চনা ভক্তি ও ভগবৎ-প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। যথাসময়ে স্থানীয় মণ্ডলীর আচার্য্য পদে ভক্ত ফকির দাস অভিষিক্ত হইলেন। ভক্ত অমৃত লাল বসু মহাশয় দীন ভক্ত ফকিরদাস ও তাঁর দলকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। ফকির ও ফকিরের সঙ্গী এই অযোগ্য ভৃত্যদিগের কোনরূপ কষ্ট অভাবের বিষয় তিনি জানিতে পারিলে স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া অর্থ প্রেরণ করিতেন। ভক্ত অমৃত লাল বসু মহাশয়ের দ্বারায় অনুরুদ্ধ হইয়া গাজীপুরের সাধক নিত্যগোপাল রায়, আরার ডাক্তার মৃত্যু গোপাল মিত্র, মোকামার বন্ধু অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল, দানাপুরের খেলাত চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক সময় সাহায্য প্রেরণ করিতেন। এইরূপে পরীক্ষা, অভাব ও দারিদ্র্যে অমরাগড়ীর দরিদ্র মণ্ডলী ভক্ত-প্রবরের আর্থিক ও আধ্যাত্মিক কতই সাহায্য পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। সুদূর হায়দ্রাবাদ, করাচি, বাঙ্গালোর, মাঙ্গালোরের বন্ধুরাও ভক্তের অনুরোধে এই মণ্ডলীকে সাহায্য করিতেন।

এই দরিদ্র মণ্ডলীকে তিনি অনেক স্থলেই পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। মঙ্গলগঞ্জের স্বর্গীয় লক্ষ্মণ চন্দ্র আশ ও খাঁটুরার স্বর্গীয় কেশব মোহন দত্ত প্রভৃতি ভ্রাতার ও প্রেমাস্পদ বন্ধুগণ সহ পরিচয় ও আত্মীয়তার মূলে ভক্ত অমৃত লালের স্নেহহস্ত বিদ্যমান।

অমরাগড়ীর মণ্ডলীকে ভক্ত অমৃতলাল প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন এবং তাঁর সহযাত্রী সরল ভক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সেই ভক্তের আকর্ষণেই অমরাগড়ীর প্রতি অনুরক্ত ও আকৃষ্ট।

হরি-প্রেমানুরাগী প্রমত্ত সিংহের ন্যায় ভক্ত অমৃত লাল, যখন ফকির দাসের গলা ধরিয়া সংকীর্ত্তনে মাতিতেন, তখনকার শোভা যাঁরা দেখিয়াছেন, তাঁরা যে ধরায় স্বর্গ দর্শন করিয়াছেন। সত্যই শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম হইতে উত্তর ভক্তের হৃদয় ভেদ করিয়া গঙ্গা যমুনার ধারার ন্যায় প্রেমভক্তির ধারা উত্তপ্ত পশ্চিমবঙ্গকে অভিষিক্ত এবং অমরাগড়ীর ক্ষুদ্র মণ্ডলীকে ভক্তিতে প্লাবিত করিয়াছিল। অমরাগড়ীর মণ্ডলীকে উৎসাহিত করিবার জন্য ভক্ত মাঝে মাঝে কতই উপদেশ দিতেন ও পত্র লিখিতেন। এস্থলে তাঁহার একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ধুনদিয়া (আরা)
১১।২।১৮৯৮

বাপ অখিলচন্দ্র।

তোমার পত্র কাল পাইয়াছি। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, ভক্তিদানে তোমাদিগকে তাঁর নবধর্ম্মবিধান-প্রচারে অনুরাগী, উপযুক্ত ও উৎসাহী করিয়া, ও প্রদেশের লোকদিগকে বিধানে আশ্রয় দান করুন। সরল ভাবে, সত্যভাবে এবং দীন ভাবে নিজেরা মাতিয়া, তাঁর পুত্রকন্যাদিগকে মাতাও। দোকানদারি করিওনা। পরের তরে যেন প্রাণ কাঁদে। ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং। এস্থান সাধন ভজন ভোজন, ভ্রমণের বেশ অনুকূল। বেশ চলিয়া

যাইতেছে। সকলেই সম্ভব একত্র হইয়াছ, আমার ভালবাসা বলিও। মঙ্গল হউক।

শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীঅমৃত লাল বসু।

পরিশেষে নববিধান-জননীর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি কৃপা করিয়া, তাঁর প্রমত্ত ভক্তের ভক্তি দিয়া, মণ্ডলীর বর্ত্তমান শুষ্কতা দূর করুন।

ভক্তপদাবনত —

শ্রীঅখিল চন্দ্র রায়।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

(প্রাপ্ত)

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দন। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥" গীতামাহাত্ম্য—৩।

যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীব্রহ্মানন্দের ন্যায় সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের নেতা। তিনিও সাড়ে চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সমন্বয়ের মহাগ্রন্থ "গীতা" মহাবীর অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন। উপরি লিখিত শ্লোকই তাহার প্রমাণ। সমস্ত উপনিষদ বেদান্ত গ্রন্থ সকল মন্থন করিয়া সর্ব্বধর্ম্মের সার গীতারূপ অমৃত জগৎকে দান করিয়া ছিলেন। উপনিষদ সকল গবী স্বরূপ, গোপাল-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাহার দোহন-কর্ত্তা, অর্জ্জুন বা পার্থ গোবৎস-স্বরূপ, এবং ভক্তগণ তাহার রসগ্রাহী, গীতা স্বয়ং দুগ্ধরূপ অমৃত। মহাভক্ত অর্জ্জুন প্রথম জিজ্ঞাসু হইয়া গোবৎসের ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন। জগৎ তাঁহার নিকট চির ঋণী।

গীতা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা—

১। বিষাদ যোগ। ২। সাংখ্য-যোগ। ৩। কর্ম্মযোগ। ৪। জ্ঞানযোগ। ৫। কর্ম্মসংন্যাসযোগ। ৬। অভ্যাসযোগ। ৭। বিজ্ঞানযোগ। ৮। অক্ষরপরব্রহ্মযোগ। ৯। রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ। ১০। বিভূতিযোগ। ১১। বিশ্বরূপদর্শন-যোগ। ১২। ভক্তিযোগ। ১৩। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-যোগ। ১৪। গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ। ১৫। পুরুষোত্তম-যোগ। ১৬। দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগ-যোগ। ১৭। শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ। ১৮। মোক্ষ-বা-সন্ন্যাস-যোগ।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, পুণ্য, বৈরাগ্য সকল একত্রে গ্রথিত করিয়া সকল ধর্ম্মের সহিত সম্মিলন রক্ষা করতঃ এই মহাযোগ শিক্ষা দিয়াছেন।

গীতার উৎপত্তি অর্জ্জুনের বিষাদ লইয়া। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে ভারতের সকল বীরগণ আত্মীয় স্বজন সহ একত্রিত হইয়াছেন। সকলেই পরস্পরকে ধ্বংস করিতে উদ্যত। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া, অর্জ্জুন বিষণ্ণ ও মোহযুক্ত হইয়া, যুদ্ধ ত্যাগ করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। তিনি বৈরাগ্য বশতঃ ক্ষণভঙ্গুর সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মহারথি একমাত্র অর্জ্জুনকে এই মোহযুক্ত বৈরাগ্য হইতে ফিরাইবার জন্য এই কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি ও বৈরাগ্যের সম্মিলন রূপ মহাগীতা ব্যাখ্যা করিলেন। অর্জ্জুন জ্ঞান লাভ করিলেন এবং নির্লিপ্তভাবে সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরের কর্ম্ম জানিয়া ও ঈশ্বরই একমাত্র সকল কর্ম্মের কর্ত্তা স্বরূপ এই জ্ঞান লাভ করিয়া, ধর্ম্ম-যুদ্ধে নিযুক্ত হইলেন। শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও এ যুগে আমাদিগকে নির্লিপ্ত বৈরাগী, ভক্তি-ও-জ্ঞানযুক্ত সংসারী করিবার জন্য, নিজ জীবনে সাধন করিয়া, নিজ জীবন রূপ জীবনবেদ জগৎকে দান করিলেন।

বেদ বেদাঙ্গ উপনিষদ পাঠ করিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করা জীবের দুঃসাধ্য। কঠিন ব্যাকরণ-যুক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করা সাধারণ জীবের পক্ষে কঠিন। তজ্জন্য পরমপিতা পরমেশ্বর শ্রীবুদ্ধ, ঈশা, মুষা, মহম্মদ, চৈতন্যের পরে সমন্বয়াচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে সাধারণ জীবের মত করিয়া, সাধারণ ভাষায় এই দুর্ব্বোধ্য নববিধান-তত্ত্ব ব্যক্ত করিবার জন্য পাঠাইলেন। এমন সরল বঙ্গীয় ও ইংরাজী ভাষায় ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাধন-পদ্ধতি, জীবনে ঈশ্বর দর্শন ও শ্রবণ এবং সংসারে তপোবন সাধন জগতে বিরল। ইহাই "নব-বিধান" নামে জগতে বিদিত। একদিন আসিবে, যখন সকলেই এই নববিধান রূপ প্রেমের মহাধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। জগৎ এক্ষণে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টিত হইতেছে। পৃথিবীর এই মিলন আন্দোলন "নববিধানের" আন্দোলন বলিয়া স্বীকার করা উচিত। নববিধানের প্রত্যেক বিশ্বাসী ইহার জন্য ঈশ্বরের নিকট আশীর্ব্বাদ ও জগতের নিকট ধন্যবাদ লাভ করিবেন।

সেবক—সত্যানন্দ।

বাসুদেব সার্ব্বভৌমোদ্ধার।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

সার্ব্বভৌম অতীব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে?" গৌর বলিতে লাগিলেন, "বেদান্তের উদ্দেশ্য ব্রহ্ম নিরূপণ করা। সেই ব্রহ্ম অতি বৃহদ্বস্তু। তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জীবের জ্ঞানাতীত। তবে সৃষ্টিরাজ্যে তিনি যত টুকু আপনাকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা তাঁহার কৃপায় তাহারই অত্যল্প মাত্র বুঝিতে পারি। কিন্তু যে অনন্ত শক্তি শুদ্ধ মুক্ত অনাবৃত অবস্থায় সৃষ্ট্যাতীত হইয়া আছে, তাহার নাম নির্ব্বিশেষ বা নিরাকার ব্রহ্ম। তাহার আমরা কি বুঝি?" সার্ব্বভৌম বাধা দিয়া বলিলেন, "সৃষ্টি তো মিথ্যা; অবিদ্যা-বা-মায়া-বিজৃম্ভিত। মায়া ছুটিয়া গেলে জীব ও ব্রহ্ম একই। তিনি ভিন্ন কি জগতে আর কিছু আছে?"

গৌর। তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই সত্য; কিন্তু তাঁহারই ইচ্ছায় এই সৃষ্টি-লীলা; এই হৃদয়নিহিত আত্মজ্ঞান। কে বলিল, সৃষ্টি মিথ্যা বা কল্পিত-জ্ঞান-মূলক? সৃষ্টি কল্পনা নহে, তবে নশ্বর মাত্র।

সার্ব্বভৌম। তিনি ভিন্ন যদি জগতে আর কিছু নাই, তবে বল দেখি, সৃষ্টিজ্ঞান কল্পিত হয় কি না?

গৌর। কা'র কল্পনা? সকল কল্পনার অতীত যিনি, তাঁহাকে কি মিথ্যা-জ্ঞানের আকর-ভূমি বলিবেন?

সার্ব্বভৌম। কখনই নয়।

গৌর। তাহা যদি না হয়, তবে একটু চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি, এই কল্পনা-জ্ঞান যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, সে ব্রহ্মের সহিত এক হইয়াও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি না? আমরা তাহাকেই জীব বলি। এবং এই জীব সৃষ্টি-রাজ্যে ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ।

সার্ব্বভৌম বিচক্ষণ পণ্ডিত। গৌরের এই সুযুক্তি-পূর্ণ কথায় জীবতত্ত্ব যে ঈশ্বর-তত্ত্বের সহিত অভিন্ন হইয়াও ভিন্নাত্মক, তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই না হয় হইল; কিন্তু তাহাতেও তো প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। তুমি যাহাকে সৃষ্টি-লীলা বলিতেছ, কে বলিল তাহা সত্য?"

গৌর। আত্মজ্ঞানই তাহার সাক্ষী। নানা বৈচিত্র্য-পূর্ণ এই ব্রহ্মলীলা আত্মতত্ত্বেই নিহিত। ব্রহ্ম আপনিই লীলারূপে বাহিরে, আত্মারূপে অন্তরে এবং ব্রহ্মরূপে সকলের মূলে। একের মধ্যে কি সুন্দর বৈচিত্র্যময় দ্বৈতভাব ও দ্বৈতের মধ্যে কি অনির্ব্বচনীয় সামঞ্জস্যীভূত একত্ব! বলুন দেখি, ইহাতে কা'র না প্রাণ মন গলিয়া যায়? এ হেন ঐশ্বর্য্যময়, পরিপূর্ণ ভগবান্‌কে আপনি কোন্ সাহসে শুষ্ক নিরাকার নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বলিতে চান্?'

সার্ব্বভৌম গৌরের ব্যাখ্যাতে মুগ্ধ হইলেন; কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "তবে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য নির্ব্বিশেষ-বাদ কেন শিক্ষা দিলেন?" ক্রমশঃ

["চৈতন্যলীলামৃত" হইতে উদ্ধৃত]

—•—

নববিধান সাধন-ব্যায়াম।

শরীরের পক্ষে ব্যায়াম যেমন, আত্মার পক্ষে সাধন তেমন। কিন্তু নববিধানে শরীরের ব্যায়াম এবং আত্মার সাধন যুগপৎ করিতে হয়। প্রাতঃস্মরণ-মননের সঙ্গে শারীরিক ব্যায়াম সাধনের একটি প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি। সম-সাধকগণ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুখী হইব।

প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলেই অন্য চিন্তা না করিয়া, যেমন আচার্য্যের শেষ শয্যাপার্শ্বে ব্রহ্মস্তোত্র উচ্চারণ করা হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার আত্মার সহযোগে প্রতিদিনই আমি করিয়া থাকি।

তাহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রযোগে সংক্ষিপ্ত উপাসনা করি।

করি প্রাতঃ উত্থান, এস প্রাণ প্রিয়জন,
ব্রহ্মানন্দ সনে পূজি জননী-চরণ;
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং
যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।

তুমি সত্য, তুমি জ্ঞান, অনন্ত ভূমা মহান্,
প্রেমময় অদ্বৈত শুদ্ধ আনন্দ ঘন;
ধ্যানে একাধারে ধরি, সপ্ত স্বরূপ হৃদে হেরি,
যোগানন্দে ব্রহ্মানন্দে হই তাঁয় মগন।

অসত্য হতে সত্যেতে, অন্ধকার হতে জ্যোতিতে,
মৃত্যু হতে অমৃতেতে লয়ে যাও মোদের এখন;
তুমি হে সত্য-স্বরূপ, প্রকাশ নিকটে ওরূপ,
দয়াময় অপার করুণায় রক্ষ মোদের অনুক্ষণ।

আচার্য্য সনে প্রার্থনা, "মা, দিয়ে বিশ্বাস ষোল আনা,
মা বিধান আদেশ ভক্তে হই স্বর্গের উপযুক্ত যেন;
বাঁচালে যদি এ প্রাণ, বাঁচাও হয়ে প্রাণের প্রাণ,
করে ব্রহ্মানন্দ জীবন পবিত্রাত্মায় পরিচালন।"

তারপর করযোড়ে বিনীত ভাবে নিম্ন মন্ত্র উচ্চারণ করি:—

"হয়ে দীন অকিঞ্চন, নমি মা ও শ্রীচরণ,
করি শব শিবসম নাচ হৃদে অবিরাম।"

এই বলিয়া, ঠিক শবের ন্যায় চিৎ হইয়া হৃদয়ে জীবনী-শক্তিরূপে আদ্যাশক্তি নৃত্য করিতেছেন এবং আমি মৃত শব, ইহা অনুধ্যান করি। আমি কিছুই নই, তুমিই আমার জীবনী-শক্তি, ইহাই উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি।

তৎপরে "দাও শাক্যের নির্ব্বাণ"

এই বলিয়া, ঠিক শাক্য সিংহ যেমন যোগাসনে অধিষ্ঠিত, সেই ভাবে উঠিয়া বসিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনকে একেবারে চিন্তাশূন্য করিয়া, কয়েক মিনিট নির্ব্বাণ সাধন করিতে চেষ্টা করি।

তাহার পর "ঈশার ক্রুশে আত্মদান"

এই বলিয়া, ঈশার ন্যায় দুই বাহু প্রসারিত করিয়া, ঈশা যেমন আপনাকে সংসারের সর্ব্ব প্রকার পরীক্ষা বহনে 'তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক' বলিয়া আত্মদান করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আত্মদান-শক্তি প্রার্থনা করি এবং আত্ম-ইচ্ছা-বলিদান ও তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, ইহা সাধন করিতে চেষ্টা করি।

পরে "মহম্মদের সয়তান বর্জ্জন"

এই কথা উচ্চারণ করিয়া, মোহম্মদের ন্যায় দক্ষিণে বামে মস্তক ফিরাইয়া দুশ্চিন্তা দূরীকরণ ও দক্ষিণে বামে এক অদ্বৈত ব্রহ্ম ঘিরিয়া আছেন, উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি।

তারপর "গৌরাঙ্গের নৃত্য কীর্ত্তন"

এই বলিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে হস্তোলন পূর্ব্বক নামানন্দ সাধনে আকাঙ্ক্ষিত হই।

তাহারপর "ব্রহ্মানন্দে করি লীন,
করাও প্রত্যক্ষ দর্শন শ্রবণ ;
লভি যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান,
হই নববিধান-মূর্ত্তিমান।"

এই বলিয়া, ব্রহ্মানন্দের ন্যায় করযোড়ে প্রার্থনার ভাবে ব'সয়া, চক্ষু খুলিয়া সর্ব্বময় ও সম্মুখে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বর্ত্তমান, ইহা দর্শন ও তাঁর বাণী "আমি আছি" শ্রবণ পূর্ব্বক, দিবসের বিশেষ কর্ত্তব্য বিষয়ে তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি ; এবং যাহাতে যোগভক্তি-কর্ম্ম-জ্ঞান-সমন্বিত নববিধান-মূর্ত্তিমান জীবন লাভ হয়, প্রার্থনা-পূর্ব্বক প্রণাম করি ও "শান্তি শান্তি শান্তি" বলিয়া শান্তিবাচন উচ্চারণ করিয়া শয্যাত্যাগ করি।

এইরূপ সাধনে উভয়, শরীরের ব্যায়াম এবং মনের ও আত্মার বল সাধন, বিলক্ষণ হইবার সম্ভাবনা।

উপকৃত।

—•—

কুচবিহার নববিধান সমাজ।

দ্বাচত্বারিংশ মহোৎসব।

অত্র ব্রহ্মমন্দিরে, গত ৪ঠা বৈশাখ, ১৭ই এপ্রিল, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময়, আরাত্রিকযোগে উৎসবারম্ভ হয়। "মা আনন্দময়ীর শ্রীমন্দিরে, চল ভাই যাই সকলে" এই সঙ্গীতটী গাইতে গাইতে মন্দিরে প্রবেশ করা হয়। তদনন্তর বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া "জয় মাতঃ জয় মাতঃ" আরতির এই সংকীর্ত্তনটী গাহিয়া দীপযোগে আরতি করা হয়। তৎপর দীপহস্তে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক আচার্য্য-কৃত মাঘোৎসবের আরতির প্রার্থনাটী অতি গম্ভীর ভাবে করেন। পরে আর একটী কীর্ত্তন হইলে অদ্যকার কার্য্য সম্পন্ন হয়।

৫ই বৈশাখ, ১৮ই এপ্রিল, বুধবার, সমস্তদিনব্যাপী উৎসব ব্রহ্মমন্দিরে হয়। প্রাতে ৮ ঘটিকায় সঙ্গীত, ৮॥০ ঘটিকায় উপাসনা হয়, উপাসনা শ্রদ্ধেয় মল্লিক মহাশয় ভক্তিভাবে করেন। উপাসনান্তে মধ্যাহ্নে প্রচারাশ্রমে প্রীতি-ভোজন হয়। অপরাহ্ণ ৩ টায় পাঠ ও আলোচনা হয়। শ্রীমদাচার্য্য-কৃত "মাঘোৎসব" হইতে "মহাজনগণ" নামে উপদেশ পাঠ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়। ৬টায়, কলিকাতা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের সুগায়ক শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যা ৭টায় আবার উপাসনা আরম্ভ হয়। উপাসনার প্রথমাংশের পর শ্রীমান্ মৃত্যুঞ্জয় দাস ও শ্রীমান্ মণিময় গুপ্ত নবসংহিতার পদ্ধতি অনুসারে দীক্ষিত হয়। সমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় দীক্ষার্থীদিগকে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের নিকট উপস্থিত করেন। উভয়ে নবসংহিতা হইতে দীক্ষার প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া নববিধান-মণ্ডলীভুক্ত হয়। শ্রীমান্ মণিময়কে শ্রীযুক্ত অবনী মোহন গুহ ও শ্রীমান্ মৃত্যুঞ্জয়কে স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র আইচ এক একখানা নবসংহিতা ও বসিয়া উপাসনা করিবার জন্য কার্পেটের একখানা আসন আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ দিয়া আলিঙ্গন দান করিলেন। শ্রদ্ধেয় মল্লিক মহাশয় দুই জনকে নববিধানাঙ্কিত দুইটী নিশান দিয়', বিশেষভাবে দীক্ষা-গ্রহণের দায়িত্ব বিষয়ে উপদেশ দান করেন। অনুষ্ঠানটী অতি গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হয়।

৬ই বৈশাখ, ১৯শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, প্রাতে ১০টায় প্রচারাশ্রমে উপাসনা হয়। উপাসনার প্রথমাংশের পর শ্রীমান্ উষা কুমার দাস নবসংহিতানুসারে দীক্ষিত হইয়া নববিধান-মণ্ডলীভুক্ত হয়। শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় দীক্ষার্থীকে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয় নাথ মল্লিকের নিকট উপস্থিত করিয়া ছিলেন। শ্রীমান্ উষা কুমার নবসংহিতা হইতে দীক্ষার প্রতিজ্ঞা পাঠ করিলে, মল্লিক মহাশয় নববিধানের নিশান-বহনের দায়িত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিয়া, একটী নিশান দিলেন এবং স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র আইচ একখানা নবসংহিতা ও বসিয়া উপাসনা করিবার জন্য একখানা কার্পেটের আসন দিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে "স্বরাজ" সম্বন্ধে মল্লিক মহাশয় "সত্যং জ্ঞানং" মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক উপদেশ দান করেন। 'স্ব'র স্ব যিনি, তাঁকে লাভ করিলেই যথার্থ স্বরাজ লাভ হয়।

৭ই বৈশাখ, ২০শে এপ্রেল, শুক্রবার, প্রাতে ৮টায় কেশবাশ্রমে উপাসনা হয়। মল্লিক মহাশয় উপাসনা করেন। স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ "নববিধানের আদর্শ চরিত্র" ও শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রার্থনা "স্বাধীনতা" পাঠ এবং প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যা ৬৷৷০ টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসক-মণ্ডলীর বার্ষিক অধিবেশন হয়। স্থানীয় উপাচার্য্য "সত্যং জ্ঞানং" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলেন।

পরে স্থির হইল যে, নববিধান সমাজের প্রচারকগণ এই সমাজের সভ্য ছিলেন, এখনও রহিলেন, এবং শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় "সুপারভাইজার" ছিলেন, এখন হইতে তিনি সহকারী সম্পাদক নামে অভিহিত হইবেন। নবদীক্ষিতগণও সভ্য হইলেন। ইহাও স্থির হইলে যে, উপযুক্ত গায়ক পাওয়া গেলে সমাজের বর্ত্তমান গায়কের পরিবর্ত্তন করা হইবে।

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরে সংকীর্ত্তনে উপাসনা হয়। শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত অতি গভীর ভাবযোগের সহিত সুললিত-স্বরে সংকীর্ত্তনে উপাসনা করেন। মন্দিরটী ভদ্র মহিলা ও বহু ভদ্রলোক দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল এবং প্রায় সকলেই শেষ পর্য্যন্ত উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। রাত্রি ৮৷৷০ টায় অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়।

৮ই বৈশাখ, ২১শে এপ্রেল, শনিবার, টাউনে কলেরা হেতু রংপুর কারমাইকেল কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র

নাথ মল্লিক (ডাঃ ডি, এন্ মল্লিক) মহাশয়কে আসিতে নিষেধ পূর্ব্বক টেলিগ্রাফ করা হয়। তিনি আগমন করিবেন লিখিয়াছিলেন এবং তাঁর ইংরাজীতে উপাসনা ও উপদেশ দেওয়ার কথা ছিল। ৮॥০টায় কেশবাশ্রমে উপাসনা হয়। উপাসনার প্রথমাংশ স্থানীয় উপাচার্য্য ও শেষাংশ মল্লিক মহাশয় সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত কেদার বাবু প্রার্থনা করেন। শ্রীমান্ সত্যেন সঙ্গীত করেন। শ্রীমান্ সত্যেন অদ্যই ২॥০টার ট্রেণে কলিকাতা চলিয়া যান। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমাধিতে উপাসনা হয়। অদ্য নীতি-বিদ্যালয়ের উৎসবের প্রোগ্রাম ছিল। আধ্যাত্মিক ভাবে স্বর্গীয় শিশুদিগকে লইয়া উৎসব করা হইল।

৯ই বৈশাখ, ২২শে এপ্রেল, রবিবার, প্রাতে ৭॥০টায় শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মুখোপাধ্যায়ের "করুণা কুটীরে" উপাসনা হয়। অদ্য আর্য্য-নারী-সমাজের উৎসবের দিন ছিল। সেই ভাবেহ স্বর্গীয় আর্য্য-নারীদিগকে লইয়া মল্লিক মহাশয় উপাসনা করেন। কেদার বাবুর সহধর্ম্মিণী "নববিধানের আদর্শ চরিত্র" ও মল্লিক মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন, কেদার বাবু প্রার্থনা করেন। সমাজের গায়ক শ্রীমান্ রাধিকা গান করেন। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা হয়। মল্লিক মহাশয়ই উপাসনা করেন।

১০ই বৈশাখ, ২৩শে এপ্রেল, সোমবার, প্রাতে ৮টায় সমাধিতে উপাসনা হয়। মল্লিক মহাশয় উপাসনা করেন। এই বেলাই শান্তিবাচন করা হইল। মল্লিক মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী, কেদার বাবুর শ্বশ্রূ-মাতা, বেচারাম চন্দ্র ও তাঁহার বড় মেয়ে এবং শ্রীমান্ বিমলের বড় মেয়ে ইন্দুলেখা উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। ইন্দুলেখার ১৫শ বর্ষের শুভ জন্মদিনের বিশেষ প্রার্থনা করা হইল। সমাজের গায়ক শ্রীমান্ রাধিকারঞ্জন শ্রীযুক্ত দক্ষিণা চরণ নন্দীর সাহচর্য্যে সঙ্গীত করেন।

মল্লিক মহাশয় ২৩শে মে,সন্ধ্যার ট্রেণে, সস্ত্রীক বাগনান ব্রহ্মানন্দাশ্রমে প্রত্যাগমন করেন।

নববিধানবিধায়িনী জননী এবার উপরোক্ত নিয়মে দ্বাচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্ভোগ করাইলেন। ধন্য মা বিধান-জননী।

সেবক—শ্রীনবীন চন্দ্র আইচ।

সংবাদ।

পরলোকগমন—আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ২৮শে মে, সিন্ধু হায়দ্রাবাদে স্বর্গীয় সাধু হীরানন্দের সহধর্ম্মিণী পরলোকগমন করিয়াছেন। গত ৪ঠা জুন তাঁর পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভ্রাতা যামিনী কান্ত কোঁয়ার করাচি হইতে এই উপলক্ষে হায়দ্রাবাদে গিয়া ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে প্রচার আশ্রমের বাড়ী ভাড়ার ঋণ হিসাবে ৫০৲ টাকা দান করা হইয়াছে। ভগবান পরলোকগত আত্মাকে শান্তিধামে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীস্থ আত্মীয় স্বজনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ৯ই জুন, ১নং গিরিশ বিদ্যারত্নের লেনে স্বর্গীয় মোহিত চন্দ্র সেনের সাম্বৎসরিক দিনে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন।

গত ১৪ই জুন, স্বর্গীয় রায় সাহেব বিপিন মোহন সেহানবিশের পত্নীর সাম্বৎসরিক দিনে, ৩৫।১ পুলিস হাসপাতাল রোডে, ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। পুত্রবধূ শ্রীমতী সুমতি ২৲ টাকা প্রচার ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

গত ১৮ই জুন, ৬।২ ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসন ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় মনোমত ধন দের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গুপ্ত বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মনোনীত ধন দে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲টাকা দান করিয়াছেন। এই দিনে মজঃফরপুরে, কনিষ্ঠা ভগ্নী, স্কুলসমূহের এসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস্ কুমারী বনলতা দের আবাসেও উপাসনাদি হইয়াছিল।

গত ২২শে জুন, ৩৫।১ পুলিস হাসপাতাল রোডে, স্বর্গীয় শরৎ কুমার দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন।

বিগত ২৮শে চৈত্র, রবিবার, প্রাতে, স্বর্গীয় যশোদাকুমার রায়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে অমরাগড়ীস্থ তাঁর সমাধি-মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন এবং স্বর্গীয় সাধকের জীবনের ব্রত ও ত্যাগের বিষয় আত্মনিবেদনে বলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায় আচার্য্যদেবের "চিন্ময়ে মগ্ন" প্রার্থনাটী পাঠ করেন।

বিগত ২৭শে এপ্রিল, শুক্রবার, প্রাতে, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, মিস্ নির্ভরপ্রিয়া ঘোষের ভবনে, তাঁহার স্বর্গীয় মাতামহ প্রেরিত ভাই অমৃতলাল বসুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন। প্রেরিত ভাইয়ের কন্যাদ্বয় শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র, শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধার্পণ ও তাঁহার চরিত্রানুকরণ বিধানবাদী মাত্রেরই একটী মহা সাধনা ও সুযোগ। মঙ্গলময়ী মা তাঁর ভক্ত-জীবন আমাদিগকে দান করুন, এই প্রার্থনা।

প্রচার আশ্রম—প্রচার আশ্রমের সাহায্যার্থ যিনি যাহা পাঠাইবেন, ভাই প্রমথলাল সেন, ৮৪নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

জন্মোৎসব—ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জের জন্মদিন উপলক্ষে গত ৩রা ও ৪ঠা জুন, শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। নববিধানাচার্য্যের রাজভক্তি ও স্বদেশ-প্রীতি যুগপৎ সাধনার অনুপ্রাণনায়, রাজপ্রতিনিধিদিগের এবং দেশবাসিগণের ও দেশের কল্যাণ প্রার্থনা করা হয়।

ব্রহ্মমন্দির—ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক যে মাসে প্রথম রবিবার ব্যতীত তিন রবিবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন।

তীর্থযাত্রা—ভাই প্রমথ লাল সেন সিমলা হিমালয় আশ্রমে তীর্থযাত্রা করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

ট্রাক্ট সোসাইটী—শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের পুস্তকাদি প্রচার উদ্দেশ্যে আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে ইং ১৮৮২ সালে "ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটী" স্থাপিত হয়। এক্ষণে এই সোসাইটী "বিধান ট্রাক্ট সোসাইটী" নামাভিধানে নিম্নলিখিতরূপে পুনর্গঠিত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেন, মিঃ কুনালচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত গণেশ প্রসাদ, শ্রীযুক্ত স্বপ্রকাশ দাস সভ্য এবং শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ও ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায় সহযোগী সম্পাদক হইয়াছেন।

সংশোধিত সংবাদ—নববিধান আশ্রম সম্বন্ধে গতবারে যে সংবাদ বাহির হইয়াছে, তাহাতে লেখা হইয়াছে, মঙ্গলবাড়ী স্থাপন হইলে প্রচারকগণের একত্রে "নবদেবালয়ে" উপাসনার ব্যবস্থা হয়। আচার্য্যদেবের গৃহ-দেবালয়েই একত্র উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সে সময় নবদেবালয় হয় নাই।

বাকীপুর, মুরাদপুর হইতে শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী রায় লিখিয়াছেন—

বাকীপুরের ডাঃ পরেশ নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী স্বর্গীয়া মহালক্ষ্মী দেবী বাকীপুর অঘোর-নারী-সমিতিতে প্রায় ২৯ বৎসর কাল প্রথমে সম্পাদিকা ও পরে সভানেত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমিতি গত ৫ই মের অধিবেশনে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা পুত্রবধূ স্বর্গাগতার একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। তৎপরে সমিতি নিম্নলিখিত মন্তব্য নির্দ্ধারণ করেন:—

"আমাদের সভানেত্রী স্বর্গীয়া মহালক্ষ্মী দেবীর স্বর্গারোহণে অঘোর-নারী-সমিতি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি প্রায় ২৯ বৎসর কাল সমিতির ভার গ্রহণ করিয়া এই সমিতিকে মাতার ন্যায় যত্নে রক্ষা ও পালন করিয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমিতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য সমিতি হইতে কোন স্থায়ী কাজ করিবার চেষ্টা করা উচিত। সমিতি তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানাইতেছেন।"

—০—

পুস্তক-পরিচয়।

মার্ক-কথিত মাঙ্গলিক।—শ্রীযুক্ত চুণীলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত। কলিকাতা খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচার সমিতি এস, পি, সি, কে, হইতে রেভাঃ, কাঃ, টি, ই, টি, শোর কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। বাইবেল ধর্ম্মশাস্ত্রের নূতন ধর্ম্মবিধি সর্ব্বপ্রথমে গ্রীক্ ভাষায় লিখিত হয়, এখন জগতের সকল ভাষাতেই অনূদিত হইয়াছে। শ্রীরামপুরের মিশনারিগণই বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে সর্ব্বপ্রথমে অনুবাদ করেন। তাঁহারা অবশ্যই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সাহায্য লইয়াছিলেন। কিন্তু সে ভাষা এতই অবোধ্য যে, তাহাতে বাইবেলের ভাবার্থ করা সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে নিতান্তই দুরূহ। তাই বাঙ্গালা বাইবেল প্রায় বাঙ্গালীর অপাঠ্য হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজী বাইবেল যেমন ইংরাজী ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে সর্ব্বত্র আদৃত, সেইরূপ প্রাঞ্জল সুপাঠ্য বাঙ্গালা ভাষায় বাইবেল খানি অনূদিত হয়, ইহা আমাদিগের অনেকদিনের সাধ। ভ্রাতা চুণীলাল মার্কের গস্পেলখানি অনুবাদ করিয়া আমাদের সেই সাধ অনেক পরিমাণে মিটাইয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র-গ্রন্থ ভাষান্তরিত করা অতি দুরূহ কার্য্য। কেন না, যে ভাবার্থে যে শব্দ আদি গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ঠিক অনুরূপ ভাবোপযোগী প্রতিশব্দ অনেক সময় অন্য ভাষাতে পাওয়াই যায় না; সুতরাং আদি গ্রন্থের ভাব রক্ষা করিয়া শব্দানুসরণে অনুবাদ করিলে তাহা প্রায়ই অপাঠ্য ও অবোধ্য হইয়া থাকে। এই জন্যই বাইবেলের প্রথম বাঙ্গালা অনুবাদকগণ এ সম্বন্ধে তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু ভ্রাতা চুণীলাল শব্দানুসরণে অনুবাদ করিতে চেষ্টা না করিয়া, যাহাতে সহজে ভাবার্থ বোধ হয়, তাহারই চেষ্টা করিয়াছেন; তাই তাঁহার অনুবাদ সুপাঠ্য ও উপাদেয় হইয়াছে। তবে দুই একটি স্থানে নূতন গঠিত শব্দ যোজনা না করিয়া, ভাবার্থবোধক প্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করিলেই যেন ভাল হইত। যাহা হউক, আশা করি, তাঁহার বইখানি বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট আদৃত হইবে এবং তিনিও এমনই বাইবেলের অন্যান্য অংশ অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করিবেন। ভগবানের কৃপায় তাঁহার উদ্যম সফল হউক। বইখানির মূল্য কিছু কম করিলে ভাল হইত।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priryanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৩ ভাগ। ১২শ সংখ্যা। | ১৬ই আষাঢ়, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক, ৯৯ ব্রাহ্মাব্দ। 30th June. 1928. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে সঙ্কট-নিবারিণী জননি! তুমি যদি উপস্থিত সকল প্রকার সঙ্কট হইতে আমাদিগকে উদ্ধার না কর, তাহা হইলে আমাদের আর আশা ভরসা নাই, উদ্ধারের আর উপায় নাই। আমাদের জীবন পথে নানা প্রকার সঙ্কট উপস্থিত। ব্যক্তিগত জীবনে সঙ্কট, পারিবারিক জীবনে সঙ্কট, মণ্ডলীগত জীবনে ও দেশের জীবনে সঙ্কট। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে, প্রয়োজন হইলে, ধর্ম্ম-জীবনকে নিরাপদ করিবার জন্য, কেহ কেহ ব্যক্তিগত জীবনে নানা কৃচ্ছ্র সাধন অবলম্বন করিতেন, প্রয়োজন হইলে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিতেন, কেহ কেহ সাধারণ লোকালয় হইতে দূরে গিয়া জন-কোলাহল-শূন্য স্থানে আপনাদের তপস্যার স্থান মনোনীত করিতেন। নববিধানে আমাদিগকে অতি উচ্চ ধর্ম্ম, সমন্বয়ের ধর্ম্ম, মহামিলনের ধর্ম্ম সাধন করিতে দিয়াছ। আমরা ধর্ম্মজীবনে সহজ পথে, স্বভাবের পথে চলিব, কোন কৃচ্ছ্র সাধন লইব না, পরিবার পরিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইব, গৃহের কোন কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিতে পারিব না, ধর্ম্ম-মণ্ডলীর প্রতি এবং সাধারণ জন-সমাজের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য, তাহাতে আরও অধিক মনোযোগী হইব। ধর্ম্ম-মণ্ডলীর অথবা সাধারণ জন-মণ্ডলীর বিভিন্ন-প্রকৃতির লোকের সঙ্গে, নানা প্রকার অমিলনের কারণ সত্ত্বেও, মিলনের ভূমিতে বাস করিব, কাহাকেও ছাড়িতে পারিব না। বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আত্মিক ধর্ম্ম-সম্পদ আদর ও সম্মানের সহিত গ্রহণ করিব, অন্তরে অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিব; বাহিরে নানা প্রকার অশ্রদ্ধার কারণ সত্ত্বেও, অন্তরে শ্রদ্ধার হ্রাস হইতে দিব না, এ ধর্ম্মাদর্শ অতি উচ্চ, অতি মহৎ। এ ধর্ম্মবার্ত্তা শুনিতেও ভাল, বলিতেও ভাল। কিন্তু এ পথে পদে পদে এত বাধা, এত সঙ্কট, ইহাতো জানিতাম না। আমার মত লোকের ব্যক্তিগত জীবনে দেখি, উচ্চ বিশ্বাস ভক্তির কত অভাব, শুদ্ধতা বিনয় বাধ্যতার কত অভাব, কত অপ্রস্তুতি। তেমনি পারিবারিক জীবনে, মণ্ডলীগত জীবনে, দেশের জীবনে কত অভাব, কত অপ্রস্তুতি। প্রত্যেক পথে পদে পদে সঙ্কট। চতুর্দ্দিকে শত সঙ্কট আমাদিগকে ঘেরিয়াছে। জীবনের যতই বৃহত্তর ভূমি, ততই অধিকতর সঙ্কট। বর্ত্তমানে দেশের জীবনে কতই সঙ্কট। কিন্তু মা! এত সঙ্কটের সময়ে তোমার দুর্গতি-হারিণী জননী-মূর্ত্তি দেখিলে আমরা সকল সঙ্কট, সকল বিপদ ভুলিয়া যাই, প্রাণে কত অভয়ই লাভ করি। জননী কি আর সন্তান-জীবনের সকল সঙ্কট দূর না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন?

তাই মা, এই সঙ্কট সময়ে যেন তোমার জননী-মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রকট দর্শন করিয়া, তোমার অভয় পদ জড়াইয়া ধরিয়া স্থির থাকিতে পারি, এবং তোমার কথাতে

একান্ত নির্ভরশীল হইয়া জীবনের কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হই। তুমি সঙ্কট-নিবারণী জননী হইয়া নিজ কৃপাগুণে সকল সঙ্কট দূর কর, তব পদে এই বিনীত প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

তপস্যার উত্তাপ।

উত্তাপ যেমন বাহ্য জগতে, তেমনই অন্তর্জ্জগতে, উভয় জগতেই নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। সূর্য্যের উত্তাপ বাহ্য জগতে কতভাবে কত প্রয়োজন সাধন করিতেছে। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, যাহারা সূর্য্যের মুক্তালোক গায়ে লাগাইবার যথেষ্ট সুযোগ পায়, তাহাদের অল্প-পরিমাণ পুষ্টিকর আহার গ্রহণ করিলেই শরীরের পোষণ হইয়া যায়; কিন্তু বড় বড় সহর ইত্যাদিতে, যেখানে উচ্চ অট্টালিকাদির ঘনতাবশতঃ সূর্য্যালোকের গতি-বিধি কম হয়, সেখানে মানব শরীর যথেষ্ট সূর্য্যতাপ পায় না, তাই সহরবাসীদের অপেক্ষাকৃত অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হয়। বৃক্ষ-লতাদির সূর্য্যোত্তাপই প্রধান পোষণ-সামগ্রী। বাহ্য জগতে কি উদ্ভিদ্দেহ, কি মানবীয় শরীর পোষণ পক্ষে সূর্য্যের উত্তাপ যদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু হয়, অন্তর্জ্জগতে সূর্য্যের সূর্য্য যিনি, সেই পরম সূর্য্য ঈশ্বরের উত্তাপ আরও কত প্রয়োজনীয়।

বাহ্য জগতে কি উদ্ভিদ্দেহ, কি মানব-দেহ, উভয়েরই বৃদ্ধির মূলে উত্তাপ। আত্মিক জীবনের বৃদ্ধির মূলেও উত্তাপ। বাহিরে বহিঃ সূর্য্যের উত্তাপ, অন্তর্জ্জগতে পরমাত্মা-রূপী পরম সূর্য্যের উত্তাপ। যাঁহারা আত্মিক জীবনে পরিপুষ্ট হইতে চান, তাঁহাদের পরমাত্মা হইতে সাক্ষাৎ ভাবে উত্তাপ গ্রহণের প্রয়োজন। বাহিরের দৈহিক জীবনে বাহিরের সূর্য্যোত্তাপ মুক্তভাবে পাইতে হইলে শরীরকে তদনুরূপ অনুকূল অবস্থায় স্থাপন করিতে হয়; তাহা না হইলে, সূর্য্যের উত্তাপ যথেষ্ট খেলিতেছে, অথচ কি বৃক্ষ লতা, কি মানব-দেহ, যথেষ্ট উত্তাপ নাও পাইতে পারে। তেমনই অন্তর সূর্য্যের নবজীবনপ্রদ উত্তাপ অন্তরে পাইতে হইলে, অন্তরকে তদনুরূপ অনুকূল অবস্থায় স্থাপন করিতে হয়; তাহা না হইলে সে উত্তাপ লাভ সম্ভব হয় না।

যৌবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বাহিরের বিদ্যার্জ্জনের সঙ্গে যদি ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপায় পাঠ্য-জীবনে, ছাত্র-জীবনে সম্ভব হয়, তাহা হইলে অন্তর সূর্য্যের উত্তাপ লাগাইয়া দ্বিজত্ব-লাভ মানব-জীবনে সুগম হয়। ইহা প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিয়াই তাঁহাদের সময়ে তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সে প্রাচীন যুগ নাই, সে ঋষি-সমাগম নাই, জীবন প্রস্তুতির সে পদ্ধতিও প্রচলিত নাই। কিন্তু আত্মিক-জীবন-প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে, সে বিধি ব্যবস্থার প্রয়োজন এখনও আছে। অবিকল প্রাচীন পদ্ধতিতে না হউক, কোন না কোন আকারে সে উপায় গ্রহণের প্রয়োজন এখনও রহিয়াছে।

ঈশ্বরের উত্তাপ অন্তরে লাভের অনুকূল সহজ স্বাভাবিক উপায় সাধু-সঙ্গে স্থিতি, কুসঙ্গত্যাগ, সাত্ত্বিকভাব উদ্দীপন করে এরূপ আহার ও পরিচ্ছদ গ্রহণ, সৎপ্রসঙ্গ, ধর্ম্ম-শাস্ত্র-পাঠ, ঈশ্বরের পূজা বন্দনা ও স্তবস্তুতি, এ সব উপায় কি কৈশোরে, কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়ে, কি বার্দ্ধক্যে, জীবনের সকল স্তরেই একান্ত প্রয়োজনীয়।

শুনিয়াছি, অতি প্রাচীন কালে সনকাদি ঋষিদিগের তপস্যানিরত জীবন দেখিয়া রাজা জনকের জীবনে ত্যাগ ও তপস্যাভাব উপস্থিত হইয়াছিল। তপস্যানিরত পূত-স্বভাব ঋষিদিগের জীবন-স্পর্শে দাসী-পুত্র বালক নারদের জীবনে দেবভাবের উদ্গম হইয়াছিল এবং সেই বাল্য জীবনেই নারদকে হরির অন্বেষণে গহন বন আশ্রয় করিয়া তপস্যাব্রত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে দস্যুতুল্য জগাই মাধাই জীবনে ভক্ত প্রেমিক শ্রীনিত্যানন্দের জীবন-স্পর্শে মুহূর্ত্ত মধ্যে কি মহা পরিবর্ত্তনই উপস্থিত হইয়াছিল; তাই মনের পরিবর্ত্তন ব্যক্ত করিয়া প্রকাশ করা হইল, "আজ কেন ভাই এমন হল, পূর্ব্ব স্বভাব দূরে গেল, চাঁদ বদনে হরি বল, বিলম্বে আর কাজ নাই"।

বর্ত্তমান যুগে পুণ্যতোয়া-গঙ্গা-পুলীনে পূর্ণচন্দ্রের পবিত্র জ্যোৎস্না-স্নাত অবস্থায়, যখন কৈশোর অথবা যৌবনের আরম্ভে ধনি-পুত্র দেবেন্দ্রনাথ দিদিমার গঙ্গাযাত্রা উপলক্ষে সাত্ত্বিক ভাব ও বিবেকোদ্দীপক সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন, "এমন দিন কি হবে, হরিবলে প্রাণ যাবে" অমনি তাঁহার প্রাণের ভিতর স্বর্গের আনন্দ-প্রবাহ ঢেউ খেলিয়া তাঁহার চিত্তকে বিহ্বল করিয়া ফেলিল। সে আনন্দের ভিতরে তিনি এমন এক স্বর্গের নবজীবন-প্রদ উত্তাপ লাভ করিলেন, তিনিও প্রকাশ করিলেন, "আজ কেন ভাই, এমন হল, পূর্ব্ব স্বভাব দূরে গেল"।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যে কারণেই হউক, চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মৎস্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,বৈষ্ণব পরিবারে ভক্ত পিতামহের প্রভাবাধীনে লালিত পালিত হইয়া ক্রমে সাত্বিক ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন; তাই শ্রীকেশবের অন্তরে দেব ভাবের সঞ্চার হইল। জীবনে দেব ভাবের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কেশব ব্যাকুল হইলেন, প্রার্থনার পথ অন্তরালোকে অবলম্বন করিলেন; ক্রমে তপস্যার উত্তাপ আসিয়া অন্তর রাজ্যকে উত্তপ্ত করিল, অগ্নিময় করিল, তপস্যা তাঁহার জীবনব্যাপী ব্রত হইল। তিনিও পরিণত জীবনে বলিলেন, "আমি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত, আমি চিরদিন অগ্নির পক্ষপাতী"।

তপস্যার এই উত্তাপ স্থায়ী করিবার জন্য প্রাচীন ভারতে জনকাদি ঋষিদিগের জীবন-ব্যাপী তপশ্চরণ, তাই নারদের জীবনব্যাপী হরিগুণ-কীর্ত্তন, তাই জগাই মাধাইর জীবনব্যাপী অনুতাপ-মূলক তপস্যা, তাই বর্ত্তমান যুগে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের জীবনব্যাপী ঋষিত্ব-সাধন, তাই নবযুগে ব্রহ্মানন্দ-প্রমুখ ভক্তবৃন্দের জীবনব্যাপী তপস্যা ও সমন্বয়ের মহিমাময় সাধন।

প্রকৃত উপাসনা।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বলেন, "উপাসনা আর কি? রং পরিবর্ত্তন। উপাসনায় আমার লোহাটা তোমাকে স্পর্শ করে সোনার রং হয়ে গেল।" উপাসনার মৌলিক অর্থ নিকটে বসা। ব্রহ্মের নিকটে বসা ব্রহ্মোপাসনা। অগ্নির নিকটে বসিলেই অগ্নির যেমন উত্তাপ লাগে, হিমাচলের নিকটস্থ হইলেই শৈত্য অনুভূত হয়, তেমনি ব্রহ্মের নিকট বসিলেই ব্রহ্মের স্বরূপের প্রভাব জীবনকে স্পর্শ করে। তাঁর নিকটস্থ হওয়াই তাঁহার প্রকৃতিতে প্রকৃতিস্থ, তাঁহার স্বরূপে স্বরূপবান হওয়া। অতএব প্রকৃত উপাসনার ফল জীবনের পরিবর্ত্তন, লৌহময় জীবন স্বর্ণময় হওয়া। যদি উপাসনা করিতে করিতে তাহা না হয়, মন যদি পরিবর্ত্তিত না হয়, জীবন যদি সত্য-জ্ঞান-প্রেম-পুণ্যময় না হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, প্রকৃত উপাসনা হইতেছে না। জীবন্ত ঈশ্বরের নিকট বসিলেই তাঁহার অগ্নিময় স্পর্শে জীবন অগ্নিময় ও পাপ-মুক্ত হইবেই হইবে।

সবার প্রতি সমান ব্যবহার।

সাধারণ কথায় বলে, সবার প্রতি সমান ব্যবহার করিবে। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম তাহা নহে। যাহার প্রতি যেমন ব্যবহার সমুচিত, তাহার প্রতি তেমন ব্যবহার করিতে হইবে। সুস্থ ব্যক্তিকে উপাদেয় ভক্ষ্য ভোজ্য দিবে, কিন্তু রোগীকে তিক্ত ঔষধ দিবে। যাহার স্ফোটক হইয়াছে, চিকিৎসক অস্ত্র-চালনা দ্বারা তাহা কাটিয়া দেন, অন্যথা করিলে জীবন-সংশয় হয়। বাস্তবিক রোগীকে যদি সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় উপাদেয় ভক্ষ্য ভোজ্য দাও, তাহাতে তাহার উপকার না হইয়া অপকারই হয়, রোগ আরো বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। তাই ভগবানও দুষ্টের দমন করেন ও শিষ্ট জনে আশীর্ব্বাদ বিধান করেন। তবে তাঁহার নিকট ন্যায়দণ্ডও যেমন প্রেমানুমোদিত, তেমনই যাহার প্রতি আমরা যেমন ব্যবহারই করি না কেন, সকলই যেন প্রেমানুমোদিত হয়।

বুদ্ধের জন্মস্থান।

সাধারণ ইতিহাসে কপিলবাস্তুই বুদ্ধের জন্মস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নেপালের তেরাই মধ্যে এক তাম্র-ফলক পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে লিখিত আছে, "এই স্থান বুদ্ধের জন্ম-স্থান"। সম্প্রতি উড়িষ্যার একস্থানে একটি সেই রকম তাম্র-ফলক মৃত্তিকা-মধ্য হইতে বাহির হইয়াছে, তাহাতেও লেখা আছে, "এইটী বুদ্ধের জন্মস্থান"। এই বিষয় লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের মধ্যে বুদ্ধের প্রকৃত জন্মস্থান নির্ণয় সম্বন্ধে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, প্রাচীনকালে যখনই যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিতেন, তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে যিনি মহত্ত্ব লাভ করিতেন, তিনিই আপনার আমিত্ব লোপ করিয়া গুরুর নামেই আত্ম-পরিচয় দিতেন বা সেই নামে শিষ্যদিগের নিকট পরিচিত হইতেন। যেমন ব্যাস একজন নয়, শঙ্করাচার্য্য একজন নয়, তেমনি অনেক বুদ্ধ পরপর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কপিলবাস্তুর বুদ্ধই যে নেপালের বুদ্ধ বা উড়িষ্যার বুদ্ধ, তাহা কে বলিতে পারে? প্রত্নতত্ত্ব তাহা নির্ণয় করুন, কিন্তু নববিধানের ধর্ম্মতত্ত্ব বলেন, যেখানে যে জীবনে বুদ্ধের জীবন নব জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই বুদ্ধের প্রকৃত জন্মস্থান। নববিধানে এই কলিকাতা সহরেও শ্রীবুদ্ধ নবজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা বিশ্বাস করি। কবে সে দিন আসবে, যে দিন প্রতি হৃদয় শ্রীবুদ্ধের জন্মস্থান ও সকল ভক্তের জন্মস্থান বলিয়া নির্ণীত হইবে।

পরলোক।

ভক্তিভাজন প্রেরিত শ্রীপ্রতাপচন্দ্রের অপ্রকাশিত উক্তি:—

"এখান থেকে সে লোক যত দূর তোমরা মনে কর, তা নয়। আশার চক্ষে দেখলে অনেক পরিষ্কার হয়।"

"আমার ভাবনা কি? আমি আনন্দময়ের কাছে যাচ্ছি। অনেকবার গিয়েছি, এবারকার মতন কখন নয়।"

"আশা। যে আশা তিনি দেন, তাহাতে আমাকে কে বঞ্চিত করতে পারে? যে আশা তাঁহা হতে পাই না, সে আশা কখনই পেতে পারি না। অনেক দিন হতে তিনি অনেক আশা দিয়ে এসেছেন, তিনি অগতি দেখে হাত ধরে ইহ-পরলোকের সেতু পার করুন। তাঁকে পেয়ে দুদিন সুনিদ্রা ভোগ করি।"

"আমি বুঝছি, আমার জন্য কিছু একটা আয়োজন হচ্ছে। কি আমি জানি না। কিন্তু হচ্ছে কিছু। ভাবলে আহ্লাদে কৌতুকে মন পূর্ণ হয়।"

"পরলোকের প্রাতঃকাল এখানকার প্রাতঃকালের চেয়ে অনেক মিষ্ট। যখন যাবো, তখন বুঝবো। এখানকার জন্য সেখানকার আশা সম্ভাবনা যেন কমাইয়া না দিই।"

"তোমরা যত দূর মনে কচ্ছ, আমি তত দূর থাকবো না। নিকটে থাকবো। নিশ্চয়ই তোমাদের দেখবো। আর তোমরা যদি সে চক্ষু পাও, তোমরাও দেখবে।"

—•—

আর্য্যনারী-সমাজের উৎসবের উপাসনা।

(মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী)

বৎসর কাটিল। আবার আর্য্যনারী-সমাজের মিলন আজ কমল-কুটীরে; আজ সুন্দর সাজে সজ্জিত কমল কুটীর। প্রাণারাম চির-সখার বংশীধ্বনি আজ এখানে আমাদের ডেকে এনেছে। বৎসর যায়, ঘণ্টা বেজে যায়, জীবনের ঢেউগুলো দুলিয়ে যায়। এক হৃদয়-দেবতা—সেই এক ধ্বনি, এক আহ্বান আমাদের এখানে একত্র করেছে। এ যে মহামিলনের উৎসব। ভাঙ্গা সুরগুলো এক হয়ে সখাকে ডাকবে। মোহন-বেশে সখা আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছেন। আজ ব্রহ্মানন্দ সতী সঙ্গে এই মহোৎসবে উপস্থিত। ভগ্ন শূন্য হৃদয় আজ পূর্ণ হবে; উৎসবের আশীর্ব্বাদ ও মিলন-সুখ আজ যথার্থ ভাবে সম্ভোগ করি। যুগযুগান্তর চলে যায়, কিন্তু মুরলীধ্বনির আহ্বান চিরদিন আমাদের অন্তরে, সমান ভাবে আমাদের হৃদয়ে ধ্বনিত। আজ সংসারে পীড়িত, কত শূন্য জীবনের শূন্যতা ফেলে বলে, সংসার ছেড়ে ছুড়ে এ মহা উৎসবে এসেছি। সংসারাসক্ত জীবনের আঁধার ঘুচে গেল; সখা মোহন-বেশে, ভালবেসে, প্রিয়ভাবে আমাদের ডেকেছেন, আমাদের দেখা দিবেন বলে। আজ সব আসন পূর্ণ, দূর নিকট ব্যবধান আর নাই; ইহপরকাল এক হয়েছে। স্নেহময়ী জননী, ঠাকুরমা, প্রিয় মোহিনী, প্রচারক-পত্নীগণ, সব জমাট ভাবে আমাদের সঙ্গে এক হয়ে আর্য্যনারী-সমাজের উৎসব কচ্ছেন। প্রাণসখা স্থির হতে পারেন নি, পাছে আমরা তাঁকে ছেড়ে দূরে চলে যাই, তাই মোহন-বেশে এসে আমাদের বার বার ডাকছেন। তাঁর আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে, পূজা আরম্ভ করি।

হে পূর্ণ দেবতা, আজ আমাদের তোমার চরণতলে মিলিয়েছ, আজ ভাল করে তোমায় বুঝিয়ে দেও, বিশ্বাস-চক্ষু খুলে তোমার আবির্ভাব আমাদের দেখিয়ে দাও। আমাদের জীবনগুলোকে স্রোতে ভাসিয়ে ভাসিয়ে তুমি আনলে তোমার চরণ-পদ্ম-তলে। জীবনগুলো কতবার অবিশ্বাস স্রোতে টলমল্ করে, তোমায় অস্বীকার করে, ভাবে প্রাণসখা ছেড়ে গিয়েছেন আমাদের। কিন্তু তোমার মোহন বংশীধ্বনি আমাদের বলে, দেখ, আমি তোদের ছাড়িনি; আয় তোরা, আয় আমার কাছে। আমি তোদের বড় প্রিয়। ভালবেসে ডেকে অবিশ্বাসী প্রাণগুলোকে তোমার পানে বিশ্বাসী প্রেমিক করে নিয়ে যাচ্ছ। ৩৬৫ দিন তোমায় একা একা ভাবলাম। কত সময় বৃথা নষ্ট কোল্লাম। আজ পূর্ণ দেবতার চরণতলে বসে দাসীরা বোল্ছে, আমরা এত দিন আমিত্বের পূজা কোচ্ছিলাম, জীবনগুলো তোমা হতে দূরে চলেছিল, আজ তোমার চরণতলে এনে বুঝিয়ে দিচ্ছ যে, ভক্তিভরে তোমার পূজা করলে সব অবিশ্বাস অন্ধকার ঘুচে যাবে। এত সময় নষ্ট করে এলাম, তোমার সত্তা ছেড়ে তোমার সৃষ্টি অস্বীকার করে জীবনগুলো ছারখার হয়ে গেল। তোমার মধুর স্পষ্ট বংশীধ্বনি শুনে শক্তিহীন দুর্ব্বল প্রাণগুলো শক্তি পেয়ে সবল হলো। আজ সকল অভাব চলে গেল। আদি শক্তি তুমি, স্রষ্টা তুমি, পূর্ণ তুমি। তোমার সুরে সুর মিলিয়ে দাসীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ কণ্ঠগুলো বোল্ছে, তোমায় বুকে নিয়ে এসেছি, আজ কে বলে তোমার দেখা পাওয়া যায় না, প্রতি হৃদয় পূর্ণ করে সদা বিরাজিত তুমি।

তুমি যে চিন্ময়ী নিরাকারা দেবতা। আজ সকলের সাথে মিলে এক সুরে তোমায় ডাকবো। তোমার মধুর বাঁশীর রব প্রাণগুলোকে এমন করে স্পর্শ কোরেছে যে, আর কিছু ভাল লাগে না। সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে টেনে নিয়ে এসে তোমার লীলাময় রূপের ভিতর ডুবিয়ে রাখ্ছো। আর সংসার ভাল লাগে না। যখন হাতে করে আমার এ জীবন-বীণা গড়েছিলে, তখন তুমি বলেছিলে,"তোমার প্রাণের সব ইচ্ছা, কামনা আমার তারে সুর মিলিয়ে বাজাও।" তুমি দূরে নও, সংসারে তুমি, প্রাণের ভিতর তুমি। তোমার স্পর্শে আজ সকল প্রাণ বেজে উঠুক। পাহাড়, নদী, ফল ফুল সকলে তোমার কথা বলে, তারা তোমারই প্রতিধ্বনি। আজ সকল বন্ধন্ টুটে গেল, প্রাণগুলো তোমার টানে এখানে ছুটে এলো। কলিযুগ সত্যযুগ হোলো, সব ভাই বোনের জীবনে তোমার সুর শুনা গেল।

তুমি চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছ। অমরাত্মাগুলো তোমাতেই অবস্থিত, আজ তাই তাঁদেরও তোমার সঙ্গে ভাল করে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দাসীদের প্রাণগুলো অধিকার করে রয়েছ। সকলের ভিতর তুমি। তাই ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জীবনগুলো বলে, যেখানে যাই, সেখানেই সখা আছেন, তাঁকে দেখি প্রাণভরে। অনন্ত রাজ্যের যাত্রী আমরা। সে যে সুপ্রশস্ত রাস্তা। তোমার সঙ্কেতে, তোমার ইঙ্গিতে চলবো আমরা। আমি কেউ নই, আমি কিছুই নই। সবই তুমি, এ পৃথিবী "তুমি ময়"। এ ক্ষুদ্র জীবনগুলো তোমার ঢেউয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাও। কোথায় সব ভাবনা চিন্তা গেল। তোমার মধুর বাঁশীর সুরের ভিতর বিলীন হই। তুমি বাঁশী বাজিয়ে দেখছো, কে কত তোমার সুরের ভিতর

আত্মহারা হয়ে যাচ্ছে। আর যেন তোমা হ'তে দূরে বিচ্ছিন্ন না থাকি। দেবদেব মহাদেব-চরণে আজ দাসীদের মিলন।

প্রেমময়, এত ভালবাস যে, আর তোমায় ভোলা যায় না। মুক্ত তোমার হস্ত, অবারিত তোমার দ্বার। তুমি কেবল আমাদের দিতেছ, যোগ্য অযোগ্য, ধনী দরিদ্র কিছুই প্রভেদ কর না। সমভাবে তোমার দান বিলাচ্ছ। দুঃখী দরিদ্র যদি বার বার ধনীর কাছে ভিক্ষা চায়, তবে সে বিরক্ত হয়, ফিরাইয়া দেয়, বলে আর নাই, আর পাবে না। কিন্তু তুমি না চাহিতেই আমাদের কত দিয়েছ, তোমার কুবেরের ভাণ্ডার অক্ষয়। আমরা যতই ব্যাকুলভাবে চাই, তুমি ততই দু'হাত ভরে আমাদের দাও; তুমি কখনও বিরক্ত হও না। তুমি যে হাতে করে আমাদের গড়েছ। এক একটী পরিবারের এক একটী সংসার সাজিয়ে দিয়েছ। সুখ ও দুঃখের সময় সমানভাবে তুমি আমাদের হৃদয়ে রয়েছ। পৃথিবীর সকলে ত্যাগ করিলেও প্রাণসখা বলেন, আমি তোকে ছাড়বো না। দুঃখ বিপদ পরীক্ষার সময় তুমি আরো বেশী ভালবেসে বুকে ধরে আমাদের অভয় দান কর। প্রাণ যখন শ্রান্ত হয়, তখন সখা মধুর বংশীধ্বনিতে ডেকে সব শ্রান্তি দূর করে দেন। তোমার মত ব্যথার ব্যথী আর সংসারে কেহ নাই। তাই এই নশ্বর দেহে তোমার দয়া, প্রেম অনুভূতির শক্তি দিয়েছ। কত দিয়েছ, তোমার দান অসীম। তবু কখনও কখনও মায়া মোহে ডুবে, বিপদ অন্ধকারে পড়ে বলি যে, ঠাকুর বুঝি আমাকে আর ভালবাসেন না, আমায় ছেড়েছেন, তাই এত দুঃখ আমি পাচ্ছি। কিন্তু তাতো নয়, মধুর বংশীধ্বনিতে তুমি বলছো, রেখেছি সুখ তোদের জন্য, নিরাশ হয়ো না। পাপীকে তুমি বড় ভালবাস। যার প্রাণের রোদন, ব্যথা কেউ বোঝে না, তার অশ্রুজল তুমি মুছিয়ে দাও, তার নিত্য খোঁজ খবর লও। অনন্ত প্রেম তোমার। এই জগৎ সংসার তোমার করুণা স্মরণ করিয়ে দেয়। দুঃখ কষ্টের সময় তোমার স্নেহ আরও গভীর হয়ে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। প্রেমের আধার দেবতাকে বুকে ভাল করে রাখি। সদাই তোমার দয়ার আহ্বান শুনবো।

সখা, পাপীর বন্ধু, অদ্বিতীয় দেবতা তুমি। আজ ৩৩ কোটী স্থানে যেয়ে দেবতাদের দর্শন করিতে হইবে না। বুকের ভিতর তোমার মন্দির। অমরধামের যত ভক্ত সাধু সাধ্বী নিয়ে তুমি এসেছ, আজ এই আর্য্যনারীর উৎসবে। তাদের নূতন জীবন দিয়ে, নূতন সাজে সাজিয়ে দিতে এসেছো। কর্ণধার হয়ে নিয়ে যাবে ভবপারে। তোমার স্বরূপ অদ্বিতীয়। আমাদের হৃদয়-পদ্মগুলো ফুটে উঠে যখন তোমার চরণ পূজা কোরবে, তখন চারিদিক শোভাময় হবে। আজ শ্রবণ-শক্তি ধন্য হলো তোমার মুরলী-স্বরে। সবই কোমল হোলো তোমার স্পর্শে, আর কিছুই কঠিন রইল না। আমরা কত শিক্ষা পেলাম, সংসারে থেকে। এই সংসারই তোমায় খুব ভাল করে বুঝিবার স্থান। হে নববিধানের দেবতা, তুমি ভাল করে বুঝিয়ে দিলে যে, তোমার পূজা আরাধনা করবার স্থান এই সংসার—এ সংসার ছেড়ে বনে যেতে হবে না তোমার সাধন ভজন করিতে।

সকল পাপী তরে যাবে তোমার নামের বলে। আজ সকল কুচিন্তা, অন্যায়, অপরাধ ঝেড়ে ধুয়ে দাও। আর যেন পাপে না মজি। ঐশ্বর্য্য বিলাস বাসনায় মজে পাছে তোমায় ভুলি, তাই তুমি বাঁশীর রবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ যে, এ প্রবাসে চিরদিন থাকব না; কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ সাধন করে অমরধামের যাত্রী হ'তে হ'বে। উজ্জ্বল করে তোমায় দেখাও, দেব, আর যেন ভ্রান্ত না হই। নিজের দোষে যেন অন্যদের দোষী না করি। সব ময়লা ধুয়ে, নববস্ত্র পরিয়ে, নূতন করে দীক্ষিত কর। পাপী আজ ডাকছে, সখা বলে তোমায়; তোমার চরণ বিনা নাই পরিত্রাণ। মুক্তি হাতে নিয়ে এসে আমাদের পাপমুক্ত কর।

মনোমোহন আনন্দময় তোমার রূপ। অনন্ত আনন্দ এনেছ। তুমি বোলছো, যত বেদনা অভাব নিয়ে আর আমার কাছে। বুকের ভিতর আর অভাব, যাতনা, শোকের প্রাদুর্ভাব থাকবে না। তুমি পূর্ণ আনন্দ নিয়ে এসেছ নারীর দুঃখময় জীবনে; আর যেন দুঃখের কান্না না কাঁদি। সব দুর্ব্বলতা দূরে ফেলে, কষ্ট দুঃখ দূরে ফেলে, আনন্দময়ীর আনন্দ, সুখ, ঐশ্বর্য্য নিতে এসেছি। তোমাতে আমাদের সবার বুকভরা আশা। চির'দন তোমার চরণে আমাদের বেঁধে রেখো, যেন তোমায় ছেড়ে চলে না যাই। সখারূপে আজ তুমি দাঁড়িয়েছ, সব ময়লা মালিন্য ধুয়ে ফেলবো। আজ সব প্রাণগুলো তোমার আনন্দময় স্বরূপে ডুবে থাক। অনিত্য সুখ সব দূরে ফেলে, পুরাতন মলিন বস্ত্র ছেড়ে, দুঃখ তাপ ফেলে দিয়ে, তোমার মোহনরূপ ভাল করে দেখে, আমরা স্নিগ্ধ হই, আরাম পাই। তুমি প্রাণের দেবতা, আনন্দময় দেবতা, সুখময়, শান্তিদাতা, দুঃখহারী, দয়াল হরি। তোমায় বার বার নমস্কার করি।

প্রাণের মাঝে নীরবে তাঁকে ডাকি, মোহনরূপ ধ্যান করি, তিনি দেখা দিন; একা একা তাঁর দর্শন লাভ করে কৃতার্থ হই।

হে ভগ্নীগণ, আজ এই মহামিলনের ভিতর অপূর্ব্ব ভাব হৃদয়ে জাগ্‌লো। সকল দীন দুঃখী দুঃখ কষ্ট ভুলে গেল; কত শ্রান্ত অবসন্ন জীবন আজ দেবতাকে দেখবার আশায়, ভক্তের লীলাভূমি এই কমল কুটীরে সমবেত হোলো। আজ আমরা প্রতিজন মায়ের প্রসাদ নিয়ে বাড়ী ফিরে যাবো। সংসারে থেকে আমরা মায়ের দেখা পাবো, এই সৌভাগ্যের কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবার জন্য এ আর্য্যনারী-সমাজের উৎসব। আজ মায়ের স্নেহে, সাদর নিমন্ত্রণে আমরা ছুটে এখানে এলাম। এ প্রবাসে আমাদের দু'দিনের বসবাস। এখানে আমরা এসেছি প্রভুর সেবা করতে। তাঁর সকল দানের যথার্থ সদ্ব্যবহার করে, তাঁর পাদপদ্ম বুকে ধরে, সকলে স্বদেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হই। আমরা এত

দূর পথ এসেছি, কিন্তু নিয়ে যাবার কিছুই নেই। তাই, সন্ধ্যায় মনে হচ্ছে, ভব-সিন্ধু-পারে যাবার কড়িও নেই। সকাল থেকে রাত অবধি তাঁকে ডাকবার সময় হলো না। কিন্তু চাইবার সময় তিনি অজস্রভাবে দিচ্ছেন। তাঁর দানের কথা ভুলে গিয়ে, নিজ বুদ্ধিদোষে দুঃখ কষ্ট পাই, তাই তাঁকে কঠোর বলে ভাবি। এখন যদি তাঁর সাধন ভজন না করি, বৃথায় সময় নষ্ট করি, তবে পারে যাবার সময় যখন তরীতে উঠবো, তখন পারের কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, কণ্ঠস্বর আর উঠবে না। তবে কি আমরা কতকগুলো জঞ্জাল ধূলো পিছে ফেলে যাবো? চরিত্রের আতর গোলাপ সৌরভ রেখে যেতে হবে। জীবনগুলো পবিত্র আদর্শ করে রেখে যাবো। আমাদের ইচ্ছাগুলো ভগবানের চরণে ফেলে দিয়ে তাঁর সেবা করি। সুখ দুঃখ, সকল ভার ফেলে দাও সখার চরণে, আপনাকেও সঁপে দাও তাঁর পাদপদ্মে। দেখবে, সন্ধ্যায় ঠাকুর তোমায় বাঁশী বাজিয়ে ঘুম পাড়াবেন। শুষ্কতা এসেছে জীবনে, তাই এত উত্তাপ। যেখানে শুষ্কতা, সেখানে নিরাশা। আজ এ উৎসবে সব নিরাশা দূর হয়ে যাবে। ভক্তের প্রার্থনায় নীরস ভাব দূর হবে। জীবন সরস হবে। ভগবানের স্নেহের স্পর্শ শোক-সন্তপ্ত প্রাণগুলোকে কত শান্তি দেয়। মিষ্টভাষী হই; ব্যবহার মিষ্ট হোক। স্বর্গের রত্ন সব আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাই আজ দীনহীন কাঙ্গালিনী বেশে এসেছি। হে অল্পবয়স্কা ভগ্নীগণ, তোমরা এখন থেকেই ধর্ম্ম ভক্তি, প্রেম পুণ্য সঞ্চয় কর; বিনয়ী মিষ্টভাষী হও; আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করে নারীজীবন সার্থক কর।

মা, সংসার পরিবার সব ভার তোমার হাতে। করযোড়ে এই ভিক্ষা চাই, জীবন থেকে শুষ্কতা, অবিশ্বাস দূর করে দাও। প্রাণগুলো ফুটিয়ে সুগন্ধ ঢেলে দাও। প্রাণগুলো নিবেদন করবো, তোমার চরণে। শুভ মঙ্গল বর্ষণ কর; তাপিত প্রাণ শীতল কর। আর্য্যনারীদের হৃদয়গুলো ফুলের মালা করে গেঁথে তোমার চরণে রেখে দাও। আর কি প্রার্থনা কোরবো। তুমি আমাদের কত ভালবাস, আমরা কত সুখী, দুঃখিনী নই। তোমার আনন্দময় শ্রীপাদপদ্ম আমাদের মাথায় রাখ। কল্যাণমাখা চরণ-পদ্মতলে সকল আর্য্যনারী মিলে তোমায় প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

(প্রাপ্ত)

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ গীতারূপ অমৃত দান করিয়া জগতের অমরত্ব দান করিয়াছিলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র Destiny of human life ও Immortality of soul বর্ণন করিয়া সেই সাংখ্য-যোগ বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। যখন মহাবীর ব্রহ্মচারী অর্জ্জুন মহাযুদ্ধে বিষাদযুক্ত হইয়া কর্ম্মরূপ ধর্ম্মযুদ্ধ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন জগতের কল্যাণকামী জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্য-যোগরূপ আত্মার অমরত্ব বর্ণন করিয়া, অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া, অর্জ্জুন ও জগতের বিষাদ দূর করিলেন। মানবের দুঃখের মূল কোথায়? মানব যদি ভাবে, আমি দুই দিনের জন্য জগতে আসিয়াছি, তাহা হইলে তাহার জগতে বাঁচা অসম্ভব। মৃত্যুময় সংসারে অনন্ত শান্তি কোথায়? কিন্তু মানব যখন দেখিবে, তাহার মৃত্যু নাই, সে ব্রহ্ম-সন্তান, অনন্ত যুগ ধরিয়া সে আছে ও থাকিবে, তখন পৃথিবীর ধ্বংস বা দুঃখ কিছুই তাহাকে দুঃখ দিতে পারে না। আমরা যদি না ছিলাম, তবে আসিলাম কোথা হইতে? যদি আমরা বর্ত্তমানে আছি স্বীকার করি, তবে নিশ্চয় অনন্ত ভবিষ্যতেও থাকিব। অনন্ত অতীত ও ভবিষ্যতে আমাদিগের বর্ত্তমান জীবন, আমাদিগের বাসস্থান অনন্ত বৈকুণ্ঠধাম কৈলাস। অনন্তকাল ধরিয়া আমরা পরম পিতা ও পরম মাতার সন্তানরূপে জগতে বর্ত্তমান, ইহাই গীতার সাংখ্য-যোগ ও আচার্য্য কেশবচন্দ্রের নববিধান। আধুনিক বিজ্ঞান ইহার প্রমাণ। বিজ্ঞান-জগতে ধ্বংস নাই, পরিবর্ত্তন।

আত্মার অমরত্ব স্বীকার না করিলে, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ত্যাগ, ভক্তি, বৈরাগ্য, মোক্ষ, সকলই মিথ্যা। আমরা অমর, অনন্তকাল আছি। আমরা অনন্ত অতীত বংশের সন্তান, অনন্ত যুগ ধরিয়া থাকিব। ইহাই আমাদিগের অনন্ত স্বরাজ। দুই দিনের মস্তিষ্ক-কল্পিত স্বরাজ স্বরাজ নহে। অনন্ত পরম পিতা মহাদেব বিশ্বেশ্বর আমাদিগের স্বরাজের রাজা। কাহার সাধ্য, তাঁহার অনন্ত শাসনদণ্ড উল্লঙ্ঘন করে। সমগ্র রাজা বা প্রেরিতগণ তাঁহারই অনুচররূপে জগতে কার্য্য করেন। অন্যায় হইলেই তাহার প্রতিবিধান হইবে। ইহাই বিশ্বাসের সুদৃঢ় দুর্গ। এখানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য স্থান পায় না। এখানে নির্ভীকতা, এখানে পবিত্রতা, এখানে অনন্ত ভক্তিধারা প্রবাহিত। এই ভক্তিপ্রবাহের গঙ্গাধারায় যাঁহারা স্নান করিয়াছেন, তাঁহারা চিরমুক্ত। কাহার সাধ্য, তাঁহাদের দুঃখ দিতে পারে। ভক্ত ধ্রুব, প্রহ্লাদ ইত্যাদি তাহার দৃষ্টান্ত। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের সাংখ্য-যোগ ও নববিধানের বিজয়ভেরী। কাল্পনিক বৈকুণ্ঠ, স্বর্গ বা কৈলাস নাই। আমাদিগের মানব-সংসারই আমাদিগের বৈকুণ্ঠ, স্বর্গ ও কৈলাসধাম।

এইজন্য ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, বৈরাগ্য প্রেম ভক্তির নিগূঢ় তত্ত্ব মানব-সমাজে প্রচারিত। মানব-সমাজ ব্রহ্ম ব্যতীত বাস করিতে পারে না। ব্রহ্মকে মানি বা না মানি, স্বীকার করি বা না করি, আমরা সর্ব্বদাই ব্রহ্মে যুক্ত হইয়া আছি, ইহা না জানাই মৃত্যু বা নরক। কাল্পনিক নরক বা মৃত্যু নাই। গীতার মধ্যে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা আছে। হিন্দুধর্ম্মে এবং অন্যান্য ধর্ম্মে যে সমস্ত শুদ্ধাচার, সাত্ত্বিক আহার পান, ব্রহ্মচর্য্য, ভজন পূজনাদির ব্যবস্থা

আছে, তাহা আমাদের অমরত্ব লাভের পন্থা। আমরা সেই সমস্ত আচার-বিধি পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়াছি। ইহার কারণ, আমরা আত্মার অমরত্ব ভুলিয়াছি, ব্রহ্মকে ভুলিয়াছি। বেদ বেদাঙ্গ উপনিষদ গীতাদি শাস্ত্রতত্ত্ব, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, শুদ্ধাচার, আহার-সংযম, বেশ-ভূষা-বাক্য-সংযম, সকলই অসার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ক্ষণিক আমোদে মত্ত হইয়া ভুলিয়া, আমাদের অমর সংসারে বিলাসিতা, অকাল-মৃত্যু, অত্যাচার, অনাচার, যুদ্ধ, বিগ্রহ সৃষ্টি করিতেছি। যে দিন আমরা আত্মার অমরত্ব চিনিব, সেই দিন আমরা ব্রহ্মকে চিনিব ও আমাদের নববিধানরূপ অমর সংসার ফিরিয়া পাইব, ব্রহ্মে যুক্ত হইয়া অনন্তকাল সুখে বাস করিব। আত্মার অনন্ত উন্নতি ও অমরত্ব নববিধানের গূঢ় তত্ত্ব।

সাকার ও নিরাকার।

সাধনার পথে যখন সাধকের বিশ্বাস ও ভক্তি-চক্ষু খুলিয়া যায়, তখন তাঁহার ভিতরে একটা স্বাতন্ত্র্য আসিয়া পড়ে। এ অবস্থায় না আসিলে সাকার ও নিরাকারের ভিতর একটা বিসদৃশ বিবাদের ভাব থাকিয়া যায়। নির্জ্জন গিরিগুহাবাসী সমাহিত ও যোগধ্যানরত নিরাকার ব্রহ্মোপাসক ঋষি মুনির মহাভাব হইতেই আকারের ভাবও আসিয়াছে। নিরাকার উপাসনা ভারতীয় আর্য্য ঋষির ব্রহ্মের নিরাকার ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। নিরাকার উপাসনা যখন সেই অবাঙ্-মানস-গোচর মহান্ সত্তার আলোকের ভাব উপাসকের অন্তরে উদ্দীপিত করিয়াছিল, তখন সেই পরব্রহ্মের অনুভূতি আসিয়াছে। তাঁহার আলোক-দানের ভাব হইতেই অব্যক্ত "ব্রহ্ম" শব্দের উৎপত্তি। সাধনশীল ঋষি-কণ্ঠ-উচ্চারিত ব্রহ্ম শব্দ আজও আর্য্যভূমিতে চলিতেছে। সাধারণ মানব-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা হইতেই ব্রহ্মবাদ সাকারবাদে আসিয়া পড়িয়াছে। সাকার দেব দেবীর ভিতরেও ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণী নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মের ভিতরে যে সর্ব্বদিক্ সম্পন্ন মহাভাব বর্ত্তমান, সেই মহাভাব হইতেই সাকার "দুর্গা" মূর্ত্তি ভারতে আসিয়াছে। এই "দুর্গা" ভাব ব্রহ্মের দুষ্প্রবেশ্য ভাব লইয়া সাকারে বিভাসিত হইয়াছে। ব্রহ্মের সর্ব্বদিক্-সম্পন্ন মহাভাব লইয়া দুর্গার দশদিক্‌ব্যাপী দশ হস্ত, তাঁহার জ্ঞানভাব-প্রসূত ভাব লইয়া "সরস্বতী" অর্থাৎ বাগ্দেবী মূর্ত্তি, তাঁহার মহামাতৃভাব-প্রসূত মহাভাব লইয়া তাঁহার ধন-ধান্য-প্রদায়িনী "লক্ষ্মী" মূর্ত্তি, তাঁহার দুর্দ্দমনীয় রিপুজয়কারী ভাব লইয়া "কার্ত্তিকেয়" অর্থাৎ "মহাসেন" মূর্ত্তি, সমগ্র জনমণ্ডলীর উপর তাঁহার দেবত্ব ও কর্ত্তৃত্ব ভাব লইয়া "গণেশ" মূর্ত্তি এবং তাঁহার "অসুর" অর্থাৎ পাপদলন ভাব লইয়া অসুরনাশিনী মূর্ত্তি একাধারে প্রকটিত হইয়াছে। অপরাপর সাকার মূর্ত্তিও এইরূপ এক একটা আংশিক ভাবব্যঞ্জক হইয়া আসিয়াছে। হিন্দু ঋষি এই সকল মূর্ত্তিকে প্রকৃত ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। এ সমস্তকে প্রতিমা শব্দে অর্থাৎ নিগূঢ় ব্রহ্মের ছায়া অথবা প্রতিকৃতি বলিয়া আখ্যা দান করিয়া গিয়াছেন। দুর্গোৎসবে তিন দিন পূজার পরেই মূর্ত্তির বিসর্জ্জন অর্থাৎ মূর্ত্তি যে কিছুই নহে, তাহারই প্রতিপাদন। হিন্দুঋষি সাধারণ জনমণ্ডলীর ব্রহ্ম-দর্শন ও বিশ্বাসের তরলতা অনুভব করিয়া একটা অভিজ্ঞতার উপর মূর্ত্তির প্রবর্ত্তনা আনয়ন করিয়াছিলেন। সাকারের পথে যে উপাসক "ইহাগচ্ছ" "ইহ তিষ্ঠ" বলিয়া উদ্বোধন আরম্ভ করিতেছেন, ইহার অর্থ কি? "তুমি এস" "তুমি প্রতিষ্ঠিত হও" এই দুই মহা-শব্দের ভিতর "তুমি" যে নিরাকার ব্রহ্ম, ইহা কোন্ সাধক না বুঝিবেন? শিশু-বিদ্যালয়ে কিণ্ডারগার্টেনের (Kindergarten) এবং ভূগোলশিক্ষায় মানচিত্রের প্রয়োজন হয়। শিশু তাহার শৈশবে সকল বস্তু দেখিয়া উঠিতে পারে না, এই জন্য তাহার বস্তুজ্ঞানের সাহায্যার্থ Kindergarten এবং ভূগোল-শিক্ষায় সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া সৃষ্টি-তত্ত্ব বুঝিয়া উঠিতে পারে না, এই জন্য মানচিত্র। মানচিত্রে পর্ব্বত ও সমুদ্রাদি যেরূপ ক্ষুদ্রাকারে অঙ্কিত আছে, শিক্ষার্থী শিশু কি তাহাদিগকে সেইরূপ ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করে? কখনই নহে। প্রকৃত ভক্ত ভক্তি-চক্ষে সাকারের ভিতর ক্ষুদ্র ও সীমাবিশিষ্ট ব্রহ্মকে দেখেন না। সাকার উপাসক "অনন্ত" মূর্ত্তির অনুভূতিতেও মূর্ত্তির প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতেও এ সাকার ভাব আসিয়াছে। যে ভাবে ভারতে বাগ্দেবী, সেই ভাবে পাশ্চাত্যে মিনার্ভা (Minerva), যে ভাবে ভারতে কার্ত্তিক, সেই ভাবে সেখানে মার্স (Mars) এবং যে ভাবে ভারতে গণেশ, সেই ভাবে সেখানে জুপিটর (Jupiter)। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এইরূপ ভাবের সমতা একই সময়ে আসিয়াছে।

এখন বলিতে আসিলাম যে, সাধনের পথে নববিধানে ভক্ত ব্রহ্মানন্দ এই সাকার-সম্ভূত মহাভাব অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি ব্রহ্ম-মন্দিরের বেদী হইতে দুর্গার মহাভাবের ব্যাখ্যা উপাসক-মণ্ডলীর সমক্ষে ব্যাখ্যান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভিতর হইতে "দুর্গা", "জগদ্ধাত্রী", "কার্ত্তিক", "গণেশ", ও "হরি" প্রভৃতির যে মহাভাব আসিয়াছে, তাহা ধর্ম্ম-জগতে কোন্ সাধক অস্বীকার করিতে পারিবেন? সাকারের ভিতর হইতে নিরাকার। ইক্ষু হইতে সুমিষ্ট শর্করা উৎপন্ন হইল। বাহিরের খোসা পড়িয়া থাকিল, আর ভিতর হইতে শস্য আসিয়া পড়িল। সাকার আসিয়াও নিরাকারে সাহায্য করিলেন। নববিধান কোন মহাভাবকে প্রত্যাখ্যান করিতে আসেন নাই। ভক্ত কেশবচন্দ্রের চক্ষু এই সাকার-বাদের ভিতরেও নিরাকারের মহাভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভক্ত কেশব একদিকে খ্রীষ্টবাদ, বৌদ্ধবাদ, ইস্লামবাদ ও বৈষ্ণববাদ প্রভৃতির সঙ্গে ভাবের গৃহে মিলিয়া গেলেন, অপর দিকে হিন্দুবাদের সঙ্গেও মিলিলেন। তিনি সাধনের মধুচক্রে সকল রসের সমতা ও মিলন দেখিতে পাইলেন। মধুচক্রে নানা জাতীয় পুষ্পরসের বিবাদ থাকে না। বিবাদ বাহিরে, আর ভিতরে মিলন। নববিধান না আসিলে এ ভাবের মিলন অসম্ভব। ভাই! নববিধান সাধন কর। মিলন অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

বাসুদেব সার্ব্বভৌমোদ্ধার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গৌর। কেন শিক্ষা দিলেন, জানি না। শুনিয়াছি, তিনি নাকি বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া মায়াবাদ প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার নিজের মত অন্যরূপ ছিল। এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য শঙ্করাচার্য্যের রচিত নিম্নোক্ত বচনটী ব্যাখ্যা করিলেন।

"যদ্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং, ন মামকীয়স্তম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ।"

"হে নাথ! ভেদজ্ঞান অপগত হইলে যদিও সৃষ্টিতে ও তোমাতে প্রভেদ থাকে না; তথাচ আমি তোমারই রচিত। তুমি কখনও আমার রচিত নও। সমুদ্রেরই তরঙ্গ হইয়া থাকে, তরঙ্গের সমুদ্র সম্ভবে না।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, 'তাহাই যেন হইল। কিন্তু শ্রুতিতেও তো নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ রহিয়াছে।'

গৌর উত্তর করিলেন, যেমন নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তেমনি সবিশেষ তত্ত্বের কথাও আছে। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ধরিয়া বুঝিতে গেলে শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না। সমগ্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও অভিপ্রায় বুঝাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। শ্রুতি যেমন বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ, হস্তপদাদিশূন্য, তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই; তিনি নাম, রূপ, উপাধি বিহীন, নীল লোহিতাদি বর্ণবিহীন, শুদ্ধ সত্ত্ব চৈতন্যময়; তেমনি অনেক স্থানে বলিয়াছেন, তিনি তেজোময়, অমৃতময়, রসস্বরূপ, পরমসুন্দর, সহস্র সহস্র তাঁহার মস্তক, সহস্র সহস্র তাঁহার হস্ত পদ, তিনি সর্ব্বত্রগামী, সকলই গ্রহণ, দর্শন ও শ্রবণ করেন; সচ্চিদানন্দরূপ, জ্ঞানবান্ বিধাতা, পরম পুরুষ, পরমাত্মা। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব এই বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্ট্যতীতে তিনি নির্গুণ নির্ব্বিশেষ; আর সৃষ্টি সম্বন্ধে সবিশেষ সগুণ, পরম পুরুষ ভগবান্। আমরা সৃষ্টি সম্বন্ধীয় জীব; সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্বে প্রকাশিত ব্রহ্ম-স্বরূপেই আমাদের বিশেষ অধিকার।

সার্ব্বভৌম গৌরের তত্ত্বজ্ঞানের গভীরতা অনুভব করিয়া, পূর্ব্বে তাঁহাকে বালক সন্ন্যাসী জ্ঞানে যেরূপ উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, সে ভাব আর রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির উদয় হইল। ভট্টাচার্য্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি সৃষ্টিকার্য্যের সহিত ব্রহ্মের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে? তাঁহার সৃষ্ট প্রকৃতিই তো সব করিতেছে; তবে আর তাঁহার বিধাতৃত্ব মানিবার প্রয়োজন কি?"

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "বিধাতৃত্ব না মানিলে চলিবে কেন? সৃষ্টিলীলার মূলেই তো বিধাতৃত্ব। যাঁহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা সুরক্ষিত হয় এবং অবশেষে যাঁহাতে লয় হইয়া যায়, এই যে ব্রহ্ম-লক্ষণ বেদে নিরূপিত হইয়াছে, ইহাতেই তো তাঁহার বিধাতৃত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন, পালন, লয় যিনি করিতেছেন, তাঁহাকে বিধাতা বলিবেন না কেন?

সার্ব্বভৌম এরূপ তর্ক যুক্তি পূর্ব্বে আর কখন শুনেন নাই। তিনি আজন্ম মায়াবাদী ভাষ্য পড়িয়া মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদকেই ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণে চরম সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; অন্যদিকে তাঁহার চিন্তা-স্রোত কখন আকৃষ্ট হয় নাই। এক্ষণে গৌরের নিকট এই কথা শুনিয়া তাঁহার অন্তরে আর এক চিন্তারাজ্য খুলিয়া গেল ও নানা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তাঁহাকে না হয় বিধাতা বলিয়া মানিলাম; কিন্তু তাঁহার শক্তি অনন্ত, কোথায় কোন্ ভাবে কি প্রকারে তাঁহার শক্তি কার্য্য করিতেছে, আমরা তাহার কি জানি? দয়া, করুণা, শান্তি, পবিত্রতা, কামক্রোধাদি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, ইচ্ছা, ভৌতিক, দৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আরও কত অজ্ঞেয় শক্ত্যাদি, সকলই ত তাঁহার শক্তি। ইহাদিগের আবার অনন্ত বৈচিত্র্য, অনন্ত বিভেদ, অনন্ত সমাবেশ। এ সব ভাবিতে গেলে আত্মহারা হইতে হয়; কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারা যায় না। সে অবস্থায় শক্তি ও শক্তিমানের পার্থক্য কিরূপে বুঝিব? শক্তি হইতে কি তিনি ভিন্ন?

গৌর বলিলেন, শক্তিতত্ত্বে তাঁহার প্রকাশ; কিন্তু শক্তি ও তিনি এক নহেন। শক্তি হইতে তাঁহাকে অভিন্নাত্মক মানিতে গেলে আবার নির্ব্বিশেষ তত্ত্বেই আসা গেল; প্রশ্নের মীমাংসা কিছুই হইল না। প্রথমে আপনি যে নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সে না হয় সত্তা-নির্ব্বিশেষ; আর এখন বলিতেছেন, শক্তি-নির্ব্বিশেষ। ফল একই রূপ, উপাসনা তত্ত্ব কি কর্ম্মের দায়িত্ব, ইহার কোনটীতেই সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু তাঁহাকে যদি সকল শক্তির কেন্দ্র স্থান বলিতে পারা যায়, তবে মীমাংসার বিষয় সুখসাধ্য হয়। সূর্য্যের এক একটী কিরণকে যেমন সূর্য্য বলা যায় না, তাহা সূর্য্যের অত্যল্প প্রকাশ মাত্র; তেমনি ভগবানের এক একটী শক্তিকে ভগবান্ বলা অযৌক্তিক; সে সব শক্তিতে ভগবানের প্রকাশ মাত্র।

সার্ব্বভৌম। তাঁহাতে কোন্ শক্তি কিরূপে লীলা করিতেছে, কেমন করিয়া বুঝিব?

চৈতন্য। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, অনন্তের অনন্তশক্তি জীবের বোধাতীত। সৃষ্টি-রাজ্যে তাঁহার যত শক্তি প্রকাশ হইয়াছে, তাহাও কেহ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তবে আত্মতত্ত্বে তাঁহার প্রকাশ। যাহার যেমন জ্ঞান ও অধিকার, শাস্ত্র ও গুরু উপদেশে যে যতদূর আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, সে ততটুকুই জানিতে পারে। সচ্চিদানন্দ ভগবানের অনন্ত অচিন্ত্য শক্তির মধ্যে তিনটী প্রধানা চিচ্ছক্তির বিষয় আমরা জানিতে পারি। তিনি 'সৎ' অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমানাবস্থায় নিত্য কাল আছেন। এই শক্তির নাম সন্ধিনী; ইহাতেই দিগদেশকাল সমস্ত সৃষ্টি আশ্রিত।

তিনি কিছু অচৈতন্য জড় বস্তু নহেন, চিরজীবন্ত জাগ্রত পুরুষ। এই শক্তিকে 'সম্বিৎ' শক্তি বলা যাইতে পারে। আর ভগবানের যে শক্তিতে প্রেম, আনন্দ আশ্রিত, তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি। এই তিন শক্তিকেই অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি বলা যায়। উহা ভগবদ্রূপে চিরপ্রকাশিতা। আর জীবশক্তি তটস্থা; উহা কেবল সৃষ্টিকালেই তাঁহাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে; সৃষ্ট্যন্তে নিদ্রিতাবস্থায় থাকে। অবশেষে, মায়াশক্তি বহিরঙ্গা; তাহা ব্রহ্ম হইতে প্রকাশ হইয়া ব্রহ্মরূপকে স্পর্শ অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপের উপর আধিপত্য বিস্তার না করিয়া দূরে থাকে। সৃষ্টি-লীলার উপরই ইহার প্রভাব। ইহার অর্থ এই যে, সচ্চিদানন্দ পুরুষের সৎ, চিৎ, আনন্দ শক্তি তাঁহার ইচ্ছায় অতি অপূর্ণরূপে সৃষ্টিতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই অপূর্ণ শক্তি হইতে অপূর্ণ জ্ঞান; আবার অপূর্ণ জ্ঞানেই ভ্রান্তি বৃদ্ধি। ইহারই নাম মায়া। সুতরাং মায়ার প্রভাব ব্রহ্মের স্বরূপে থাকিতেই পারে না। মায়াবাদ-ভাষ্যে মায়াকে অবস্তু বলা হইয়াছে; প্রকৃত পক্ষে উহা অবস্তু নয়; অসম্পূর্ণ জ্ঞানমূলক মাত্র। এমন যে ঐশ্বর্য্যময় ভগবত্তত্ব, ইহাকে আপনি কোন্ সাহসে নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বলিতে চাহেন? যে প্রভুর ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই, জ্ঞানের অন্ত নাই, যাঁর চিচ্ছক্তিবিলাস ভক্ত-হৃদয়ে কত সুখতরঙ্গ তুলিয়া দেয়, যিনি মায়াকল্পনার অতীত, আপনি কোন্ প্রাণে তাঁহাকে মায়ামুগ্ধ জীবের সহিত অভেদ বলিতে সাহস করেন?

সার্ব্বভৌম। তবে তাঁহার রূপ কি?

চৈতন্য। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়, লীলাবিলাসী। পূর্ণানন্দ বিগ্রহ, কল্পনার বিষয় নয়, প্রত্যক্ষ-সাধ্য। শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত পাষণ্ডী। বুদ্ধ বেদ মানেন নাই বলিয়া তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া থাকেন; আর শ্রীবিগ্রহ না মানিলে মানুষ যে ভীষণতর নাস্তিক হইয়া যায়, তাহা দেখিতেছেন না কেন? এক আপত্তি করিতে পারেন যে, বিকার না হইলে সৃষ্টি হয় না; ঈশ্বর কি তবে বিকারী হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? এ আপত্তি অতি অকর্ম্মণ্য। অচিন্ত্য অভাবনীয় শক্তি যাঁহার, তিনি কি সৃষ্টি করিয়াও অবিকারী থাকতে পারেন না? মণির কথা কি শুনেন নাই? স্বর্ণ প্রসব করিয়াও মণি পূর্ব্বের অবস্থায় যদি থাকিতে পারে, তবে বিচিত্রকর্ম্মা ভগবান্ কি সৃষ্টি করিয়াও মায়াতীত থাকিতে পারেন না? ভ্রান্তিজ্ঞানমূলক বিবর্ত্তবাদ-মত কোন মতেই টিকিতে পারে না।

ক্রমশঃ।

["চৈতন্যলীলামৃত" হইতে উদ্ধৃত]

—•—

প্রেরিত ভাই কেদার নাথ দে।

জন্ম ও বাল্যজীবন।

কলিকাতার দক্ষিণে চব্বিশ পরগণার অন্তর্ভূত সোণারপুরের নিকটে হরিনাভী গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত দে পরিবারে ১৮৩৮ সালের কার্ত্তিক মাসে শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে রাত্রি ১১টার সময় ভাই কেদার নাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম শ্রীরাম কুমার দে, পিতামহের নাম শ্রীভৈরব চন্দ্র দে ছিল। হরিনাভী গ্রামের অধিকাংশ ভূমিই এই দে বংশের অধিকারভুক্ত ছিল। পূর্ব্ব সময়ে ইঁহারা বড় তালুকদার ছিলেন। কালক্রমে শ্রীরাম কুমার দে Treasuryতে বড় কাজে নিযুক্ত হন। তখন সেখানে দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি অনেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত। এরূপ কিংবদন্তি আছে, ১২৭১ সালে ভীষণ ঝড় হইয়া কত নগর গ্রাম ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, কোথাও দাঁড়াইবার স্থান ছিলনা। তখন সে গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী ইঁহাদিগের আশ্রয়ে রক্ষা পাইয়াছিল। সে বিশাল অট্টালিকা যে কিরূপ মাল মশলা দ্বারা পরিপাটীরূপে নির্ম্মিত হইয়া ছিল, কোন সময়ে সিঁদ কাটিবার জন্য সারারাত্রি পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়াও চোর একখানি ইষ্টক খসাইতে পারে নাই। এই সকল কথা শুনিলে মনে হয়, দুর্গ বিশেষ ছিল। প্রাচীন কালের নির্ম্মাণ-কৌশল কি অদ্ভুত ছিল।

মহাত্মাদিগের জন্ম অনেক সময় আশ্চর্য্যরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। অনেকদিন গৃহে পুত্র জন্মে নাই, বৃদ্ধ ভৈরব চন্দ্র পৌত্র-মুখ দর্শনে আগ্রহান্বিত ছিলেন। "কেদারেশ্বর" দেবতা পূজা করিয়া শ্রীকেদার নাথ ও আর একটী ভগিনী যমজ হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ কন্যা প্রসূত হয়, তাহাতে সকলে দুঃখিত হন। কিছুক্ষণ পরে একটী আবরণ সহ বস্তু দেখা গেল। পরে চিরিয়া দেখা গেল, অপূর্ব্ব সুন্দর কুমার! তখন আনন্দের সীমা আর রহিল না। তাঁহার জন্মস্থানটী এখনও বর্ত্তমান আছে।

বিধাতার বিধান কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। দুই বর্ষ ছয় মাসের সময় শিশু মাতৃহীন হইলেন। তখন হইতে পিতামহী ভৈরবী দেবী শিশুর লালন পালনের ভার স্বহস্তে লইলেন। শ্রীরামকুমার দে ভক্ত ছিলেন। পত্নী-বিয়োগে নিতান্ত উদাসীন ও বৈরাগী ভাবে বাহিরে থাকিতেন। অনেক দিন পরে পুনঃ বিবাহ করিয়াছিলেন। কেদারনাথের মাতার ন্যায় বিমাতাও সুন্দরী ছিলেন। তিনি মাতার ন্যায় বিমাতাকে চিরদিন ভক্তি করিয়াছিলেন।

অতি শৈশবেই কেদারনাথ ধীশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। বাড়ীর ও পল্লীর বালকগণের সঙ্গে যখন খেলা করিতেন, সকলেই ভালবাসিত ও প্রাধান্য দিত। পিতামহীর আদরে আব্দার করিয়া বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হইতেন; কিন্তু যে দিন উপস্থিত হইতেন, তৎক্ষণাৎ সব বইর সব পড়া এত কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন যে, শ্রেণীতে প্রথম হইতেন। ইংরাজী ও গণিতে অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার হস্তাক্ষরও অতি সুন্দর ছিল। ক্রমে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী Senior পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বপ্রথম হন। তখনকার সময়ে এই Senior পরীক্ষাই সর্ব্বোচ্চ ছিল। এই পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়া শেষ করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হন। পিতা শ্রীরাম কুমার তখন জীবিত ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমলতা চন্দ।

প্রার্থনা।

(২৭শে মে, স্বর্গগত প্রেরিত-প্রবর প্রতাপ চন্দ্রের সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীমতী হেমলতা চন্দের প্রার্থনার সার।)

হে স্নেহময় পিতা, জানি, সকল বিষয়েই তোমার মঙ্গল হস্ত তুমি জীবের কল্যাণের জন্ত রাখিয়া দিয়াছ। তাই মনে হইতেছে, আজ তোমার শান্তি-কুটীরে এই মহাসভার আয়োজন কেন? যিনি এই কুটীরে সকলকে আহ্বান করিয়া বড়ই আনন্দিত হইতেন, আজ তিনি দেহে এ মহাসভায় উপস্থিত না হইলেও, তুমি নিজে দেখাইতেছ, তোমার অদৃশ্য ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যে, তুমি তাঁকে কি মহাগৌরবে, কোন উচ্চ সিংহাসনে তোমার প্রেম পুণ্যের মুকুট পরাইয়া সস্নেহে বসাইয়াছ। তাই এ মহাসভা মধ্যে তাঁকেও দেখিতেছি। এ গৃহের সকল স্থান যে তিনি-ময়। তাঁর শান্তিময় জীবন এ গৃহে বিরাজিত। এই শান্তি-কুটীরের ক্ষুদ্র উপাসনা-গৃহে যখন তিনি দৈনিক উপাসনা করিতে বসিতেন, সেই প্রশান্ত গম্ভীর অথচ তোমার পুণ্য জ্যোতিতে পূর্ণ সে মূর্ত্তি মনে পড়িতেছে। একতারীসহ একটী গান করিয়া যখন তোমার আরাধনা প্রার্থনাতে মগ্ন হইতেন, সেই অল্প সময়ের মধ্যেও মনে হইত, স্বর্গের দেবমূর্ত্তি তোমার সঙ্গে মিশিয়া, হে জ্যোতির্ম্ময়, তোমার পূজা করিতেছেন। সেই স্বর্গীয় দেবাত্মার উপাসনায় যোগদান করিয়া, হে পিতা, তুমি জান, কত ভাবে কতরূপে তোমার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছি। কি আকর্ষণ তুমি দিয়াছিলে, তুমিই জান। সেই যে বৎসর বেনেটোলার বাড়ীতে ভাদ্রোৎসবে প্রাতঃকালীন উপাসনা তিনি করিয়াছিলেন, একটী কথা বলিয়াছিলেন, যাহা এখনও মনে অনন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। যখন শুনিলেন, মেয়েদের স্থান অল্প ছিল, অনেকে ভাল শুনিতে পান নাই, তখনই নাম করিয়া বলিলেন, "অমুক তো শুনিয়াছিল? এসব উপদেশ তাহাদের জন্যই দেওয়া"। সে দিন পরলোক-তত্ত্ব বিষয়ে কি মধুর উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁর স্নেহ সকলের প্রতিই ছিল। তাঁহার কুটীরে কেহ আসিলেই তিনি সুমিষ্ট সম্বোধনে কত সুখী করিতেন। হে জননীর জননী, তিনি কষ্ট কত প্রকারে পাইয়াছিলেন, সে সমুদায় এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে চির-মুদ্রিত। কখনও যে ভুলিবার নয়। কিন্তু পিতা, তোমার লীলা অধম আমি কি বুঝিব, যে কার্য্যের জন্ত ভবে তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলে, সেই দেশ দেশান্তরে তোমার ধর্ম্ম, তোমার বিধান প্রচার করিয়া, এই শান্তি-কুটীরে শান্তভাবে অনন্ত শান্তির রাজ্যে চলে গেলেন। এই পৃথিবীতে তাঁহার উপাসনা সময়ে যাঁহার গানের জন্য তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন, জানিতেছি, আজ সেখানে, যেখানে শান্তি কুশল ও মিলনের রাজ্য, সেই স্বর্গ-নিকেতনে তিনি উপাসনাতে সেই গান শুনিতেছেন। তিনি আমাদের সকলকেই বড় স্নেহ করিতেন। আমরা তাঁহার চরিত্র যেন না ভুলি। তিনি যে পুণ্যে সুশোভিত, যে শান্তিতে চির সমুজ্জল হইয়াছেন, আমরাও যেন তাঁহার উপদেশ, তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার চরণ অনুসরণ করিয়া, হে অনন্ত-রাজ্যেশ্বর, তোমার পুণ্য নিকেতনে তাঁহার সঙ্গে চির মিলিত থাকি।

—•—

শ্রীকেশবচন্দ্র সঙ্গে।

একদিন কমল কুটীরে গিয়াই দেখিলাম, আচার্য্যদেবের গাড়ী তৈয়ারী। একটু পরেই চোগা চাপকান টুপি পরিয়া আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র বাহিরে যাইবার জন্ত উপর হইতে নামিয়া আসিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "ঠিক সময়েই এসেছো, যাবে নাকি?" আমি বলিলাম, "হাঁ, যাব বই কি।" কোথায় যাচ্ছেন, তখনও কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তিনি গাড়ীতে উঠিতেই আমিও উঠিলাম। বোধ হয়, প্রচারক মহেন্দ্র বাবুও উঠিলেন। গাড়ী একবারে লাল বাজার পুলিশ কোর্টের সামনে গিয়া থামিল।

"মুক্তি ফৌজের" একজন নেতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ধর্ম্ম-প্রচার করার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়া সেখানে ফৌজদারিতে সোপর্দ্দ হইয়া আনীত হইয়াছিলেন, সে দিন তাঁহারই মকদ্দমা হইতেছিল। সেই ধর্ম্ম-যাজক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন এই মনে করিয়া, তাঁহার জরিমানার টাকা দিবার জন্যই শ্রীকেশবচন্দ্র টাকা লইয়া গমন করেন। সেখানে আচার্য্যদেব গিয়া গাড়ীতে বসিয়া রহিলেন, এবং মকদ্দমার কি হইতেছে জানিবার জন্ত আমরাই আদালতের ভিতরে গিয়া মকদ্দমার বিষয় খবর লইলাম। আমার যতদূর মনে হয়, যদিও কেশবচন্দ্র জরিমানার টাকা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে সে টাকা দিতে হয় নাই। যাহা হউক, এই ঘটনা যে তাঁহার সর্ব্বধর্ম্ম-সাধকদিগের প্রতি উদার প্রেম ও সহানুভূতির পরিচায়ক, বলা বাহুল্য। এইরূপ যখনিই কোন খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের সম্বন্ধীয় কোন কার্য্য করিতে হইত, এ সেবককে প্রায়ই তাহা করবার সুযোগ দিতেন।

"ব্যাণ্ড অফ্ হোপের" সংস্রবে খৃষ্টীয়-ধর্ম্মাবলম্বী প্রচারকদিগের অনেকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়। বিশেষ ভাবে অক্সফোর্ড মিশনের ক্যানন ব্রাউন সাহেবের সঙ্গে বিশেষ সম্প্রীতি হইয়াছিল। আমাকে তিনি একজন ভক্ত বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অচিরে দীক্ষা লইয়া তাঁহাদের মণ্ডলীভুক্ত হইতে পারি, যথেষ্ট আশা করিয়াছিলেন। তিনি কতই আমার খোঁজ খবর লইতেন, কতই আমাকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু যখন দেখিলেন, আমি তাঁহাদের মণ্ডলীভুক্ত হইলাম না, তখন বলিলেন, "কেশব বাবুর সম্বন্ধে যেমন আমি বিশ্বাস করি, তিনি এক ভাবে খৃষ্টকে গ্রহণ করিতেছেন, আমরা একভাবে গ্রহণ করিতেছি, তেমনি তোমার সম্বন্ধেও মনে করি, আমরা একপথে যাইতেছি, তুমি আর এক পথে যাইতেছ।"

কেশবচন্দ্র মাঝে মাঝে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী সাহেবদিগকে নিমন্ত্রণ

করিয়া, দেশীয় প্রথা অবলম্বনে মাটিতে আসনে বসাইয়া কলা-পাতাতে প্রীতিভোজন করাইতেন। মিস্ পিগটের স্কুলে, যে বাড়ীতে এখন Refuge বা আতুর আশ্রম আছে, সেই বাড়ীতে এইরূপ এক প্রীতিভোজ হয়। অনেকগুলি ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান—সাহেব বাঙ্গালী একত্রে বসিয়া লুচি তরকারী দই সন্দেশ প্রীতি-পূর্ব্বক ভোজন করেন। এইরূপ আচার্য্যদেবের কমল-কুটীরের উপর বারাণ্ডাতেও প্রীতিভোজন হয়। স্থানের সংকুলান না হওয়াতে ব্রাউন সাহেব আমাকে লইয়া এক পাতে আহার করেন। এই প্রীতিভোজে খৃষ্টবাদীদের সঙ্গে নববিধান-বিশ্বাসী-দের ক্রমে আন্তরিক প্রীতি ও সদ্ভাব বর্দ্ধিত হইতেছিল।

দীন—সেবক।

টাঙ্গাইল অঞ্চলে প্রচার।

৩রা জুন, রবিবার, কুমুল্লী গ্রামে পৈতৃক বাড়ীতে স্থিতি করি। সন্ধ্যার পর পল্লীর মেয়ে পুরুষ কয়েকটী আমার আহ্বানে মিলিত হইলে তাঁহাদিগকে লইয়া রবিবাসরীয় উপাসনার ভাবে সঙ্গীত প্রার্থনা ও ধর্ম্ম প্রসঙ্গাদি উপস্থিত সকলের উপযোগী করিয়া যথাসম্ভব করা হয়। আত্মীয় স্বজন, পাড়াপ্রতিবাসীর কিঞ্চিৎ সেবা এই ভাবে করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হই।

৫ই হইতে ২৪শে জুন পর্য্যন্ত টাঙ্গাইলে, আমার প্রীতিভাজন বন্ধু ডাক্তার সুকুমার বসুর বাসায় আতিথ্য স্বীকার করিয়া তথায় বাস করি। এই সময় মধ্যে সময় সময় সুকুমার বাবুর বাসায় ও সময় সময় শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ তালুকদার মহাশয়ের বাসায় পারি-বারিক ভাবে, কখন কখন ২।৩টী নববিশ্বাসী বন্ধু সহ মিলিত হইয়া উপাসনাদি করি। ১০ই জুন, রবিবার, টাঙ্গাইল নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে পূর্ব্বাহ্ণে সামাজিক উপাসনার কার্য্য করি।

১৫ই জুন, শুক্রবার, টাঙ্গাইল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় দুর্গাদাস বসু মহাশয়ের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে বাঘিলে তাঁহাদের বাটীতে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। সেই অনুষ্ঠানে উপাসনার কার্য্য করি। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ও টাঙ্গাই-লের উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে আগত শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ শী সঙ্গীত করেন। উপাসনাতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় ও গ্রামের অন্যান্য কেহ কেহ যোগদান করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে কৃষ্ণকুমার বাবু স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের জীবন-কাহিনী এবং কি ভাবে এই বাঘিল গ্রামে ও বসু মহাশয়দিগের পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার হয়, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করেন। তৎপরে পুরুষ মহিলা অনেকেরই এখানে মধ্যাহ্ন ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানটী বেশ গম্ভীরভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।

১৬ই জুন, শনিবার হইতে ১৯শে জুন, সোমবার পর্য্যন্ত টাঙ্গাইল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। শনিবার সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে উদ্বোধনসূচক উপাসনা হয়। "স্বর্গ রাজ্যের আশা" বিষয়ে আচার্য্যদেব-কৃত প্রার্থনা পঠিত হয় এবং "ঈশ্বরের অমৃত বক্ষই আমাদের স্বর্গরাজ্য" এই ভাবে আত্ম-নিবেদন করা হয়।

১৭ই জুন, রবিবার, সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণে ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা হয়। "নৈকট্য-সম্ভোগ" আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পঠিত হয়। "পরব্রহ্ম পিতা মাতা বন্ধু ও সহায়রূপে এবং বিশেষভাবে সুমিষ্ট মাতৃরূপে প্রকাশিত হইয়া তিনি আমাদের কত নিকটে, ইহা এই উপাসনা কালে তাঁহার উজ্জ্বল মধুময় প্রকাশ দ্বারাই সাক্ষ্য দান করিতেছেন", এই ভাবে এ বেলা আত্ম-নিবেদন করা হয়। গতকল্য ও আজ এ বেলা উপাসনার কার্য্য আমাকে করিতে হয়। উপাসনার পর ভিখারী ভিখারিণীদিগকে তণ্ডুল ও পয়সা বিতরণ করা হয়। মধ্যাহ্নে প্রীতি-ভোজন হয়। অপরাহ্ণে আলোচনাদি হয়। সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ তালুকদার মহাশয় নির্ব্বাহ করেন। তিনি উপদেশে বলেন, রিপু-সংযম, পবিত্রতা-লাভ ইত্যাদি বিষয়ে আমি সাধন করিতে যাইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বরের ইঙ্গিত আমার প্রতি এই, বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত আমি ঈশ্বরের উপাসনা করিব, বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিব, তাহাতেই পরিত্রাণ হইবে। ১৮ই জুন, সোমবার, পূর্ব্বাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনায় আমি ব্যবহৃত হই। "ব্রহ্মের যন্ত্র" শীর্ষক আচার্য্যদেবের উপদেশের প্রথমাংশ এবং "আমরা মার হাতে গঠিত" প্রার্থনা পঠিত হয়। আজ উৎসবের তৃতীয় দিনের পূজায়, জাতীয় শারদীয় উৎসবে নবমীর মহাপূজার ভাবে আত্ম-বলিদান করিয়া আমরা ধন্য হই, এই ভাবে বেদী হইতে প্রার্থনা হয়। এদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় টাউনহলে বক্তৃতার কথা ছিল, কিন্তু নানা বাধা বিঘ্ন জন্য এদিন বক্তৃতা হইতে পারে নাই। সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে শান্তিবাচনের উপাসনা হয়।

এ সময় মেঘ বৃষ্টির দিন সত্ত্বেও স্থানীয় মুনসেফ বাবুদ্বয়, স্থানীয় হাই স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু প্রভৃতি গণ্য মান্য ভদ্রলোকগণ উৎসব দিনে উপাসনাদিতে যোগদানে উৎসব সম্ভোগে আমাদিগের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, কেহ অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে ধন্যবাদ দান করি। শ্রীমান কালিদাস তালুকদার প্রভৃতি এবং শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ শী সঙ্গীতাদি করিয়া উপাসনাদির বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

২২শে জুন, শুক্রবার, পূর্ব্বাহ্ণে শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ তালুকদার মহাশয়ের দৌহিত্রী ও শ্রীমতী ভক্তিমতী উকীলের শিশু কন্যার জাতকর্ম্ম উপলক্ষে আশা কুটীরস্থ দেবালয়ে উপাসনা করি। সন্ধ্যা ৭॥০টার পর স্থানীয় টাউনহলে ভারতে ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বন করিয়া "আমার প্রাণের কথা" বিষয়ে বক্তৃতা করি।

২৪শে জুন টাঙ্গাইল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করি। নিজ আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া আত্ম-নিবেদন করি। পরম জননীর কৃপায় উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল,

হয়। উল্লেখ করিয়া শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ তালুকদার মহাশয় প্রার্থনা করেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

মুঙ্গের ভক্তি-তীর্থ।

(মুঙ্গের নববিধান ব্রহ্মমন্দির মেরামত ও কম্পাউণ্ডের উন্নতি।)

বিগত ১৯২৭ সনের অক্টোবর হইতে ১৯২৮ সনের জুন পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত দাতৃগণ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন—

শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেন ৫৲, কুমারী সুনীতি বালা দাস দুই দফায় ৫৲, শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র দাস ১৲, ডাক্তার বিধান প্রসাদ মজুমদার ২৲, শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষ ২৲, শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র কুণ্ডু ১৲, শ্রীমতী ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী ১৲, ডাক্তার অন্নকূলচন্দ্র মিত্র ১৲, কুমারী শান্তিপ্রভা মল্লিক ১৲, ডাক্তার শশিভূষণ দাসগুপ্ত ১৲, শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র চন্দ ১৲, মুঙ্গের ব্রহ্ম-মন্দিরের ট্রাষ্টী প্রফেসার নিরঞ্জন নিয়োগী ২৲, মিঃ পি, কে, সেন ১০৲, মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার পক্ষ হইতে প্রফেসার প্রেমসুন্দর বসু ১০৲, শ্রীমতী হেমলতা চন্দ ১৲, শ্রীমতী শান্তিসুধা রায় ১৲, শ্রদ্ধেয় ভাই বিহারীলাল সেন ৫৲, শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা ১৲, মোট প্রাপ্ত ৫১৲ একান্ন টাকা।

ব্যয়।—ব্রহ্মমন্দিরের কপাটে রং লাগান ও ভিতর বাহির কলি ফেরান, সমাধিগুলি মেরামত, কম্পাউণ্ডের মাটী স্থানে স্থানে সমতল করান এবং স্বর্গীয় গৃহস্থ প্রচারক ও মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরের উপাচার্য্য স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বাগচি মহাশয়ের সমাধির প্রথমাংশ নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্যে মোট ব্যয় ৬১৷৷০ টাকা এবং সমাধিচত্বরের পশ্চিম দক্ষিণ দিকে আর একটী ইষ্টকের বেঞ্চ বা সাধনের বেদী প্রস্তুতের ব্যয় ৫৲, একুনে ব্যয় হইয়াছে ৬৬৷৷০ টাকা। ঋণ ১৫৷৷০ টাকা। ভক্তি-তীর্থের উন্নতি কল্পে উক্ত সময় মধ্যে আমার হাত দিয়া যে আয় ব্যয় হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রকাশ করিয়া, ঐ কার্য্যের জন্য আমার ঋণ ১৫৷৷০ টাকা, তীর্থানুরাগী ভাই ভগিনীদের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।

শান্তি-কুটীর,
নববিধান প্রচারাশ্রম,
৮৪নং অপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা।

নববিধান-তীর্থ-সেবক,
শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

সংবাদ।

শুভ বিবাহ—স্বর্গীয় হরিসুন্দর বসুর মধ্যম পুত্র, বোলপুর বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসুর সহিত, পাটনার শ্রীযুক্ত দামোদর পালের জ্যেষ্ঠা কন্যা, ভাগলপুরের স্কুল সমূহের এসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্ট্রেস শ্রীমতী অকিঞ্চনবালার শুভ বিবাহ পাটনায় সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন। নববধূর শুভাগমন উপলক্ষে গত ২৫শে জুন, সন্ধ্যাকালে, ভাগলপুরে, স্বর্গীয় হরিসুন্দর বাবুর গৃহে প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি হয়। শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রার্থনা করেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে স্বর্গের আশীর্ব্বাদ দান করুন।

নামকরণ—গত ১লা জুন, শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ওয়ার্কশপের অধ্যক্ষ শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র রায়ের শিশুপুত্রের নামকরণ কলেজের অন্তর্গত বাস-ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন এবং শিশুকে "সিতাংশু" নাম প্রদান করেন। ভগবান শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

আর্য্যনারী-সমাজের উৎসব—গত মাঘোৎসবে আর্য্যনারী সমাজের উৎসবের দিনে কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী, সি, আই, উপাসনা করেন। সেই উপাসনার উদ্বোধন, আরাধনা, উপদেশ, প্রার্থনাদির সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর বিবরণ শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত ধর্ম্মতত্ত্বের জন্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহা অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

ব্রহ্মমন্দির—গত জুন মাসের প্রথম দুই রবিবার, পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী এবং শেষ দুই রবিবার ভাই অক্ষয়কুমার লধ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৪ই মে, ১১এ স্কট্‌স্ লেনে রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র লাল খাস্তগীরের দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গীয় প্রশান্ত কুমারের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমবাসীদের সেবার্থ যোগেন্দ্র বাবু হইতে ৫৲ টাকা এবং নববিধান ট্রাষ্টের প্রশান্ত মেমোরিয়াল ফণ্ড হইতে ৭৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে, স্বর্গীয় রামলাল ভড়ের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনাদি হইয়াছে। পুত্রগণ এই দিনের স্মরণার্থ ৪৲ টাকা প্রচার ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

নিবেদন।

বহুদিনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ "ধর্ম্মতত্ত্ব" পাক্ষিক পত্রিকাখানি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্ররূপে সমাজের ও দেশের নানাভাবে সেবা করিয়া আসিতেছে। কিছুদিন হইতে অর্থাভাবাদি নানাবিধ কারণে ইহার পরিচালনা বিষয়ে নানা ত্রুটি হইয়াছে। আমরা সেজন্য অতীব দুঃখিত। আবার নূতন ব্যবস্থাধীনে আনিয়া, যাহাতে কাগজখানি পূর্ব্বমত সুপরিচালিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। এই নূতন ব্যবস্থায় আমরা গ্রাহক, অনুগ্রাহক, সহানুভূতিকারী, সাহায্যকারী সকলকে স্মরণ করিতেছি এবং তাঁহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি ভিক্ষা করিতেছি। আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া, অর্থদানে, সাহায্যদানে, পরামর্শ-দানে, প্রবন্ধাদি ও কাগজের মূল্যাদি পাঠাইয়া সকলে আমাদের সহায় হউন। আমরাও তাঁহাদের সেবকরূপে কাগজখানির পরিচালনা বিষয়ে যথাসাধ্য কর্ত্তব্য সাধন করিয়া ধন্য হই।

বিনীত
শ্রীঅক্ষয়কুমার লধ
কার্য্যাধ্যক্ষ।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priryanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৩ ভাগ। ১৩শ সংখ্যা। | ১লা শ্রাবণ, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক, ৯৯ ব্রাহ্মাব্দ। 17th JULY, 1928. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে মাতঃ, জননি, আমাদিগকে তুমি যে ধর্ম্মবিধান দিয়াছ, তাহা কতই বড়। কিন্তু আমাদের মত এত উচ্চ, জীবন কেন তেমন হইতেছে না? তোমার নববিধানের নাম ও তত্ত্ব বিস্তার করিতে আমাদিগের যত আকাঙ্ক্ষা, নববিধানের জীবন লাভ করিবার জন্য কেন আমাদিগের তেমনি আগ্রহ হয় না? যুগে যুগে তোমার ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ যাহা জীবনে দেখাইয়াছেন, তাহাইত শাস্ত্র বলিয়া তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণ প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগেও নবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক অগ্রে জীবনে যাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলেন, তাহাই বিধাতার নববিধান বলিয়া প্রচার করিলেন। তিনিত কোন মত, কোন তত্ত্ব ততক্ষণ প্রচার করেন নাই, যতক্ষণ না নিজ জীবনে তাহার আস্বাদ সম্ভোগ করিয়াছেন। তিনি যে তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞাত সত্যই সকলকে উপদেশ দিয়াছেন। তবে যখন আমরা নববিধান-প্রচারে আগ্রহান্বিত হই, আমরা কি আচার্য্যের ন্যায় অগ্রে জীবনে তাহা সাধন করিব না? আচার্য্য বলিলেন, "মত হইতে জীবন বড়," "ব্রাহ্মসমাজ হইতে নববিধান বহুদূর"। নববিধান যে বাস্তবিক জীবনের বিধান, ইহা মতের বিধান নয়। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এ বিধানকে শুষ্ক মতের বিধান মনে না করি; এবং সাধন দ্বারা ইহার তত্ত্ব যতক্ষণ না জীবনে উপলব্ধি করি, ততক্ষণ যেন তাহার প্রচারেও ব্যস্ত না হই। জীবন বিনা নববিধান নববিধান নয়, ইহাই বিশ্বাস করিতে দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

নববিধানের নব আবিষ্কার।

নববিধান এক নূতন আবিষ্কার। সমুদয় পুরাতন বিধান পূর্ণ করিতেই নববিধান সমাগত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল বিধান হইতেই ইহা উদ্ভূত, অথচ ইহা সম্পূর্ণরূপে সকল হইতে পৃথক ও নূতন। এমন কি, ব্রাহ্মসমাজের গর্ভে ইহা জন্মগ্রহণ করিলেও, যেমন মাতা এবং সন্তান এক নয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং নববিধানের পার্থক্যও সেইরূপ। আকাশ হইতে বারিধারার বর্ষণ হয়, কিন্তু আকাশ ও বারিধারা দুই এক নয়।

নববিধান সম্পূর্ণ এক নূতন সৃষ্টি। নূতনত্ব ইহার শক্তি ও জীবন। ইহা সকলকে নূতনত্ব বিধান করিবার জন্যই বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত।

নূতনত্বই জীবন। পুরাতন যাহা, তাহা মৃত, শুষ্ক। যে বীজে নূতন অঙ্কুর হয় না, তাহা মৃত। বীজ অঙ্কুরিত হইলেই সে বীজও মৃত হইয়া পড়ে এবং তাহা হইতে যে অঙ্কুর বাহির হয়, তাহা নূতন আকার ধারণ করে এবং ক্রমে ক্রমে নব নব বিকাশ তাহা হইতে উদগত হয়।

নববিধান বাস্তবিক সকলকে নবজীবন দিবার জন্যই আসিয়াছেন। মৃত ঈশ্বরকে, মৃত সাধুকে, মৃত শাস্ত্রকে, মৃত ধর্ম্মকে, মৃত সাধনকে, মৃত সংস্কারকে, মৃত বিধিকে, মৃত আচার ব্যবহারকে, মৃত শব্দকে, মৃত ভাষাকে, মৃত দেশকে, মৃত জাতিকে, মৃত মানুষকে, যাহা কিছু মৃত সকলকে নবজীবনে জাগ্রত জীবন্ত করিবার জন্যই নববিধানের আগমন।

তাই যে ঈশ্বর কেবল নামেতে, শব্দেতে, ভাবেতে, আন্দাজেতে, কল্পনাতে, মতেতে, জড় দেবদেবীতে, শাস্ত্রেতে বা সাধুর কথাতে নিবদ্ধ ও মৃত ছিলেন, তাঁহাকে নিত্য জীবন্ত, সম্মুখস্থ, চিন্ময়, অনন্ত-ক্রিয়াশীল, সর্ব্বগত, সর্ব্বপাপসংহারকারী বিধাতা, আনন্দময়ী মা রূপে সকলকার প্রত্যক্ষগোচর বলিয়া নববিধান নবাবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি আর দূরে নন, এই এখানে এইক্ষণে যেমন সবার দর্শনীয়, তেমন সবার সঙ্গেই তিনি কথা কন। নববিধান-বিশ্বাসী মাত্রেরই সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত। কেহ যদি বলেন, ঈশ্বরকে দেখিতে পান না, কিম্বা তাঁহার কথা শুনিতে পান না, তবে তিনি প্রকৃত নববিধান-বিশ্বাসী নন, কিম্বা এখনও নববিধানে সুদীক্ষিত হন নাই। আবার এই ঈশ্বরের দর্শন শ্রবণ যদি নিত্য নূতন না হয়, তাহাও নববিধানের নয়। নববিধানের ঈশ্বর নিত্য নূতন। তাঁহার পূজাও নিত্য নূতন।

নববিধানের নবাবিষ্কার এই যে, ঈশ্বর-দর্শন অতি সহজ এবং নিত্য নূতন। বায়ু-সেবন, সূর্য্যের আলোক গ্রহণ যেমন সহজ, নববিধানের ঈশ্বর-দর্শন ও ঈশ্বরের বাণী-শ্রবণ তেমনি সহজ। অন্ন আহার ও জলপান যেমন সহজ, তাঁহার উপাসনা-সাধনও তেমনি সহজ। কোন প্রকার কষ্টসাধ্য সাধনা, যাহা মানবের অহংকৃত-পুরুষকার-কলুষিত, তাহা নববিধানে বর্জ্জিত। নববিধানের সকলই সহজ ও নিত্য নূতন।

সহজ ঈশ্বর-দর্শন যেমন, তেমনি সহজে সকল সময় সকল কর্ম্মে ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া জীবন যাপন নববিধানের নবাবিষ্কার। ঈশ্বর যেমন সর্ব্বদা কাছে, তেমনি সর্ব্বদা সকল বিষয়ে পরামর্শ ও শিক্ষা দিবার জন্য তিনি ব্যস্ত। তাঁহার পরামর্শ, অভ্রান্ত বেদ-বাণী বিবেক-কর্ণে সর্ব্বক্ষণই শুনা যায়।

ঈশ্বর-দর্শন-শ্রবণ যেমন, তাঁহার সহিত যোগও অতি সহজ যোগ। মা যেমন শিশুকে নানা অবস্থায় রাখিয়া লালন পালন করেন, নববিধান-বিশ্বাসীর সহিত নববিধানের মাও সেইরূপই ব্যবহার করেন। তাই তাঁর সকল সাধনই সহজ মাতৃস্নেহ-প্রণোদিত এবং প্রতিদিনই তাহাতে নব নব ভাব প্রকাশিত হয়।

নববিধানে ব্রহ্মগত জীবনই পরলোক। সুতরাং ইহলোক পরলোকে একই জীবনের ক্রমবিকাশ। পরলোক-গত আত্মার সঙ্গ সহবাস চরিত্রযোগে সহজ সাধ্য ও নিত্য নূতন।

নববিধানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানের প্রবর্ত্তকগণ ও সাধু ভক্ত সকলেই চির জীবিত এবং তাঁহাদের আত্মিক সঙ্গ সহবাস সহজে লাভ করা সকলেরই সর্ব্বদাই সম্ভব। মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া তাঁহারা তাঁহাদের অধ্যাত্ম জীবনের প্রভাব পিপাসিত সাধক মাত্রকেই দিয়া থাকেন। অধ্যাত্ম জগতে তাঁহাদের পার্থিব ভিন্নতা নাই, তবে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব আছে। মাতৃযোগে সকলেই একাত্মা। তাঁহাদিগের সহিত যোগও নিত্য নূতন হইবে।

নববিধানের দেবতা সকল শাস্ত্র, সকল বিধানের মর্ম্ম সহজে বোধগম্য করাইবার জন্য স্বয়ং পবিত্রাত্মারূপে প্রকাশিত। শাস্ত্রে যাহা কিছু দুর্ব্বোধ্য, অবোধ্য বা অসামঞ্জস্যীভূত, সকলই নববিধানে সহজে মীমাংসিত এবং মহা সমন্বয়ে মিলিত। শাস্ত্রের প্রত্যেক মন্ত্র, প্রত্যেক শব্দ নবজীবনপ্রদ এবং ক্ষুধিত ও তৃষিত আত্মার জীবনের অন্ন-পানস্বরূপ। অতএব নববিধানে সকল শাস্ত্র নবজীবনপ্রাপ্ত, এবং তাহার অর্থও নিত্য নব নব ভাবে উপলব্ধ হয়।

নববিধানে প্রত্যেক ধর্ম্মের বিশেষত্ব স্বীকৃত, প্রত্যেক ধর্ম্মে নবজীবন সঞ্চারিত হইয়া পরস্পরের বিবাদ বিসম্বাদ ভিন্নতা স্বতন্ত্রতা ভুলিয়া এক অখণ্ড আকারে পরিণত। কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারে না, পরিত্যাগ করিলে অপূর্ণ হয়। ঈশ্বরের এক স্বরূপ যেমন অন্য স্বরূপ হইতে পৃথক করা যায় না, মানবদেহের এক অঙ্গ যেমন অন্য অঙ্গ হইতে পৃথক হইলে বিকলাঙ্গ হয়, ইহাও সেইরূপ।

এইরূপে বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি, মানব পরিবারের বিভিন্ন শাখা ও ব্যক্তি সকলেই নববিধানে এক অখণ্ড দেহরূপে গ্রথিত, এবং পরস্পরের সহিত নিগূঢ় আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ। মানব-দেহের অভ্যন্তরীণ শিরা সকল যেমন দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে এক অখণ্ড বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন

হইতেই পারে না এবং হইলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তেমনি এই সমগ্র মানব-পরিবার এক অখণ্ড মানবত্বে অবিচ্ছন্ন রূপে গ্রথিত। এই মানব-ভ্রাতৃত্ব-যোগ-সমাধান নববিধানের বিশেষ নবাবিষ্কার।

নববিধানের নূতন আবিষ্কার, পাপীর জন্য নরক নয়, কিন্তু স্বর্গদ্বার তাহার জন্য উন্মুক্ত আছে। রোগী ছেলের অধিক আদর যেমন মার কাছে, পাপীর জন্যও তেমনি মার স্নেহ-ক্রোড় প্রসারিত। পাপী, তাপী, দুঃখী, দীন, দরিদ্র, অধম, চণ্ডাল, শিশু, পাগল, মাতাল সবার আদর স্বর্গে, ইহারা সবাই মার অধিক কৃপাপাত্র। দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ শোক, বিপদ পরীক্ষা, জরা মৃত্যু, সকলই মার অনুগ্রহ; এ সকলই তাঁর বিশেষ মঙ্গল বিধান এবং সকলই নিত্য নব-জীবন ও জীবনে নব নব উন্নতি বিধানের জন্যই নিয়োজিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

মানুষকে ভালবাসা।

মানুষকে ভালবাসিতে হইবে, ধর্ম্মের ইহাই বিধি। কিন্তু মানুষকে কেবল মানুষ বলিয়া কি আমরা ভালবাসিতে পারি? মানুষকে ভালবাসিতে গিয়া, তাহার দোষ ত্রুটী দুর্ব্বলতা, তাহার হীনতা নীচতা এতই আমাদের চক্ষে পড়ে যে, আমরা তাহাকে ভালবাসিতে গিয়া পাছে সেই সকলেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয় এই ভাবিয়া, শাসন করিতেই অধিক ব্যস্ত হই। অথবা যদিও ভালবাসি, কৃপাপাত্র ভাবিয়া, নীচ ভাবিয়াই ভালবাসি। তাই নববিধান বলেন, "নর নারীকে ব্রহ্মপুত্র, ব্রহ্ম কন্যা জানিয়া প্রীতি ও সম্মান করিতে হইবে"। বাস্তবিক মানুষের ভিতর ব্রহ্মপুত্রত্ব বা দেবত্ব না দেখিলে যথার্থ ভালবাসা যায় না। হিন্দু শাস্ত্রও বলেন, "সর্ব্ব-দেবময়োঽতিথিঃ," অর্থাৎ অতিথিকে সকল দেবতার ন্যায়, দরিদ্র জনকে "নারায়ণ" জ্ঞানে আদর করিবে। নববিধানাচার্য্য বলিলেন, "রামায়ণে যেমন পতির সহিত সতী বনবাসিনী হইয়াছিলেন, নববিধানে তেমনি পুত্রের সহিত পিতাও নির্ব্বাসিত হন।" পিতা পুত্রের এমনই একত্ব। ব্রহ্মকে ভালবাসার প্রমাণ মানুষকে ভালবাসা। মানুষের ভিতর ব্রহ্ম আছেন, ইহা উপলব্ধি করিলেই যথার্থ ভালবাসা যায়, অন্যথা ভালবাসা যায় না।

কেমনে অমর হওয়া যায়।

আমরা সকলেই চিরজীবী বা অমর হইতে চাই। কিন্তু কেমনে অমর হই? পাপই মৃত্যু, কাম, ক্রোধ, লোভ, অহং, হিংসা, দ্বেষ আমাদিগের বিষম রোগ; এই সকল রোগেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হই। পৃথিবীতে থাকিয়া আমরা যদি এই সকলের বশবর্ত্তী হই, তাহা হইলে কিছুতেই আমরা মৃত্যুর হাত অতিক্রম করিতে পারি না; কিন্তু যদি আমরা চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করিতে পারি, আত্মস্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরের সেবা করিতে পারি এবং নীতি ধর্ম্ম জীবন দ্বারা বিস্তার করিয়া অপরকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত শিক্ষিত করিতে পারি, কিম্বা কোন দেশ-হিতকর কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারি, তবেই আমরা চিরজীবী ও অমর হইতে পারি। সাধু ধার্ম্মিক অমর হন; কাম-ক্রোধ লোভ-পরতন্ত্র ব্যক্তির নাম জগতে থাকে না।

সাধনের লক্ষ্য।

সাধনের লক্ষ্য দুইটী হইবে। আত্মোন্নতি ও অন্য জীবনে জীবনের প্রভাব-বিস্তার। আমরা নিজ নিজ সাধনে উন্নত হইতে সকলেই চেষ্টা করি, কিন্তু যতক্ষণ না আমাদের সাধনের প্রভাব অপর জীবনে সঞ্চারিত হয়, ততক্ষণ যথার্থ আত্মোন্নতির প্রমাণ হয় না। যে অগ্নি-কণা পার্শ্বস্থ তৃণখণ্ডকে অগ্নিময় করিতে পারে না, তাহা তেজোবিহীন ও অচিরেই নিবিয়া যায়; তৃণখণ্ড প্রজ্বলিত হইলেই তাহার অগ্নিত্বের প্রমাণ হয়। তেমনি ধর্ম্ম-জীবনের প্রভাব যদি অপর জীবনকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে, তবেই তাহা প্রমাণিত হইয়া থাকে। সন্তান না হইলে যেমন বংশ-রক্ষা হয় না, তেমনি অপর জীবনে বা পরিবারে জীবনাদর্শ সঞ্চার করিতে না পারিলে যথার্থ ধর্ম্মরক্ষা হয় না। অগ্নি-উপাসকগণ বা সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ যেমন বংশপরম্পরায় হোমাগ্নি রক্ষা করিতেন, তেমনি জীবনের প্রভাব ধর্ম্ম-বন্ধুতে ও পরিবারে সঞ্চার করিয়া যাইতে হইবে।

পরস্পরকে গ্রহণ।

"একোঽহং বহুঃ স্যাম্" ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনি নানা আকারে বহুধা প্রকাশিত। তবে কি তিনি যেমন এক অদ্বিতীয় দেবতা, তেমনই তিনি নানা আকারে আপনাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বহু খণ্ড দেবতারূপে পরিণত হন? আপনাকে বহুধা প্রকাশিত করেন? ঈশ্বর চিরকাল এক অখণ্ড অদ্বিতীয় দেবতা, তিনি কখন আপনাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বহু ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হন না। তবে "একোঽহং বহুঃ স্যাম্" কোন অর্থে সম্ভবে? তিনি অখণ্ড অদ্বিতীয়ই থাকেন; কিন্তু কুম্ভকার যেমন নানা ছাঁচের মুখস প্রস্তুত করিয়া রাখে এবং প্রয়োজনমত একই জাতীয় মৃত্তিকা অবলম্বন করিয়া বহুবিধ মূর্ত্তি গঠন করে, তেমনই ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় অখণ্ড দেবতা থাকিয়া, আপনার অখণ্ডস্বরূপ হইতে নানা সাজে মনুষ্যাকারে খণ্ড খণ্ড মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, বিভিন্ন রুচি, ভাব ও শক্তি সম্পন্ন মূর্ত্তির প্রকাশ করেন। কুম্ভকার নানা সাজের মূর্ত্তি গঠন করিবার প্রবর্ত্তনা কোথা হইতে লাভ করে? ভিতর হইতে স্বভাবজাত প্রবর্ত্তনা উপস্থিত না হইলে মনুষ্য

কোন কার্য্যই করিতে পারে না। কুম্ভকারের জীবনে নানা সাজে গঠনের প্রবর্ত্তনা স্ফূর্ত্তি লাভ করে, তাই সে নানা সাজে মূর্ত্তি গঠন করে। এ প্রবর্ত্তনার মূলে অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রেষ্ঠ কুম্ভকার, শ্রেষ্ঠ কারিকর ঈশ্বর। ঈশ্বরের প্রবর্ত্তনা আছে বলিয়া কুম্ভকার নানা ছাঁচে মূর্ত্তি গঠন করে, এবং সেই গঠন অন্য লোক স্বীকার করে, গ্রহণ করে, এবং সেই গঠনের বিচিত্রতার মধ্যে কুম্ভকারের মহিমা গৌরব ফুটিয়া বাহির হয়। সেই বিচিত্র গঠনের কারুকার্য্যের মধ্যে কুম্ভকারের জীবনের গৌরব ও গুরুত্ব নিহিত থাকে। ঈশ্বরে এই বিচিত্র ভাবের ও গঠনের প্রবর্ত্তনা আছে বলিয়া, মানুষের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে এত বিচিত্রতা স্বাভাবিক বলিয়া গৃহীত হয়।

এই প্রকাণ্ড বিশ্বে মানব-জাতির, মানব-পরিবারের মধ্যে কি বিচিত্র ভাবের গঠন! ঈশ্বর যেন তাঁহার সাজের ঘর হইতে ক্রমাগতই নূতন সাজে, নূতন গঠনের মানুষ বাহির করিয়া ভবের বাজারে মানব-পরিবারের প্রকাণ্ড হাট বসাইয়াছেন। ইহার মূলে ঈশ্বরের স্বভাবেরই প্রবর্ত্তনা। তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার স্বরূপ হইতে খণ্ড খণ্ড কণা লইয়া তিনি বিচিত্র সাজের মানুষ গঠন করেন এবং সেই বিচিত্র সাজের মানুষ লইয়া মানব-পরিবার, মানব-সমাজ, মানব-মণ্ডলী রচিত হয়। তিনি নিজে খণ্ড খণ্ড ঈশ্বর হন না, কিন্তু তাঁহারই উপাদান লইয়া তিনি বিচিত্র ভাবের মানুষ খণ্ড খণ্ড আকারে সৃজন করেন। বৈষ্ণবগণ বলেন, জীব চিৎকণ। সেই অনন্ত চিৎ শক্তির কণা জীব। বিদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে, Man is made after the image of God. ঈশ্বর যদি আপনার স্বাভাবিক প্রবর্ত্তনায় প্রত্যেক মানুষকে নূতন সাজ দিয়া আপনার স্বরূপের খণ্ড উপাদানে গঠন দান করিলেন এবং এই বিচিত্র আকারের, বিচিত্র শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক গঠনের মানব-সমষ্টি লইয়া যদি মানব-মণ্ডলী রচিত হইল, তবে আমি আমার একটু ভাবের বিরোধী, রুচির বিরোধী হইল বলিয়া অন্যকে ঈশ্বরের সেই গঠনের ভূমিতে, বিচিত্র গঠনের দৃষ্টিতে স্বীকার করিব না কেন? একে অন্যকে তাহার বিশিষ্টতার জন্য মান্য দিবে না কেন?

আমরা জানি, তত্ত্বের ভাবে আমরা একজন অন্যকে স্বীকার করিতে পারি, গ্রহণ করিতে পারি, মান্য দিতে পারি; কার্য্যত: আমরা দেখিতে পাই, পরস্পরের প্রকৃতির স্বাভাবিক বিচিত্রতা আমাদিগের প্রাণে তত আঘাত করে না, কিন্তু সেই বিচিত্রতার মধ্যে অস্বাভাবিকতা, বিকৃতি যখন উপস্থিত হয়, তখন সেই একের বিকৃত ভাব, বিকৃত রুচি অন্যকে আঘাত করে; এই বিকৃতি জন্য একজনের ভাব, কার্য্য, আচরণ অন্যে সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু খুঁজিলে দেখিতে পাই, এই বিকৃতি অল্লাধিক কাহার না আছে? এই বিকৃতিকে দূর করিয়া প্রকৃতিস্থ হওয়ার জন্যই তো সাধনা। এই বিকৃতি দূর করিয়া পরস্পরের সহায়তায় প্রকৃতিস্থ হইবার ও একে অন্যের বিশিষ্টতার সহায়তা লইয়া পূর্ণতার পথে পরিপুষ্ট হইবার জন্যই মিলিত উপাসনা, আলোচনা, সৎপ্রসঙ্গ, এই জন্যই নানা ভাবে এক ক্ষেত্রে সম্মিলন।

নববিধানে আমরা এক নূতন ছাঁচের সামাজিক ধর্ম্ম, মণ্ডলীগত ধর্ম্ম পাইয়াছি। পরস্পরকে না হইলে, পরস্পরের সহায়তা না পাইলে, আমাদের ধর্ম্মাদর্শ, কর্ম্মাদর্শ কিছুই ফুটিয়া উঠে না, গড়িয়া উঠে না। একাকী আজীবন নির্জ্জন সাধন আমাদের ধর্ম্ম নহে, জন-সঙ্গ-ত্যাগের সন্ন্যাসাশ্রমও আমাদের ধর্ম্মাদর্শ নহে। কিন্তু কার্য্যত: আমরা আজ কাল দেখিতে পাই, কোন একটী বা একাধিক বিষয়ে আলোচনা করার এবং মীমাংসায় উপস্থিত হওয়ার মানসে যদি আমরা মিলিত হই, সেখানেও আমরা পরস্পরের ভাব সহিতে পারি না, পরস্পরকে ধর্ম্মের ভূমিতে একটু গ্রহণ করিয়া সম্মান ও সহানুভূতি দিতে পারি না। প্রত্যেকে আপনার ভাবের দিকে এত ঝুঁকিয়া পড়ি যে, অন্যের কথা শুনিবার সময় ও সুযোগ দিবারও প্রবৃত্তি থাকে না। এই অসহিষ্ণুতার ভাব প্রায় অনেকের মধ্যেই, দীর্ঘ সময়ের পোষণের ও পরিচালনের ফলে, অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

বিধাতার বিধানের দিক দিয়া যদি আমরা দেখি, তবে দেখিতে পাই, আমরা বিধির বিধানে ধর্ম্ম-জীবন-পথে একে অন্যের সহায়তায়, পরস্পরের মধ্যে যাহা কিছু অল্লাধিক বিকৃতি অথবা ভুল ধারণা আছে, তাহা হইতে প্রমুক্ত হইয়া কল্যাণের পথে, মুক্তির পথে অগ্রসর হইবার জন্য বিধান-ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। কোন একটী বিশেষ বিষয় লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে হইবে, সে বিষয়ের কত দিকে আমাদের মনোনিবেশ করিবার আছে। আমরা ধীরভাবে আলোচ্য বিষয় লইয়া আলোচনা করিব, সে বিষয়ে কাহার কি বলিবার আছে, বলিবার সুযোগ দিব, যতদূর সম্ভব সকলে সে বিষয়ে ঐক্যের ভূমিতে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিব, কাহারও মনে অযথা ক্ষোভ থাকিয়া না যায় তাহা দেখিব, প্রত্যেক বিষয়ে মিলন স্থাপন আমাদের লক্ষ্য হইবে। আমরা কি ঈশ্বরের সৃষ্টির বিচিত্রতা মানব-জীবনে অস্বীকার করিয়া ঈশ্বরদ্রোহী হইব? খণ্ডশ: বিচিত্র মানব-জীবনের সমষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের অনন্তত্ব দর্শনে আমাদের দিব্য দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে, সে সুযোগ হইতে কি আমরা বঞ্চিত হইব? সকলকে যথাযথ গ্রহণে আবার আমাদের প্রতিজনের হৃদয়, মন ও আত্মার প্রশস্ততা, পূর্ণতা, উচ্চ পরিণতি ও পরিতৃপ্তি, এ সত্য কি আমরা ভুলিয়া যাইব? আমাদের আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "পরের মন্দ দিক্ দেখিতে আমি নই।" দেবত্বের দিক দেখিয়াই অন্যকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন গ্রহণের পথ নাই, মিলনের উপায় নাই। কিন্তু কার্য্যত: আমরা কত বিপরীত পথেই না চলিতেছি! পরস্পরকে গ্রহণ সম্পর্কে ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

—•—

নূতন সঙ্গীত।

"আমার মাকে কি দেখেছিস তোরা বল সত্য করে"—সুর।

(এই যে) দেখেছি কেশব তোমার মায় সত্য করে।
মা আপনি যেচে দেখা দেছেন এইত আবারে॥
আমি ত দেখতে চাহি না,
আমি তাঁরে চিনিনা,
(এযে) আপনি "আমি আছি" বলে,
(আছেন) প্রাণের মাঝারে।
চিন্ময়ী মার জ্যোতি কিবা,
(এই ত) প্রকাশিত নিশি দিবা,
(দেখান) অনন্ত রূপের প্রভা,
অন্তরে বাহিরে।
আপন প্রেমে আপনি গলে,
(বুঝি) আমি রোগা ছেলে বলে,
(একাই) মা সর্ব্বস্ব হয়েছেন
আমার চিরতরে।
দিয়ে প্রেম-পুণ্য-স্তন্য,
কার নবশিশু যেন,
করেন ব্রহ্মানন্দে মগন,
এই যে আমারে।

—•—

শ্রীকেশবচন্দ্র সঙ্গে।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

পরমহংস রামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে সদলে আসিয়া কমলকুটীরের উপরের বারাণ্ডায় কথাবার্ত্তা, নৃত্যগীত ও প্রীতিভোজন করিতেন। একদিন অমার বেশ মনে আছে, কথাবার্ত্তা নৃত্যগীত হইতেছে, এমন সময় রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "শা—লা—রা বলে, তুমি কেশব সেনের বাড়ী যাও কেন? তোমার যে জাত যাবে। আমি আজ আর কিছু খাবো না।" একটু পরে বলিলেন, "কেবল দুখানি জিলিপী খাবো।" তিনি বড় জিলিপী ভালবাসিতেন।

অল্পক্ষণ পরেই একটি থালায় সাজাইয়া, জিলিপী, রসগোল্লা ও আরো কিছু কিছু মিষ্টদ্রব্য ও ফলাদি বাড়ীর ভিতর হইতে আচার্য্য-পত্নী-দেবী পাঠাইয়া দিলেন। রামকৃষ্ণ শিশুর মত যেন আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিলেন, পাইয়াই খাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। বলিলেন, "জিলিপী ত লাট সাহেবের গাড়ী। কি জান? যখন রাস্তায় খুব গাড়ীর ভিড় হয়, কোন গাড়ী না যেতে পাল্লেও লাট সাহেবের গাড়ী এলে তাকে পথ করে দিতে হয়।" এই বলিতেছেন, আর এক এক করিয়া খাইতেছেন।

তখন বোধ হয়, পূর্ব্বের জাতি যাবার কথা মনে পড়িয়া গেল। সামনে যার দিকে দৃষ্টি পড়িল, তাকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দ্যাখ, বলিস্‌নি আমি কেশব সেনের বাড়ী খেয়েছি"। আবার খাইতে খাইতে ডাইনে বামে পেছনে এক একবার তাকাইয়া যাহার দিকে দৃষ্টি পড়িল, এই কথা বলিলেন, "দ্যাখ, বলিস্‌নি আমি কেশব সেনের বাড়ী খেয়েছি।" কিন্তু খাইতে খাইতে এবং ঐরূপ বলিতে বলিতে শেষে ঠিক মাতালের মত ভাবে বিভোর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে শা—লা—রা, তোরা বলগে যা, আমি কেশব সেনের বাড়ী খেয়েছি, আমার জাত গিয়েছে"। এই বলিতে বলিতে উন্মত্ত ভাবে এক গান ধরিয়া দিলেন, "আমার জাতি গিয়াছে"! আরো সেই ভাবের কয়টি গান করিয়া সমাধিস্থ হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যেমন কমলকুটীরে বারবার আসিতেন, শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্রও দুই তিনবার, বোধ হয়, দক্ষিণেশ্বরে সদলে গিয়াছিলেন।

একবার কুচবিহারের মহারাজা শ্রীনৃপেন্দ্র নারায়ণের একখানি ষ্টীমারে করিয়া শ্রীকেশব সদলে গমন করেন। সেই দিন এ অধম সেবকের অসাবধানতা বা অপরাধ বশতঃ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জীবন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় নিপতিত হইয়াছিল। ধন্য ভগবান্, সে বিপদে একমাত্র তিনিই কেশবের জীবন রক্ষা করেন।

ষ্টীমারের ডেকে সকলে আচার্য্যদেবকে ঘিরিয়া পাঠ প্রসঙ্গ সঙ্গীত সংকীর্ত্তনাদি করিতেছিলেন। শ্রীমান্ করুণা প্রভৃতি আমরা কয়েকজন যুবক বন্ধু ষ্টীমারের জালি বোটে গিয়া উঠি। আচার্য্যদেব ষ্টীমারে ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া সেই বোটে গিয়া আমাদের দলে মিশিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি আহ্লাদে আটখানা হইয়া, ষ্টীমারের সহিত যে কাছি দড়িতে জালিবোট বাঁধা ছিল, সেই কাছিটি টানিয়া ষ্টীমারের সহিত সংলগ্ন করি। সাবধান কেশব অতি সাবধানে ষ্টীমারের রেলিং ধরিয়া জালিবোটে নামিতে চেষ্টা করেন। তিনি জালি বোটে পা দিবা মাত্র আমি সে ভার সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও কাছি ধরিয়া রাখিতে পারি না; করুণাচন্দ্র ও আর কেহ কেহ আসিয়া ধরিলে আমি ছাড়িয়া দিই, আর তখনই আচার্য্য যেন ঝুলিয়া পড়েন। সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া ষ্টীমার থামাইয়া দেওয়া হয় এবং ভগবানের কৃপায় আচার্য্যদেব জলমগ্ন হইতে রক্ষা পান। কমল কুটীরে আসিয়া আচার্য্যের আসন্ন মৃত্যু হইতে জীবন রক্ষা হেতু বিশেষ উপাসনা হয়।

দীন—সেবক।

—•—

অনুতাপ ও পূর্ণ বিশ্বাসের আহ্বান।

("New Dispensation" হইতে অনূদিত)

ঈশ্বরানুগামী লোকদিগের মধ্যে এই স্তিমিত নির্জ্জীবতা, শীতলতা ও ভগ্নোৎসাহের ভাব কেন? কেন এই সব ভীরুতা-ব্যঞ্জক অসত্যের সঙ্গে সন্ধি ও লজ্জাজনক পশ্চাৎ-গমন? পরস্পরের

প্রতি এই অবিশ্বাস, রাগ ও প্রতিযোগিতা কেন? বাহ্য দৃশ্যমান আধ্যাত্মিকতার ভিতর নৈতিক শিথিলতার কারণ কি? যাঁহারা নেতৃত্ব করছেন, তাঁরাও পর্য্যন্ত নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের প্রতি উদাসীন! এ সময়ে আমাদের প্রেরিত দল, আচার্য্য ও প্রচারকগণ কোথায়? তাঁরা কি তাঁদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছেন? অথবা তাঁরা কি তাঁদের শিষ্যমণ্ডলীর স্তরে নামিয়ে গিয়েছেন ও তাদের মতই সাংসারিক, স্বার্থপর ও উদাসীন হয়েছেন? নিশ্চয়ই তাঁরাও ঐ সংক্রামক রোগাক্রান্ত হয়েছেন। ঈশ্বর যে অগ্রগামী সন্তানদের অন্যকে পাপমুক্ত করবার জন্য পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা নিজেদেরই রক্ষা করতে পারছেন না।

আশা ও বিশ্বাস, উদারতা ও পবিত্রতার অবনতির লক্ষণ সব দেখা যাচ্ছে এবং এগুলির মধ্যে ভেজাল চলছে। বিশ্বাসের সঙ্গে সন্দেহ ও অবিশ্বাসকে মিশান হচ্ছে, আশা নিরাশার সঙ্গে মেশান হচ্ছে, উদারতা ও স্বার্থপরতার সন্ধি হয়েছে, এবং পবিত্রতার সঙ্গে বহু পরিমাণ অধর্ম্ম মিশেছে। এই সকলের মূল কারণ হচ্ছে, জীবন্ত বিশ্বাসের অভাব।

আমাদের মনে হয়, আমাদের লোকেরা ঈশ্বর-প্রকাশিত সত্যকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করেন নি। প্রত্যেকে নিজ নিজ সুবিধানুসারে সত্যকে গ্রহণ করেছেন। ইহা কি ব্রাহ্মধর্ম্ম, না একেশ্বরবাদ, না ইহা নববিধান? ঈশ্বরের সত্যকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে না এবং যা কিছু অপ্রীতিকর ও অসুবিধাজনক, যা কিছুতে ত্যাগ ও সংযমের দরকার হয়েছে, তাকেই পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং পুষ্পশয্যা-নিদ্রিত এক ঈশ্বর খাড়া করে তারই পূজা করা হচ্ছে।

আমরা যারা নববিধানের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত, তীব্রভাবে ইহাই অনুভব করছি যে, লোকে তাদের বিশ্বাসকে খর্ব্ব করে কত বড় গর্হিত কাজ করছে। হয় সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে হবে, না হয় সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। ইহার মধ্যে কোন অর্দ্ধসত্য বা সন্ধি করে চলা নেই। যখন ঈশ্বর কথা বলছেন, তখন মানুষ তাঁর সমালোচনা ও বিচার না করে বা যা কিছু তাঁর দাবী তাহা ছেড়ে দিতে না ব'লে, যেন সে সম্পূর্ণ অবনত-মস্তকে তাঁকে গ্রহণ করে। ঈশ্বরকে যারা বিচার করে, তাদের স্পর্দ্ধার আর ক্ষমা হয় না।

লোকে অন্যান্য ধর্ম্মকে যে ভাবে দেখে, তাতে ইহার সমালোচনা করে, নিন্দা করে, কোন অংশকে বা বাদ দেয় ও তার পর যা পড়ে থাকে, তাকে গ্রহণ করে। নববিধানের লোকেরা যেন এই রকম ঐশ্বরিক অবমাননা করতে সাহস না করে ও আমাদের নিকট যে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বাণী, তা নিয়া নকড়া ছকড়া করার স্পর্দ্ধা না রাখে। নববিধান-মণ্ডলী কোন অল্প-বিশ্বাসী, অহঙ্কারী সমালোচক বা সন্ধিকারী সংসারীকে নিজের মধ্যে আসতে দিবেন না। ইনি আমাদের নিকট পূর্ণ বিশ্বাসের দাবী করছেন। আমাদের মহীয়ান্ সম্রাটের নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ, অন্যথা বিদ্রোহ, ইহা ছাড়া আর অন্য মধ্যপথ নাই।

ইহা বিশ্বাস করার কারণ হয়েছে যে, মানুষ নববিধানকে স্বীকার করতে লজ্জিত হয়। তারা পূর্ণ মতকে স্বীকার করতে সাহস করে না। যদি তারা তা করে, তবে সমাজের চক্ষে ঘৃণিত হবে, বন্ধুদের হারাতে হবে ও সকলের অপ্রিয় হবে। যদি তারা তাদের নেতার ন্যায় বিধানের প্রত্যেক মতের সমর্থন করে ও প্রত্যেক আচার ব্যবহার গ্রহণ করে, তবে লোকে তাদের মূর্খ বলবে ও উপহাস করবে। এই সব লোক হচ্ছে, "সম্মানিত ভদ্রলোক"। তাদের নেতার ন্যায় তাদের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব ও অর্থহীন চরম পন্থানুবর্ত্তিত্ব নাই।

এই কারণে, তারা যাহা এই নূতন ধর্ম্মের সার বলে মনে করে, সেইগুলি গ্রহণ করে এবং তাদের নেতার বা কোন বিশেষ সাধকদলের যা কিছু, তারা নিরর্থক বলে মনে করে, সে সব তারা পরিত্যাগ করে। তারা বলে যে, উন্নত অগ্রগামী দলের মধ্যে এমন অনেক অবোধ্য ভাব-প্রবণতা, কুসংস্কার, উৎকট পন্থিত্ব ও মূর্খতার ব্যাপার আছে, যা জ্ঞানপূর্ণ যুক্তির নিয়মে ত্যাগ করতে হবে। এই কারণে ভদ্রতার খাতিরে অঙ্গভঙ্গি, ভাষা ও প্রকাশ্য প্রচারে যা কিছু অসুন্দর ও হীনতা, সে সমুদায় পরিত্যাগ করা নিতান্ত প্রয়োজন মনে করে।

এইরূপে একটির পর একটি করে নববিধানের যে সব প্রধান সত্য, সে সমস্তকে কেটে ছেটে ঘসে মেজে লওয়া হয়েছে ও শেষে যুক্তি-বাদের এক পচা বাসি সাংসারিকতা ও অহঙ্কার ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

এই সব লোককে আমরা এই বলি,—সভ্যদেবগণের উপাসকগণ, হে কাপুরুষ কুবেরানুচরগণ, ওহে সম্মানিত ও সুরুচি-সম্পন্ন স্বর্গের রাজার বিদ্রোহী প্রজাগণ, চির বিদায়, চির বিদায়। ভীতাত্মাগণ, তোমাদের মুখ আচ্ছাদিত কর, নববিধানের মন্দিরে মুখ আর দেখাইও না, তোমরা যুক্তি-বাদের ময়লা গর্ত্তের মধ্যে তোমাদের ঘৃণিত জীবন যাপন কর।

এই সব লোকরা বলে থাকে, যারা বিনা কারণে আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, তাদের ক্ষমা করা উচিত নয়; আমাদের শত্রুদের ভালবাসা উচিত নয়। দুঃখ ও দৈন্য পরিত্যাগ ক'রে, সুখ শান্তি অন্বেষণ করা ন্যায্য; আমাদের নিতান্ত হীন হওয়া উচিত নয়, কিন্তু গৌরব ও আত্মসম্মান আমাদের থাকা দরকার। কখন কখন সততার নিয়ম লঙ্ঘন করা যেতেও পারে; এবং আমাদের শুদ্ধ বিশ্বাসের মুদ্রা প্রচলনের জন্য, স্বার্থ-পরতার খাদ অল্প পরিমাণ মিশ্রিত থাকা দরকার। এইরূপে ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা ও সুবিধার জন্য তারা সদাই আমাদের বিশ্বাসের উচ্চতর পবিত্রতর ভাব সকলকে উচ্ছেদ করিতেছে। বুঝিবা জীবনের খাদ্যকে পশুর খাদ্যে পরিণত করাই তাদের একমাত্র উচ্চ লক্ষ্য। এই সব লোকরা অভিশপ্ত, কারণ পবিত্র ঈশ্বর ও

পবিত্র ধর্ম্ম মণ্ডলীর নামে তারা তাদের নিজেদের ও অন্যকে বিপথগামী করছে।

অন্য একদল আছে, যারা আমাদের অতি পবিত্র বিশ্বাসের তত্ত্বের দিক বাদ না দিয়া নৈতিক দিক বাদ দেয় ও নিজেদের জন্য এক অপবিত্র মত খাড়া করে।

যুক্তি-বাদী ও ভোগ-বাদী এই দুই রকম পাপি-দলের মাঝামাঝি, পরস্পরের কাছাকাছি, অনেক রকম মতের থাক আছে। তাদের আমরা বলি, সাবধান হও। আমরা তাদের সকলকে ডেকে বলি, অনুতাপ কর, নূতন বিধানের বিশ্বাসকে পূর্ণভাবে স্বীকার কর। পূর্ণ বিশ্বাস ভিন্ন মুক্তি হয় না। এমন কি, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা ও অবিশ্বাসকে সমর্থন করে তারা আমাদের পবিত্র মণ্ডলীর সভ্যও হতে পারে না। আমরা আমাদিগের মত পাপীদিগকে, অতি অধম পাপীদিগকেও সাদরে অভ্যর্থনা করি, কিন্তু অল্প-বিশ্বাসীদিগকে আমরা গ্রহণ করি না ও করিতে পারব না।

যারা আমাদের পূর্ণ বিশ্বাসকে গ্রহণ করে, মাত্র তারাই আমাদের লোক ; অন্য সকলে আমাদের শত্রু পক্ষ, যদিও তারা এখনও সে দলে নাম লেখায় নি। মৌখিক বন্ধু আমরা চাই না, মৌখিক সহানুভূতিকারীদিগকেও আমরা চাই না। যারা অসত্যের সঙ্গে সন্ধি ক'রে চলে, তাদের সম্বন্ধে আমরা হতোৎসাহ হয়েছি, কাপুরুষতা ও কপটতা দেখে দেখে আমাদের অসহ্য হয়ে উঠেছে। ভারতের প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজ ও প্রত্যেক বিশ্বাসী একেশ্বর-বাদী, যেন সরলভাবে নিজ নিজ বিশ্বাস প্রকাশ্যে স্বীকার করেন, এই আমাদের সকলের প্রতি অনুরোধ ও আহ্বান।

আমাদের দলের প্রকৃত শক্তি ও সামর্থ্য প্রকাশিত হউক। আমাদের শত্রুরা এক দিকে দাঁড়াক ও নিরপেক্ষ দল অন্য দিকে দাঁড়াক, ইহারা সকলে নিজ নিজ পথ অবলম্বন করুক। কিন্তু আমাদের নিজের লোক কাহারা, তা অবধারণ করা ও চেনা দরকার। যাঁরা বলেন, নূতন বিশ্বাসকে গ্রহণ করতে আমরা লজ্জিত নই এবং ইহার প্রচারিত প্রত্যেক মত যাঁরা বিশ্বাস করেন, মাত্র তাঁরাই আমাদের মণ্ডলীর লোক, অন্য কেউ নয়। যাঁরা বিশ্বাসের জন্য যা কিছু সবই ত্যাগ করবেন ও মণ্ডলীকে পূর্ণভাবে ও সমগ্রভাবে সমর্থন করবেন, মাত্র তাঁরাই আমাদের, অন্য কেউ নয়।

মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়েছে, নৈতিক পবিত্রতায় ভাঁটা পড়েছে, অবিশ্বাস ও যুক্তি-বাদ আমাদের শীঘ্র শীঘ্র বেড়ে উঠ্‌ছে, এবং এই সমস্তের একমাত্র কারণ বিশ্বাসের অভাব। অতএব আর নয়। বিশ্বাসী যোদ্ধাগণ, তোমরা জাগ্রত হও ও নববিধানের পতাকা হাতে নিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হও।

শ্রীআশাকুমার বানার্জি।

সাকার-নিরাকার-তত্ত্ব।

(প্রাপ্ত)

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা। সাকার ও নিরাকারের তারতম্য কোথায়? সাকার হতে নিরাকার এবং নিরাকার হতে সাকার, অদৃশ্য হইতে দৃশ্য এবং দৃশ্য হইতে অদৃশ্য, আবির্ভাব ও তিরোভাব, এতো এই পঞ্চভূতময় জগতের খেলা সদাই হইতেছে। তবে নিরাকার বলিলেই কি পঞ্চভূতের অতীত বোঝায়, না সাকার বলিলেই কেবল পঞ্চভূতময় বস্তুকে বোঝায়? বরফ, জল, বাষ্প সাকার নিরাকার হইলেও উহার প্রত্যেক অবস্থাই পঞ্চভূতময় নয় কি? যাঁহাদের ঈশ্বর-দর্শন হয়েছে, তাঁরা ঈশ্বরকে সাকার বা নিরাকার কিছুই বলেন না। উভয়েরই মূলাধার চিদাকার বলেন, যাঁহা হইতে সাকার নিরাকার উভয়ই বহির্গত হইয়াছে। অতএব উভয়ের অন্তর্গত হইয়াও উভয়ের অতীত। সকলের মধ্যে সেই চিদাকার সত্বস্থ না থাকিলে নিরাকার বা সাকার কিছুই থাকিতে পারে না। সুতরাং নিরাকারের আশ্রয় যিনি, সাকারেরও আশ্রয় তিনি। যে নিরাকারে সৎ চিৎ দর্শন করিল, সে কি সাকারেও উহা দর্শন করিবে না? যখন উভয়ের মধ্যে সেই চিদাকার প্রকাশিত হয়, তখন সে কাকে বড় ও কাকে ছোট বলিবে? ভেবে দেখ, যে সেই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বগত ও সর্ব্বাতীত ঈশ্বরকে দেখেছে, তার কাছে সাকার নিরাকার উভয়ই স্বচ্ছ কাঁচের আকারে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। সে এই কাঁচের ঘরে বসে ভিতরে বাহিরে একই সৎ চিৎ বস্তু দেখিতে পায়। প্রথমেই সৎ (আছে) জ্ঞান এবং সেই সঙ্গেই চিৎ জ্ঞান। সতের মধ্যে চিতের প্রকাশ কোথায় না আছে? জগতের মধ্যে এমন কোন্ হীন হেয় বস্তু আছে, যার মধ্যে মানবের বুদ্ধ্যাতীত অপূর্ব্ব চিৎ শক্তির কৌশল প্রকাশিত নাই? একটা বালির কণা হইতে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি পর্য্যন্ত, একটা জঘন্য কীটাণু হইতে মানব, দেব, দানব পর্য্যন্ত কোথায় না অসীম জ্ঞান প্রকাশ পায়? এতাবৎকাল কোন বস্তুর সম্পূর্ণ জ্ঞান এবং এই বিশ্বসংসারে তাহার উদ্দেশ্য কি, কাহাকে এবং সকল বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, মনুষ্য কি তাহা উপলব্ধি করিয়াছে? না কখনও করিতে পারিবে? বাহিরে অসীম জ্ঞান-কৌশল দেখিয়া মানুষ যখন নিজের শরীরের দিকে তাকায়, তখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিচিত্র কৌশল এবং শরীর রক্ষার্থে ভুক্ত অন্ন শাক পাতা হইতে রক্ত মাংস অস্থি চর্ম্মাদির সৃষ্টি স্থিতি ও বৃদ্ধি নিরীক্ষণ করে; সাকার ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া কি করিয়া দর্শন স্পর্শন শ্রবণাদি জ্ঞান উপলব্ধ হয় এই সকল যখন ভাবে, তখন সে তার বুদ্ধ্যাদির অতীত অপূর্ব্ব জ্ঞানালোকে আনন্দিত হইয়া "সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দ" বলিয়া সৎ চিৎ আনন্দ এই তিনের অবিভাজ্য আনন্দে মজে যায়। সাকার নিরাকারের ভেদ বুদ্ধি থাকে না। তখন সে কবীরের মত নাচে গায় আর বলে, "নিরাকার মেরা বাপ সাকার মেরা মাতারি। কিস্‌কো নিন্দে কিস্‌কো বন্দে দোনো পাল্লা ভারি।"

তাঁহারা বলেন, "ব্রহ্মের সাকার রূপ অর্থাৎ চিদাকার রূপ জড় পদার্থ, কাঠ, মাটী, কিম্বা কোন প্রকার ধাতু-নির্ম্মিত নয়। তাঁর রূপ যে কি এবং কি পদার্থ হতে তৈরী, তা কেউ বলতে পারে না। 'জ্যোতির্ঘন' বলা যেতে পারে। কিন্তু সে জ্যোতি চন্দ্র সূর্য্যের সহিত তুলনা হতে পারে না। ফলে তাঁর রূপ অনুপমেয় এবং বচনাতীত। এই সাকার মূর্ত্তি যে কেবল চোখে দেখা যায়, তা নয়। ভক্ত সাধক ইচ্ছামত বাক্যালাপ এবং অঙ্গ স্পর্শনাদি ক'রে শান্তি লাভ ক'রে থাকেন।" এসব কথা আর অধিক বলিতে গেলে লোকে কল্পনা বলিয়া উপহাস করিবে। যে যা জানে, তার অধিক কিছু শুনিলে, সে বিশ্বাস করে না, বরং বক্তাকে মিথ্যুক বলিয়া উড়াইয়া দেয়।

যখন আমি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কলেজে এফ, এ পড়ি, তখন আমাদের শ্রেণীতে স্কটের ট্যালিসম্যান নামক নভেল পড়া হইত। তাহাতে আছে, স্যালাদিন (আরব্য দেশীয় বীর) এবং কেনেথ (বিলাতী বীর) দুই জনে ঘোড়ায় চড়িয়া আরব্য মরুভূমির উপর দিয়া যাইতে যাইতে কেনেথ বলিল, আমাদের দেশে আমরা বড় বড় জলাশয়ের উপর দিয়া এইরূপে ঘোড়ায় চড়িয়া যাই। স্যালাদিন শুনিয়া বলিল, এসব কথা আমার বিশ্বাস হয় না। উত্তরে কেনেথ বলিল, আমি কি মিথ্যা বলিতেছি? আমাদের দেশে সময়ে সময়ে এত শীত হয় যে, ঠাণ্ডায় বড় বড় জলাশয় জমে বরফ হয়ে পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়, আর সেই বরফের উপর দিয়া আমরা ঘোড়া চালাই। স্যালাদিন যে কখন শীত-প্রধান দেশে যায় নাই, বরফ কখনও দেখে নাই। তাই সে বলিল, এ তোমার সম্পূর্ণ মিথ্যাকথা, তুমি মিথ্যুক, আমার সঙ্গে তামাসা করিতেছ। আমি কি তোমার তামাসার পাত্র? খবরদার, সাবধানে কথা কহিও। এইরূপ কথা কাটাকাটি হতে উভয়ে তলোয়ার খুলিয়া অঙ্গ কাটাকাটি করিতে প্রস্তুত হইল।

সাকার নিরাকার নিয়ে আমাদেরও সেই দশা। যে নানা রূপের মধ্যে একই অরূপের রূপ দেখেছে, যে বাষ্প, জল, বরফের মধ্যে রসতন্মাত্র দেখেছে, যে সাকার নিরাকারের মধ্যে একই চিন্ময় রূপ দেখিয়াছে, তার কাছে সবই সম্ভব, অসম্ভব কিছুই নাই। তার কাছে একই রস বাষ্প, জল, বরফ সবই হতে পারে, অথচ রসের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। শক্তি মাত্রই নিরাকার হইলেও সাকারে তার প্রকাশ। আবার শক্তি বিনা সত্তার স্ফূর্ত্তি আমাদের নিকটে কখনই হইতে পারে না। তবে সাকার না থাকিলে ব্রহ্মসত্তার প্রকাশ হয় কি?

আর একটি কথা বিশেষ বিবেচ্য। বল দেখি, সাকার নিরাকার, সসীম অসীম, ছোট বড় ইত্যাদি পরস্পর বিপরীত ভাবের জ্ঞান কি রূপ? একের জ্ঞান না থাকিলে কি অপরের জ্ঞান হয়? দুই জ্ঞান কি সমসাময়িক নয় অর্থাৎ এক সঙ্গে উদয় হয় না? একটি জমির সীমা জানিতে হইলে, ঐ সীমার বাহিরের জমীর জ্ঞান না থাকিলে কি কখন হইতে পারে? ছোট জ্ঞান না থাকিলে কি বড় জ্ঞান হয় অথবা বড় জ্ঞান না থাকিলে কি ছোট জ্ঞান হয়? ছোট বড়, সসীম অসীম, সাকার নিরাকার, এ সমস্ত বস্তুকে আমরা পৃথক করিতে পারি সত্য, কিন্তু ছোট বড় ইত্যাদি জ্ঞান উপলব্ধি করিতে হইলে, দুই জ্ঞানই এক সঙ্গে না, থাকিলে হয় না, হবার নয়। এই গাছটা বড় বলিবার সময়েই তার সঙ্গে একটা ছোট গাছের জ্ঞান থাকে, আবার এই গাছটা ছোট বলিবার সময়েই তার সঙ্গে একটা বড় গাছের জ্ঞান থাকে। একটা ছেড়ে অপরটার জ্ঞান হতেই পারে না। এ রূপ অবস্থায়, যখন একের জ্ঞান না হলে অপরের জ্ঞান হতেই পারে না তখন কি বলা যায় না, ছোট জ্ঞানের মধ্যে বড় জ্ঞান নিহিত এবং বড়র মধ্যে ছোট নিহিত, সসীমের মধ্যে অসীম নিহিত এবং অসীমের মধ্যে সসীম নিহিত, সাকারের মধ্যে নিরাকার নিহিত, নিরাকারের মধ্যে সাকার নিহিত; অথবা এই পতিপক্ষ জ্ঞান পরস্পরে জড়িত, একটি ছেড়ে অপরটি থাকিতেই পারে না। তবে বল, "কিসকো নিন্দে কিসকো বন্দে দোনো পাল্লা ভারি" ঠিক কথা কি না?

(ক্রমশঃ)

সেবক—শ্রীযুধিষ্ঠির শর্ম্মা।

—•—

কেশবচন্দ্র ও নববিধান।

সময় না আসিলে বস্তুর পরীক্ষা হয় না। এক একটী ক্ষুদ্র বস্তুও বুঝিতে অনেক চিন্তা ও অনেক গবেষণার প্রয়োজন। পুষ্প হইতে মধু সংগৃহীত হয়, এ তত্ত্বও অনেক দর্শন ও অনেক গবেষণা সাপেক্ষ। মক্ষিকার গতি-বিধি ও অন্বেষণ তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ না করিলে, এ তত্ত্ব মানবীয় জ্ঞান বুদ্ধি হইতে অনেক দূরে পড়িয়া থাকিত। কেশবচন্দ্র ও নববিধান-তত্ত্ব অনেক পরিদর্শন, পরিচিন্তন ও গবেষণা সাপেক্ষ। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের জন্য নিউটন, বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কারের জন্য ফ্রাঙ্কলীন, বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কারের জন্য জেমস্‌ওয়াটস্ এবং পৃথিবীর অপরার্দ্ধ আমেরিকা আবিষ্কারের জন্য কলম্বসের প্রয়োজন হইয়াছিল। সমস্তের আবিষ্কারের মূলে গভীর গবেষণা, গভীর চিন্তা ও মস্তিষ্কের গভীর পরিচালনা নিহিত। প্রাচীন বাইবলের পর যখন নূতন বাইবল আসিয়াছে, তখন তাহার মূলে অনেক গভীর সাধনা। অভিধানের শব্দানুক্রমে প্রাচীন হইতে নূতন বাইবল এ শব্দ আসে নাই। নবোন্মেষ ব্যতীত নূতনের জ্ঞান আসে না। কোরক যখন ফুটিয়া উঠে, তখন তাহা 'ফুল' নাম ধারণ করে। পক্ষীর ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ বস্তু 'পক্ষী' নাম ধারণ করে না। অণ্ড-বিস্ফারিত বস্তু যখন পক্ষ-বিশিষ্ট হইয়া বাহির হয়, তখন তাহা, 'পক্ষী' নাম ধারণ করে। যখন Old Testament হইতে বিস্ফারিত ও বিকশিত বস্তু নূতন হইয়া বিশ্বাসী দলের সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তাহাকে New Testament রূপে তাঁহারা চিনিতে পারিলেন। এই পরিচয় তাঁহাদের বহু সাধনা সাপেক্ষ।

প্রাচীন ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই বিকাশই (Evolution) নববিধান। রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কক্ষে পড়িয়াছিল, বিকাশ অর্থাৎ Evolution এর যুগে তাহা সে কক্ষ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের পিতৃগণের সেই অক্ষর-নিবদ্ধ বেদশাস্ত্র আর নাই। ব্রহ্মের সম্বন্ধে তৃতীয় পুরুষের "তিনি" শব্দ আর নাই। দূরের ব্রহ্ম নিকটে। "আমি ও তুমি" ইহার মধ্যেই ব্রহ্ম-শাস্ত্র আসিয়া পড়িল। নববিধান সাধনশীল কেশবচন্দ্রের সমক্ষে কোরক-বিস্ফারিত ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। জীবনের উষাকালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র শাস্ত্র, মন্ত্র ও গ্রন্থবিহীন হইয়া, স্বীয় পরিবারের নিভৃত প্রকোষ্ঠে ব্রহ্মোপাসনায় একাকী উপবিষ্ট হইয়া, তৃতীয় পুরুষের ব্রহ্মকে সম্মুখীন ব্রহ্ম জানিয়া, দ্বিতীয় পুরুষের ব্রহ্ম বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের সঙ্গে মিলিত হইয়াও কেশবচন্দ্র জীবনের এক মহা সংগ্রামে পড়িয়া গিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে "খ্রীষ্ট-বিভীষিকা" শব্দ বাহির হইয়াছে, কেশবচন্দ্র তাঁহার সার্ব্বভৌমিক ধৰ্ম্মমত লইয়া তাহার ভিতরে কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারেন? তিনি সেই সাম্প্রদায়িক ধৰ্ম্মমন্দিরের প্রাচীর ভেদ করিয়া যখন চলিয়া আসিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে একদল উদার নৈতিক দল যখন গড্ডালিকা প্রবাহের মত চলিয়া আসিয়া সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিমূলে প্রথম ইষ্টক প্রোথিত করিলেন, বল দেখি ভাই, সেই একাকী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে ব্রহ্মোপাসনা হইতে নবমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন পর্য্যন্ত তিনি বিধাতার কোন্ প্রেরণায় পরিচালিত হইলেন? বিধাতার নববিধান তাঁহাকে কোন স্থানে আনিয়া ফেলিল? সুদূর প্রস্তর-রাশির নিম্নে অলক্ষিতে যেমন সুদূর প্রবাহিত জলস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, ধর্ম্ম-জীবনের উষাকাল হইতে তাঁহার ভিতরে সেই স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। সময় আসিলে প্রস্তর ভেদ করিয়া যেমন জলস্রোত বাহির হইয়া আসে, কেশবের ভিতরও তাহাই হইয়াছিল।

কুচবিহার-বিবাহ-তত্ত্বও এই নববিধানের ভিতর নিহিত। নববিধান না আসিলে কুচবিহার ব্যাপার আসিত না। New Testament না আসিলে ক্রশ (cross) আসিত না। পৃথিবীর বিঘ্ন বাধা ও পৃথিবীর মতামত অতিক্রম করিয়া এক নূতন প্রদেশের প্রবেশ দ্বারে করাঘাত করা এক মহা নবশক্তি সাপেক্ষ। সাধুপল (St. Paul) চারিদিকের লোক-নিন্দা ও মতামত ভুলিয়া গিয়া, কত বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন অসভ্য জাতির ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। New Testament বিনা পলের প্রবেশ অসম্ভব হইত। নববিধানের প্রেরণায় কেশবচন্দ্রের কুচবিহারে প্রবেশ। কুচবিহারের উদয়োন্মুখ প্রভাত-রশ্মি তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছিল। সেই নববিধানের প্রাভাতিক দীপ্তি তাঁহাকে সে পথে আহ্বান করিলেন। বল দেখি ভাই! এ নববিধান কি আমরা পালন করিতে পারিতাম? ক্ষুদ্র আঘাতেই আমরা বায়ু বিতাড়িত বৃক্ষ-পত্রের মত আন্দোলিত হইতে থাকি। সাধুপল বিরোধী জাতির ভিতরে প্রবেশ করিয়া তৎকালীন লোকদিগের মধ্যে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ংই ব'লয়া গিয়াছেন, "I am made fool for my master's sake"। কেশবচন্দ্রও নববিধানের জন্য তদ্রূপ লাঞ্ছিত। বিধাতার আজ্ঞা-পালন ও প্রত্যাদেশের অনুসরণে কেশবচন্দ্র লাঞ্ছিত। তর্কবাদীর তর্কের উত্তরে প্রত্যাদিষ্ট কেশব কহিলেন, "Posterity would judge" ভবিষ্যৎ বিচার করিবেন। নববিধান না আসিলে কেশব এত দূর আসিতে পারিতেন না। নববিধান না আসিলে কেশব সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমন্দিরের প্রাচীরের ভিতর পড়িয়া থাকিতেন। তাই আজ বলিতে আসিলাম, এই নববিধানে কেশবচন্দ্রকে যদি কোন স্থানে ভালরূপ বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে এই কুচবিহার ব্যাপারে। কুচবিহারই নববিধানে কেশবচন্দ্রের স্থান আরও দৃঢ় ভাবে প্রমাণ করিয়াছে। শিশু সূর্য্যকে দেখিয়া মনে করে, সূর্য্যই ঘুরিতেছে, আর পৃথিবী স্থির; কিন্তু যাঁহারা পৃথিবীর গতিতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞান অন্যরূপ। দূরবীক্ষণ যন্ত্র বিনা দূরের বস্তু প্রতীত হয় না। দৃষ্টিযন্ত্রের কাচফলকে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত না হইলে প্রকৃত দর্শন সম্ভব হয় না। উন্মদিক্ষু ব্যক্তি বস্তুর দীপ্ত ভাব দেখিতে পায় না। নববিধান সাধন সাপেক্ষ। অনেক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া বৃক্ষপত্রও সাটিন বস্ত্রে পরিণত হয়। "The mulberry leaves become satin." সাধনের পথে নববিধান। সাধনার বাহিরে তর্ক ও বিবাদ। নববিধান নাম নহে। নববিধান সাধনা। বিধাতার নূতন দানই নববিধান। নববিধান নামাত্মক নহে। ইহা সাধনাত্মক। সকল ধৰ্ম্মই ব্রহ্মের দান, সুতরাং সকল ধৰ্ম্ম এবং নববিধানও ব্রাহ্মধৰ্ম্ম। নববিধান সাধনা-প্রসূত নূতন দান।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

অধিকার প্রতিষ্ঠা।

"This flag of the New Dispensation I hold before thee, is a flag of truce and reconciliation. There shall be no more war, but henceforth peace and amity, brotherhood and friendliness". —

"এই যে নববিধানের নিশান আমি আপনাদের সম্মুখে ধরিয়াছি, ইহা মিলন ও শান্তির নিশান। পৃথিবীতে আর সংগ্রাম হইবে না, এখন হইতে শান্তি, সদ্ভাব, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।" শ্রীকেশবচন্দ্রের অগ্নিময় বাণী আজ ভারতের আত্মা হইতে তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, নববিধান পৃথিবীতে আগমন করিয়া সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পুরুষের অধিকার, নারীর অধিকার, ব্রাহ্মণের অধিকার, শূদ্রের অধিকার, রাজার অধিকার, প্রজার অধিকার, গুরুর অধিকার, শিষ্যের অধিকার, ধনীর অধিকার, শ্রমিকের অধিকার, সকলের অধিকার-ভেদের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শক্তি-ভেদ, শিক্ষা-

ভেদ ও কর্ম্ম-ভেদের মধ্যে নববিধান মানব-সমাজে এক অখণ্ড যোগের ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে বিধান মুক্তির সংবাদ লইয়া, স্বাধীনতার নিশান হস্তে লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট দেশের ও জাতির সকল সমস্যার সমাধান হইবে। যাঁহারা বিধানের নিশান লইয়া পৃথিবীতে আগমন করেন, তাঁহাদেরই পাপের বিরুদ্ধে আত্মবলিদান করিতে হয়। প্রাণ দিয়া তাঁহারা সকল প্রশ্নের সমাধান করেন। মিথ্যা, পাপ ও অধীনতা হইতে আত্মা মুক্ত হইতে না পারিলে তাহার কর্ম্ম শুদ্ধ হয় না। সমাজ ও রাষ্ট্র আত্মার বাহিরের ক্রিয়া, আত্মার বাহ্য প্রকাশ মাত্র। সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে হইলে, সমাজকে পাপ ও আবর্জ্জনা হইতে মুক্ত করিতে হইলে, সমাজে সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, নানা বৈষম্যের ভিতর সাম্যের একাধিপত্য স্থাপন করিতে হইলে, নিজের শোণিত দিয়া সমাজের পাপ ধৌত করিতে হয়। যে সকল বিধান-প্রবর্ত্তক প্রাচীন যুগে মুক্তির সংবাদ প্রচার করিয়াছেন, সাম্যের অধিকার স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই আত্মদান করিতে হইয়াছে। হৃদয়ের লাল রক্ত দিয়া মুক্ত আকাশে বিশ্বাসের কথা লিখিয়া রাখিতে হইয়াছে।

সম্রাট অশোক প্রথম যৌবনে বৌদ্ধ ছিলেন না। তিনি বৌদ্ধদের নির্য্যাতন করিতেন। কাহারও হস্তচ্ছেদন করিতেন, কাহারও নাসিকা কাটিয়া ফেলিতেন, কাহারও চক্ষু উৎপাটন করিতেন, কাহাকেও প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ বিনাশ করিতেন। একদা একজন সৌম্যমূর্ত্তি, শান্ত ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত ভিক্ষু রাজপথ দিয়া গমন করিতে ছিলেন, এমন সময় অশোক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকাইয়া আনিলেন। দ্বারবান্‌কে আজ্ঞা করিলেন যে এক প্রশস্ত অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত কর। তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা পালন করা হইল। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ভিক্ষুককে নিক্ষেপ করা হইল। শান্ত ও সমাহিত চিত্তে ভিক্ষু রাজদণ্ড বহন করিতে লাগিলেন। যখন সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া আসিল, আর বাঁচিবার কোন আশা নাই, তখন অশোক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভিক্ষু, তুমি কি চাও? অর্হৎ উত্তর করিলেন, মহারাজ অশোক, আমি আপনার কল্যাণ চাই! অশোক বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ভিক্ষুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আমার কল্যাণ? আমি তোমাকে পোড়াইয়া মারিতেছি, আর তুমি আমার কল্যাণ কেন প্রার্থনা করিতেছ? ভিক্ষু বলিলেন, জীবের কল্যাণ প্রার্থনা করাই আমার ধর্ম্ম। অশোক স্তম্ভিত হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার সর্ব্বশরীর বিদ্যুচ্চমকে শিহরিয়া উঠিল! মুহূর্ত্তমধ্যে রাজা রূপান্তরিত হইলেন! মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজা কিঙ্কর হইলেন ও ভিক্ষুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন! ভিক্ষু শুভ মুহূর্ত্ত প্রাপ্ত হইয়া অশোকের নিকট রাজার অধিকার ঘোষণা করিলেন এবং অনধিকারের দণ্ডস্বরূপ অশোককে ভিক্ষুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে যুগান্তর উপস্থিত হইল সাধুর শোণিত হইতে সহস্র ধর্ম্মাশোক জন্মগ্রহণ করিল। মহর্ষি ঈশার ক্রুশে প্রাণদানের ইতিহাসও একই প্রকারের। পাপ, অনাচার, ব্যভিচার, মিথ্যা ও অধীনতা হইতে জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য এবং মানবের ন্যায্য অধিকার তাহাকে দিবার জন্য ঈশা নিজের শোণিত দান করিলেন। আমাদের দেশে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে শিখধর্ম্মের ইতিহাসেও সেই একই কথা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই সকল ভীষণ অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণ করিলে মানুষের শোণিত চঞ্চল হইয়া উঠে! জগৎ স্তম্ভিত হয়! মৃত্যু-যাতনা দেশ ও কালের ব্যবধান ভেদ করিয়া নর নারীর হৃদয়কে অভিভূত ও অবসন্ন করে। সাধুদিগের প্রাণদান পৃথিবীর নিকট এক অপার্থিব পদার্থ! বেদ বেদান্ত অপেক্ষা গূঢ় ও রহস্যপূর্ণ! মানব-সমাজে ইহা অপেক্ষা মহাকীর্ত্তি আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না।

সাধুরা যদি আত্মদান না করিতেন, পৃথিবী একদিকে যেমন তাঁহাদের বিশ্বাসের পরিচয় পাইত না, অপরদিকে মানবের ন্যায্য অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইত না। এ জন্য ইহা অমূল্য! সাধুর আত্মদান পৃথিবীর নিকট অমূল্য ও অপার্থিব হইলেও স্বর্গের নিকট ইহা শ্রেষ্ঠ দান নহে; সাধু স্ব-ইচ্ছায় ভগবানের জন্য, জীবের হিতের জন্য, সমাজের কল্যাণের জন্য যতটুকু দান করেন, তাহাই তাঁহার নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। ইহাই আত্মাকে স্বর্গের দ্বারে লইয়া যায়। বৌদ্ধ ভিক্ষুর জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ, ঈশার ক্রুশে প্রাণদান, শিখগুরু তেগ বাহাদুরের শিরশ্ছেদন, বান্দার শিশু পুত্রের বক্ষে ছুরিকাঘাত, সক্রেটিশের বিষপান প্রভৃতি লোমহর্ষক নির্য্যাতন অনিবার্য্য রাজদণ্ড; ইহা বাধ্যতামূলক। এখানে বাহিরের প্রভাব বা প্রবল রাজ-শক্তি আসিয়া সাধুকে প্রাণদান করিতে বাধ্য করিয়াছে! বাহিরের চাপ আসিয়া এমন করিয়া সাধুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাকে আর অতিক্রম করিবার যো নাই। এখানে আত্মদান করা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। এই সকল মৃত্যু দৈব দুর্ঘটনা মাত্র।

যেমন ভূকম্পে অগ্ন্যুৎপাতে লক্ষ লক্ষ নরনারী ভূগর্ভে প্রোথিত হয়, জল-প্লাবনে কত নগর উপনগর ভাসিয়া যায়, তাহার উপর মানুষের কোন হাত নাই; তেমনি সাধুদিগের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর উপরেও তাঁহাদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। বাহিরের কোন চাপ বা বাধ্যতা না থাকা সত্বেও জীব যখন ভগবানের জন্য বা মানুষের জন্য যথাসর্ব্বস্ব দান করে, তাহাই জীবের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। পৃথিবীর অসভ্য অবস্থায় বা অর্দ্ধসভ্যাবস্থায় সাধুদিগের উপর যে সকল অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুগ আর সে সকল তেমন শুনা যায় না। ভবিষ্যতে পৃথিবী আরো উন্নত হইলে, হয়ত এ সকল অত্যাচারের কাহিনীতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া কি পৃথিবী মানুষের আত্মদানের পরিচয় পাইবে না? বাহিরের চাপ অপেক্ষা আমাদের ভিতরের চাপই অধিকতর প্রবল ও শক্তিশালী; তবে বাহিরের আঘাতে হঠাৎ যেমন শরীরের বিনাশ অনিবার্য্য, ভিতরের চাপে সকল সময় শরীরের অপমৃত্যু সম্ভব নয়, এই মাত্র প্রভেদ। ভিতরে যে ব্যাঘ্র ভল্লুকের ন্যায় কাম ক্রোধাদি রহিয়াছে, তাহাদের সহিত

সংগ্রাম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে হইলে, নানা বিপরীত অবস্থার সংঘর্ষ অতিক্রম করিয়া সত্যকে জয়যুক্ত করিতে হইলে, সাধু ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া মণ্ডলী ও সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে, সকল প্রকার অন্যায়, অত্যাচার, পাপ ও মিথ্যার নির্য্যাতন হইতে জন-সঙ্ঘকে রক্ষা করিতে হইলে, তিল তিল করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া না লইলে কিছুতেই ধর্ম্ম-রক্ষা করা যায় না। একদিকে সত্যের অধিকার, অন্যদিকে মিথ্যা ও পাপের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, এ দুইয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সত্যকে রক্ষা করিতে হইলে, মৃত্যুর কঠোর শাসন মানিয়া লইতেই হইবে। যে ব্যক্তি স্ব-ইচ্ছায় দুঃখ, দারিদ্র, সমাজের নির্য্যাতন ও মৃত্যুকে বিধাতার দান বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনিই ধন্য! সাধুর ইচ্ছা-মৃত্যু বাধ্যতামূলক রাজ-দণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গৌরবজনক।

রাজা হরিশ্চন্দ্র সত্য-রক্ষার জন্য নিজেকে ও রাজমহিষীকে বিক্রয় করিলেন, ইহা তাঁহার স্বেচ্ছায় দান। হরিশ্চন্দ্রের আত্মত্যাগ হয়ত অনেকের নিকট উপাখ্যান বলেই মনে হইবে। কিন্তু জীবনে এমন অনেক সত্য ঘটনা সংঘটিত হয়, যাহা উপাখ্যান অপেক্ষা কোন অংশে কম চিত্তাকর্ষক নয়। বাঁকিপুরের প্রকাশচন্দ্রকে সকলেই জানেন। তিনি একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, ধনে মানে সম্ভ্রমে পদে তিনি বড়লোক। এক দিন একজন অতিথি (ভদ্রলোক বন্ধু) তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহে একটীও পয়সা নাই, কিরূপে তাঁর আদর অভ্যার্থনা হইবে? কি দিয়া তাঁর ছুটী ক্ষুধায় অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিবেন? তাঁহার চাপরাশী চিন্তামনকে ডাকিলেন, একটী ঘটী হাতে দিয়া বলিলেন যে, ইহা বিক্রয় করিয়া যে পয়সা পাইবে, তদ্দ্বারা কিছু আহার্য্য লইয়া আসিবে। চিন্তামন বলিল, সে কি হুজুর? আপনি ডিপুটী, আমি তাবেদার, হুকুম করিলে এখনি দশ হাজার টাকার জিনিষ ধারে আনিতে পারি। প্রকাশচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, না চিন্তামন, আমি ধার করি না। চিন্তামন চোখের জল রাখিতে পারিল না। ডিপুটীর পোষাক পরিয়া এক দেবতা যে তাহার কাছে আসিয়াছেন, বুঝিতে পারিল। দেবতার আজ্ঞা পালন করিল, ।৶০ ছয় আনা পয়সা ঘটীটী বিক্রয় করিয়া পাইল, তাহা দিয়া চাল ডাল আটা কিনিয়া আনিল। প্রকাশচন্দ্র স্বেচ্ছায় মিথ্যার অধিকার অতিক্রম করিয়া দরিদ্রের পবিত্র অধিকার গ্রহণ করিলেন। এ দান মানুষের শ্রেষ্ঠ দান! এই ব্রাহ্মসমাজে এমন কত ঘটনা আছে, যাহা লিপিবদ্ধ করিলে প্রকাণ্ড ইতিহাস হয়, উপন্যাস অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও মধুর সঙ্গীত অপেক্ষা মধুরতর হয়।

কেহ ধর্ম্মের জন্য অর্থ ত্যাগ করিলেন, কেহ বিত্ত ত্যাগ করিলেন, কেহ গৃহ, কেহ পিতামাতা, কেহ স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিলেন, কেহ গাঁদাফুল খাইয়া, কেহ কর্দ্দম ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নি-বারণ করিলেন। ইঁহাদের লইয়া একটী দল গঠিত হইল, ইঁহারা দেশের অগ্রণী, সৈনিক বেশে পাপ মিথ্যার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য ইঁহাদের জন্ম। দেশের পাপ, জাতির পাপ নিবারণ করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই আত্মদান করিয়াছেন। যখনই জাতি পাপ তাপে কলঙ্কিত হয়, তখনই বিধান আগমন করে। দেশের চারিদিকে যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে—সমাজে, কর্ম্মক্ষেত্রে, রাষ্ট্রে—ইহা কেবল অধিকার লইয়া। বিধাতার দত্ত অধিকার সকলকে দান করিতে হইবে। সমাজে ও দেশে সত্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে, সমাজে সকলের স্থান হইবে। ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা নির্ব্বিশেষে সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বিধাতার ইঙ্গিত শুনিয়া চল, পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিমালয়ে মহোৎসব।

আমাদের প্রিয় ভাই প্রমথলাল সেন সীমলা শৈল তীর্থে গমন করা অবধি প্রায় প্রতিদিনই এক একটি উৎসব সম্পাদন করিতে-ছেন। তাঁহার সহিত আমাদের কয়জন সাধক বন্ধুও গমন করিয়া তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছেন। এই উৎসবের সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১লা জুন, হিন্দি ও বাঙ্গালা কীর্ত্তন।

২রা জুন, ময়ূরভঞ্জের শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুচারুদেবীর সভা-নেতৃত্বে পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ "ধর্ম্মের একতা বিষয়ে ধারণা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৩রা জুন, প্রাতে ভাই প্রমথলাল বঙ্গভাষায় উপাসনা করেন, সন্ধ্যা ৫-৩০টার সময় ভ্রাতা বেণীমাধব দাস ইংরাজীতে উপাসনা করেন, ও লক্ষ্ণৌয়ের ভ্রাতা সত্যেন্দ্র নাথ রায় ইংরাজীতে উপদেশ দেন, বিষয়—"সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জাতিবিভাগ"

৮ই জুন, ভাই প্রমথলাল সেনের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত ভ্রাতা খড়্গসিংহ ঘোষ "নববিধানে বেদান্ত ও খৃষ্টধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

৯ই জুন, বাঙ্গলা ও হিন্দি কীর্ত্তন।

১০ই জুন, প্রাতে ভাই প্রমথলাল সেন বাঙ্গলা ভাষায় উপাসনা করেন, এবং সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় হিন্দিতে উপাসনা করেন ও শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস "নবযুগে হিমালয়ের দান" বিষয়ে উপদেশ দেন।

১৫ই জুন, হিন্দি ও বাঙ্গলা কীর্ত্তন।

১৬ই জুন, ভাই প্রমথ লালের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ "ধর্ম্ম জীবনে জীবন পরিবর্ত্তন"।

১৭ই জুন, প্রাতে ভাই প্রমথলাল বাঙ্গালায় উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ রায় হিন্দিতে উপাসনা করেন ও ভ্রাতা বেণীমাধব দাস ইংরাজীতে উপদেশ দেন, বিষয় "সমন্বয়ের নীতি"।

১৯শে জুন, প্রাতে ভাই প্রমথ লাল ও সন্ধ্যায় মহারাণী সুচারু দেবী বাঙ্গালা ভাষায় উপাসনা করেন।

২১শে জুন, ভ্রাতা বেণীমাধব দাস "উৎসবের ভাব" বিষয়ে উপদেশ দেন, তাহার পর সংকীর্ত্তন হয়।

২৩শে জুন, সন্ধ্যায় শিশু-সম্মিলন ও পরে আরতি হয়।

২৪শে জুন, প্রাতে ভাই প্রমথলাল ইংরাজীতে উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তনে উপাসনা হয়।

২৫শে জুন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদিগের সম্মিলন হয়। মহারাণী সুচারু দেবী সবান্ধবে সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া জলযোগাদি করান।

গত ৩রা জুলাই, বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ বন্ধুদিগকে লইয়া হিমালয় ব্রহ্মমন্দির-প্রাঙ্গণে আর এক বন্ধু সম্মিলন হয়। মহারাণী সুচারু দেবী অন্যান্য ভগ্নীদিগের সংযোগে সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। সিমলায় সকল সম্প্রদায়ের প্রায় প্রধান ব্যক্তিগণ সমাগত হন। এই উপলক্ষে বাঙ্গলা ও হিন্দি ভাষায় সঙ্গীত হইলে, ভাই প্রমথলাল একটি প্রার্থনা করেন, মহরাণী সুচারু দেবী ও মিস সুনীতি ঘোষ ভগ্নীদিগের অভিনন্দন-সূচক কিছু কিছু বলিয়া সকলকে ভাই ফোঁটা ও পুষ্পমালা অর্পণ করেন এবং পরে চা ও মিষ্টান্ন দিয়া জলযোগ করান।

গত ৮ই জুলাই, প্রাতে ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন এবং সন্ধ্যায় ভ্রাতা সত্যেন্দ্র নাথ রায় ইংরাজীতে উপাসনা ও উপদেশ দান করেন।

১১ই জুলাই, লক্ষ্ণৌ ইসাবেলা কলেজের মিস্ এম, ডিমিট, এম, এ, "ব্যক্তিত্বের প্রতি ভক্তি" বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। আরম্ভে ও শেষে বাঙ্গালা ও হিন্দি কীর্ত্তন হয়।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ৬ই জুলাই, সেবক ভাই প্রিয়নাথের মাতৃদেবীর জন্মদিন স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। ১৫ই ১৬ই জুলাই সেবক ভাই প্রিয়নাথের জন্মদিন স্মরণে ভ্রাতা ভগ্নীদিগের সম্মিলন ও বিশেষ উপাসনাদি হয়।

নামকরণ—গত ১লা শ্রাবণ, মঙ্গলবার, দানাপুর-প্রবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কুণ্ডুর পৌত্রী ও ডাঃ অমরনাথ কুণ্ডুর শিশু-কন্যার নামকরণ উপলক্ষে তাঁহার লিলুয়াস্থ ভবনে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল. শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দোপাধ্যায় উপাসনা করিয়াছিলেন। শিশুর নাম শ্রীমতী "রুবী" ও শ্রীমতী "সবিতা" রাখা হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রচার আশ্রমের বাড়ী ভাড়ার ঋণ পরিশোধার্থ ৫ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভ বিবাহ—গত ১৮ই আষাঢ়, আলিপুরে, জুলজিকাল গার্ডেনে, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ বসুর চতুর্থ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সত্যপ্রিয় বসুর সহিত, বারাসত-নিবাসী স্বর্গীয় হৃষীকেশ চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা, জুলজিক্যাল গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার বসুর ভাগিনেয়ী কল্যাণীয়া শ্রীমতী শোভনার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন। ভগবান্ এই নব দম্পতিকে স্বর্গের আশীর্ব্বাদ দান করুন।

পরলোকগমন—আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১২ই জুলাই, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়, বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, সকল যন্ত্রণার অতীত দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল। তাঁর চরিত্রে অনেকগুলি সদ্গুণ ছিল। তাঁর ধর্ম্মোৎসাহ, বিধান-বিশ্বাস, দৃঢ়চিত্ততা, নবভক্তের প্রতি অচলা ভক্তি প্রভৃতি সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করিত। রোগ, শোক, দুঃখ, দরিদ্র্য, পত্নীবিয়োগ, কন্যা-বিয়োগ, অর্থনাশ, মনস্তাপ প্রভৃতি নানাবিধ গুরুতর পরীক্ষায় পড়িয়াও তিনি বিচলিত হন নাই এবং ঈশ্বর-বিশ্বাস হারান নাই। তিনি সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। শোক, দুঃখ, তাপের মধ্যে প্রেমময়ের প্রেমসঙ্গীত রচনা করিয়া, বিশ্বাস ও ভক্তিভরে তাহা গান করিয়া নিজে মুগ্ধ হইতেন, অন্যকেও মুগ্ধ করিতেন। পরমজননী তাঁর অনন্ত প্রেমবক্ষে তাঁর এই সন্তানকে আশ্রয় দান করুন এবং শোকভারাক্রান্ত পুত্র কন্যা ও আত্মীয় স্বজনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ৮ই আষাঢ়, ভাই প্রিয়নাথের স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। নিত্যকালী বালিকা বিদ্যালয় এই উপলক্ষে অবসর দেওয়া হয়।

গত ২০শে মে, রবিবার, প্রাতে, ভাগলপুরে, লীলালজে, স্বর্গীয় বিনয়ভূষণ বসুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উপাসনা হয়, শ্রীমতী মনোমহিনী বসু উপাসনার কার্য্য করেন, কন্যা শ্রীমতী কৃপাকণা একটী লিখিত প্রার্থনা পাঠ করেন। স্থানীয় কয়েকটী মহিলা উপাসনায় যোগ দেন। ধর্ম্মতত্ত্বের ঋণ পরিশোধার্থ ২ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১৬ই জুলাই, ৭নং বজবজ রোডে, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বীরের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী কুমুদিনী দাস প্রচার ভাণ্ডারে ২ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, গিঁথিতে, শ্রীযুক্ত কালীপদ দাসের পত্নীর সাম্বৎসরিক দিনে কালী বাবুই উপাসনা করেন এবং ভাই প্যারী মোহন চৌধুরীর সেবার্থ ১ টাকা দান করেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Prirya-nath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

স্ববিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৬৩ ভাগ । ১৪শ সংখ্যা ।
১৬ই শ্রাবণ, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক, ৯৯ ব্রাহ্মাব্দ ।
1st AUGUST, 1928.
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ ।

প্রার্থনা ।

হে বিশ্বজননি, তুমি আমাদিগকে দেশের সঙ্গে, দশের সঙ্গে, বিশ্বের সঙ্গে মিলিত করিয়া, তোমার পবিত্র প্রশস্ত নববিধানের কার্য্যক্ষেত্রে স্থাপন করিয়াছ। তোমার পবিত্র নববিধান-ধর্ম্ম তো সুধু কোন বিশেষ নামে পরিচিত, ক্ষুদ্র-মণ্ডলীবদ্ধ, হাতে গণা অতি অল্প-সংখ্যক নর নারীর জন্য নয় ? এ ধর্ম্ম উদার-ভাবে সকল শ্রেণীর নর নারীর জন্য আপনার প্রেমবাহু প্রসারণ করিয়া, সকলকেই সমভাবে আলিঙ্গন করিতে, গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু দেখ, আমাদের মন কেবল নিজের পরিত্রাণ ও নিজের কল্যাণের জন্য, বেশী হইলে নিজের পরিবার ও নিজের মণ্ডলী বলিয়া যাঁহারা গণ্য, অন্ততঃ তাঁহাদের জন্য কিছু কিছু আপনার ভাব ও রুচি অনুসারে করিতে ব্যস্ত ; জগতের জন্য, বিশেষভাবে নিজের দেশের জন্য, দশের জন্য ভাবিতে ও কার্য্য করিতে আমরা তেমন অভ্যস্ত কই ? আমরা যদি দেশের ও দশের শোক সন্তাপে, দুঃখ দৈন্যে সমবেদনা সহ ব্যথিত হইয়া, তাঁহাদের বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক সকল অভাবে আমাদিগকে অভাবগ্রস্ত মনে না করি, আমরা যে সুধু তাঁহাদের সেবা হইতে নিজকে বঞ্চিত করিলাম তাহা নহে, আমরা আমাদিগকে নববিধানের অতি উচ্চ ও উদার ধর্ম্মের লোক বলিয়া পরিচিত ও গণ্য করিয়াও আমরা কার্য্যতঃ ক্ষুদ্রমনা, ক্ষুদ্র-হৃদয়ই রহিয়া গেলাম ; সাম্প্রদায়িক গণ্ডির ক্ষুদ্র সীমাতে আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া আমরা ভাবতঃ কার্য্যতঃ সাম্প্রদায়িকই হইলাম। নিজ জীবনের মহা ক্ষতি করিলাম, ধর্ম্ম-মণ্ডলীর ক্ষতি করিলাম, তোমার সাধ অপূর্ণ রহিল, নববিধান ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এরূপ অপরাধ অল্পাধিক নিজ জীবনে ও আমাদের সহকর্ম্মি-দলে প্রত্যক্ষ করিয়া, কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিতেছি, নবযুগে কার্য্য, অনুষ্ঠান ও আচরণে যিনি উদারভাবে স্বদেশ ও বিদেশের কল্যাণের জন্য, সদ্গতি ও মিলনের জন্য, বিশেষ ভাবে আপনার দেশের জন্য, দশের জন্য কত ভাবে সেবা করিয়া গেলেন, সেবার আদর্শ রাখিয়া গেলেন, সেই ভক্ত ব্রহ্মানন্দের পদ-চিহ্ন অনুসরণ করিয়া এবং স্বদেশ বিদেশের অনুকরণীয় বিভিন্ন কর্ম্মী ও সেবকগণের ভাব গ্রহণ করিয়া, যাহাতে আমরা জগতের জন্য সাধারণ ভাবে এবং আপনার দেশের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক দুঃখ দৈন্যে প্রপীড়িত ভাই ভগ্নীর জন্য বিশেষ-ভাবে সেবার ভার গ্রহণ করিতে পারি, তোমার দেওয়া যাহা কিছু উপযোগিতা আমাদের আছে, তাহা দ্বারা প্রাণ ভরিয়া সেবা করিয়া যাহাতে তোমার সাধ পূর্ণ করিতে পারি, তোমার উদার ধর্ম্ম নববিধানকে মহিমান্বিত করিতে পারি, তুমি আমাদিগকে সেই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

—•—

২১শে জুন, ভ্রাতা বেণীমাধব দাস "উৎসবের ভাব" বিষয়ে উপদেশ দেন, তাহার পর সংকীর্ত্তন হয়।

২৩শে জুন, সন্ধ্যায় শিশু-সম্মিলন ও পরে আরতি হয়।

২৪শে জুন, প্রাতে ভাই প্রমথলাল ইংরাজীতে উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তনে উপাসনা হয়।

২৫শে জুন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদিগের সম্মিলন হয়। মহারাণী সুচারু দেবী সবান্ধবে সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া জলযোগাদি করান।

গত ৩রা জুলাই, বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ বন্ধুদিগকে লইয়া হিমালয় ব্রহ্মমন্দির-প্রাঙ্গণে আর এক বন্ধু সম্মিলন হয়। মহারাণী সুচারু দেবী অন্যান্য ভগ্নীদিগের সংযোগে সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। সিমলাস্থ সকল সম্প্রদায়ের প্রায় প্রধান ব্যক্তিগণ সমাগত হন। এই উপলক্ষে বাঙ্গলা ও হিন্দি ভাষায় সঙ্গীত হইলে, ভাই প্রমথলাল একটি প্রার্থনা করেন, মহরাণী সুচারু দেবী ও মিস সুনীতি ঘোষ ভগ্নীদিগের অভিনন্দন-সূচক কিছু কিছু বলিয়া সকলকে ভাই ফোঁটা ও পুষ্পমালা অর্পণ করেন এবং পরে চা ও মিষ্টান্ন দিয়া জলযোগ করান।

গত ৮ই জুলাই, প্রাতে ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন এবং সন্ধ্যায় ভ্রাতা সত্যেন্দ্র নাথ রায় ইংরাজীতে উপাসনা ও উপদেশ দান করেন।

১১ই জুলাই, লক্ষ্ণৌ ইসাবেলা কলেজের মিস্ এম, ডিমিট, এম, এ, "ব্যক্তিত্বের প্রতি ভক্তি" বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। আরম্ভে ও শেষে বাঙ্গালা ও হিন্দি কীর্ত্তন হয়।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ৬ই জুলাই, সেবক ভাই প্রিয়নাথের মাতৃদেবীর জন্মদিন স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। ১৫ই ১৬ই জুলাই সেবক ভাই প্রিয়নাথের জন্মদিন স্মরণে ভ্রাতা ভগ্নীদিগের সম্মিলন ও বিশেষ উপাসনাদি হয়।

নামকরণ—গত ১লা শ্রাবণ, মঙ্গলবার, দানাপুর-প্রবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কুণ্ডুর পৌত্রী ও ডাঃ অমরনাথ কুণ্ডুর শিশু-কন্যার নামকরণ উপলক্ষে তাঁহার বিলুয়াস্থ ভবনে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল. শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করিয়াছিলেন। শিশুর নাম শ্রীমতী "রুবী" ও শ্রীমতী "সবিতা" রাখা হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রচার আশ্রমের বাড়ী ভাড়ার ঋণ পরিশোধার্থ ৫্ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভ বিবাহ—গত ১৮ই আষাঢ়, আলিপুরে, জুলজিক্যাল গার্ডেনে, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ বসুর চতুর্থ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সত্যপ্রিয় বসুর সহিত, বারাসত-নিবাসী স্বর্গীয় হৃষীকেশ চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা, জুলজিক্যাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার বসুর ভাগিনেয়ী কল্যাণীয়া শ্রীমতী শোভনার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন। ভগবান্ এই নব দম্পতিকে স্বর্গের আশীর্ব্বাদ দান করুন।

পরলোকগমন—আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১২ই জুলাই, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়, বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, সকল যন্ত্রণার অতীত দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল। তাঁর চরিত্রে অনেকগুলি সদ্গুণ ছিল। তাঁর ধর্ম্মোৎসাহ, বিধান-বিশ্বাস, দৃঢ়চিত্ততা, নবভক্তের প্রতি অচলা ভক্তি প্রভৃতি সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করিত। রোগ, শোক, দুঃখ, দরিদ্র্য, পত্নীবিয়োগ, কন্যাবিয়োগ, অর্থনাশ, মনস্তাপ প্রভৃতি নানাবিধ গুরুতর পরীক্ষায় পড়িয়াও তিনি বিচলিত হন নাই এবং ঈশ্বর-বিশ্বাস হারান নাই। তিনি সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। শোক, দুঃখ, তাপের মধ্যে প্রেমময়ের প্রেমসঙ্গীত রচনা করিয়া, বিশ্বাস ও ভক্তিভরে তাহা গান করিয়া নিজে মুগ্ধ হইতেন, অপরকেও মুগ্ধ করিতেন। পরমজননী তাঁর অনন্ত প্রেমবক্ষে তাঁর এই সন্তানকে আশ্রয় দান করুন এবং শোকভারাক্রান্ত পুত্র কন্যা ও আত্মীয় স্বজনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ৮ই আষাঢ়, ভাই প্রিয়নাথের স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। নিত্যকালী বালিকা বিদ্যালয় এই উপলক্ষে অবসর দেওয়া হয়।

গত ২০শে মে, রবিবার, প্রাতে, ভাগলপুরে, লীলালজে, স্বর্গীয় বিনয়ভূষণ বসুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উপাসনা হয়, শ্রীমতী মনোমোহিনী বসু উপাসনার কার্য্য করেন, কন্যা শ্রীমতী কৃপাকণা একটী লিখিত প্রার্থনা পাঠ করেন। স্থানীয় কয়েকটী মহিলা উপাসনায় যোগ দেন। ধর্ম্মতত্ত্বের ঋণ পরিশোধার্থ ২্ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১৬ই জুলাই, ৭নং বকুলবাগান রোডে, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বীরের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী কুমুদিনী দাস প্রচার ভাণ্ডারে ২্ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, সিঁথিতে, শ্রীযুক্ত কালীপদ দাসের পত্নীর সাম্বৎসরিক দিনে কালী বাবুই উপাসনা করেন এবং ভাই প্যারী মোহন চৌধুরীর সেবার্থ ১্ টাকা দান করেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Prirya-nath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৩ ভাগ। ১৪শ সংখ্যা। | ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক, ৯৯ ব্রাহ্মাব্দ।
1st AUGUST, 1928. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে বিশ্বজননি, তুমি আমাদিগকে দেশের সঙ্গে, দশের সঙ্গে, বিশ্বের সঙ্গে মিলিত করিয়া, তোমার পবিত্র প্রশস্ত নববিধানের কার্য্যক্ষেত্রে স্থাপন করিয়াছ। তোমার পবিত্র নববিধান-ধর্ম্ম তো সুধু কোন বিশেষ নামে পরিচিত, ক্ষুদ্র-মণ্ডলীবদ্ধ, হাতে গণা অতি অল্প-সংখ্যক নর নারীর জন্য নয়? এ ধর্ম্ম উদার-ভাবে সকল শ্রেণীর নর নারীর জন্য আপনার প্রেমবাহু প্রসারণ করিয়া, সকলকেই সমভাবে আলিঙ্গন করিতে, গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু দেখ, আমাদের মন কেবল নিজের পরিত্রাণ ও নিজের কল্যাণের জন্য, বেশী হইলে নিজের পরিবার ও নিজের মণ্ডলী বলিয়া যাঁহারা গণ্য, অন্ততঃ তাঁহাদের জন্য কিছু কিছু আপনার ভাব ও রুচি অনুসারে করিতে ব্যস্ত; জগতের জন্য, বিশেষভাবে নিজের দেশের জন্য, দশের জন্য ভাবিতে ও কার্য্য করিতে আমরা তেমন অভ্যস্ত কই? আমরা যদি দেশের ও দশের শোক সন্তাপে, দুঃখ দৈন্যে সমবেদনা সহ ব্যথিত হইয়া, তাঁহাদের বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক সকল অভাবে আমাদিগকে অভাবগ্রস্ত মনে না করি, আমরা যে সুধু তাঁহাদের সেবা হইতে নিজকে বঞ্চিত করিলাম তাহা নহে, আমরা আমাদিগকে নববিধানের অতি উচ্চ ও উদার ধর্ম্মের লোক বলিয়া পরিচিত ও গণ্য করিয়াও আমরা কার্য্যতঃ ক্ষুদ্রমনা, ক্ষুদ্র-হৃদয়ই রহিয়া গেলাম; সাম্প্রদায়িক গণ্ডির ক্ষুদ্র সীমাতে আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া আমরা ভাবতঃ কার্য্যতঃ সাম্প্রদায়িকই হইলাম। নিজ জীবনের মহা ক্ষতি করিলাম, ধর্ম্ম-মণ্ডলীর ক্ষতি করিলাম, তোমার সাধ অপূর্ণ রহিল, নববিধান ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এরূপ অপরাধ অল্পাধিক নিজ জীবনে ও আমাদের সহকর্ম্মি-দলে প্রত্যক্ষ করিয়া, কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিতেছি, নবযুগে কার্য্য, অনুষ্ঠান ও আচরণে যিনি উদারভাবে স্বদেশ ও বিদেশের কল্যাণের জন্য, সদ্গতি ও মিলনের জন্য, বিশেষ ভাবে আপনার দেশের জন্য, দশের জন্য কত ভাবে সেবা করিয়া গেলেন, সেবার আদর্শ রাখিয়া গেলেন, সেই ভক্ত ব্রহ্মানন্দের পদ-চিহ্ন অনুসরণ করিয়া এবং স্বদেশ বিদেশের অনুকরণীয় বিভিন্ন কর্ম্মী ও সেবকগণের ভাব গ্রহণ করিয়া, যাহাতে আমরা জগতের জন্য সাধারণ ভাবে এবং আপনার দেশের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক দুঃখ দৈন্যে প্রপীড়িত ভাই ভগ্নীর জন্য বিশেষ-ভাবে সেবার ভার গ্রহণ করিতে পারি, তোমার দেওয়া যাহা কিছু উপযোগিতা আমাদের আছে, তাহা দ্বারা প্রাণ ভরিয়া সেবা করিয়া যাহাতে তোমার সাধ পূর্ণ করিতে পারি, তোমার উদার ধর্ম্ম নববিধানকে মহিমান্বিত করিতে পারি, তুমি আমাদিগকে সেই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

তপস্যার উত্তাপ।

পুণ্যভূমি ভারতের প্রাচীন কালের তপস্যার স্বর্গীয় উত্তাপে উদ্দীপ্ত, উজ্জ্বল মহিমাময় ঋষি আত্মা, যোগী আত্মা, ভক্তাত্মা সকল এখন কোথায়, যাঁহারা ভারতের নিত্য কালের অলঙ্কার হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহারা আপনারা অমর হইয়া তাঁহাদের অমর জীবনের প্রতাপ দ্বারা ভারতকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন? স্বদেশে তাঁহারা অমর, বিদেশেও তাঁহারা অমর, পরলোকে তাঁহারা অমর, ইহলোকেও তাঁহারা অমর। একি একটা ভাবের কথা, না অমোঘ তত্ত্বমূলক সত্য? সুধু তত্ত্বমূলক, বিচারমূলক সত্য, না জীবনে উপলব্ধিমূলক সত্য? ইহা দুই একটি বিশেষ জীবনে উপলব্ধির বিষয়, না ঈশ্বর বিশ্বাসী সাধনশীল প্রত্যেক জীবনের উপলব্ধির বিষয়? ইহা সুধু সাধনশীল বিশেষ শ্রেণীর উপলব্ধির বিষয়, না জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে সর্ব্বসাধারণের সহজ ধারণার বিষয় এবং সম্ভোগের বিষয়? এ সকল একটু বিশদরূপে ভাবিবার বিষয়।

তপস্যার উত্তাপ ঈশ্বরের স্বর্গীয় উত্তাপ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ঈশ্বর অবিনাশী, তপস্যার উত্তাপও অবিনাশী। তপস্যার উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ অমর হইলেন, সে উত্তাপ লইয়া তাঁহারা অদৃশ্য লোকে চলিয়া গেলেন, ইহা আমরা জানি। অদৃশ্য লোকে ঋষি আত্মাদের অমর জীবনে সে উত্তাপ নিত্য বিরাজমান, আমরা ইহা স্বীকার করিতে পারি। এ স্বীকার অনুমানের স্বীকার নয়। ঋষি আত্মাগণ তপস্যার উত্তাপ-বলে অমর জীবন পাইয়াছেন; তাঁহাদের জীবন যখন অমর, তখন তাঁহাদের জীবনের প্রাণস্বরূপ মৌলিক উপাদান তপস্যালব্ধ উত্তাপও অবিনাশী, ইহা গণিতের গণনামূলক সিদ্ধান্তের ন্যায় সত্য। এরূপ গণনামূলক অথবা যুক্তিমূলক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া কি আমরা বলিতে পারি, তপস্যার উত্তাপের অবশ্যই বিনাশ নাই, তাহা হইলেও এ সিদ্ধান্তের মূল্য ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে কিছুই নয়? অতীতকালের ঋষি, যোগী, ভক্তগণের জীবন-লব্ধ স্বর্গীয় উত্তাপ যদি বর্ত্তমানে শরীরধারী লোক-সমাজে সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় না হয়, কোন প্রকারে সম্ভোগের বস্তু না হয়, তবে সে উত্তাপের নিত্যতার মূল্য আমাদের নিকট কিছুই নয়; সে নিত্যতার সংবাদ শ্রুতি-মধুর হইলেও অর্থশূন্য। স্বদেশের, বিদেশের অতীতকালের সাধকদিগের তপস্যালব্ধ উত্তাপ আমরা প্রধানতঃ দুইটী উপায়ে সাক্ষাৎ উপলব্ধি ও সম্ভোগের বিষয় করিয়া থাকি। প্রথমতঃ তাঁহাদের অমর বাণীর ভিতর দিয়া, দ্বিতীয়তঃ সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহাদের আত্মিক জীবন গ্রহণের ভিতর দিয়া।

তপস্যানিরত অমর জীবনের অমর বাণী কিরূপে তাঁহাদের জীবনলব্ধ তপস্যার উত্তাপকে, লোক-সমাজে, পরিবারে পরিবারে, ব্যক্তিগত জীবনে, ব্রত নিয়ম অনুষ্ঠানে, লৌকিক আচরণে, স্বদেশে, বিদেশে নিত্য প্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত করিয়া, মানবকুলকে বংশপরম্পরায়, যুগপরম্পরায় সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, স্বর্গের উত্তাপে উত্তপ্ত রাখিয়াছে, সুখ সম্পদে পূর্ণ রাখিয়াছে, শিক্ষা সভ্যতায় মণ্ডিত রাখিয়াছে, তাহাই প্রথমে আমরা আলোচনা করিব।

সাধক-জীবন যখনই তপস্যার উত্তাপে সমধিক উত্তপ্ত হয়, তখনই তাঁহার জীবনে নব নব কর্ম্ম-শক্তি জাগিয়া উঠে, জীবনের বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের দিকে অনুপ্রাণন (Inspiration) উপস্থিত হয়। ঈশ্বরানুপ্রাণন যে কর্ম্মের মূলে, সে কর্ম্ম কোন ব্যক্তিগত কি পারিবারিক জীবনে আবদ্ধ থাকে না, সে কর্ম্ম বিশ্বমঙ্গল বিশ্বসেবায় নিয়োজিত হয়। তাই দেখি, ঈশ্বরানুপ্রাণিত ঋষি ও ভক্তদিগের জীবন-প্রস্রবণ হইতে ঈশ্বরবাণীপূর্ণ কত বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ, কত স্তোত্র, কত ধর্ম্মসঙ্গীত, ঈশ্বরের গুণ ও মহিমা কীর্ত্তনের আকারে খরধারায় প্রবাহিত হইয়া, চিরকালের জন্য পৃথিবীর সম্পদরূপে রহিয়া গিয়াছে। তাই দেখি, দেশ ও কালের অতীত ভাবে, বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রের আদর ইউরোপ ও আমেরিকায় এবং বাইবেল ও কোরাণের আদর ভারতে! তাই দেখি, জনচক্ষুর অগোচরে সুদূর বনভূমিতে যেমন কত সুন্দর সুবাসিত ফুল ফুটিয়া আবার লোকচক্ষুর অগোচরেই শুকাইয়া যায়, তেমনই এ দেশে এবং অন্য দেশে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে, নগণ্য ভাবে, তপস্যার উত্তাপে উত্তপ্ত কত সাধু-জীবন-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া, অল্প স্থানে অল্প লোকের মধ্যে আপনাদের সুগন্ধ ছড়াইয়া, অল্প সময় মধ্যেই, সাধারণ জনমণ্ডলীর দৃষ্টির অগোচরে অদৃশ্যলোকে গিয়া চির-অদৃশ্য হইয়া গেলেও তাঁহারা এই পৃথিবীর সম্পর্কে মরেন নাই, অমরজীবনে জীবিত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা এতদিন লুপ্ত রত্নের আকারে বিস্মৃতির গর্ভে, অবহেলার অতলতলে লুক্কায়িত ছিলেন। এখন কত শত শত বৎসর পরে দেশের

অনেক সুসন্তান, সত্যরত্ন ও তত্ত্বরত্ন উদ্ধারে ব্রতধারী হইয়া, সেই সকল অজানিত অজ্ঞাত সাধু সাধ্বীদিগের ধর্ম্মজীবন-লব্ধ পরমতত্ত্ব, যাহা তাঁহাদের তপস্যামূলক উত্তাপময় বাণীতে, খণ্ড উপদেশের আকারে, বিবিধ গাথা ও সঙ্গীতের আকারে দুই চারিটী শিষ্য প্রশিষ্যের জীবনে নিবদ্ধ আছে, তাহা কুড়াইয়া লইয়া পুস্তক ও পুস্তিকায় পরিণত করিতেছেন, কথকতায়, পাঠ ও প্রসঙ্গে তাহা প্রচার করিতেছেন, এবং শিক্ষা, সভ্যতা ও ধনে, মানে মণ্ডিত কত নরনারী তাহা আদরে শ্রবণ করিয়া, গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেছেন। ধন্য তপস্যার উত্তাপপ্রসূত অমর বাণী!

তৎপর আলোচনার বিষয়, তপস্যার উত্তাপপ্রসূত আত্মিক অমর জীবন। ঈশা, চৈতন্য প্রভৃতি বড় বড় সাধু আত্মা, ভক্তাত্মাগণ হইতে আরম্ভ করিয়া, স্বদেশের বিদেশের ছোট বড় কত সাধু সাধ্বী পুণ্যাত্মা নরনারীর জীবন, এখন আমাদের নিত্য অনুধ্যানের বিষয়। দেহধারী সাধুদের সঙ্গ অপেক্ষা সেই অদেহী অমরাত্মাগণ আমাদের ধর্ম্মজীবন-পথে কত মূল্যবান জীবন্ত জ্বলন্ত সৎসঙ্গ। ঈশ্বর সর্ব্বোপরি পরম সহায়, ঈশ্বরের কৃপার দান এই সাধু ভক্তগণের জীবন, ঈশ্বরের পরেই মানব-কুলের অমূল্য সহায়। সত্যই তাঁহারা লোক-সমাজরূপ বিচিত্র ও বিরাট সৌধমালার স্তম্ভস্বরূপ। কিন্তু এই মানবকুলভূষণ সাধু ভক্তগণের সকল জীবনই তপস্যার উত্তাপ-জাত।

শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল বিষয়ে দুর্ব্বল বঙ্গ ও ভারতের লোক আমরা। বঙ্গ ও ভারতের প্রিয় ভাই ভগ্নীদিগের নিকট তাই সবিনয়ে নিবেদন করি, বঙ্গ ও ভারতের উদ্ধার-সাধন যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, বঙ্গ ও ভারতের মুখ উজ্জ্বল করা যদি আমাদের অভিপ্রায় হয়, তবে ব্রহ্ম-তপস্যার উত্তাপলব্ধ সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর অমর জীবনই আমাদের সর্ব্বোপরি লভনীয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

পৌত্তলিকতা।

নববিধানাচার্য্য প্রার্থনায় বলিলেন, "বেদ বেদান্তের সময় কি কঠোর ব্রহ্মজ্ঞান ছিল, পৌত্তলিকতার সময় কি বিকৃত ব্রহ্মজ্ঞান ছিল"; এই দুই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানই নববিধানে অপসারিত। যাহা হউক, পৌত্তলিকতা যে ব্রহ্মজ্ঞানেরই বিকার, ইহা আচার্য্যদেব স্বীকার করিয়াছেন। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা", সাধকদিগের হিতের জন্যই ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, ইহাইত পৌত্তলিকতার মূল। মানবের কল্পনা হইতে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং ইহা ব্রহ্মজ্ঞানের বিকার ভিন্ন আর কি? বাস্তবিক ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করিতে গিয়া সাধকের কল্পিত ভাব হইতেই এই পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হইয়াছে। বেদ বেদান্তের প্রতিপাদ্য নিরাকার ব্রহ্মকে ব্যক্তিরূপে উপলব্ধি করাই নববিধানের নূতন ব্রহ্মজ্ঞান। নববিধান "বেদ বেদান্তের কঠোর ব্রহ্মজ্ঞানকে" সহজ করিয়াছেন এবং "পৌত্তলিকতার বিকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের" প্রকৃত তথ্য উদ্ভাবন করিয়া এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন।

দাস্যভাব সাধন।

স্বাধীনতার আন্দোলনের যুগে দাস্যভাব-সাধনের উৎকর্ষ কে স্বীকার করিবেন? কিন্তু ধর্ম্মবিধানে পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থই অধীনতা বা প্রকৃত দাস্যভাব। যুগে যুগে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ তাই ইহার মহত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন এবং এখনও যাঁহারা স্বাধীনতার প্রকৃত পক্ষপাতী তাঁহারা কি, দেশের সেবা, দশের সেবা এবং ঈশ্বর ও তাঁর ভক্তগণের সেবা-সাধনেই যে মুক্তি, তাহা অস্বীকার করিতে পারেন? বাস্তবিক দাস্যভাব সাধন করিতেই মানবাত্মা পৃথিবীতে প্রেরিত ও নিয়োজিত এবং স্বাধীন-ভাবে দাস্যভাব সাধন করাই আমাদের জীবনের সর্ব্বোচ্চ সাধন। আমরা যেন এই ভাবে ঈশ্বরের, দেশের ও জগতের সেবা করিয়া প্রকৃত মুক্তি লাভ করিতে পারি।

মৃত্যু।

মহাপণ্ডিত সোলেমান বলেন, "জীবনে ভ্রান্তির পথে চলিয়া মৃত্যুকে বরণ করিও না। পাপাচরণ দ্বারা নিজকে ধ্বংস-মুখে লইয়া যাইও না। ঈশ্বর মৃত্যু সৃজন করেন নাই, কাহাকেও বিনাশের পথে যাইতে দেখিলে তিনি তুষ্ট হন না। বাঁচিবার জন্যই সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি। সৃজনী-শক্তি জীবনের অনুকূল, তাহাতে মৃত্যুর আধিপত্য থাকিবে না।" কি সুন্দর কথা। বাস্তবিক ঈশ্বর মৃত্যু সৃজন করেন নাই। নববিধানও বলেন, পাপই মৃত্যু, সে মৃত্যু মানবের সৃষ্ট, ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়। নরকৃত যাহা তাহাই নরক, যেন আমরা ইহা উপলব্ধি করিয়া মৃত্যুকে জয় করি ও মৃত্যু হইতে অমরত্বে যাইতে পারি।

দাস দাসীর কার্য্য।

দাস দাসীর প্রধান কার্য্য গৃহের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা। গৃহের আবর্জ্জনা যেমন, সংসারের আবর্জ্জনা তেমনি পাপ এবং রিপু-পরতন্ত্রতা। ঈশ্বরের গৃহে যাঁহারা দাস দাসীরূপে নিযুক্ত, তাঁহাদেরও প্রধান কার্য্য, সংসারের এই পাপ আবর্জ্জনা পরিষ্কার

করা। অতএব দেহ মন প্রাণ, গৃহ-পরিবার, সমাজ এবং দেশকে ঈশ্বরের গৃহরূপে দর্শন করিয়া, তাহার সকল প্রকার আবর্জ্জনা মুক্ত করাই ঈশ্বরের দাসদাসীর কার্য্য।

—•—

আচার্য্যের প্রার্থনা-সাধন।

নববিধানের উপাসনা নূতন উপাসনা। এই উপাসনা-প্রণালী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপাসনা-প্রণালী। সঙ্গীত, উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, নাম-স্মরণ, শাস্ত্র-পাঠ, উপদেশ, প্রার্থনা এই কয়টি এই প্রণালীর প্রধান অঙ্গ। এই সকলের মধ্যে এখন আচার্য্যের প্রার্থনাও একটি বিশেষ অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেকের মধ্যে মত-ভেদ বা ভাব-বিভেদ দেখা যায়।

কেহ কেহ একেবারেই আচার্য্যের প্রার্থনা উপাসনা-প্রণালীর অঙ্গরূপে গ্রহণের বিরোধী; কেন না তাঁহারা ভয় করেন, পাছে তদ্দ্বারা আচার্য্যকে অভ্রান্ত গুরু বলিয়া, ঈশা গৌরাঙ্গের শিষ্যেরা যেমন তাঁহাদিগকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করিতেছেন, আমরাও তেমনি করিয়া তুলি।

আবার আচার্য্যের প্রার্থনা যাঁহারা উপাসনার অঙ্গরূপে সাধন করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও এ সম্বন্ধে ভাব-বিভেদ অনেক দেখা যায়। কেহ কেহ ইহাকে শাস্ত্রের ন্যায় পাঠ করিয়া, উপদেশ বা নিজ প্রার্থনার ভাব উদ্দীপনায় সহায় মনে করেন।

আমরা কিন্তু এ ভাবের পক্ষপাতী নই। কেন না ইহাতে শাস্ত্রকার সাধুগণের স্থানীয়রূপেই আচার্য্যকে গ্রহণ করা হয় এবং সে ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করা আমরা সমুচিত মনে করি না। এতদ্দ্বারা ক্রমে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের আশঙ্কার কারণ এখন না হউক, পরবর্ত্তী কালে সাধকদিগের মধ্যে যে আসিতে পারে, সন্দেহ নাই।

আচার্য্যের সহিত আমরা চির সহসাধক হইয়া নববিধান সাধন করিব, ইহাই নববিধানের নূতন সাধন। সেই জন্য প্রতিদিন তাঁহার আত্মিক সঙ্গ সাধনার্থ তাঁহার প্রার্থনায় প্রার্থনা করা আমাদের উপাসনা-প্রণালীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু এ সম্বন্ধেও অনেকে বলেন, আচার্য্যদেবের আত্মা এখন যে উন্নত অবস্থায় উন্নীত হইতেছেন, কি করিয়া আমরা তাঁর সে আত্মার সঙ্গ পাইব? তখন যে প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন, এখনও তিনি তাহাই করিতেছেন, ইহা কিরূপে আমরা স্বীকার করিব? ইহার উত্তর এই যে, তিনি যখন দেহে অবস্থিত ছিলেন, তখনও ত আমাদের অপেক্ষা উন্নত ছিলেন, তথাপি যেমন আমাদের আত্মা তাঁহার উন্নততর আত্মার সঙ্গে সাধন করিতে সক্ষম হইত, এখনও ত তেমনি তাঁর আত্মার সঙ্গ করিতে সক্ষম। অবশ্য তাঁহার আত্মার উন্নতির সঙ্গে আমাদের আত্মা ছুটিতে পারিতেছে না। কিন্তু তিনি দেহে অবস্থান কালে যে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহা তো আমাদের অগ্রে আয়ত্ত করিতে হইবে; এবং তবেত তিনি এখন যে অবস্থা লাভ করিতেছেন, তাহা পাইতে আশা করিতে পারিব।

ব্রহ্ম-সম্বন্ধে আচার্য্য যেমন বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম নিত্য, তা থাকুন; কিন্তু আমার লব্ধ ব্রহ্ম আমার উপযোগী নব নব ভাব ধারণ করেন"; তেমনি ব্রহ্মানন্দ নিজে এখন যতই উন্নত হউন না, কিন্তু তিনি দেহে অবস্থান কালে যতদূর বিকসিত হইয়াছিলেন, আমাদের সাধনার উপযোগিরূপে, তাঁর ভাবে যতদূর পারি, তাহাই আমাদিগকে আয়ত্ত করিতে হইবে। সমুদ্রের জল সমুদ্রে যত হউক না, আমার ক্ষুদ্র ভাণ্ডে যতটুকু ধরে, ততটুকুই আমার লব্ধ সমুদ্রের জল। চন্দ্র আকাশের যতই উচ্চ স্থানে থাকুক না, নদীর জল তার আকর্ষণে নিজের পরিমাণ অনুরূপে উর্দ্ধে উঠে; কিন্তু চাঁদ যত দূরে, অবশ্য ততদূর পর্য্যন্ত আর উঠিতে পারে না। আমাদেরও উন্নতি আমাদের আত্মিক অধিকার অনুরূপেই হইবে, তাহার অধিক কেমনে হইবে?

—•—

(প্রাপ্ত)

সাকার-নিরাকার-তত্ত্ব।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

আরও যখন ভাবি, জীব কি? সাকার, না নিরাকার? তুমি আমি কি? যতক্ষণ তুমি আমি জ্ঞান আছে, ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ নামরূপ আছে। এই নাম রূপের আমিই কি জীব? না ইহার অতীত কিছু, যাহা রূপ ধারণ ক'রে আপনাকে ভুলে যায়—স্বরূপের বোধকে বিলোপ করে? Socrates বলিলেন, "Know thyself". হিন্দু বলিলেন, "Know thyself as a part or particle of the Supreme Self". বড় সচ্চিদানন্দ ও ছোট সচ্চিদানন্দ। বিভু অণু, পূর্ণ ও অংশ, এ আবার কি? অখণ্ড সচ্চিদানন্দের আবার ছোট বড় ছেদ ভেদ অংশ কি? পরিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থেরই ইহা হইয়া থাকে। ভগবানের ইচ্ছা-শক্তির বিকাশের তারতম্য অনুসারেই এই অংশাংশী। পূর্ণ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দের বিভাগ নয়, তাঁর শক্তি প্রকাশের বিভাগ। নিরাকার পথ দিয়া যাই, আর সাকার পথ দিয়া যাই, উদ্দেশ্য এক থাকিলে সকলেই সেই সচ্চিদানন্দ-ধামে পঁহুছিব। সকল পথের গম্যস্থান এক হইলে, অবশেষে একই স্থানে সকল আসিয়া মিশিবে, তবে কোন পথ দিয়া অবিলম্বে ও কোন পথ দিয়া বিলম্বে পঁহুছান যাইবে। অধিকারী ভেদে পথের ব্যবস্থা। পাহাড়ের উচ্চস্থানে উঠিবার খাড়া পাকডণ্ডি পথ আছে, আবার কম বেশী ঢালু পথ ঘুরে ফিরে নানা দিক দিয়া আছে। সবল মানুষ খাড়া পথ দিয়া উঠিতে পারে, দুর্ব্বল সে পথে গেলে পা হড়কে গড়াতে গড়াতে কোন খড়ে (উপত্যকায়) পড়ে যাবে, তার ঠিক কি? গরুর গাড়ী যে চড়াই পথে উঠিতে পারে, রেল গাড়ী সে পথে উঠিতে পারে না। যার যেমন ক্ষমতা ও অবস্থা, সে সেই পথ দিয়াই গম্যস্থানে যায়। কেহ কি বলে, আমার এই

পথ দিয়া না যাইলে গম্যস্থানে পৌঁছিতে পারবে না? কোন পথই পাহাড়ের চূড়া নয়; কিন্তু গম্যস্থান ঠিক থাকায় সকল পথই সেই চূড়ায় গিয়া মিশেছে। কোন মতই ঈশ্বর নয়, কিন্তু উদ্দেশ্য এক হইলে সকল মতই ঈশ্বরে মিলিবে। আগ্রহ ও ব্যাকুলতা সহ উদ্দেশ্য এক হইলে, যত মত তত পথ হইলে ক্ষতি কি? অপর পথের নানা দোষ থাকিলেও, যে পথ যার উপযোগী, সেই পথই তার পক্ষে ভাল। আমি যে পথ দিয়া আসিয়াছি, সেই পথই আমি জানি; সেই পথই যে অপরের পক্ষেও ভাল হইবে, এরূপ বলা ঠিক নয় এবং সে পথ ছাড়া যে অপর কোন পথ নাই, এরূপ বুদ্ধিও ভাল নয়। সকল পথেই কম বেশী বিঘ্ন বাধা আছে! ব্যাকুলতা ও আগ্রহ থাকিলে সকল বাধাই অতিক্রম করা যায়। মানুষের দৌর্ব্বল্য আছে ও চিরকাল থাকিবে। অতএব ঈশ্বরের পূর্ণভাব কে ধারণ করিতে পারে? সৃষ্টির বিষয় মানুষ কতটুকু জানে? সৃষ্টি-কর্ত্তার বিষয় মানুষ কি বুঝিবে? অতএব ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া তর্ক বিতর্ক, বাদ বিসংবাদ করা অন্ধের হস্তিদর্শন-ন্যায়। তুমি যতটুকু জান ততটুকু ঠিক, আমি যতটুকু জানি ততটুকুও ঠিক, কিন্তু কাহারও ধারণা সম্পূর্ণ নয়, সুতরাং উভয়েরই ধারণা ক্রম-বিকাশ-শীল। প্রত্যেক মানবের, সুতরাং প্রত্যেক ধর্ম্ম-সমাজের বা জাতির উত্থান ও পতন আছে। এই উত্থান পতনের দ্বারা যে অভিজ্ঞতা হয়, তাহা দ্বারাই মানবের ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়াই ক্রমোন্নতির গতি নির্দ্ধারিত। ইতিহাস ইহার প্রমাণ। কিরূপ অসভ্য অবস্থা হইতে মানুষ ক্রমান্বয়ে সুসভ্য অবস্থায় আসিয়াছে এবং আরও কত উৎকৃষ্ট অবস্থায় যাইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না; কারণ জ্ঞান বিজ্ঞান চিরদিনই বাড়িবে। আমাদের প্রত্যেকের জীবন-চরিতও ইহার সাক্ষ্য দান করে। উঠিতে পড়িতে হাঁটিতে শিখিয়াছি, ভুল করিয়া ভুল শোধরাইতে শিখেছি, অত্যাচার করিয়া পীড়াগ্রস্ত হইয়া পরিমিতাচার শিখিয়াছি, অন্যায় কাজের তীব্র যাতনা ভোগ করিয়া ন্যায়-পরায়ণ হইতে চেষ্টা করিতেছি। বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় চতুরবস্থার মধ্যে দিয়া কত খেলা, কত সঙ্গ, কত উচ্চাভিলাষ, কত শত প্রকার অনিত্য সুখের মোহময় আকর্ষণের উত্থান পতনের ভিতর দিয়া, নিজের আত্মার সত্তার নিত্য প্রকাশ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর ভাবে অনুভব করিতেছি। কত অবস্থাকে আমি আত্মার অপরিহার্য্য অবস্থা বলিয়া বুঝিয়াছি, আবার সেই অবস্থার তিরোধানে নব অবস্থার আবির্ভাবে সেই নূতন অবস্থাকেই আমার আত্মার অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। এই রূপ মানবের অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সহিত আত্ম-জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইতে ইহবে। এখন বুঝিয়াছি, আমার আত্মা সকল অবস্থার সাক্ষী, কোন প্রকার অবস্থা নয় এবং কোন প্রকার অবস্থার দাসও নয়। জ্ঞানই তাহার স্বরূপ—জ্ঞানময়, প্রকাশময় ও সত্তাময় আত্মা। (ক্রমশঃ)

সেবক—শ্রীযুধিষ্ঠির শর্ম্মা।

প্রেরিত ভাই কেদারনাথ দে

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

ধর্ম্মোন্মেষ ও উদ্বাহ।

শৈশবকাল হইতেই কেদারনাথ পিতামহীর অঙ্কে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। প্রতিরাত্রিতে নানা প্রকার গল্প ও পৌরাণিক ব্রতাদির কথা শুনিতেন ও শিখিতেন। ইতু লক্ষ্মীর ব্রত-কথা পিতৃদেবের নিকট শুনিতাম। বৎসরের প্রতি অগ্রহায়ণ মাসে রবিবারে ভোরে ঠাকুরমার নিকট তিনি এই ব্রত-কথা শুনিতে ভালবাসিতেন; এবং এমনই কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তেমনই অবিকল আমাদের বলিতেন।

অনূন ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মৎস্য-মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মায়ের মুখে শুনিয়াছি, অক্ষয় কুমার দত্তের পুস্তক পাঠে পিতার আমিষ-পরিত্যাগ ও নিরামিষ-ভোজনে অভিলাষ জন্মিয়া ছিল।

এই সময়েই কেদার নাথের মনে নিরাকার ঈশ্বরই যে সত্য, তিনিই যে পূজনীয়, এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়াছিল এবং এখন হইতেই ব্রাহ্ম-সমাজের আকর্ষণ অন্তরে অনুভব করিলেন। নবসংহিতায় শ্রীমদাচার্য্যদেব লিখিয়াছেন, "১৬ বৎসর বা তৎসম কালে শিক্ষক উপযুক্ত হইয়াছে বলিলে, বালকেরা নববিধানে দীক্ষা গ্রহণ করিবে।" দুঃখের বিষয়, সমাজ ও মণ্ডলীতে আজকাল তাহা ক্বচিৎ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তখন নবসংহিতা রচিত হয় নাই, কিন্তু ভগবানের প্রেরিত জীবন সংহিতাদির অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহারই প্রেরণায় যথাসময়ে সকল সংসাধন করেন। প্রেরিত কেদার নাথের জীবনটী তাহার একটী নিদর্শন।

হরিনাভি গ্রামের অনতিদূরে, মোল্লার চক নামক গ্রামে, ২১ বৎসর বয়সে, দশম বর্ষীয়া বালিকা স্বর্ণলতার সহিত, পিতা রামকুমার দে কেদার নাথের বিবাহ দিয়াছিলেন। এখনকার কালে ছেলে মেয়েরা কত দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা করিয়া বিবাহ করিতেছেন, তথাপি কত স্থলে বিভ্রাট সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু তদানীন্তন কালে তাঁহাদিগের ভগবানে নিভরশীলতা এবং পূজনীয় আত্মীয়গণের প্রতি ভক্তিই এই মিলন-সূত্রকে অনন্ত যোগে যুক্ত করিয়া দিত।

বিবাহের এক বৎসর পরে নববধূ যখন প্রথম শ্বশুর-গৃহে বাস করিতে আসিলেন, সেই সময় পিতামহীর মৃত্যুতে কেদার নাথ প্রথম এবং অত্যধিক শোকাঘাত প্রাপ্ত হন। এই পিতামহী যে কিরূপ ধার্ম্মিকা রমণী ছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যু সময়ের দৃষ্টান্ত দ্বারাই আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। কথায় আছে, জপ কর আর তপস্যা কর, মরতে জানলে হয়। মৃত্যু যে অমৃতের সোপান, তাহা সাধু সজ্জনদিগের দেহাবসান সময়ে অনুভব করিতে পারা যায়। কেদার নাথের পিতামহীর মৃত্যু-কাহিনী শ্রবণ করিলে মনে হয়, ঐ প্রকার মৃত্যুই যেন লাভ করি। কোন কঠিন পীড়া পূর্ব্বে হয় নাই। সে দিন প্রাতে উঠিয়া প্রতিদিনের মত প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে ইষ্ট দেবতার

পূজা বন্দনা করেন। তাঁহার দুই বধূমাতা ছিলেন। কেদার নাথের বিমাতাই বড় বধূমাতা। বধূমাতারাই পর্য্যায়-ক্রমে শ্বশ্রূমাতার রন্ধন করিয়া দিতেন। ছোট বধূমাতাই অধিকাংশ সময় রন্ধন করিতেন। কিন্তু সে দিন বড় বধূমাতা খুব ভাল করিয়া রন্ধন করিয়াছিলেন এবং তিনি আহার করিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন। আহারাদির খানিক ক্ষণ পরে একবার দাস্ত হওয়াতে তিনি নিজে বুঝিতে পারেন যে, শেষ সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; তাই তিনি আর শয়ন-কক্ষে না গিয়া বাহিরের বড় দালানে একটী স্থানে শুইয়া রহিলেন। চারিদিকে লোকে খবর পাইলেন। মুহূর্ত্তে মধ্যে গৃহ-প্রাঙ্গণ লোক-সমাগমে পূর্ণ হইয়া গেল। বৈদ্যগণ আসন্ন সময় বুঝিলেন। ভৈরবী দেবী সন্তানে সমবয়স্কা জ্ঞাতি মহিলাকে বলিলেন, "নবকুমারের মা, আমার লীলা খেলা ফুরাল, ছেলে, নাতী, ঝি, বউ সব তোমাদের কাছে রেখে চল্লাম, তোমরা দেখো"। তখনই জীবিত অবস্থায় গঙ্গাযাত্রা করা হইল। দলে দলে আত্মীয় স্বজন চলিলেন, কীর্ত্তনাদিও সঙ্গে চলিল। গঙ্গাতটে মহাভারত-রামায়ণ-কথা ও অবিরাম কীর্ত্তনাদি ও হইতে লাগিল। মৃত্যুর পরে পুত্রগণ মহাসমারোহে শ্রাদ্ধক্রিয়া সুসম্পন্ন করিলেন। চিরদিন কি আলৌকিক নিয়মে পৃথিবী চলিয়া আসিতেছে! এক এক দল চলিয়া যায়, অন্য দল ঠিক তেমনই ভাবে সেই স্থান পূর্ণ করে। কত যুগ যুগান্তর শেষ হইয়া গিয়াছে, তারপর আমরা আসিয়াছি। সেই গৃহ, সেই আঙ্গিনা উদ্যান কতক কতক তাঁদের স্মৃতি মনে উদ্দীপন করিয়া দিতেছে।

কেদার নাথের পিতৃদেবও সংসারে ধর্ম্ম সাধন করিতে করিতে পরলোকে চলিয়া যান। ৪৫ বৎসর মাত্র তাঁহার বয়ঃক্রম হইয়াছিল। হরিনাভির বাড়ীতে পিতা যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত, পুত্র কেদার নাথ প্রতি রাত্র জাগরণ করিয়া সেবা করিতেন; আবার প্রতিদিন কলিকাতায় আফিস করিয়া, পিতার নিমিত্ত ঔষধ পথ্যাদি যাহা প্রয়োজন থাকিত তাহা লইয়া, রাত্রে বাড়ী ফিরিতেন। সে দিন গতিক ভাল নয় জানিয়া কেদার নাথ আফিসে যাইবেন না স্থির করেন। ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? বিমাতা তাঁহাকে পথ্যাদি নানা বস্তুর বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া, কেদারনাথের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সত্বর কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। যে সময় কেদারনাথ পথ্যাদি লইয়া অতি শীঘ্র বাড়ী আসিতেছিলেন, বাহির হইতে ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন। আসিয়া শুনিলেন, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার পিতা কেদার নাথকে দেখিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গাড়ী আসিল কিনা, পুত্র পৌছিল কিনা, অন্য সকল কথা ত্যাগ করিয়া বারংবার এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হয়ত জ্যেষ্ঠ পুত্র স্নেহের কেদার নাথকে কোন বিশেষ কথা বলিবার ছিল, অথবা দেখিবার বা পুত্রের হস্তে জল পান করিবার বাসনা জাগিয়াছিল; কিম্বা পুত্রকে শেষ সময় কাছে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কারণ অনেক পুণ্যফলে পুত্র-লাভ হয়, ইহা শাস্ত্রে ও সকল স্থানে শুনা যায়। না জানি, এই সকল শ্রবণ করিয়া কেদারনাথের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে কত বেদনাই অনুভূত হইয়াছিল। যাহা আজিও আমরা শুনিলে বা চিন্তা করিলে অধীর হই। এ ভবে মানুষকে কত কষ্টই নীরবে সহ্য করিয়া চলিয়া যাইতে হয়, কে তাহার গণনা করে। কেদার নাথের পিতার শেষ সময়ে গ্রামস্থ জমীদার, উকীল, ডাক্তার এবং যত বড় লোকে গৃহ পূর্ণ ছিল। শেষ মুহূর্ত্তে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গোবিন্দ বলিয়া ডাকিলেন। তাঁহার একটী প্রজার এই নাম ছিল। মৃত্যুও তখনই হইল, আর কথা কহিলেন না। সকল লোক অবাক হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল, আমরা সবাই এতদিনের বন্ধু ও আত্মীয়জন বসিয়া রহিলাম, একটী কথা আমাদের বলিলেন না, আর একটা চাষা কোথা-কার তাকে ডাকলেন। পরে কেদার নাথ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি কোন্ গোবিন্দকে ডাকিলেন, কে জানে? আবার ইহাঁদের পৈতৃক গৃহ-দেবতা ঠাকুর ঘরে আছেন, প্রতিদিন পূজা হয়, তাহাও রাধা গোবিন্দ নামে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ মূর্ত্তি। অন্তিমে প্রাণ-গুরু গোবিন্দকেই হয়ত প্রাণভরে ডাকিয়া লইলেন।

এক্ষণে সংসারের গুরুভার কেদারনাথের উপর পড়িল। ছোট ভাইটীর নাম মহেন্দ্র নাথ। তাঁহার শিক্ষা এবং অন্যান্য সর্ব্ব কর্ত্তব্য কেদারনাথের উপরেই ন্যস্ত হইল। পিতার মৃত্যুর বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৮ অব্দে কেদারনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমনোমত ধন দে আপন মাতার মাতুলালয়ে মল্লার চকে জন্ম গ্রহণ করেন। আরও কিছু দিন কার্য্য করিয়া সংসারের শৃঙ্খলা স্থাপন পূর্ব্বক, কেদার নাথ কর্ম্ম হইতে অবসর লন এবং কিছু দিনের মত পরম পিতা পরমেশ্বরের সাধনায় নিযুক্ত হন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অতি প্রত্যুষে কেদারনাথ মাঠে গিয়া যোগে বসিতেন এবং একাসনে অনশনে থাকিয়া রাত্রে গৃহে ফিরিতেন। তখন যৎ কিঞ্চিৎ একাহার করিতেন। ক্রমে আরও অধিক রাত্র পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতে লাগিলেন। শুনা গিয়াছে, রাখাল বালকেরা কেদার নাথের যোগ ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত ঢেলা মারিত এবং আরও নানারূপ উপদ্রব করিত। অবশেষে ব্রহ্ম-ভক্ত কেদারনাথকে স্থির ও অটল দেখিয়া নিরস্ত হইয়া পলায়ন করিত। ইহার পরে কেদারনাথ সাধু অঘোর নাথের সঙ্গে মোরি পর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং আরও নানা দেশ ভ্রমণে ও সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার পূর্ব্বেই ত ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন এবং পত্নীকে মাঘোৎসবের সময় কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময়ে হরিনাভি গ্রামে ইহাতে নিন্দা হইলেও মাতৃদেবী পুনরায় দেশে আসিয়া শ্বশ্রূমাতার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তখনকার সময়ে ব্রাহ্মদিগের প্রতি লোকের কিরূপ ধারণা ছিল, শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। লোকে বলিত, একটা ঘরে নর নারী দুই সারি হইয়া বসে এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে। খানিক ক্ষণ এরূপ থাকিবার পর মধ্যস্থলে রক্ষিত স্তূপীকৃত কচুড়ী জিলাপী খাইতে থাকে। এক্ষণে সে সকল দিন চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে দেশ বিদেশে গিয়ে দেখিতে পাই, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি অনে-

কেরই বিশ্বাস। কত প্রাচীন হিন্দু-নাম-ধারী লোক দেখিয়াছি, যাঁহাদিগের সাধনা ও কথা-বার্ত্তায় নববিধানের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সকল ধর্ম্মের সার লইয়া যে ধর্ম্ম, তাহাইত নববিধান। সত্য ধর্ম্ম যাঁহাদিগের অন্তরকে পূর্ণ করিয়াছে, তাঁহারাই নববিধি পালনের উপযুক্ত এবং কত জীবনে এইরূপে নববিধান জয়ী হইয়াছেন, তাহার নির্ণয় কে করিতে পারে।

কেদারনাথের পিতা রামকুমার দের মৃত্যুর পর বহির্ব্বাটীর একটী প্রশস্ত গৃহে ব্রাহ্ম-সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা ও অন্য কার্য্যাদি হইত। কলিকাতা হইতে ব্রাহ্মগণ সমবেত হইয়া এবং গ্রামস্থ যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদিগকে লইয়া, প্রতি বুধবারে সন্ধ্যায় একত্রে উপাসনা হইত। অনেকেই জানেন, সে সময়ে পৈতা ফেলিয়া যে কেহ ব্রাহ্ম হইতেন, তাঁহাদের যে সব নির্য্যাতন হইত, তাহা ভয়ানক ছিল। এক্ষণে সে দিন গত হইয়াছে। পরলোকগত শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত তৎকালে হরিনাভি High School এর Hd. Master ছিলেন। কেদারনাথ তাঁহার প্রতি সমাজের ভার অর্পণ করিয়া বিদেশে চলিয়া যান। তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে একটী ঘটনা হয়। অট্টালিকার উদ্যান পুষ্করিণী ইত্যাদি সংলগ্ন গৃহে ব্রাহ্ম-সমাজের লোকেরা আসিবে, কেদারনাথের খুল্লতাত ইহা অপছন্দ করেন এবং উভয় দিক হইতে বিস্তর গোলযোগ উপস্থিত হয়। পরে কেদারনাথ সকল শুনিয়া মিটমাট করিয়া দিলেন এবং স্থায়ী সমাজের নিমিত্ত বাটী হইতে কিছু দূরে একটা জমী মৌরসী পাট্টাতে লেখা পড়া করিয়া সমাজের জন্য দান করেন। এখন সেখানে বেশ ইমারত প্রস্তুত হইয়াছে। ফাল্গুন মাসের প্রথমে বাৎসরিক উৎসব পিতৃদেব জীবিতাবস্থায় সম্পন্ন করিতেন এবং মাতৃদেবীর সঙ্গে আমরাও উৎসবে কয়েক বার গিয়াছি। এই সময়ে দাদা শ্রীমনোমত ধম দে উপাসনায় কীর্ত্তনে গান করিতেন, সকলে মুগ্ধ হইত। সেখানে কেদারনাথের এবং অনেকের সমাধিও স্থাপন করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এক্ষণে নববিধানের কেহই সেখানে কার্য্য করিতে যান বলিয়া শুনিতে পাই না। আমরাও অনেক বৎসর গত হইয়া গিয়াছে, তথায় গমন করি নাই, আজ কাল কিরূপ ভাবে কার্য্য চলিতেছে, তাহাও জানিনা। সে দিনের আশায় আছি, নববিধানের লোক সকল দেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে ধর্ম্ম-কার্য্য ও প্রচার করবে এবং ব্রহ্মানন্দের আনন্দকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। শীঘ্র শীঘ্র বিশ্বাসী প্রচারক দলে দলে এ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন।

একবার শ্রীমদাচার্য্যদেব ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রচার উপলক্ষে সদলে হরিনাভিতে গমন করেন। মাতৃদেবীর মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে এত লোক-সমাগম হইয়াছিল যে, একটী প্রশস্ত স্থানেও স্থান সঙ্কুলান হয় নাই। আশ পাশের গ্রাম সমুদায় হইতে বিস্তর লোক আসিয়াছিল। কুলবধূগণ কেশবচন্দ্রকে দর্শন করিবার জন্য চিক ভাঙ্গিয়া ফেলে। সেদিন তিনি "ধনের অহংকার, মানের গর্ব্ব কর কেন" ইত্যাদি বিষয় বলিয়াছিলেন। শেষে দেশের লোক সব বলিতে লাগিল, কেমন হয়েছে, নবীন ঘোষকে খুব ঠুকেছে কেশব সেন। কারণ সবারই জমীদারের প্রতি ক্রোধ, সেই জন্য তাহারা মনে করিল, ঐ সকল কথা জমীদার নবীন ঘোষকেই উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে। শ্রীকেশব যে মনুষ্য মাত্রকেই শিক্ষা দিলেন, কিন্তু অল্পজ্ঞানী মানব তাহা গ্রহণ করিল না। সেই জন্যই মানুষ স্বায় সত্য বিষয় প্রেম লাভ করিতে বা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। ঈর্ষা, অহঙ্কার, আত্ম অভিমান না ঘুচিলে, জগতে প্রকৃত প্রেম-ধর্ম্ম আসিতে পারিবে না। শুধু মুখের কথা হাজার শুন বা শুনাও, বল বা বলিতে অনুরোধ কর, তাহাতে কোন ফল হবে না।

ক্রমশঃ

শ্রীহেমলতা চন্দ।

—০—

প্রেরিত পত্র।

নববিধানকে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেন বলি ?

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তুমি আমাদের পবিত্র ধর্ম্মকে নববিধান ব্রাহ্মধর্ম্ম কেন বল? শুধু নববিধান বলিলেই তো হয়। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ও বিনীত নিবেদন আমার সমবিশ্বাসী ভ্রাতৃবর্গের নিকট প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করি; কেননা পবিত্রাত্মা শ্রীহরি এ সম্পর্কে যে আলোক ও ইঙ্গিত আমার হৃদয়ে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা মণ্ডলীর সমক্ষে জ্ঞাপন করা আমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় সুধু নববিধান বলিলে, বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম-বিধানের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সম্যক ব্যক্ত হয় না। যাঁহারা বর্ত্তমান বিধানে বিশ্বাসী, তাঁহারা নববিধান বলিলে এ ধর্ম্মের মর্ম্ম কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন সত্য, কিন্তু সর্ব্ব সাধারণে নববিধান বলিলে প্রায় কিছুই বুঝিতে পারে না। ইহা কি ঐশ্বরিক বিধান, কি মানবীয় বিধান, তাহা বুঝিতেও তাহাদের মধ্যে গোল ঘটে। বর্ত্তমানে বঙ্গবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কখন কখন বঙ্গীয় কি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার বিধি বা আইনকে নববিধান আখ্যায় আখ্যাত করিতেছেন। কেহ কেহ বা কোন কোন নূতন আইন, নাটক ও উপন্যাসকে নববিধান বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। এদিকে অপর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে নববিধান (New Dispensation) শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। খ্রীষ্টানগণ তাঁহাদের New Testament ধর্ম্মকে নববিধান বলিয়া থাকেন। Swedenburgh সম্প্রদায়ের লোক সকলও তাঁহাদের ধর্ম্মকে New Dispensation বলিয়া ঘোষণা করেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্ম্মের ঐশ্বরিক মূল(Divine origin) জ্ঞাপনার্থ তাঁহাদের ধর্ম্মকে নববিধান বলেন। এরূপ স্থলে ভারতের বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্মকে শুধু নববিধান বলিলে সহজেই লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হয়। তাঁহারা

জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইহা কোন নববিধান, কাহার নববিধান? ইহা কি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, না পরমহংস মহাশয়ের ধর্ম্ম, না খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম?

কোন বিশেষ ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিতে হইলে, তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব জনসাধারণকে স্পষ্টরূপে জানিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। নববিধান বহু-ভাবাত্মক, ইহার এক এক ভাব এক এক সম্প্রদায় কি ব্যক্তি বিশেষ গ্রহণ করিয়া, আপনাপন মতানুসারে নূতন নূতন নববিধানের অবতারণ করিতে পারেন। এ বিষয়ে আমাদের ভক্তি-ভাজন আচার্য্যদেবও যথেষ্ট আশঙ্কা পোষণ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং নববিধান সম্বন্ধে কোন ভ্রমাত্মক ভাব লোক-হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য প্রত্যেক নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্মের সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম-বিধান মূলতঃ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম। পৃথিবীতে অনেক বিধান আছে এবং আগত হইতেছে, যাহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম-মূলক নহে। আমরা বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম ভিন্ন অপর কোন ধর্ম্মকেই নিখুঁত ব্রাহ্মধর্ম্ম আখ্যা দিতে পারিনা। তবু পৃথিবীতে এমন অনেক ধর্ম্ম আছে, যাহার ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে অতি দূরবর্ত্তী সম্বন্ধ। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-বিধান ঈশ্বরকে দূরে রাখিয়াছেন এবং হিন্দু-বিধানের মধ্যে অনেকে বহুদেব-বাদ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টীয়, মুসলমান, ইহুদী সম্প্রদায় একেশ্বর-বাদী হইলেও সম্পূর্ণ কুসংস্কার-পরিশূন্য নহে। জৈন ধর্ম্ম-বিধান ঈশ্বর সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম সেরূপ নহে, ইহা সম্পূর্ণ একেশ্বর-বাদ-মূলক, বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানই ইহার প্রাণ ও সুদৃঢ় ভিত্তি। এই জন্য বিশ্বাসী ব্রাহ্মগণ ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিধান বা Theism of the New Dispensation বলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে এ বিধানের বিধানত্বই আর থাকে না। সুতরাং ইহাকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সহিত চির-সংযুক্ত রাখা কর্ত্তব্য। কি জানি বা মহাপুরুষ মহম্মদকে কেহ ঈশ্বরের আসনে স্থাপন করেন, এজন্য ইস্লাম ধর্ম্মের মূল-মন্ত্র, "লা এলাহেলেল্লার" সঙ্গে "মহম্মদ রসুলেল্লা" এই বাক্যটিও সংযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা মুসলমান ধর্ম্ম পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ প্রভৃতির হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত রহিয়াছে। তদ্রূপ নববিধানকেও ভাবী পৌত্তলিকতা, অবতার-বাদ, মায়াবাদ, মধ্যবর্ত্তিবাদ প্রভৃতি দূষিত মত হইতে নির্ম্মুক্ত রাখিয়া, ইহার প্রচারিত ব্রহ্মজ্ঞানকে নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক রাখিতে হইবে। ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত চির সংযুক্ত রাখিতে হইবে। তজ্জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধানের সহিত সম্মিলিত রাখা সুসঙ্গত মনে হয়।

আর একটী কথা। নববিধান ব্রাহ্মধর্ম্মেরই ক্রম-বিকাশ, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ইহার জন্মগত সম্বন্ধ। মহাত্মা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তিনজনেই এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ এবং এক বিধানেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার কর্ম্মী। এই তিনজনই ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিকশিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছেন। ইহা মহর্ষিদেবের প্রাণের প্রিয়তম সামগ্রী এবং ব্রহ্মানন্দের হৃদয়ের ধন। সুতরাং এই মধুর ও ভাবাত্মক নাম কদাচ ত্যাজ্য নহে। ইহাকে নববিধানের সঙ্গে সংযুক্ত রাখিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যে নববিধান বিশেষ ভাবযোগে বদ্ধ, তাহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রম-বিকাশ ঈশ্বরের বিচিত্র লীলা ব্যাপার। ইহার সহিত পারম্পর্য্যসম্পর্ক (Continuity) রক্ষা কদাচ নিন্দনীয় বা বর্জ্জনীয় হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, নববিধানের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম-শব্দ সংযুক্ত রাখিলে, অপর দুই সমাজের ধর্ম্মমতের সহিত ইহাকে একীভূত করিয়া দেখা হইবে। আমরা এ আশঙ্কাকে সমীচীন বলিয়া মনে করি না। ব্রাহ্মধর্ম্ম-শব্দ ব্যবহার দ্বারা উক্ত উভয় সমাজের সহিত একদিকে যেমন আমাদের যোগ-রক্ষা হইবে, তেমনি নববিধান-শব্দ দ্বারা আমাদের ধর্ম্মের বিশেষত্ব অক্ষুন্ন থাকিবে। আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্যদেব যত দিন দেহে অবস্থিত ছিলেন, ততদিন তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের নামেই সকল কার্য্য সম্পন্ন এবং নববিধান প্রচার করিতেন। তখন নববিধান মাধ্যাহ্ন তপনের ন্যায় সমস্ত পৃথিবী আলোকিত করিয়াছিল। কিন্তু এখনকার অবস্থা কিরূপ, তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন।

ব্রাহ্মসমাজের অপর দুই শাখা এক্ষণে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিতেছেন। আমাদের আশা ও বিশ্বাস, তাঁহারা ধীরে ধীরে নববিধানের দিকে অগ্রসর হইয়া যথাকালে নববিধানের পূর্ণ সমাচার গ্রহণ করিবেন। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায়, তাঁহাদের এই অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে কোন বাধা কি প্রতিবন্ধকতা সৃজন করা সঙ্গত নহে। আমাদের অবলম্বিত ও আচরিত ধর্ম্ম যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম, তৎসম্বন্ধে আমাদের উপরোক্ত ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের মনে আমরা যেন কোন সন্দেহ আনয়ন না করি, তৎপ্রতি সর্ব্বদা সুতীব্র দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

পরিশেষে বিধানাশ্রিত ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন নববিধান প্রচার ও সাধন সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দের জীবন ও চরিত্র, আচরণ ও ব্যবহার সর্ব্বদা দৃষ্টি-পথে রাখিয়া চলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর আমাদের মণ্ডলীতে যেরূপ বিভিন্ন মতবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ভয় হয়, নববিধান-মণ্ডলী কবে বা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি পরিত্যাগ করিয়া কক্ষভ্রষ্ট হন।

আমি আমার প্রাণের কথা বিশ্বাসি-মণ্ডলীর নিকট নিবেদন করিলাম। যদি আমার অবলম্বিত ভাষার ভিতরে কোন সত্য দেখেন, আশা করি, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিবেন।

বিধান নৈমিষারণ্য,
আশাকুটীর, টাঙ্গাইল;
৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৫ সন।

চিরদাস—
শ্রীশশিভূষণ তালুকদার।

বাঙ্গালীজাতি ও বাঙ্গলার ধর্ম্ম।

আমরা আজ জাতি-তত্ত্ব ও জাতীয় ধর্ম্ম-তত্ত্ব বিষয়ে দুই একটী কথা বলিতে চাই। জাতি-তত্ত্ব ও ধর্ম্ম-তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। এই সৃষ্টি হইতেই মানুষের শরীর, মন ও আত্মা গঠিত হইয়াছে। একটী ধূলি-কণার ভিতর কি অদ্ভুত তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার গূঢ় রহস্য এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। বিজ্ঞান এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জল বায়ুর প্রভাব শরীর মনের উপর কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করে, বিজ্ঞান-জগতে তাহারও গণনা চলিতেছে। উদ্ভিদ জগতের সহিত আমাদের কতকটা নৈকট্য বর্ত্তমান আছে, এবং তাহারা আমাদের শরীর, মন ও আত্মার গঠন-কার্য্যে কতটা সাহায্য করে, বর্ত্তমান জগতে তাহারও আন্দোলন চলিতেছে। অতএব সৃষ্টি-সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে দুই একটি কথা বলিলে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমাদের দেশের শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, ব্রহ্ম যেমন অনাদি, সৃষ্টিও সেইরূপ অনাদি। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা সৃষ্টির আদি আছে স্বীকার করেন, কিন্তু এই আদির সন্ধান করিতে গিয়া এমন এক স্থানে উপনীত হইয়াছেন, যেখানে সৃষ্টি-রহস্য ভেদ করা তাঁহাদের পক্ষে দুরূহ হইয়াছে। আমরা সৃষ্টি-তত্ত্বের এই আদি অনাদি সম্বন্ধীয় রহস্যের ভিতর প্রবেশ না করিয়া, একটা মধ্য পথ অবলম্বন করিলে আমাদের আলোচ্য বিষয় সুগম হইতে পারে। এই দৃশ্যমান ধূলিময় পৃথিবীকে যদি আমরা সৃষ্টির ভিত্তি বলিয়া অনুমান করি, তাহা হইলে আমাদের অনুমান, সৃষ্টির সূক্ষ্মতত্ত্ব ভেদ করিতে না পারিলেও, মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা চিন্তা-জগতে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই যে, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রত্যেক ধূলিকণাকে জীবন্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ধূলিকণার ভিতর নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা (Potentiality) রক্ষা করিয়াছেন। এই ধূলিকণা হইতে তৃণকণার উৎপত্তি হইতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, এই তৃণকণা একদিকে ক্রমবিকাশের ধারা বহিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদে পরিণত হইতেছে এবং সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদগুলি অতিকায় মহীরুহের আকার ধারণ করিতেছে, আবার অন্যদিকে সেই তৃণকণাগুলি দৃষ্টির অতীত অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণুকে জন্ম দান করিতেছে। এই জীবাণু হইতে বর্ত্তমান জীব-জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্যই এই জীব-জগতের চরম সৃষ্ট! আমাদের শারীরিক যন্ত্র ও প্রক্রিয়া গুলির অনুসন্ধান করিলে ও বিচার করিলে আমরা এই সত্যে উপনীত হইব যে, মানবই উদ্ভিদ ও জীব-জগতের ক্রম-বিকাশ। অতএব ধূলিকণা হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ভিদ ও প্রত্যেক জীবের সহিত মানবীয় অচ্ছেদ্য যোগ নিবদ্ধ রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, বীজাণু (Embryo) হইতে মানবের উৎপত্তি হয়। ভ্রূণের আদি অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, তাহা ঠিক উদ্ভিদের cell বা কোষের মত। মানব-কোষ (human cell) হইতে উদ্ভিদ-কোষকে (plant cell) কোন রূপে পৃথক বলিয়া অনুমান করা যায় না। ক্রমে এই ভ্রূণকোষ (cell) রূপ পরিবর্ত্তন করে এবং এই পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া এক-কোষ (Amocba) জাতীয় জীব-দেহে পরিণত হয়। এই এক-কোষ জাতীয় জীবদেহ ক্রমে ক্রমে কৃমি-জাতীয় বা (Multicellular) জীব-দেহ ধারণ করে। এই কৃমি জাতীয় জীব হইতে মেরুদণ্ড-হীন (invertibrate) জীব-দেহ গঠিত হয় এবং ক্রমে তাহা মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট (vertibrate) জীব-দেহ ধারণ করে; এই মেরুদণ্ড বিশিষ্ট জীব ক্রমে ক্রমে উচ্চতর জীব-দেহ ধারণ করিয়া, অসংখ্য পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া, মানব-দেহে পরিণত হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই বলা যায় যে, বহু যুগ যুগান্তর ও কাল কালান্তরের মধ্য দিয়া যে সকল জীব অতীত কালে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে জন্ম-গ্রহণ করিতেছে, এই মানবদেহ তাহারই ঘনীভূত প্রতিকৃতি (concentrated form)। সমস্ত বিশ্বের জীব-দেহের অদ্ভুত ইতিহাস এক মানবদেহেই পাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ড্রুমণ্ডের লিখিত কয়েক পংক্তি পাঠ করিলে আমাদের কথা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে।

"The human form does not begin as a human form, it begins as an animal; and at first and for a long time to come there is nothing wearing the remotest semblance of humanity. What meets the eye is a vast procession of lower forms of life, a succession of strange inhuman creatures emerging from a crowd of still stranger and inhuman creatures; and it is after a prolonged and unrecognizable series of metamorphosis that they culminate in some faint likeness to the image of him who is the newest and yet the oldest of created things. Embryology has started the world by declaring that ancient life of the earth is not dead, it is risen. It exists to-day in the embryos of still living things and some of the most archaic types find a resurrection and a life in the form of man himself."

"মানব-দেহ প্রথমেই মানব-দেহরূপে আরম্ভ হয় নাই, ইহা আদিতে ইতর প্রাণীর রূপ ধারণ করে। ইহার আদিতে এবং বহুদিন পর্য্যন্ত মানব আকৃতির সহিত দূরতম সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় নাই। আমরা দেখিতে পাই যে, ইহা বহু প্রকার নিম্নতর জীবদেহ ধারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে এবং একটীর পর আর একটী আশ্চর্য্য ইতর জীবদেহ ধারণ করিয়া চলিয়াছে। ইহা বহু পরিবর্ত্তন ও রূপ ধারণ করিতে করিতে এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপনীত হয়, যেখানে মানব-দেহের অতি সূক্ষ্মতম চিহ্ন মাত্র উপলব্ধি হয়, যাহা সৃষ্টির অতি পুরাতন ও অতি নবীন জীব-দেহের মিলন ঘোষণা করে। ভ্রূণতত্ত্ব (Embryology) তাহার

নূতন আবিষ্কারের দ্বারা এক দিকে পৃথিবীকে যেমন চমকিত করিয়াছে, অন্যদিকে জগতের নিকট ঘোষণা করিয়াছে যে, পৃথিবীর অতি প্রাচীন জীবও ধ্বংস হয় নাই, বরং মৃত্যুর পর নূতন জীবনে উত্থিত হইয়াছে। সে জীবন আজও জীবিত জীবের ভ্রূণের মধ্যে স্থিতি করিতেছে এবং অতি প্রাচীনতম জীব, যাহাদের অস্তিত্ব বর্ত্তমান জগতে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহারাই মানব-দেহে পুনরুত্থিত হইয়া স্থিত করিতেছে।"

এক মানবের ভিতর সকল জাতীয় জীবের সমাবেশ হইয়াছে। সকল জীবের জীবনের ক্রম-বিকাশের ধারা বহিয়া মানব-দেহ রচিত হইয়াছে। কত অসংখ্য জীবের আদি আকার রূপ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে যে মানব-জীবন গঠিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই অত্যাশ্চর্য্য প্রণালীর ভিতর সৃষ্টির মহাতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। কি অদ্ভুত যোগের ভিতর দিয়া বিধাতা মানব-জীবনকে প্রস্ফুটিত করিয়াছেন, চিন্তা করিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

ইহাত বিজ্ঞানের কথা। মানব-জীবন যে সকল রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান দেহ ধারণ করে, তাহা সাধারণের বোধগম্য হইবার কথা নয়। ইহা পণ্ডিতদিগের আলোচ্য বিষয়। সাধন-সিদ্ধ চক্ষু ব্যতীত এবং অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত জীবনের ধারা-বাহিক প্রবাহকে চর্ম্ম-চক্ষুর গোচর করা সহজ নয়। তবে এই বিষয়ের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর সহিত মানব-জীবনের বিচার করিলে ইহা প্রত্যক্ষ করা যায় যে, জীবনের যে সকল ক্রিয়া আমাদের ভিতর কার্য্য করিতেছে এবং যে সকল সাধারণ প্রক্রিয়ার ভিতর আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর মধ্যে তাহা অল্পাধিক দৃষ্টি-গোচর হয়, জীবনের সাড়ার ভিতর একটা জ্ঞাতিত্বের পরিচয় অনুভূত হয়। সমস্ত বিশ্বের সহিত আমাদের যে একটা পূর্ব্বাপর যোগ রহিয়াছে, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ লাভ করা যায়।

মানব-জীবন উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশের ধারা বহিয়া, তাহা আমাদের বর্ত্তমান জীবনে পূর্ণ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যেমন খাদ্য জীব সাধারণের জীবন-রক্ষার প্রধান উপায়; ইহা উদ্ভিদ, ইতর প্রাণী ও মানুষ নির্ব্বিশেষে সকলকেই গ্রহণ করিতে হয়। ইহা জীবনের একটা সাধারণ লক্ষণ। আমাদের শরীরের আর একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, আমাদের শরীরের ক্ষয় ও বৃদ্ধি আছে, শরীরের পুরাতন পেশীগুলি (tissue) ক্ষয় হইতেছে ও তাহার স্থানে নূতন পেশীগুলি (tissue) জন্ম গ্রহণ করিতেছে। এই ক্ষয় ও বৃদ্ধি ক্রিয়া উদ্ভিদ, ইতর প্রাণী ও মানুষ নির্ব্বিশেষে একই প্রকারে চলিতেছে। বৃক্ষও বৎসরান্তে একবার পুরাতন ছাল পরিত্যাগ করিয়া নূতন ছাল গ্রহণ করে। আত্ম-রক্ষা (self preservation) জীব সাধারণের একটী বিশেষ লক্ষণ। উদ্ভিদ এবং জীব মাত্রেরই এই আত্ম-রক্ষার প্রবৃত্তি আছে। কোন পুরাতন মন্দির বা গৃহের ছাদের পার্শ্বে বটবৃক্ষ জন্মিলে, মাটী হইতে তাহার রস গ্রহণ করিবার জন্য, ইট পাথর ভেদ করিয়া শিকড় মৃত্তিকা স্পর্শ করে। দেড় হাত কিম্বা দু'হাত গাছের ১৫।২০ হাত লম্বা শিকড় দেখা গিয়াছে। কোন অন্ধকারময় স্থানে একটী বৃক্ষ রোপণ করিলে, যে দিকে রোদ ও হাওয়া পাওয়া যায়, বৃক্ষটী সেই দিকে তাহার মাথা ফিরাইয়া দেয়।

জীবনের আর একটী বিশেষ লক্ষণ, সুখ দুঃখ বা আনন্দ অবসাদ প্রকাশ করা; ইহাও উদ্ভিদ, ইতর প্রাণী ও মনুষ্য-জীবনের সাধারণ লক্ষণ। উদ্ভিদেরা অঙ্গ-চালনা দ্বারা সুখ দুঃখ প্রকাশ করে, ডাঃ জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। আত্ম-রক্ষার (Self preservation) আরো কতকগুলি ভাব বা অবস্থা ইতর প্রাণীতে এত স্পষ্টতর রূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে এ বিষয়ে মনুষ্যের সহিত তাহাদের কোন পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। মানুষ দেশে খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিলে যেমন বিদেশে গমন করে বা বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে, কোন কোন পক্ষী ও পশু-জাতীয় জীবও দেশে খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিলে বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। উদ্ভিদের অঙ্গচালনা, পশুপক্ষীর ভিন্ন ভিন্ন শব্দ-প্রকাশ ভাষার আদি অক্ষর; এই আদি ভাষাই বাক্যে পরিণত হইয়া, মনের ভাব প্রকাশ করিবার যন্ত্ররূপে মানবে ব্যবহৃত হইতেছে। যে সকল বৃত্তি থাকাতে আমরা মনুষ্য নামের যোগ্য হইয়াছি, সেই সকল বৃত্তি আংশিক ভাবে কোন কোন পশু পক্ষীর ভিতর পরিস্ফুট হইয়াছে। অনেক পশু পক্ষীর ভিতর সন্তান-বাৎসল্য ও পিতামাতার প্রতি ভক্তি বা স্নেহ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন সঙ্কট আসিলে তাহারা দলবদ্ধ ভাবে কার্য্য করে ও বিপদের সম্মুখীন হয়, নতুবা এড়াইবার চেষ্টা করে। কোন জারম্যান পণ্ডিত বানরের ভাষা ও ভাষার ব্যাকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। অসভ্য জাতিদিগের যেমন একজন দলপতি থাকে, বানরের দলেরও একটী মাত্র দলপতি থাকে। মানুষ যে সমাজ-বদ্ধ হইয়া বাস করে, উদ্ভিদ ও পশু পক্ষীর ভিতরেও দলবদ্ধ হইয়া বাস করিবার প্রবৃত্তি আছে। বানরের মধ্যে এই সামাজিক প্রবৃত্তি অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

সৃষ্টি যেমন ক্রম-বিকাশের ধারা বহিয়া বর্ত্তমান সৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে, জীব যেমন ক্রম-বিকাশের ভিতর বর্ত্তমান মানব-দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, উচ্চতর মানব-বৃত্তিগুলি যেমন পশু পক্ষীতে ক্রমে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া মানবে পূর্ণ হইয়াছে, সামাজিক মানব বৃত্তিগুলি যেমন ইতর প্রাণীতে আংশিক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ জাতিতত্ত্ব এবং ধর্ম্মতত্ত্বও ক্রম-বিকাশের ধারা বাহিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

একান্ত ভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করিলে আমাদের এই প্রতীতি জন্মে যে, ভগবান যেন মানুষকে সৃষ্টি করিবার জন্যই এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন। শরীর, মন ও আত্মা, ধর্ম্ম, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র একই অনবচ্ছিন্ন যোগের বাহ্য প্রকাশ মাত্র। যে অখণ্ড বিধি বহির্জ্জগতে কার্য্য করিতেছে, তাহাই আবার সমাজ ও

অন্তর্জগতে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। অতএব জাতিতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব একই অখণ্ড বিধির অন্তর্গত। ক্রমশঃ

শ্রীকামাখ্যা নাথবন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদ।

জন্ম—গত ২৯শে জুলাই, ১৩ই শ্রাবণ, হাজারিবাগে, মাতামহ শ্রীযুক্ত ব্রজ কুমার নিয়োগীর গৃহে, এলাহাবাদ গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ অমিয় চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভগবান শিশুকে ও তাহার পিতা-মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

জন্মদিন—গত ২৪শে জুলাই, আমাদের প্রিয়তম ভ্রাতা শ্রীমান্ প্রেমেন্দ্র নাথ রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে নববিধান প্রচার কার্য্যালয়ের দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার কার্য্যালয়ের সকলকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করান হয়। ভগবান্ প্রিয়তম ভাইয়ের জীবনকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করুন।

পরলোকগমন—গভীর শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে আজ একটী অভাবিত আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করিতেছি। আমাদের সকলের অতি প্রিয়, মণ্ডলীর যুবকগণের প্রাণের বন্ধু, পিতামাতার একমাত্র বুকের ধন, যুবতী পত্নীর হৃদয়াকাশের আশাচন্দ্র, হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠদেহ, যৌবনের উজ্জ্বল পূর্ণ মূর্ত্তি, সাধু অঘোর নাথের দৌহিত্র, মিঃ এন্, সি, ঘোষের একমাত্র পুত্র স্নেহের মণি (শ্রীমান্ পূর্ণানন্দ ঘোষ) আর পৃথিবীতে নাই। গত ২৩শে জুলাই, সোমবার, প্রাতে পৌনে আটটার সময়, দার্জ্জিলিংএ, টাইফয়েড রোগে দুইসপ্তাহ ভুগিয়া, মর পৃথিবী হইতে মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে, চির যৌবনের অমৃতময় রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছে। সুন্দর সুঠাম দেহ এখানে ভস্মে পরিণত হইল, আর অমর জগতে অমর আত্মা আনন্দধ্বনির মধ্যে মহানন্দে প্রবেশ করিল। এখানে অশ্রুজল ও ভস্মরাশি, আর ওখানে নিত্যানন্দ ও নিত্যজীবন। বিধাতা জন্ম মৃত্যু ও আনন্দ বিষাদের একটা অদ্ভুত লীলা করিলেন। গত ২রা জুলাই, স্নেহের মণির প্রথম সন্তান একটী কন্যারত্নের আগমনে গৃহ আনন্দে পূর্ণ হয়। নবজাত শিশুর জন্মের আটদিনের দিনে পিতৃত্বের প্রথমকর্ত্তব্য অষ্টাহ অনুষ্ঠান অতীব আনন্দ সহকারে সম্পন্ন করিয়া, তার পরদিনই দুরন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। কে জানিত, ইহাই পরম কাল হইবে, আনন্দের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মধ্যে বিষাদের ঘনগভীর মেঘ হইতে বজ্রপাত হইবে! মৃত্যু পলকের মধ্যে সকল সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল, সকল আশাতরু উন্মূলিত করিল। আশা ভরসার স্থল যে এ জগৎ নহে, মৃত্যু তাহা হৃদ্গত করিল এবং বলিল, নিত্যজীবন, নিত্য আশা ভরসা ঐ পরলোকে। স্নেহের মণি দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটিতে ওভারসিয়ারের কার্য্য করিত। P W D এর সঙ্গেই তাকে কাজকর্ম্ম করিতে হইত। তাহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী P. W. D. র ইঞ্জিনীয়ার তাকে বড়ই ভাল বাসিতেন, এবং আশা করিতেন, স্বীয় অভিজ্ঞতা ও কার্য্য-দক্ষতাগুণে শীঘ্রই দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইবে। বিধাতার বিধান অন্যরূপ হইল। এইরূপে কার্য্যের দক্ষতায়, নির্ম্মলচরিত্রের সুগন্ধে, আচার ব্যবহারের মিষ্টতায় ওখান-কার সকলেরই অতীব প্রিয় হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাকে ভাল বাসিত, তার অলস্ত প্রমাণ মৃত্যু সময়ে পাওয়া গিয়াছে। সকলের প্রিয় হইয়াই স্নেহের মণি ভগবানেরও অতীব প্রিয় হইয়াছিল; তাই বুঝি, ভগবান তাঁর প্রিয়তম সন্তানকে শোক দুঃখ তাপের অতীত তাঁর নিত্য প্রেমরাজ্যে তুলিয়া লইলেন। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইল, এখনকার সকল ইচ্ছা চূর্ণ হইল। এখন শান্তিদাতা শ্রীহরি শোকদগ্ধ পিতামাতা, যুবতী পত্নী, একমাত্র সহোদরা ভগ্নী ও শ্বশুর শাশুড়ীর ভগ্নপ্রাণে এবং বন্ধুবান্ধবদের ব্যথিত হৃদয়ে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন এবং পরলোকগত আত্মাকে স্বর্গের সকল সম্পদে সম্পন্ন করুন, এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২২শে জুলাই, ১৩নং বাদুর বাগান রো, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র নাথ মিত্রের ভবনে, স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র দত্তের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন, ভাই অক্ষয় কুমার লধ শোকাদি পাঠ করেন। শ্রীমান সন্তোষ কুমার দত্ত প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের সর্ব্বশেষে শ্রীমান্ সন্তোষ কুমার পিতৃতর্পণ উদ্দেশে সুন্দর সহজ ভাবপূর্ণ স্বকীয় লেখাটী পাঠ করেন।

গত ১০ই জুলাই, সিমলা পাহাড়ে, ডাঃ কৃপাসুন্দর বসুর সহধর্ম্মিণীর ভ্রাতা স্বর্গীয় অনুপম চন্দ্র মৈত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রমথ লাল সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে নববিধান প্রচার ভাণ্ডারে ২০৲ টাকা, হিমালয় ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা, ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, মুঙ্গের নববিধান মন্দিরে ৫৲, ভাই প্যারী মোহন চৌধুরীর সেবার জন্য ৫৲, নববিধান কাগজের সাহায্যার্থ ৫৲, সিমলা অনাথ আশ্রমে ৫৲, মোট ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদের শান্তিধামে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীস্থ শোকার্ত্তগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বর্ষণ করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৭ই জুলাই, ৯২।১ গড়পার রোডে, ভাগলপুরের স্বর্গীয় শিশির কুমার চাটার্জ্জির সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ৫ই জুলাই, স্বর্গীয় অমৃতানন্দ রায়ের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া সরস্বতী দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, ৮২।১ অপার সারকুলার রোডে, কানন্তা কন্যার ভবনে উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ৫ই জুলাই, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র লাল খাস্তগীরের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া সরলা দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে কলুটোলাস্থ কৃষ্ণ-ভবনে উপাসনা হয়। ভাই গোপাল গুহ উপাসনা করেন, যোগেন্দ্র বাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে যোগেন্দ্র বাবু হইতে ৬৲ টাকা এবং নববিধান ট্রাষ্টের অন্তর্গত সরলা খাস্তগীর স্মৃতি ভাণ্ডার হইতে ৫৲ টাকা প্রচার আশ্রম ও প্রচার কার্য্যালয় বাসীদের সেবার্থ পাওয়া গিয়াছে।

গত ১৩ই জুলাই, ১৭নং বৈঠকখানা রোডে, স্বর্গীয় সুধাংশু নাথ চক্রবর্ত্তীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। প্রচার ভাণ্ডারে দান ২৲ টাকা।

গত ২৪শে জুলাই, স্বর্গগত ভাই নন্দলাল বানার্জ্জির সাম্বৎসরিক দিনে, ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, নববিধান প্রচার কার্য্যালয়ের দেবালয়ে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ২৪শে জুলাই, অনাথ আশ্রমে, আশ্রমের মাতৃ-স্বরূপা স্বর্গীয় ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া ক্ষান্তমণি দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ২৯শে জুলাই, ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, নববিধান প্রচার-কার্য্যালয়ের দেবালয়ে স্বর্গীয় টাহিলরাম লীলারাম শিবদাসানীর সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। প্রচার ভাণ্ডারে দান ৫৲ টাকা।

—•—

ঊনষষ্টিতম ভাদ্রোৎসব।

উৎসবের কার্য্যপ্রণালী।

(আবশ্যক হইলে কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে)

১৫ই আগষ্ট, ১৯২৮, ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩৫, বুধবার—স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক, ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৭টায় প্রসঙ্গাদি।

১৬ই „ ৩১শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার—যুবকসঙ্ঘ।

১৭ই „ ১লা ভাদ্র, শুক্রবার—স্বর্গগত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৭টায় প্রসঙ্গ।

১৮ই „ ২রা ভাদ্র, শনিবার—অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায়, ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে, নববিধান প্রচার-কার্য্যালয়ে প্রীতি-সম্মিলন।

১৯শে „ ৩রা ভাদ্র, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা।

২০শে „ ৪ঠা ভাদ্র, সোমবার—স্বর্গগত জেনারেল বুথের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৭টায় প্রসঙ্গাদি।

২১শে „ ৫ই ভাদ্র, মঙ্গলবার—স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের ও বলদেব নারায়ণের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৭টায় প্রসঙ্গ।

২২শে „ ৬ই ভাদ্র, বুধবার—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা।

২৩শে „ ৭ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টায় উপাসনা; অপরাহ্ণ ৪॥০ টায় পাঠ আলোচনা প্রভৃতি এবং সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা।

২৪শে „ ৮ই ভাদ্র, শুক্রবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টায় সঙ্কীর্ত্তন।

২৫শে „ ৯ই ভাদ্র, শনিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টায় কেবলমাত্র মহিলাদিগের জন্য উপাসনা।

২৬শে „ ১০ই ভাদ্র, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত-দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭টায় কীর্ত্তন, ৮টায় উপাসনা। মধ্যাহ্নে ৩টায় উপাসনা, তৎপরে পাঠ আলোচনা, ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা; ৬টায় কীর্ত্তন ও সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা।

২৭শে „ ১১ই ভাদ্র, সোমবার—স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৭টায় প্রসঙ্গ।

সকলের সপরিবারে ও সবান্ধবে যোগদান প্রার্থনীয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
৮৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮ই আগষ্ট, ১৯২৮।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন
সহকারী সম্পাদক।

দ্রষ্টব্য ;—উৎসবের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ভক্তির অঞ্জলিরূপে যিনি যাহা দিবেন, তাহা ২৮নং নিউ রোড, আলিপুর, কলিকাতা, এই ঠিকানায় সহকারী সম্পাদকের নামে অথবা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয় কুমার লধের নামে পাঠাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

৮ই, ৯ই ও ১০ই ভাদ্র, ব্রহ্মমন্দিরে দান সংগৃহীত হইবে।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Prirya-nath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ৩১শে শ্রাবণ, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৩ ভাগ। ১৫শ সংখ্যা। ১লা ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক, ৯৯ ব্রাহ্মাব্দ। 17th AUGUST, 1928. অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা আনন্দময়ি, তুমি তোমার সন্তান-সন্ততিদিগকে নিত্য আনন্দ, নিত্য উৎসব বিধান কর। "যার মা আনন্দময়ী, তার কি রে নিরানন্দ।" বাস্তবিক যে তোমাকে আনন্দময়ী বলিয়া বিশ্বাস করে ও পূজা করে, তাহার কি কখনও নিরানন্দ ভোগ করিতে হয়? আমাদিগের সে বিশ্বাস নাই, তাই আমাদের কখনও আনন্দ, কখনও নিরানন্দ, কখনও উৎসব, কখনও শুষ্কভাব, কখনও জোয়ার, কখনও ভাটা। তোমার ভক্তের অবস্থা কিন্তু এ রকম নয়, চির-বসন্ত, চির-উৎসবময় ব্রহ্মানন্দ-জীবন। তাই তিনি বলেন, "আমার মা আনন্দময়ী, তিনি কখনও আমাকে দুঃখ দেন না।" সত্যই তুমিও তো আমাদিগকে কখনও দুঃখ দিতে, নিরানন্দ ভোগ করিতে দিতে চাও না। হিমালয় কি কখনও গ্রীষ্মের উত্তাপ বিতরণ করিতে পারে? আনন্দময়ী যিনি, তিনি কি কখনও নিরানন্দ দেন? নিরানন্দ আমরা আপনাদিগের অবিশ্বাসের ফলে ভোগ করি। দ্বার রুদ্ধ থাকিলে যেমন আকাশের ঝড় বহিলেও তাহা ভিতরে প্রবেশ করে না, তেমনি মনের দ্বার অবিশ্বাসের অর্গল দিয়া বন্ধ করিয়া রাখি বলিয়াই আমরা তোমার নিত্য আনন্দের প্রকাশ সম্ভোগ করিতে পারি না। যাহারা মুক্ত-আত্মা, তাহারা সদাই তাহা সম্ভোগ করে। কিন্তু তুমি যে অনন্ত স্নেহে উচ্ছ্বসিত, তুমি কি আমাদিগের দুঃখ নিরানন্দ সহ্য করিতে পার? তাই বারবার তুমি স্বর্গের উৎসব লইয়া আকাশের বারিধারার ন্যায় বর্ষণ কর। ভাদ্র মাসে অবিরল ধারে যেমন আকাশের বারি-বর্ষণ হইতেছে, এবং পৃথিবীর শুষ্ক ভূমিও জলাভিষিক্ত ও জলপ্লাবিত হইতেছে, তেমনি আমাদিগের শুষ্ক পাপ-অবিশ্বাসময় জীবনকে তোমার স্বর্গের উৎসবের আনন্দে ভাসাইয়া দিবার জন্য তোমার ভাদ্রোৎসব লইয়া আসিতেছ। আশীর্ব্বাদ কর, সত্যই যেন এ সময় তোমার আনন্দময় রূপের প্রকাশে এবং তোমার অমর ব্রহ্মানন্দদলের সঙ্গ-সহবাসে আমাদিগের পাপ, অবিশ্বাস, শুষ্কতা দূর হয় এবং জীবন সর্ব্বজন-সঙ্গে উৎসবানন্দ-সম্ভোগে ধন্য হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

ভাদ্রোৎসব।

নববিধান নিত্য নব নব উৎসবের বিধান। এই বিধান যিনি পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি স্বর্গে যেমন তাঁহার অমর সন্তান-সন্ততিদিগকে লইয়া নিত্য উৎসব করিতেছেন, তেমনি তাঁর পৃথিবীর সন্তান-সন্ততিগণও সেই উৎসবের আস্বাদ সম্ভোগ করিয়া, যাহাতে তাহাদিগের মা কে ও কেমন চিনিতে পারে ও তাহাদিগের স্বর্গস্থ ভাই ভগ্নীরা যে আনন্দ নিত্য সম্ভোগ করিতেছেন তাহার আভাস পাইয়া, তাহাদিগের জাতি-কুলের মর্য্যাদা ও গৌরব লাভ করিতে পারে,

তাহারই জন্য মা তাঁহার স্বর্গস্থ ভক্তবৃন্দকে লইয়া পৃথিবীতে উৎসব করেন। তাই উৎসব পৃথিবীতে স্বর্গের অবতরণ বা পৃথিবীর স্বর্গে গমন।

বাস্তবিক উৎসব কখনই পার্থিব ব্যাপার নহে। আকাশ যেমন বায়ুমণ্ডলে পূর্ণ, কিন্তু যতক্ষণ না সে বায়ু প্রবহমান হয়, ততক্ষণ তাহা কেহ সম্ভোগ করিতে পারে না; বায়ুর অস্তিত্ব-সত্ত্বেও লোকে তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া ওষ্ঠাগত-প্রাণ হয়। তেমনি পৃথিবী ঈশ্বরের অস্তিত্বে পূর্ণ হইলেও আমরা তাঁহার জীবন্ত আবির্ভাব অনুভব করিতে না পারিয়া, অবিশ্বাসে নিরীশ্বর-জীবন হই। তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই প্রবহমান বাতাসের ন্যায় স্বর্গের উৎসবের আবির্ভাব হয়।

তাই স্বর্গের অবতারণারই নাম উৎসব। সুতরাং স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁহার মাতৃস্নেহে প্রণোদিত হইয়া এই উৎসব বিধান করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপা বিনা উৎসব-সম্ভোগ হয় না। আমাদিগের সাধ্য সাধনা, উপাসনা প্রার্থনা বা উদ্যোগ আয়োজনের দ্বারাই যে আমরা উৎসব-সম্ভোগ করিতে পারি, তাহা নহে। সে সকল চাই সত্য, কিন্তু তাহাতেই উৎসব হইবে আমরা যদি মনে করি, তাহা নিতান্তই আমাদিগের ভ্রান্তি।

মানুষের হাতে উৎসবের ব্যবস্থা নহে। মানুষ বিধি ব্যবস্থা করিতে পারে, কার্য্য-প্রণালী, সাধন-প্রণালী স্থির করিতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ পবিত্রাত্মার অবতারণা বিনা কিছুতেই উৎসব হইতে পারে না। কৃষক ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু আকাশের বারি-বর্ষণ না হইলে যেমন শস্য ফলে না, তেমনি জীবন্ত ঈশ্বরের কৃপাবতরণেই উৎসবের ফল ফলিয়া থাকে।

মার বিশেষ কৃপার দান এই উৎসব। কিন্তু এই উৎসব স্বর্গের অবতারণা হইলেও, আমরা যদি না তাহার জন্য উন্মুখীন হই, আমরা যদি না মার যথার্থ কৃপার ভিখারী হই, আমরা যদি আপনাদিগকে পাপ তাপে তাপিত, দুঃখ কষ্টে দীনহীন মনে করিয়া উৎসবের ভিখারী না হই, কিম্বা উৎসবানন্দ-সম্ভোগের প্রার্থী না হই, আমরা উৎসব পাইয়াও তাহা সম্ভোগের অধিকারী হইতে পারি না।

মৃতদেহে রক্তসঞ্চালন করিলে কি তাহাতে শক্তি-সঞ্চার হয়? মোহঘুমে আচ্ছন্ন যে, তাহার সম্মুখে পিতা মাতা উপস্থিত থাকিলেও কি দেখিতে পায়? অহংজ্ঞানে স্ফীত যে, সে কি সৎশিক্ষা দিলেও তাহা গ্রহণ করিতে পারে? গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া যে আপনাকে সংকীর্ণ গৃহে আবদ্ধ করে, সে কি মুক্ত-বায়ু-সম্ভোগে সমর্থ হয়? রোগে যাহার মুখ বিকৃত, সে কি সুস্বাদু সরবতের আস্বাদ পাইতে পারে? তেমনি স্বর্গের উৎসব অবতীর্ণ হইলেও আমরা তাহা সম্ভোগ করিতে পারি না, যদি আমরা অবিশ্বাসী, অহং-অন্ধ, সঙ্কীর্ণ-হৃদয় এবং কঠোর প্রবঞ্চক হই। কিন্তু আমাদিগের মহাপাপ সত্ত্বেও তখনই আমরা উৎসবের আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারি, যখন সরল বিনীত-হৃদয়ে আত্মদোষ স্বীকার করি এবং দীনাত্মা হইয়া মার কৃপার ভিখারী হই। মা আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন তাঁর প্রকৃত কৃপা-প্রার্থী হইয়া তাঁহার মহোৎসব সাধন ও সম্ভোগে ধন্য হইতে পারি।

—০—

ব্রহ্মমন্দির।

ব্রহ্মের মন্দির ব্রহ্মমন্দির। ভারতবর্ষে নানা দেব দেবীর মন্দির বহুকাল হইতে রহিয়াছে, নিরাকার পরব্রহ্মের মন্দির বলিয়া কোন মন্দির ইতিপূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত বা অভিহিত হয় নাই। বিশ্বেশ্বর, ভুবনেশ্বর, জগন্নাথ ইত্যাদি নাম যদিও ব্রহ্মেরই নাম, কিন্তু সে সকল নামে মূর্ত্তি কল্পিত ও তাঁহাদের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক ব্রহ্মনামে কোন মূর্ত্তিও কল্পিত হয় নাই এবং ব্রহ্মমন্দির নামেও কোন মন্দির কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

নিরাকার ব্রহ্মের উপসনাদির জন্য যে গৃহ ইতিপূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাও ব্রহ্মমন্দির নামে অভিহিত হয় নাই, তাহাকে ব্রাহ্মসমাজগৃহ নাম দেওয়া হয় এবং পরেও যাঁহারা ব্রহ্মমন্দির ত্যাগ করিয়া যান, তাঁহারাও যে গৃহ নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম দিয়াছেন প্রার্থনার "হল" বা প্রার্থনাসমাজ গৃহ। সুতরাং সমগ্র ভারতে একমাত্র "ব্রহ্মমন্দির" "ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির", এবং একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মন্দির জগতে এক এই ব্রহ্মমন্দির।

যিনি জলেতে, অগ্নিতে এবং বিশ্বভুবনের সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকিয়া বিশ্বকে তাঁহার মন্দির করিয়া অধিষ্ঠিত, সেই বিশ্বমন্দিরের ঘনীভূত নিদর্শনস্বরূপ তাঁহারই এই ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত। যাঁহার প্রাণে এই ব্রহ্মমন্দির নাম প্রথমে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাঁহার হৃদয়মন্দিরেও যে "এই সুবিশাল বিশ্বরূপ পবিত্র ব্রহ্মমন্দির" প্রতিফলিত, কে অস্বীকার করিতে পারে?

আবার এই ব্রহ্মমন্দির যে কেবল হিন্দু দেবমন্দিরের নামানুকরণ, তাহাও নহে। এই ব্রহ্মমন্দিরের চূড়ায় হিন্দুর মন্দির, মুসলমানের মস্‌জিদ, খৃষ্টানের গির্জ্জা ও বৌদ্ধের স্তূপ একাধারে সমন্বিত এবং তাহার উপর নববিধানের পতাকা উত্তোলিত।

সুতরাং এই "ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির" সম্পূর্ণ নূতন বিধানের নূতন মন্দির, ইহাই সর্ব্বজনীন ব্রহ্মমন্দির, নববিধানের মা আনন্দময়ীর শ্রীমন্দির।

এই মন্দির-প্রতিষ্ঠার উপলক্ষেই প্রথম ভাদ্রোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং ভাদ্রোৎসব একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার উৎসব। এই উৎসব-সাধনে যাহাতে আমরা সেই নিরাকার ব্রহ্মকে এই বিশ্বমন্দির হইতে গৃহমন্দিরে এবং ক্রমে এই দেহমন্দিরে নিত্য বিরাজিত দর্শন করিয়া, নিত্য উৎসব সম্ভোগ করিতে পারি, তাহারই জন্য এই ভাদ্রোৎসব।

আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ এই ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠাকালে বলেন :—

"দয়াময় ঈশ্বর কি আমাদিগকে ছাড়িতে পারেন? আশ্রিত জনের অভাব তিনি মোচন করিবেনই করিবেন। দেখ, এই অসহায় অবস্থাতে তিনি এই পাপীদিগের জন্য কত স্নেহ ও যত্ন প্রকাশ করিতেছেন। আমাদিগের জন্য এক মনোহর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আমাদিগকে ডাকিতেছেন।

"দীন দরিদ্রদিগের প্রতি দয়া করিয়া সময়ে সময়ে যে ধর্ম্মরূপ সম্পত্তি দিয়াছেন, তাহা তাহারা কোথায় রাখিবে? যদি সংসার আবার সেই ধন কাড়িয়া লয়, পিতা সেই জন্য একটী উপযুক্ত গৃহ আমাদিগকে প্রদান করিলেন। কেমন যত্নপূর্ব্বক তিনি আমাদিগকে এতদিন বিঘ্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া অবশেষে এই অমূল্য আশ্রয়স্থান দিলেন, তাহা মনে করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

"বিশ্বাস প্রীতির নববেশ ধারণ করিয়া, আমরা উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করিব; এবং তথায় তাঁহার পূজা করিয়া কৃতার্থ হইব।

"এখন পাপীরাও সেখানে পিতার চরণলাভ করিবে। যাঁহার কৃপায় পৃথিবী স্বর্গতুল্য হয়, রজনীতে সূর্য্যোদয় হয়, তাঁহারই মহিমার জন্য সেই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ঈশ্বর করুন, যেন এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দির পাপী তাপী, দীন দরিদ্রের আশ্রয়স্থান হইয়া এবং ভক্তদিগের শান্তি-নিকেতন হইয়া, চিরদিন তাঁহার পতিতপাবন ভক্তবৎসল নামের মহিমা মহীয়ান্ করে।"

আবার এক উপদেশে আচার্য্য বলেন :—

"এই ব্রহ্মমন্দির একখানি সুন্দর তরণীস্বরূপ। বাস্তবিক ইহা সামান্য নৌকা নহে। ভবসমুদ্রের মধ্যে ভয়ানক তুফান দেখিয়া, মৃত্যুর আশঙ্কায়, প্রাণের দায়ে ইহার মধ্যে সকলে উঠিয়া পড়িয়াছে। ভয়ঙ্কর কল্লোলের মধ্যে, ভবকাণ্ডারীর মুখে তাহারা উৎসাহকর 'মাভৈঃ মাভৈঃ' শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিল। আরোহীরা নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত হইল।

"যাঁহারা এই নৌকার আরোহী, তাঁহাদের রজনীতেও ভয় নাই, দিবসেও আশঙ্কা নাই। ঘাট ছাড়িয়া এই নৌকা চলিয়া গিয়াছে। যে কয়েকটী লোক এই নৌকায় উঠিয়াছেন, আর তাঁহারা সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না। এখানে কেবল সদ্ভাব-সম্বর্দ্ধন এবং মধ্যে মধ্যে সুমধুর ব্রহ্মসঙ্গীত।

"এই নৌকা যথার্থ ই ভবসাগরের উপর ভাসিতেছে। এই মন্দিরে যে আমরা ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে পিতার নাম করিতেছি, ইহা কি আমাদের সামান্য সৌভাগ্যের বিষয়। এই ব্রহ্মমন্দিররূপ নৌকার আরোহীদিগকে ভবসাগর ডুবাইতে পারিবে না। ভবকাণ্ডারীর উপরে নির্ভর করিয়া থাক। যখন ভবসাগর পার হইয়া যাইবে, তখন বুঝিতে পারিবে, কেমন ভাল বন্ধুর হাতে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলে।

"সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া পরস্পরের সঙ্গে মিলিত ভাবে কার্য্য কর। যাঁহারা এই নৌকায় আছেন, তাঁহাদিগকে ভাই বন্ধু বলিয়া ভালবাসিবে। পরস্পরের সঙ্গে যেন বিবাদ না হয়। সাবধান, বিবাদ করিলে মরিবে। পরস্পরকে না চিনিলে বাঁচিবে না।

"ঈশ্বর আমাদিগকে লইয়া চলুন! তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক! তাঁহার কৃপায় ভবসাগর পার হইয়া শান্তি-উপকূলে উপস্থিত হই।"

ধর্ম্মতত্ত্ব।

পাপবোধ।

জলে যখন ময়লা মিশ্রিত থাকে, তখন তাহা তত মলিন বোধ হয় না। কিন্তু যখন নির্ম্মলি স্পর্শে শোধন করা হয়, তখন জল হইতে ময়লা পৃথক হয়ে নিম্নে পতিত হয় ও বুঝা যায়, জলে কত ময়লা মিশ্রিত ছিল। আমাদের এই পার্থিব জীবনও আপাতত কতই স্বচ্ছ বোধ হয়, কিন্তু যখন ব্রহ্মের পুণ্য স্পর্শ অনুভব হয়, তখনই আমাদের পাপবোধ উদ্দীপন হয় এবং তখনই বুঝিতে পারি, এ জীবন কতই মলিন ও আমি কত পাপী।

উৎসব-সম্ভোগের উপায়।

আলোড়িত জলে বা তৃণাচ্ছাদিত পুষ্করিণীতে চন্দ্রের জ্যোতি প্রতিভাত হয় না। আমাদের চঞ্চল হৃদয়ে বা অবিশ্বাস-আবর্জ্জনাপূর্ণ মনে মার আনন্দঘন মুখ প্রতিভাত হয় না, এই জন্যই আমরা উৎসবের আনন্দ-সম্ভোগে বঞ্চিত হই। মন স্থির করিলে, হৃদয় নির্ম্মল করিলে, সর্ব্বক্ষণই মার হাস্যময় মুখ দৃষ্ট হয় ও ব্রহ্মানন্দ-সম্ভোগ হয়।

মার প্রেমের পাত্র কে ?

হাঁসপাতালে যে রোগী পড়িয়া থাকে, সম্রাট সম্রাজ্ঞীও তাহার মাথার কাছে গিয়া তাহার শুশ্রূষা করেন। পথের ভিখারী যে, দয়ার্দ্র ব্যক্তি স্বয়ং যাচিয়া তাহাকে অন্ন-দান করেন। এমনই যে আপনাকে মহাপাপ-রোগগ্রস্ত জানিয়া মার মন্দিরে পড়িয়া থাকে, রাজরাজেশ্বরী স্বয়ং তাহার রোগের শুশ্রূষা করেন এবং তাহার জীবনের অন্ন-পান দিয়া ক্ষুধা পিপাসা নিবারণ করেন।

যোগানন্দ।

সংসারের চাকরী করিলে, লোকে বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন্ ভোগ করে। ধর্ম্মরাজ্যে যাহারা চাকরী করে, বৃদ্ধ বয়সে তাহাদের পেন্সন্ যোগ-সম্ভোগ। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা এই পেন্সন্ পান।

ইংলণ্ডে রবিবার।

(শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপচন্দ্র লিখিত ও প্রকাশিত)

অদ্য রবিবার প্রাতঃকাল। ধূমাকৃতি নগরে সূর্য্য উঠিয়াছে। গৃহের সম্মুখের ক্ষুদ্র উদ্যানের কৃষ্ণবর্ণ গাছের ঝাড় যেন রৌদ্র পোহাইবার জন্য শাখা পত্র বিস্তার করিয়া ঈষৎ বায়ুভরে দুলিতেছে। গৃহের পশ্চাতে নিবিড় শ্যামবর্ণ তৃণাচ্ছাদিত ভূমি সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া হাসিতেছে। পথের প্রস্তর-বদ্ধ দুই পার্শ্ব এমনি শুষ্ক, পরিষ্কার এবং সমতল যে, সেখানে অনায়াসে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করান যাইতে পারে।

রবিবার প্রাতঃকালে সূর্য্য উঠিয়াছে, লোকের আনন্দ কি ধরে? আজ সব দোকান বন্ধ, দোকান খুলিলে জরিমানা হয়। রাস্তায় লোকের ভিড় নাই, গাড়ির সম্ভ্রধ্বনি শুনা যায় না। কর্ণপাত কর, শুনিবে, নানা শব্দে মুহুর্মুহু শত দেব মন্দির হতে ঘণ্টাধ্বনি বায়ুর হিল্লোলে চারিদিকে ভাসিতেছে। সে শব্দ কি ললিত, কি বিশুদ্ধ; বায়ু, আলোক ও আকাশের শোভাকে যে কতদূর সুমধুর করে, তাহা কি বলা যায়?

ঐ দেখ, বিলাতের লোকে দ্রুতপদে প্রাতঃকালীন উপাসনা করিতে যাইতেছে। স্ত্রী স্বামীর বাহু অবলম্বন করিয়াছে, পুত্র কন্যা পিতা মাতার পার্শ্বে চলিয়াছে। ক্ষুদ্র বালক বালিকা আত্মীয়দের অঙ্গুলি ধরিয়াছে। সকলেরই শরীরে উৎকৃষ্ট সজ্জা। দেবারাধনার সময় সুন্দর বস্ত্র পরিবেনা তো ভাল কাপড় লইয়া আর কি করিবে?

ইংরাজ-সন্তান সাহেবেরা বল, স্বাধীনতা ও ভদ্রতার প্রতিরূপ; ইংলণ্ডের দুহিতাগণ প্রফুল্লতা, সুরুচি ও কোমলতার আদর্শ; ইংরাজ শিশু স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও নির্দ্দোষিতার প্রতিবিম্ব! সকলে নিঃশব্দে, দ্রুতবেগে, দলে দলে উজ্জ্বল-মুখে, রবিবার প্রাতঃকালে দেবমন্দিরে চলিয়াছে।

আমি তাহাদিগের সঙ্গ লইলাম। ক্রমে ক্রমে সকলে নিজ নিজ স্থানে প্রবেশ করিল। প্রতি রবিবারে নির্দ্দিষ্ট আসন প্রত্যেক উপাসকের চিহ্নিত স্থান, প্রত্যেক আসন-তলে সঙ্গীত ও ধর্ম্মপুস্তক। ১১টা বাজিল, ঘণ্টা থামে না। প্রকাণ্ড অর্গানের গভীর নিনাদ উচ্চ মন্দিরের শিখর ভেদ করিয়া আকাশে উঠিল।

আচার্য্য নিরূপিত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া বেদীতে আরোহণ করিলেন। তাহার পর নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে উপাসনা কার্য্য সমাধা হইল এবং অর্দ্ধঘণ্টাকাল-পরিমিত বক্তৃতা শেষ হইল। এই উপাসনা ও বক্তৃতার গুণাগুণ বিচার করা এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে এই মাত্র বলা যায় যে, যে দেড় ঘণ্টাকাল উপাসনা-কার্য্য হয়, সে সময়ে অধিকাংশ লোকের মুখেই অমনোযোগ ও উপেক্ষার চিহ্ন। কিন্তু সঙ্গীতের সময় সকল নরনারী একত্র হইয়া মনোহর সুরে কখন ঈশ্বর ও কখন ঈশার মহিমাগান করে। আমার বোধ হয়, এই সকল লোকের মধ্যে উপাসনা অপেক্ষা সঙ্গীতের অধিক আদর। তবে যে যে মন্দিরের আচার্য্য বিশেষ গুণালঙ্কৃত ও সুন্দর বক্তা, সেখানে অধিক লোকের সমাগম।

রবিবার অপরাহ্নে বিলাতীয় লোকেরা স্ব স্ব পরিবার সঙ্গে লইয়া নগরস্থ প্রান্তর ও উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যায়। এই সকল স্থানে সন্ধ্যার পূর্ব্বে এত লোকের জনতা হয় যে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা সহজ নহে। কেহ বা ঘন তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে, কেহ কেহ ছায়াপ্রদ বৃক্ষের নিম্নস্থ আসনে বসিয়া মৃদুস্বরে আলাপ করিতেছে। মহিলাগণ উজ্জ্বল ও অল্পায়তন ছত্র হস্তে ধারণ করিয়া শিশুদিগের পশ্চাতে দৌড়িতেছে। যুবকগণ সমবয়স্কা নারীদিগের সঙ্গে নিঃশঙ্কচিত্তে আলাপ ও হাস্য করিতেছে, বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণ যষ্টি হস্তে লইয়া সাবধানে বায়ু সেবন করিতেছে। নির্ধনগণ যথাসাধ্য সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া স্বাধীনভাবে ধনীর সঙ্গে একত্রে ভ্রমণ করিতেছে। রবিবার জাতির বিচার নাই। বিলাতে অর্থবিহীন লোকে উচ্চাবস্থার লোককে ভয় করে না।

অপরাহ্নে পুনরায় দেবমন্দিরের ঘণ্টা বায়ুকে সহায় করিয়া চারিদিকে আপনার আহ্বান প্রচার করিল। যাহারা সে নিমন্ত্রণে আকৃষ্ট হইবার, তাহারা আবার দেবপূজার আয়োজন করিল। অবশিষ্ট লোকে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, সুখে আহার করিয়া, শয্যাবলম্বন করতঃ সপ্তাহশেষে বিশ্রাম ভোগ করিল।

আমি অসহায় ব্রাহ্ম, বিদেশে কাহার মন্দিরে প্রবেশ করিব? ইহাদিগের কাহারও উপাসনায় যোগ দিয়াই আমার পিপাসু প্রাণের তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। আমি পথে, প্রান্তরে, উদ্যানে, ধর্ম্মালয়ে, যেখানে যাই, সেই আমাদের আদরের বহু যত্নের ব্রহ্মমন্দির মনে পড়ে, যেখানে আমার বহুদূরস্থ পুরাতন আত্মীয়গণ আমাদের পুরাতন দয়াময়ের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতেছেন। এখানে ব্রহ্মমন্দির আমার প্রাণের ভিতর। আমার জীবন্ত ইষ্টদেবতা, তোমার ভক্ত-বৃন্দকে লইয়া সেইখানে প্রস্ফুটিত হও। আমি

বিদেশে স্বদেশ ভোগ করি। আমি নির্জ্জনতায় গভীর সহবাস সম্ভোগ করি। এখন আমার নিকট দিন, তোমাদের নিকট রাত্রি। এই দিন রাত্রি একত্র হইয়া সকল বিশ্রাম, সকল আশীর্ব্বাদ তোমাদের আত্মাতে বর্ষণ করুক।

মহাবাক্য।

জগতের সাধু মহাজনগণ সাধারণ লোক-মণ্ডলীর ধর্ম্ম-পথের সহায়ার্থ কত মহাবাক্যই রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের এক একটী বাক্য কত অচেতন জীবনে নব চেতনা দান করিতেছে, কত মোহান্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে মুক্তির দিব্যালোক উদ্ভাসিত করিয়া দিতেছে, দৈত্য দানব সদৃশ কত দুর্দ্দান্ত জীবনে মহা শুভ পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়েছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? কিন্তু, দেখা যায়, মানুষের জীবনে মহাবাক্যগুলি সকল সময়ে এক ভাবে কার্য্য করে না। বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে অসংখ্য সাধু-বাক্য সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে, কত সময় তাহা পঠিত হইতেছে, কত শত লোক তাহা শুনিতেছে, বড় বড় সভা সমিতিতে উপদেষ্টাগণ কত অমূল্য উপদেশ-বাক্য উচ্চারণ করিয়া সকলকে উপদেশ দিতেছেন, পূজা উপাসনায় মন্ত্রাকারে কত মহাবাক্য সকল উচ্চারিত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে, সে সকল বাক্য সকলের প্রাণকে এক ভাবে স্পর্শ করে না; কাহারও কাহারও প্রাণের নিদ্রিত সদ্ভাব সাময়িক ভাবে জাগ্রত করে, কিছু সময় পরে সে ভাবগুলি নিবিয়া যায়, অনেকের জীবনেই সে সকল স্থায়ী ফল প্রসব করেনা। যে যতটা শ্রদ্ধাপূর্ণ-হৃদয়ে মহাবাক্যগুলি পাঠ করে, অথবা অন্যের মুখে শ্রবণ করে, ততটা মহাবাক্যগুলি অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও মানব-প্রাণকে স্পর্শ করিবেই, তাহা দ্বারা চিত্তের নিদ্রিত সদ্ভাবগুলি অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যও জাগিয়া উঠিবেই। চিত্তভূমি শ্রদ্ধা বিনয়ে আর্দ্র থাকিলে, কিম্বা কোন গূঢ় অভাব জনিত ব্যাকুলতায় ব্যাকুলিত থাকিলে সে চিত্তের উপর মহাবাক্যের স্বর্গীয় ছাপ পড়িবেই। এ সব হইতেছে সাধারণ অবস্থার কথা। কিন্তু জীবনের বিশেষ অবস্থায় এক একটী বাক্য বিশেষ ভাবে কার্য্য করে, বিশেষ চেতনা ও পরিবর্ত্তন আনয়ন করে, বিশেষ সাধন-পথ খুলিয়া দেয়। তাই একজন সাধকের জীবনে এই ভাবের কথা আছে, "হরিনাম শুনেছি কত, মিঠা তো লাগে নাই এত, আজ কেন ভাই মন্ত্রের মত, অন্তরে পশিল আমার"।

বাইবেল গ্রন্থ তো কত ব্যক্তিই পাঠ করেন, বাইবেলের মহাবাক্যগুলি কার নিকট আদরণীয় নয়? ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র জন দি ব্যাপ্টিষ্টের মুখে শুনিলেন, "অনুতাপ কর, স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী"; শ্রীঈশার মুখে শুনিলেন, "অন্যকার জন্য চিন্তা করিও না"; কেশবচন্দ্রের জীবনে সেই সময়ের অবস্থানুসারে এই বাক্যগুলি কি জীবন্ত আকার ধারণ করিয়া কি জীবন্ত ফলই প্রদান করিয়াছিল, কয়জনের জীবনে সেরূপ হইয়া থাকে? জীবনের বিশেষ অবস্থানুসারে সামান্য বাক্যও মহাবাক্যের আকার ধারণ করিয়া, জীবন-বিশেষে মহৎ পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে। বঙ্গের লালা বাবুর নাম অনেকেই জানেন, তিনি একজন ব্যস্ত সংসারী ছিলেন। একদিন কোন অপরাহ্নে সামান্য এক ব্যক্তির মুখে উচ্চারণ করিতে শুনিলেন, "বেলা তো গেল", এই বাক্য শুনিবামাত্র তাঁহার প্রাণে নূতন চেতনা উপস্থিত হইল, তাঁহার জীবনের বেলা তো শেষ হইয়া আসিতেছে, জীবনের গণা দিন তো ফুরাইয়া আসিতেছে, অন্তরে এই ভাব উদয় হইবামাত্র তিনি সংসারের সকল বন্ধন কাটিয়া বৈরাগ্যের পথ আশ্রয় করিলেন, তীর্থবাসী হইলেন, বৃন্দাবনতীর্থে স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া হরিপদ-সাধনে জীবন কর্ত্তন করিলেন। তাই বলি, জীবনে অবস্থা-বিশেষে উপদেশ-বাক্য, মহাবাক্য তীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় চিত্তকে বিদ্ধ করে, জীবনে ঘোর পরিবর্ত্তন আনয়ন করে।

আমাদের চিন্তা করা উচিত, জগতের সাধু ভক্তগণ জনহিতৈষী হইয়া, জগতের অগণ্য অসংখ্য নরনারীর কল্যাণ-কামনায়, কত মহাবাক্যই রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান যুগে কত সদ্‌গ্রন্থই পাঠ করি, কত উপদেশ-বাক্যই উচ্চারণ করি, কিন্তু আমাদের জীবনে তাহার শুভ ফল অতি অল্পই হয়। আবার এমন অনেক লোক মানব-সমাজে সকল শ্রেণীর মধ্যেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা সামান্য খেলা ধুলা করিয়া সময় কাটাইতে অভ্যস্ত, তাহাতেই তাহাদের অনুরাগ, সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ করিতে মতি হয় না, কোন সাধু-বাক্য মননাদি করিতে মন যায় না। সাধারণতঃ এ বিষয়ে এই বলা যায়, যাহাদের মন যত সরল, যত কোমল, যত সহজ অবস্থাপন্ন, তাহাদের মনে উপদেশ-বাক্য সমধিক কাজ করে। যাহাদের মন বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া কুটিল হয়, কঠিন হয়, শুষ্ক হয়, অথবা বিশেষ বিষয়-রসপানে মত্ত থাকে, তাহাদের প্রাণে ধর্ম্মকথা অথবা সাধু বাক্য তেমন ক্রিয়াশীল হয় না।

আত্ম-চিন্তা, আত্মানুসন্ধান দ্বারা মনকে যত প্রস্তুত করা যাইবে, জীবনের একটী অপরাধে মন যত অনুতপ্ত হইবে, মন যত প্রার্থনাশীল হইবে, উপদেশ-বাক্য তত জীবন্ত ভাবে কার্য্য করিবে।

সাধক সাধনের পথে।

সাধনা শান্ত ও দান্ত গুণ সাপেক্ষ। ইহা মানবীয় চাঞ্চল্য গুণ সাপেক্ষ নহে। জন্ চর্চ্চম্যান (John Churchman) কহেন, "A wavering man is as a wave of the sea." অর্থাৎ চঞ্চল-প্রকৃতি-বিশিষ্ট মানুষ সমুদ্রের তরঙ্গের মত চঞ্চল। শান্ত দান্ত ভাব না আসিলে সাধনা দাঁড়ায় না। সাধন-মার্গে আসিয়া মানুষ প্রশান্ত সমুদ্রের মত স্থির ও হিমালয়ের ন্যায় গম্ভীর। এ পথে সবাই এক। চৌমাথায় দাঁড়াইয়া সাধক তাঁহার দূরদর্শী ও সুবিস্তৃত চক্ষে দেখিতে পান যে, সমগ্র পথের চলিষ্ণু পথিকগণ এক মহাপথ-কেন্দ্রে আসিয়া মিলিতেছেন। সব দিক্ হইতে পাখী আসিয়া এক বৃক্ষে এক ডালে বসিয়াছে। তাই, শৈশবে ভূগোল

সূত্রে পড়িয়াছ, কুক্, ড্রেক্ সমুদ্রের নির্দ্দিষ্ট উপকূল হইতে জাহাজ ছাড়িয়া আবার সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া অবতরণ করিলেন। সেই ভূগোলেই পড়িয়াছ, পৃথিবী আহ্নিক গতিতে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া আবার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়। জ্যামিতিক বৃত্তে দেখিয়াছ, পরিধি হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত যত রেখা টানা যায়, সমুদায়গুলিই এক। একবার মানচিত্রের দিকে তাকাইয়া দেখ, দুই জল-রাশির মধ্যস্থিত ব্যবধান কাটিয়া দিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমুদ্রের মহামিলন হইয়াছে। ভাই, অধ্যয়ন কর, দেখিবে, বিধাতা স্বয়ং নববিধানের চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছেন। অধ্যয়ন কর, এক হিমালয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে পাঁচটা নদী বাহির হইয়া এক মহানদীতে মিলিত হইয়াছে। অধ্যয়ন কর, হিমালয়ের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া যাইবার গিরি-সঙ্কট হইতে সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ কাটিয়া ভারত ও আফগানিস্থান মিলিত হইয়াছে। পাখী যখন উড়ে, তাহার সে পথে আর ব্যবধান থাকে না। নীচে কত পাহাড় পর্ব্বত ও নদী পড়িয়া থাকে, পাখী আকাশপথে অব্যাহত-ভাবে উড়িয়া যায়। ধর্ম্মাকাশে ব্যবধান নাই। আমিত্বের ব্যবধান কাটিয়া দিয়া সাধক উড়িয়া যান, আর তাঁহার সে পথে ব্যবধান নাই। তাঁহার পথ প্রশস্ত, তিনি সে পথে গিয়া দেখেন, "নদীয়া, জুডিয়া, মক্কা, গয়া" সমস্তই এক মহাপথ-কেন্দ্রে মিলিয়া গিয়াছে। তাই আজ নির্জ্জনে বসিয়া গাহিতেছি :—

দেখ ভাই, সব এক, দুই আর নাই,
বলিলেন এই তত্ত্ব "কেশব গোঁসাই"।
ঈশা, মুষা, শ্রীচৈতন্য, শাক্য, মহম্মদ,
দেখিবে সকলে এক হলে অগ্রপদ।
মীরা, ডোরা, মেরী, এক গার্গী ও গায়ন,
দেখিবে সবাই এক হইলে সাধন।
সব পথ মিলে, ভাই, এক পথ হয়,
সাধনে মিলন, ভাই, সবার নিশ্চয়।
পরিধির সব রেখা কেন্দ্রে মিলে যায়,
সাধকের মিল হয় শুধু সাধনায়।
কেশবের পথে, ভাই, সবার মিলন,
বিধান আলোকে, ভাই, কর দরশন।
নববিধানের কথা অমৃত-সমান,
শ্রীকেশব করিলেন সুসংবাদ দান।

সাধনার পথে সাধকের অবস্থা যতটুকু অনুভব করিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, এ পথ সাধারণ পথ নহে। পাঠশালায় অনেক লোক গতি বিধি করে, কাহাকেও চিনাইয়া দিতে হয় না। সাধনার পথ তাহা নহে। ভিতরে যিনি পথ-প্রদর্শকরূপে বর্ত্তমান, তিনিই চিনাইয়া দেন। সদ্যজাত বৎস যে গাভীকে সঙ্গে সঙ্গে চিনিয়া লয়, সে পরিচয় কোথা হইতে আসে? বৎসের বিদ্যালয় নাই, বৎসের গ্রন্থ নাই, কিন্তু তাহার ভিতরে শিক্ষকরূপে যিনি বর্ত্তমান, সেই নিভৃত শিক্ষকই তাহার ভিতরে সে শিক্ষা বিধান করিতেছেন। পৃথিবীর লোক-সাধারণ-সুলভ-পথ সেই চিন্ময় বিধাতাকে চিনাইয়া দিতে পারে না। বৎস তাহার মাতৃগর্ভে নিভৃতে বাস করিয়া এই মহাপরিচায়ক শিক্ষা লাভ করিয়া এক অভ্রান্ত পথে তাহার মাতাকে চিনিয়া লয়। তাহার আহার পান সমস্তই এক অভ্রান্ত পথে সম্মুখে উপস্থিত। সাধক সাধনার পথে সেই সাধনীয় নিভৃত বস্তু লাভ করেন। এই প্রাপ্ত বস্তু তাঁহার নিকটে "Secrets of the Most High" অর্থাৎ সেই মহান্ প্রভুর এক প্রচ্ছন্ন বস্তু। না চলিলে কোন্ পথিক তাঁহার গন্তব্য পথ প্রাপ্ত হয়েন? কণ্টকাকীর্ণ খর্জ্জুর তরুকে না কাটিলে মিষ্ট রস বাহির হয় না। সম্পেষণ-যন্ত্রে ইক্ষু-দণ্ডকে সম্পেষিত না করিলে সে রসনা-তৃপ্তিকর সুমিষ্ট রস বহির্গত হয় না। আমিত্বের ছেদন ও আমিত্বের পেষণ ব্যতীত সাধন-রস অসম্ভব। রস দানা বাঁধিয়া যায়, রস শর্করা ও মিছরিতে পরিণত হয়। তাই বলিতেছি, পথ না ধরিলে কিছু পাওয়া যায়না। সাধক সাধন-রাজ্যে যে সুঘ্রাণ লাভ করেন, তাহাতে তাঁহার পথ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়ে। উষ্ট্র ঘ্রাণ-শক্তিতে ভীষণ বালুকাপূর্ণ মরুভূমিতে সুশীতল জলপূর্ণ জলাশয় প্রাপ্ত হয়। উষ্ট্র সেই ঘ্রাণ-নির্দ্দেশিত পথে না চলিলে, সেই কৃষাণুসম মরুভূমিতে আপনার প্রাণ ও তাহার পৃষ্ঠোপরি উপবিষ্ট আরোহীর প্রাণ বাঁচাইতে পারে না। সাধনা-নির্দ্দিষ্ট পথ না ধরিলে সাধকের প্রাণ বাঁচেনা। সাধক আবরণ-উন্মুক্ত প্রজাপতি। সাধক অণ্ড-বিস্ফারিত পাখী। সাধক গোলাপ গাছ। সাধক বল্কল-বিচ্যুত তালতরু। সাধক প্রজাপতি ও পাখী হইয়া আবরণের মধ্যে আর প্রবেশ করেন না। সাধক গোলাপ গাছের মত অস্ত্র-বিদ্ধ ও কর্ত্তিত হইয়া আরও বর্দ্ধিত ও আরও বৃহদাকার পুষ্প-রাশিতে শোভিত। সাধক তালতরুর মত পৃথিবীর বাসনা-বল্কল-বিরহিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নত। সাধক পৃথিবীর ভাষা-বিরহিত। "Silence is wisdom, where speaking is folly"—যেখানে মুখের ভাষা নির্ব্বুদ্ধিতা, সেখানে মৌনই জ্ঞান। ম্যাডাম গায়ন তাঁহার সাধনশীল জীবনে এই ব্রতই অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভক্ত ব্রহ্মানন্দের ভিতরে এই মহা সাধনা আসিয়াছিল। তুমি আমি কত অভিযোগ উপস্থিত করিলাম, কিন্তু তাঁহার ব্রত ভঙ্গ হইল না। অল্প জলে অনেক ভীষণ তরঙ্গ-সঙ্কুল বজ্র-নিনাদ, কিন্তু গভীর জলে শব্দ নাই। "Posterity would judge"—"ভবিষ্যৎ বিচার করিবেন" এই উত্তরই ভক্তের ভিতর হইতে আসিল। সত্য সত্য সাধকেরা পৃথিবীর ভাষা ছাড়িয়া দেন। "Old man to be put off and the new man to be put on"—পুরাতন মনুষ্যত্ব-বিমুক্ত নূতন মানুষ হইয়া সাধক চলিতে থাকেন। "If the enemy comes and tempts you, suggesting this or that, keep looking up, the clouds will break and you will, by faith, see His face."—যদি শত্রু আসিয়া তোমাকে নানারূপ প্ররোচনায় প্রলুব্ধ করে, তাহা হইলে উপর দিকে তাকা-

ইয়া থাক, মেঘ সরিয়া যাইবে এবং তুমি বিশ্বাসের দ্বারা তাঁহার মুখ দেখিতে পাইবে। সাধনশীল সাধনার পথে কোথায় চলিয়া যান, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহার পথ ও তাঁহার দৃষ্টি স্বতন্ত্র। "He walks not by sight but by faith." —তিনি বহির্দৃষ্টি দ্বারা চলেন না, তিনি বিশ্বাসের দ্বারা চলেন। এ যুগে ব্রহ্মানন্দ এই পথে চলিয়াছিলেন। পৃথিবীর পথিক সে পথ চিনিতে পারেন না। যাঁহারা পাহাড়ের নিম্ন ভূমিতে চলেন, তাঁহারা পাহাড়ের উপরের পথ কোথায় চলিয়াছে, তাহা দেখিতে পান না। সাধকের নিত্য নূতন জীবন। তাই, ভাই, আজ আমার নির্জ্জন কুটীর হইতে বলিতেছি:—

সাধনায় সাধকের নূতন জীবন,
সাধনায় পুরাতন নিত্যই নূতন।
পক্ষের উত্তাপে পাখী অণ্ড হ'তে উ'ড়,
প্রজাপতি উড়ে তার আবরণ ছেড়ে।
"ছোট পাখী আমি" সেই ব্রহ্মানন্দ হ'তে,
উড়েছিল কোথা, ভাই, তাঁহার অজ্ঞাতে।
তালতরু উঠে যত আকাশের দিকে,
ছাড়িতে বন্ধল তার দিন দিন শিখে।
ব্রহ্মবাসী ঋষি, ভাই, ব্রহ্মেতে মগন,
আহার পানীয় তাঁর সেই ব্রহ্মধন।
ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মে তাই এ নববিধানে,
পাইলেন সব তাঁর নূতন জীবনে।

প্রস্তুতি বিনা কে কি করিতে পারে? পক্ষ বিনা কোন্ পাখী উড়িতে পারে? আধার বিনা জল কোথায় দাঁড়ায়? দ্বারোদ্ঘাটন না হইলে কে গৃহে প্রবেশ করিতে পারে? ফুল না ফুটিলে মক্ষি ফুলের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। তাই খৃষ্ট-বিধানে প্রেরিত ঋষি বলিলেন, "And they that were ready went in"—যাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিলেন। চির-প্রস্তুত অনুসন্ধিৎসু মক্ষি ভিন্ন কে ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে? যাঁহারা গৃহের দ্বার অন্বেষণ করেন, বিধাতা স্বয়ং আসিয়া তাঁহাদিগকে বলেন, "Behold, I have set before you an open door which no man can shut"—দেখ আমি তোমাদের সম্মুখে এক মুক্ত দ্বার স্থাপন করিয়াছি, এ দ্বার কোন মনুষ্যই বন্ধ করিতে পারে না। ব্রহ্ম-সাধন স্থিরতা-সাপেক্ষ। সুপ্ত আত্মার উত্থান মহা সমাধি-সাপেক্ষ। সাধনার পথে অবিশ্রান্ত সাধনার প্রয়োজন। পাখীর ডিম একদিনে ফোটেনা। একদিনে বটবীজ প্রকাণ্ড বটবৃক্ষে পরিণত হয় না। সাধনের ভূমি আমিত্ব-বিনাশ। এ বিনাশও সাধন-সাপেক্ষ। "The death of self is not accomplished at once."—একেবারেই আমিত্বের বিনাশ সাধিত হয় না। একখানি ইটের উপর আর একখানি গ্রথিত হইয়া মিশরের আকাশভেদী পিরামিড (pyramid) রচিত হইয়াছে। আত্ম-পরীক্ষা অর্থাৎ আমি কি, এরূপ দৃষ্টি না আসিলে আত্ম-নির্ব্বেদরূপ মহাধর্ম্ম আসিতে পারে না। তাই সাধক বলিলেন, "The reason why there is so tittle self-condemnation, is because there is so little self-examination."—আত্ম-পরীক্ষার অভাবে পৃথিবীতে আত্ম-নির্ব্বেদের অভাব। সাধক আরও বলিলেন, "For the very beginning of self-exaltation is the beginning of Babel"। ভিতরের ভাষায় যতই গোলমাল আসিবে, ততই আপনাকে বড় করিবার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমিত্বের প্রাচীর যতই দণ্ডায়মান হইবে, সম্মুখ দৃষ্টি ততই কমিয়া যাইবে। জর্জ্জফক্‌স (George Fox) কহিলেন, "But such as have lost their eye-salve and their sight is grown dim, lose their judgment, discerning and distinction in the Church of Christ". যাহারা চক্ষুর অঞ্জন হারাইয়াছে এবং যাহাদের দৃষ্টিশক্তি অন্ধীকৃত হইয়াছে, তাহারাই খৃষ্টের ধর্ম্মমন্দিরের বিচার করিবে। এই স্থানে সত্যই সাধক ফক্‌স ধর্ম্ম-মন্দিরের বিবাদ-মীমাংসার কথা বলিলেন। এই কেন্দ্র-ভূমিতে আসিয়া ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "All religions are true"—সকল ধর্ম্মই সত্য। সাধনে সব বিবাদ মিটিয়া যায়। সাধন অঞ্জনাভিষিক্ত অন্তর্দৃষ্টি বিধান করেন। সাধনে ধর্ম্মের সমুদায় রস এক মধুচক্রে আসিয়া মিলিত হয়। সাধনে ভক্ত-আত্মা-বিনিসৃত ভাব-দুগ্ধ এক পাত্রস্থিত নানা বর্ণ-বিশিষ্ট গাভীর দুগ্ধের ন্যায় এক অভেদ্য বর্ণে পরিণত হয়। মধু-চক্রে আসিয়া সকল ফুলের মধু এক হইয়া যায়। তাই, ভাই, আজ নির্জ্জনে গাহিতেছি:—

খোলেনাক দৃষ্টি, ভাই, বিনা অভিষেক,
নানা ফুল হ'তে মধু মধুচক্রে এক।
নানাবর্ণ গাভী হ'তে দুগ্ধ এক হয়,
সাধনেতে এক ধর্ম্ম এই বিশ্বময়।
শ্রীকেশব আসিলেন ইহাই বলিতে,
জলের বিবাদ নাই একই ঘটেতে।
সাধনে বিবাদ নাই—সাধনে মিলন,
এই স্থানে ব্রহ্মানন্দ সকলের ধন।
মিলনের কেন্দ্র, ভাই, সাধন-ভূমিতে
পারিবে এখানে তুমি কেশবে চিনিতে।
দুই হাত তুলে বল বিধানের জয়,
বল আজ প্রাণ ভরে "ধর্ম্ম-সমন্বয়।"

সাধন-ব্যতীত বিধাতার ধর্ম্ম বিধান জলশূন্য পাত্র অথবা প্রাণশূন্য দেহের মত পড়িয়া থাকে। মরুভূমিতেও শিশিরপাত হয়। সাধন সকল দিক পূর্ণ করে। সাধক অগষ্টি স্যাবেটীয়ার (Auguste Sabbatier) বলিলেন, "Without the soul religion is but an empty form—a mere corpse."—ধর্ম্ম-সাধনের আত্মা ব্যতীত ধর্ম্মবস্তু এক প্রাণশূন্য দেহের মত পড়িয়া থাকে।

সেবক—শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

(প্রাপ্ত)

সাকার নিরাকার তত্ত্ব।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

প্রত্যেকের জীবনে, প্রত্যেক জন-সমাজের, সমস্ত মানবজাতির ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, উত্থান পতনের ভিতর দিয়াই মানবের ক্রমোন্নতির পথ নির্দ্ধারিত। জগতে যত মহাপুরুষ আসিয়াছেন, সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, "অমুক সময় অমুক দুরবস্থা না হইলে আমি কখনই এরূপ হইতে পারিতাম না"। যোগী, ঋষি, জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মী, পাপী, পুণ্যবান্ সকলেরই উত্থান ও পতন আছে। ইহা দেখিয়াই সাধক গাইলেন, "(তুমি) হয় রাখ সুখে না হয় রাখ দুখে, তোমার বিপদ সম্পদ আমার দুই সমান; তুমি যে বিধি কর বিধি, সেই হয় মঙ্গল বিধি, গুণনিধি হে; ঘোর বিপদেও বলবো তোমার দয়াময়।" তাই বলি, কেহ যেন পতনে নিরুৎসাহ হয় না, কিম্বা অপরের পতন দেখিয়া তার নিন্দা ক'রে আপনার গৌরব চরিতার্থ করে না। অন্তর্যামী দয়াময় হরি প্রত্যেকের হৃদয়ে থাকিয়া, কাকে কোন্ পথ দিয়া ঘুরায়ে ফিরায়ে বুঝায়ে সুঝায়ে নিজের কোলে টানিতেছেন, তা কে বলিতে পারে? নিজের জীবনবেদ উল্টাইয়া দেখিতে পারিলে তাঁর এই নিগূঢ় লীলার অর্থ যখন হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন আর চক্ষে জল ধরে না, উহা বহিয়া বুক ভাসায়ে দেয়। তখন আপনার ও অপর সকলের মঙ্গলের জন্য দয়াময় শ্রীহরির কৃপা ভিক্ষা করিতে সহজেই প্রাণ চায়। তখন বুঝি, ঈশ্বরের মহিমা কত! পতিতপাবনের পতিত-উদ্ধারের কি আশ্চর্য্য নিয়ম! প্রেমস্বরূপের কি গুপ্তপ্রেমের খেলা! ঠেকে না শিখিলে ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁর বিধান লইয়া তর্ক করা বৃথা। আরও যখন ভাবি, সকল বিধান-প্রবর্ত্তকেরই উদ্দেশ্য এক—সেই অনন্তের মিলন আশে ধাবমান—তখন মনে হয়, সকল বিধানই অনন্ত উন্নতি-পথের সোপান। সুতরাং সকল বিধানেই অনন্তের স্বরূপ কতক ব্যক্ত, কতক অব্যক্ত নিশ্চয়ই থাকিবে; তা না হলে অনন্তের মহিমা থাকে না। অনন্ত বলিয়াই তিনি নিত্য নব নব ভাবে ভক্তের নিকটে প্রকাশিত হইয়া, তাঁহার সৌন্দর্য্যে ভক্তের প্রাণ মন সর্ব্বস্ব ধন হরণ করিয়া, "শ্রীহরি শ্যামসুন্দররূপে" পরিগণিত হইয়াছেন। এই নিতুই নতুন ভাব প্রকাশ করিতে এবং সম্ভোগ করিতে হিন্দু তাঁহাকে "শ্যামসুন্দর" নামটি দিয়াছেন। যে অনন্ত সত্তা দ্বারা আমরা নিরন্তর পরিবেষ্টিত, সহস্র যত্ন করিলেও কেহই সে সত্তাজ্ঞানকে অপসারিত করিতে পারে না। কারণ সেই সত্তা-নিহিত অনন্ত শক্তি দ্বারা আমাদের সর্ব্ব বিষয়ের জ্ঞান সীমাবদ্ধ হইতেছে, ইহা আমরা প্রতিক্ষণেই বুঝিতে পারি এবং এই সীমা বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গেই সীমার বাহিরের জ্ঞানও অনিবার্য্য। এই যে সীমাজ্ঞান ও সীমার বাহিরের জ্ঞান, উভয়ের সমসাময়িক জ্ঞানই ক্রমোন্নতির দিকে মানুষকে নিরন্তর লইয়া যাইতেছে। যতই মানুষ জানে, ততই না জানার বিষয় সামনে আসিয়া তাকে আরও জানিবার জন্য উৎসাহিত করে। এই না জানা বিষয়, এই অব্যক্ত বিষয়-দ্যোতককে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ "শ্যাম" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। তারপর এই অব্যক্তের মধ্যে ক্রম-বিকাশ দেখিয়া মানব সদাই অব্যক্তের দিকে ধাইতেছে অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে মানবের জ্ঞান যতই অগ্রসর হয়, তার সঙ্গে সঙ্গে দিঙ্মণ্ডলের ন্যায় (Horizon) তার অজ্ঞাত বিষয়ও সরে সরে গিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়, আর মনে হয়, যেন ঐ অনন্ত আকাশকে যেখানে আকাশ নেমে এসে পৃথিবীকে ঢাকে করেছে, সেইখানে ত্বরায় পঁহুছিতে পারিব। এইরূপে মানুষ ক্রমান্বয়ে জ্ঞানের অনুসন্ধানে দৌড়াইতেছে, অথচ উহার সৌন্দর্য্যের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইতেছে। কারণ কোন বিষয় সম্পূর্ণ জানিতে পারিলে উহা সাধারণ হইয়া পড়ে, ক্রমে পুরাতন হইয়া উহার সৌন্দর্য্য হারায়। এই অব্যক্তের পরে পরে ব্যক্তাবস্থা অর্থাৎ ক্রমবিকাশ দেখিয়া, এই নিত্য নবীনত্বের অসাধারণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঐ অচিন্ত্যত্ব-দ্যোতক "শ্যাম" শব্দের সহিত অসাধারণ সৌন্দর্য্য-দ্যোতক "সুন্দর" শব্দ যোগ করিয়া, কি এক অবিভাজ্য ভাব, (অর্থাৎ যেই অনন্ত সেই চিরসুন্দর, যেই চিরসুন্দর, সেই অনন্ত) কি এক একত্বভাব অথবা একে দুই ভাব জড়িত "শ্যামসুন্দর" নামে কেমন সুস্পষ্ট করিয়াছেন। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় বলেন, ইহার শাস্ত্র-প্রমাণ উপনিষদ্বাক্য "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে।"

এখন বোঝা গেল, যাহা নিত্য নবীন, তাহাই নিত্য, অর্থাৎ আদি-অন্ত-বিহীন। ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র এই ক্রম-বিকাশ-প্রক্রিয়া সর্ব্ব-ধর্ম্ম-মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া এবং আপনার জীবনে নিত্য নবীনত্ব সম্ভোগের সহিত, যুগযুগান্তরের প্রেরিতদিগের সহিত, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মিলিত হইয়া, তাঁহারই আদেশে, তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া, অপূর্ব্ব ভাষায় ভাব ভঙ্গিমায় জলদগম্ভীরস্বরে ইহাকে "নববিধান" বলিয়া প্রচার করিলেন। জগদ্বাসী স্তম্ভিত হইয়া তাঁর শ্রীমুখের মধুমাখা কথা শুনিতে লাগিল, আর অবাক হইয়া সকলে আপন আপন জীবনে এবং আপন আপন ধর্ম্ম-পুস্তকে ঐ নববিধানের অঙ্কুর অন্বেষণ করিতে লাগিল। ঐ অঙ্কুর দেখিয়া সকলেই বলিতে লাগিল, এ তো আমাদের ধর্ম্মেও আছে, তবে আর ইহাকে নববিধান বলিবার প্রয়োজন কি? এ একটা ফাঁকির কথা, অপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মন ভোলাবার কথা। ইহা শুনিয়া তিনি ইংরাজী বাঙ্গালায় নানা ভাবে, নানা কথায় এই বিধানের নূতনত্ব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তার মধ্যে আজকের বিষয় সম্বন্ধে যাহা প্রযোজ্য, তাহাই উল্লেখ করিতেছি। যাহা হইতে বোঝা যায় যে, এই বিধান পুরাতন অর্থাৎ অনাদি এবং নিত্য নবীন অর্থাৎ অনন্ত ক্রমবিকাশশীল বলিয়াই ইহা চিরকাল ছিল, আছে ও চিরকাল থাকিবে এবং নিত্যই বিকসিত হবে, ইহাই ইহার নূতনত্ব। সকল বিধান মধ্যেই ইহার বীজ বা অঙ্কুর অথবা বৃক্ষ নিহিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। সে

কথাগুলির ভাব এই,—যখন বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণাদি কিছুই ছিল না, তখনও এই বিধান ছিল, যদি এই ত্রিভুবনও বিনষ্ট হয়, তথাপি ইহার নিশান উড়িবে। অপর সকল বিধানের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা স্বতন্ত্র, ভিন্নতা থাকিলেও যোগযুক্ত। সকল যুগের প্রেরিত মহাপুরুষেরা ইহার জয়গান করিতেছেন।

তাই বলি, সকল বিধানের মধ্যে, এমন কি সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার সাদৃশ্য দেখিয়া এবং দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে, এক কথায় অধিকারী ভেদে, ধর্ম্মসাধনের নানা আচার ব্যবহারের মধ্যেও উদ্দেশ্য বুঝিয়া সকলকে সমাদর পূর্ব্বক যথাসাধ্য সেবা করাই এই নববিধানের স্বাতন্ত্র্য। নিম্ন-শ্রেণী ছাত্রের বিদ্যা-চর্চ্চা দেখিয়া উচ্চশ্রেণী ছাত্রের অশ্রদ্ধা করা কি কর্ত্তব্য ? গুরু মহাশয়ের (স্বয়ং ভগবানের) আদেশে যদি সর্দ্দার পোড়ো হয়ে গুরুর সাক্ষাতে ও ইঙ্গিতে নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রকে শিখাইতে পার, তো বহুৎ আচ্ছা, তা না হলে কোন শ্রেণীর লোককে অনাদর করা, আর নববিধানের অনাদর করা একই বলে মনে হয়। তাই বলি, অপরের কথা ছাড়িয়া দিয়া নিজেদের মধ্যেই অনাদর অসদ্ভাব মনোমালিন্য দেখিয়া প্রত্যক্ষদর্শীরা যেন ইহাতে নিরুৎসাহিত না হন। আমরা যদি এই বিধানকে অনাদর ও অশ্রদ্ধা করি, তাহাতে বিধানের কোন মর্য্যাদার হানি হইবে না। স্বয়ং ভগবানের বিধান বুঝিয়া যিনি ইহার মাধুর্য্য সম্ভোগ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় বলিতে পারেন যে, যখন তাঁর মত নরাধমেও ইহার আশ্রয়ে পরম আনন্দের সন্ধান পাইয়াছে, তখন ইহার মর্য্যাদা নিশ্চয়ই দিন দিন বাড়িবে এবং সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইবেই হইবে। ঈশ্বরের অবমাননা করিলে কিম্বা তাঁকে না মানিলে ঈশ্বরের কিছুই হয় না, বরং যে না মানে, তারই অজ্ঞান ও অহঙ্কার বাড়িয়া তাকেই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তাঁর বিধানের মর্ম্ম না বুঝিয়া, যথেচ্ছাচারে বিধানের অপমান করিলে, বিধানের কিছুই ক্ষতি হবে না, বরং যথেচ্ছাচারীদের দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রত্যক্ষ-দর্শীরা আরও দৃঢ় নিশ্চয় হইবেন। তাঁহারা বুঝিবেন যে, এই বিধান কেবল মতামতের বিধান নয়, কেবল বিদ্যাবুদ্ধির বিধান নয়, কেবল বাহবার বিধান নয়, লোক দেখান বিধান নয়, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে সচ্চিদানন্দের সহবাস সম্ভোগ করাই এই বিধান। ইহা সম্ভোগের বিধান, কেবল বিচার-বুদ্ধির সংশয়াত্মক অতএবের বিধান নয়। অনুমান নয়, সদা বর্ত্তমান। আর যাঁহারা পরের মুখে ঝাল খান, পরের কথার মর্ম্ম সম্ভোগ না করিয়া অনুমানের সাহায্যে পরের কথা নিয়েই তর্ক বিতর্ক করেন ও নিজের কোট বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত, তাঁরা সাধারণ-বিধানবাদী; নববিধানবাদী মুখে বলিলেও নববিধানের মর্ম্মগ্রাহী ও মাধুর্য্য-সম্ভোগী নন। সুতরাং তাঁহাদের পতন দেখিয়া নববিধানের পতন কেহ যেন না ভাবেন। সকল বিধানেরই বিধানবাদীদের এই দশা, তথাপি সকল বিধানেরই প্রত্যক্ষ-দর্শী দ্বারা, স্বয়ং ভগবান্ আপনার বিধান সমূহের আস্বাদ দিয়া, সকল বিধানের ক্রমবিকাশ করিতেছেন। অবশেষে সকলের সমন্বয়-স্থানে সকল বিধান মিলিত হইবেই হইবে, নিশ্চয়ই হইবে। তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষদর্শীর হৃদয়, সকল মতের বা পথের চরমে মিলন।

শ্রীযুধিষ্ঠির শর্ম্মা।

—•—

উৎকল নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।

বালেশ্বরে ঊনষষ্টিতম সাম্বৎসরিক মহোৎসব।

১১ই জুলাই, ২৭শে আষাঢ়, বুধবার—সন্ধ্যার সময় ব্রহ্ম-মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে উপাসনা শ্রদ্ধেয় প্রাচীন সাধক শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র দাস সম্পন্ন করেন। উদ্বোধনে মহাভাবের স্রোত প্রবাহিত হয়। ধন্য বিধান-জননীর কৃপা।

১২ই জুলাই, সকালে উপাসনা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস সম্পন্ন করেন। "ডাকার মত ডাকতে পারলে তাঁর দেখা পাওয়া যায়" অবলম্বনে উপদেশ প্রদান করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বিশালের গৃহে কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র পাণ্ডা অতি ভাবের সহিত "দয়াময় বলে আমরা তাই ডাকি" কীর্ত্তনটী করেন। উপাসনার ভিতর দিয়ে বিধাতা আমাদিগকে বলিলেন, "বালেশ্বরে আজ ৬০ বৎসরের অধিককাল আমি আমার লীলা করিতেছি। তোমরা তাহা দেখিয়া সকল প্রকার অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা দূর কর"। উপাসনান্তে শ্যাম বাবুর স্ত্রী সকলকে অতি শ্রদ্ধার সহিত মিষ্টান্নাদি খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত ও নব উৎসাহে উৎসাহিত করেন। উৎসবের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ৫৲ টাকা প্রদান করেন। ভগবান্ এই বিশ্বাসী পরিবারের প্রাণ হইয়া থাকুন। স্বয়ং শ্যামসুন্দরও প্রাণমন ঢেলে উৎসবের সকল দিকে সাহায্য করিয়া আমাদিগকে নবোৎসাহে উৎসাহিত করিয়া নিজে ধন্য হইলেন।

১৩ই জুলাই, সকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পন্ন করেন। সন্ধ্যায় রেল ষ্টেশনের নিকট জিলা স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ রায়ের গৃহে শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র দাস অতি ভাবের সহিত উপাসনা সম্পন্ন করেন। ভয়ানক বৃষ্টির জন্য অপর কেহ যোগ দিতে পারেন নাই। উপাসনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। অতীতের স্মৃতির সঙ্গে বিধাতার লীলা কেমন ভাবে বালেশ্বরে হয়ে আসচে, তাহার সংক্ষিপ্ত অতিশয় আশাপ্রদ বিবরণ বলা হয়েছিল।

১৪ই জুলাই, সকালে প্রাচীন বিশ্বাসী শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র দাসের গৃহে উপাসনা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সম্পন্ন করেন। জীবনে বিশ্বাসের পরিচয় যাহাতে আমরা দিতে পারি, এরূপ ভিক্ষা ভগবানের চরণে করা হয়। শ্রদ্ধেয় ভগবান্ বাবুর বাড়ীতেই মধ্যাহ্ন ভোজন

হয়। ভগবান্ বাবুর স্ত্রী ও বধুমাতাগণ সেবা-কার্য্য উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করেন।

সন্ধ্যার সময় ভক্ত বন্ধু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত, অবসর প্রাপ্ত হেড মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় কীর্ত্তন, পাঠ ও প্রসঙ্গাদি করা হয়। শিখধর্ম্মের সুখমণি গ্রন্থ হইতে পাঠ অত্যন্ত সুখকর হয়েছিল। ভক্ত বন্ধুর সহিত হরিনাম কীর্ত্তনাদি করিয়া আমরা অপার আনন্দ লাভ করিলাম।

১৫ই জুলাই, রবিবার—সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। সকালে উৎকল নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা শ্রদ্ধেয় ভগবান বাবু সম্পন্ন করেন। নগেন্দ্রনাথ পাঠাদি করেন। আচার্য্যের উপদেশ হইতে 'ভিখারী ঈশ্বর' বিষয়টী পাঠ করা হয়। সুখমণি গ্রন্থ হইতেও কিছু পঠিত হয়। সন্ধ্যায় কীর্ত্তন হয়, তৎপর ভগবান্ বাবুই উপাসনা করেন ও নগেন্দ্রনাথ "আমি ভক্ত জনের প্রিয়" আচার্য্য-দেবের এই উপদেশটী পাঠ করেন।

১৬ই জুলাই, সকালের প্যাসেঞ্জারে শ্রদ্ধেয় সেবক অখিল চন্দ্র রায় ও প্রেমিক ভ্রাতা প্রেমেন্দ্র নাথ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় আবার নব উৎসাহের স্রোত প্রবাহিত হয়। প্রথমে প্রাতে সেবক অখিলচন্দ্র উদয় বাবুর সহিত উপাসনা করেন ও নগেন্দ্র নাথ সকাতরে প্রার্থনা করেন। পরে ব্রহ্মমন্দিরেই নারী-সমাজের উপাসনা শ্রদ্ধেয় অখিল চন্দ্র রায় সম্পন্ন করেন ও মহিলাগণ সকাতরে প্রার্থনা ও সঙ্গীত করেন। সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন হবার কথা ছিল, কিন্তু ভয়ানক বৃষ্টি হওয়াতে নগর প্রদক্ষিণ অসম্ভব হওয়ায়, ব্রহ্মমন্দিরেই শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা তাঁহার সহকারীদিগকে লইয়া "বুড়িলা প্রেম-সিন্ধু-নীরে" কীর্ত্তনটি খুব ভাবের সহিত গান করিয়া সকলকে প্রেমে উন্মত্ত করেন।

১৭ই জুলাই, মঙ্গলবার, প্রাতঃকালের উপাসনা ভ্রাতা প্রেমেন্দ্র নাথ সম্পন্ন করেন, অখিল বাবু পাঠাদি করেন। সায়ংকালে ভগবান্ বাবু ও অখিল বাবু প্রার্থনা করিলে কীর্ত্তন-দল সন্ধ্যার সময় নগর প্রদক্ষিণ করিতে বহির্গত হন। মাড়োয়ারী ভ্রাতাদিগের দোকানের সম্মুখ দিয়া গমন করিবার সময় প্রেমিক ডাঃ রুবেণের "নববিধানকী উৎসব দেখো" গাইতে গাইতে যাওয়া হয়। উক্ত গীতটী ছাপাইয়া সাধারণে বিতরিত হয়েছিল। পুলিশ ষ্টেশনের নিকট উপস্থিত হইয়া "করহে আনন্দে জয় গান" এই সঙ্গীতটী গীত হওয়ার পর, অখিল বাবু বাঙ্গলায় "ধর্ম্মের জন্য আত্মত্যাগ না করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না ও নববিধানে মার নব অবতরণ, তিনি এখন ঘরে ঘরে মা হয়ে বিরাজ কচ্চেন" এ বিষয়ে কিছু বলেন। তৎপরে প্রেমেন্দ্রনাথ "নববিধান কি ও তাহার দ্বারা জগতের কি উপকার হবে" উর্দ্দু ভাষায় অতি সুন্দররূপে সকলকে বুঝাইয়া দেন। শেষে প্রাচীন সাধক শ্রীযুক্ত ভগবান্ চন্দ্র দাস উৎকল ভাষায় সকল ভাইদিগকে নিজ নিজ হৃদয়ে হাত দিয়ে দেখিতে বলেন, যেখানে সেই এক ভগবান অধিষ্ঠিত আছেন। তৎপরে স্বর্গীয় ভক্ত পদ্মলোচন দাসের রচিত "আস আস হে নরনারী প্রেমময় হরিকু পূজা করি" কীর্ত্তনটী তাদের সহিত গীত হয়। অদ্য হাটবার থাকায় এইস্থানে সকল সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত লোক উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতাদি খুব আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন। তৎপরে কীর্ত্তনের দল অপর রাস্তা অতিক্রম করিতে করিতে ব্রহ্মমন্দিরে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় উপস্থিত হইবার পর সেবক অখিল চন্দ্র রায় একটী প্রার্থনা করিলে শেষ হয়। যখন ভদ্র-পল্লীর মধ্য দিয়া কীর্ত্তনের দল চলিতে থাকে, কুল-কামিনীরা শঙ্খ-ধ্বনি করিয়া আমাদিকে উৎসাহিত করিতে থাকেন। পরিশেষে ভিক্ষালব্ধ মার প্রসাদ দানে উপস্থিত সকল নরনারীর শ্রান্তি দূর করা হয়।

১৮ই জুলাই, বুধবার, সকালের উপাসনা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ করেন। ভ্রাতা প্রেমেন্দ্র অতি গভীর ভাবে মগ্ন হইয়া প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় বাৎসরিক সভা ভ্রাতা প্রেমেন্দ্রের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হয়। কর্ম্মচারি-নিয়োগ, উপাসক-মণ্ডলী-গঠন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা সহকারী সম্পাদক মনোনীত হন। তৎপর শান্তি-বাচনের প্রার্থনা প্রেমেন্দ্রনাথই করেন। অদ্য শ্রদ্ধেয় অখিল বাবু সকাল হইতে পেটের বেদনায় কাতর হইয়া পড়েন ও অদ্য রাত্রেই Puri Express এ উভয়ে কলিকাতা রওনা হন।

এই উৎসবে কলিকাতা, বারিপদা, বস্তা হইতে যাত্রিগণ আসিয়া যোগদান করিয়া আমাদিগকে উপকৃত করেন। হিন্দি ভজনে Dr. Reubenর উচ্ছ্বসিত ভক্তির ভাব আমাদিগকে প্রমত্ত করিয়া দেয়। দূরস্থিত বন্ধুগণ অর্থ-সাহায্য ও সহানুভূতি করিয়া আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। স্থানীয় ভদ্র লোকেরা আমাদিগকে অর্থ-সাহায্য ও সহানুভূতি করিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। স্থানীয় চর্ম্মকার বন্ধুরাও অর্থ-সাহায্য ও সকল প্রকারের সহানুভূতি করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। নারী উৎসবে উক্ত শ্রেণীর কয়েকটী নারী আসিয়া যোগদান করেন। পুরুষেরা বিধানের পতাকা ধারণ করিয়া নগর-কীর্ত্তনের অগ্রবর্ত্তী হইয়া আমাদিগকে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন।

লীলাময়ী জননীর অপার কৃপাগুণে আশ্চর্য্যরূপে উৎসব সম্পন্ন হইল। আমাদের আমিত্ব চূর্ণ করে তিনি দেখালেন, তিনিই আমাদের সর্ব্বস্ব। ভক্তিভরে তাঁর চরণে প্রণত হই।

সকল বন্ধুদিগকে নমস্কার করি। সকল কর্ম্মীদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি। সকলের কাছে কৃতজ্ঞ হই। বিধান-জননীর চরণে প্রাণমন দিয়া পড়ে থাকি। শান্তিঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•—

সংবাদ।

উৎসব—শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমের সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে, গত ১লা আগষ্ট, আশ্রম-প্রতিষ্ঠার দিন স্মরণে সমস্ত-দিন-ব্যাপী উৎসব হয়। প্রত্যূষে উষাকীর্ত্তন, পরে প্রাতঃকালীন উপাসনা, প্রীতিভোজন, পাঠ আলোচনা, সন্ধ্যায় উপাসনা ও সান্ধ্য ভোজন দ্বারা উৎসব সম্পন্ন হয়। প্রাতে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন ও সেবক ভাই প্রিয়নাথ পাঠাদি ও প্রার্থনা করেন। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ যেখানে মাতৃক্রোড়ে সমুদয় অমরবৃন্দ ও ব্রহ্মানন্দিদল লইয়া নিত্য বাস করিতেছেন, তাহাই যথার্থ শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রম। ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে, সর্ব্বজন সঙ্গে, সেই আশ্রম-তীর্থে বাস করাই ব্রহ্মানন্দাশ্রম-বাসের উদ্দেশ্য। অধ্যাত্ম যোগে সকলে মিলিয়া যেন তাহাই সাধন করিতে পারি, উপাসনা প্রার্থনায় ইহাই উপলব্ধ হয়। স্থানীয় হাইস্কুলের শিক্ষকগণ ও অন্য কতিপয় ব্যক্তি পাঠ ও আলোচনায় বিশেষভাবে যোগদান করেন। মণ্ডলীর বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী প্রায় সকলেই দুইবেলা উপাসনায় যোগ দিয়া ও প্রীতিভোজন করিয়া আশ্রমবাসী বাসিনীদিগকে উৎসব-সম্ভোগে ধন্য করিয়াছেন।

বিগত ২৩শে জুলাই হইতে ৩০শে জুলাই পর্য্যন্ত ময়ূরভঞ্জে বারিপদা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় বারিপদায় গমন করিয়াছিলেন। উৎসবের বিবরণ হস্তগত হইলে পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

আরোগ্য সংবাদ—আমাদের পরম প্রীতিভাজন ভ্রাতা ডঃ দেবেন্দ্র নাথ মল্লিক সম্প্রতি রংপুরে কঠিন পীড়াক্রান্ত হইয়া সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হন। এক্ষণে মাতৃ-কৃপায় তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা ভগবচ্চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।

সাম্বৎসরিক—হাবড়া নেপাল সাহার লেনে, ডাঃ শশিভূষণ দাস গুপ্তের পিতৃদেব পুর্ণিয়া-প্রবাসী প্রাচীন ব্রাহ্মবন্ধু উকিল স্বর্গীয় পার্ব্বতী চরণ দাস গুপ্তের স্বর্গগমন দিন স্মরণার্থ গত ৭ই জুন বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন এবং ভ্রাতা অখিলচন্দ্র ও ডাঃ শশিভূষণ বিশেষ প্রার্থনা করেন।

বিগত ৩০শে জুন, অমরাগড়ীতে স্বর্গীয়া গোলাপসুন্দরী দেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁর সমাধি মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। সেবক অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন ও স্বর্গগতা দেবীর বিশেষত্ব বিষয়ে কিছু নিবেদন করেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ প্রসন্ন কুমার রায় "মার প্রসন্নতা" বিষয়ে আচার্য্যের প্রার্থনাটী পাঠ করেন।

গত ১০ই জুলাই, স্বর্গীয় রাজমোহন বসুর চতুর্থ পুত্র নির্ম্মল চন্দ্রের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয় এবং ১১ই জুলাই ভাই প্রিয়নাথের একমাত্র পুত্র শ্রীপ্রমোদ নাথের স্বর্গগমন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও অপরাহ্নে শিশুসেবা হয়।

পরলোকগমন—গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত, সীতাকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী মুরাদপুর গ্রামে, স্বীয় বাস-ভবনে, নববিধানের একজন সরল গভীর বিশ্বাসী ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র নাথ সাতদিন সন্ন্যাসজনিত অর্দ্ধাঙ্গ রোগে শয্যাগত থাকিয়া, গত ৫ই আগষ্ট তারিখে, পুত্র, কন্যা, সহধর্ম্মিণী, গ্রামবাসী ও আত্মীয় স্বজন সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন। নববিধানের যে আলো লাভ করিয়া, তিনি সংসারে ঘোর বিপদ পরীক্ষার ভিতরে, রোগ শোক তাপের মধ্যে, দুঃখ দৈন্যের কঠোর নিপীড়নে, নানা প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষণে স্থির ধীর শান্তভাবে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, গ্রামবাসিগণ ও স্বজাতীয়গণ যাহাতে সেই আলো লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে কর্ম্ম করিতেন। শেষ নোয়াখালী জিলাস্কুল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বগ্রামে বাস করিতেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশীয় বস্ত্র প্রচলনের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, এজন্য ক্ষতিগ্রস্তও হইয়াছিলেন। ভগবান পরলোকগত আত্মাকে তাঁর শান্তি-ক্রোড়ে চিরবিশ্রাম দান করুন, এবং শোকার্ত্ত জনের প্রাণে স্বর্গের শান্তি সান্ত্বনা বিধান করুন।

গৃহদেবালয় প্রতিষ্ঠা—গত ১৩ই আগষ্ট, দেউলটী নিবাসী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সত্য চরণ সিংহের বাড়ীতে একটি গৃহ-দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রার্থনা করিয়া এই দেবালয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে, গৃহস্বামী নবসংহিতার প্রার্থনা-যোগে দেবালয়টী মাতৃ-চরণে উৎসর্গ করেন। তৎপর দেবালয়ে সপরিবারে প্রবেশ পূর্ব্বক উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং দেবালয়ে উপাসনা সম্বন্ধে নবসংহিতা হইতে পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন। ভ্রাতা সত্য চরণের জ্যেষ্ঠা কন্যা সঙ্গীত করেন। তিনি দেবালয়টী পত্র পুষ্পে বিশেষভাবে সুসজ্জিত করেন। এই উপলক্ষে গরিব দুঃখীদিগকে বিতরণের জন্য কিছু চাউল ও ১৲ টাকা উৎসর্গ করা হয়। নববিধান-বিশ্বাসী মাত্রেরই গৃহে এইরূপ গৃহদেবালয় যেন প্রতিষ্ঠিত হয়।

গৃহপ্রবেশ—গত ৬ই জুলাই, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশের নিউপার্কষ্ট্রীটস্থিত নবনির্ম্মিত গৃহে প্রবেশোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেবী উপাসনা করেন। ভগবান গৃহকে, গৃহবাসী সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির—গত ১লা, ৮ই, ১৫ই ও ২২শে জুলাই চারি রবিবার সায়ংকালে সেবক অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। ১লা "ধরায় স্বর্গস্থাপন," ৮ই "সমস্ত নরনারীর সহিত বিশুদ্ধ প্রেম" ১৫ই "ভ্রাতৃত্বে ও ভগ্নিত্বে স্বর্গীয় বন্ধন", ২২শে

জুলাই, "অহৈতুকী সেবা" তাঁর আত্ম-নিবেদনের বিষয় ছিল। ২৯শে জুলাই, ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—হাওড়া, ১২৯নং থুরুট রোডস্থিত শ্রীযুক্ত জগবন্ধু পালের মাতৃদেবী গত ২৬শে আষাঢ় পরলোক গমন করেন। গত ২৩শে শ্রাবণ তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়া নবসংহিতা-মতে সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার আশ্রমের ঋণ শোধে ২৲, নববিধান সমাজে ২৲, সাধারণ সমাজে ১৲, অনাথ-বন্ধু-সমিতি ১৲, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমিতি ।৹, আর্য্য সমাজের শুদ্ধি আন্দোলন ॥৹, কলিকাতা অনাথ আশ্রম ১৲, কুষ্ঠাশ্রম ১৲, খ্রীষ্টান প্রচারকদিগের জন্য ।৹, মুসলমান সমাজ ॥৹, রামকৃষ্ণ মিশন ॥৹, বৌদ্ধ-সমাজ ॥৹, দুর্ভিক্ষ-সাহায্য ১৲, খুচরা দান ১৩৲ টাকা, বস্ত্র ২ খানা, ভোজা ৫টা দান করা হইয়াছে।

গত ২রা আগষ্ট, দার্জ্জিলিং ব্রহ্মমন্দিরে, শ্রীযুক্ত নিমাই চরণ ঘোষের একমাত্র পুত্র স্বর্গীয় পূর্ণানন্দ ঘোষের পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার উপাসনা করেন। মহারাণী স্কুলের মেয়েরা সঙ্গীত করেন। নিমাই বাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, মুসলমান, পাহাড়ী, সকল সম্প্রদায়ের লোক অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে নববিধান প্রচার ভাণ্ডারে ১০৲ টাকা, দার্জ্জিলিং ব্রাহ্মসমাজে ১০৲, এবং দার্জ্জিলিং হিন্দু শ্মশান ঘাটে ১০৲, এই ৩০৲ টাকা দান করা হইয়াছে। অদ্য কলিকাতায় ১৭এ বিপ্রদাস ষ্ট্রীটেও উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে স্বর্গধামে রক্ষা করুন এবং তাঁদের শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বর্ষণ করুন।

জাতকর্ম্ম—গত ৩রা আগষ্ট, দার্জ্জিলিংএ, স্বর্গীয় পূর্ণানন্দ ঘোষের নবজাত কন্যার জাতকর্ম্ম উপলক্ষে শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার উপাসনা করেন। শিশুটী ২রা জুলাই জন্মগ্রহণ করে, ২৩শে জুলাই পিতৃহীন হয়। স্নেহময়ী জননী শিশুকে ও তাঁহার দুঃখিনী মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

স্মরণীয় দিন—গত ১৫ই আগষ্ট, নববিধানের প্রেরিত শ্রদ্ধাস্পদ ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণ দিন ও কোচবিহার ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপনের সাম্বৎসরিক দিন এই উভয় দিন স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই নন্দলালের স্বর্গারোহণ দিন ও মৌরভঞ্জের ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার উৎসব দিন স্মরণেও প্রার্থনাদি হয়।

পুস্তক পরিচয়।

সোলেমানের তত্ত্বজ্ঞান—শ্রীচুণীলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত। কলিকাতা খ্রীষ্টতত্ত্ব-প্রচার-সমিতি এস, পি, সি, কে, হইতে রেভাঃ ফাদার টি, ই, টি, শোর কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ॥৹ আট আনা।

সোলেমান ইহুদী জাতির একজন বিজ্ঞ সম্রাট্ ছিলেন। তিনি যে সমুদয় তত্ত্ব-কথা উপদেশ আকারে দিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁর তত্ত্বজ্ঞান নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী অনেকেও তাঁহারই নাম দিয়া যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহাও তাহাতে প্রক্ষিপ্ত। গ্রন্থকার ভূমিকায় ইহার আলোচনা করিয়াছেন। যাহা হউক, উপদেশ গুলি যে অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব-সমন্বিত, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মূল গ্রীক ভাষাতেই ইহা প্রথম লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদিত হয়। ভ্রাতা চুণীলাল গ্রীক-ভাষাভিজ্ঞ ধর্ম্মাচার্য্যদিগের সহায়তায়, ইংরাজী হইতে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় এই গ্রন্থখানি অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ প্রাঞ্জল ও সত্যই সুখপাঠ্য হইয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্ব-শিক্ষার্থী মাত্রেই ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন। এরূপ গ্রন্থের যতই প্রচার হয়, ততই সমন্বয়-ধর্ম্ম-বিধানের অঙ্গ পরিপুষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।

শান্তিপুর অনাথ আশ্রম।

শান্তিপুর ব্রাহ্ম-সমাজের সেবকগণ ১৩১৬ সালে এক অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে অনাথ বালক বালিকা প্রাপ্ত হইলে সাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। কেহ অনাথ বালক বালিকা পাঠাইলে তাঁহারা কৃতার্থ ও আনন্দিত হইবেন।

শ্রীযোগানন্দ প্রামাণিক।
সম্পাদক।

নিবেদন।

বহুদিনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ "ধর্ম্মতত্ত্ব" পাক্ষিক পত্রিকাখানি ব্রাহ্ম-সমাজের মুখপত্ররূপে সমাজের ও দেশের নানাভাবে সেবা করিয়া আসিতেছে। কিছুদিন হইতে অর্থাভাবাদি নানাবিধ কারণে ইহার পরিচালনা বিষয়ে নানা ত্রুটি হইয়াছে। আমরা সেজন্য অতীব দুঃখিত। আবার নূতন ব্যবস্থাধীনে আনিয়া, যাহাতে কাগজখানি পূর্ব্বমত সুপরিচালিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। এই নূতন ব্যবস্থায় আমরা গ্রাহক, অনুগ্রাহক, সহানুভূতকারী, সাহায্যকারী সকলকে স্মরণ করিতেছি এবং তাঁহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি ভিক্ষা করিতেছি। আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া, অর্থদানে, সাহায্যদানে, পরামর্শ-দানে, প্রবন্ধাদি ও কাগজের মূল্যাদি পাঠাইয়া সকলে আমাদের সহায় হউন। আমরাও তাঁহাদের সেবকরূপে কাগজখানির পরিচালনা বিষয়ে যথাসাধ্য কর্ত্তব্য সাধন করিয়া ধন্য হই। বিনীত

শ্রীঅক্ষয়কুমার লধ
কার্য্যাধ্যক্ষ।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ১৫ই ভাদ্র, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৩ ভাগ। ১৬শ সংখ্যা। | ১৬ই ভাদ্র, শনিবার, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক, ৯৯ ব্রাহ্মাব্দ। 1st September, 1928. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

অনন্ত-লীলাময়ী জননি, তুমি অযাচিত কৃপাগুণে আমাদের মধ্যে আবার ভাদ্রোৎসব-রূপ একটী নূতন আধ্যাত্মিক উৎসব বিধান করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিলে। উৎসব আর কি, মানব-জীবনে তোমার নব নব প্রকাশ, নব নব স্পর্শ। উৎসব আর কি, মানব-হৃদয়ে তোমার নূতন বিকাশ, নূতন খেলা, নূতন লীলা। উৎসব আর কি, তোমার অনন্ত ভাণ্ডার হইতে তোমার স্নেহের হস্তে উৎসব-ক্ষেত্রে সমাগত অগণ্য অসংখ্য তোমার প্রিয় সন্তানগণ মধ্যে প্রেম-পুণ্যের প্রসাদ-বিতরণ। উৎসব আর কি, তোমার স্বর্গের প্রসাদ খেয়ে নব জীবন, দেব জীবন, পুণ্যজীবন লাভ। উৎসব আর কি, তোমার সঙ্গে তোমার পুত্র কন্যাদের নূতন সম্মিলন, পুণ্য সম্মিলন, আর সেই সম্মিলনের ভিতর দিয়া তোমার বক্ষঃস্থিত সাধু মহাজন যোগী ঋষি ভক্তাত্মাদিগের সঙ্গে মধুর মিলন, আবার পাপী পুণ্যবান্ নির্ব্বিশেষে ইহলোকবাসী পরলোকবাসী, স্বদেশবাসী বিদেশবাসী, সকলের সঙ্গে এক অখণ্ড মিলন। উৎসব আর কি, তোমার মধ্যে সকলকে এবং সকলের মধ্যে তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে এবং সকলের সঙ্গে এক আধ্যাত্মিক মধুর যোগে স্থিতি, গতি এবং অনন্ত জীবনে ক্রমোন্নতির দিব্য উপলব্ধি। উৎসব আর কি, তোমার নব নব বাণী-মন্ত্রে মন্ত্রপূত হইয়া নব নব সাধন-ব্রত নীরবে তোমা হইতে গ্রহণ। উৎসব আর কি, তোমার মধ্যে এবং তোমার পুত্র কন্যাদিগের মধ্যে, অন্তর্জ্জগতে এবং বহির্জ্জগতে তোমার অনন্ত শোভা সৌন্দর্য্য মহিমা গৌরব দর্শন করিয়া, তোমার বিশ্বাসী ভক্তবৃন্দ সঙ্গে তোমার পরিত্রাণপ্রদ সুধা-মাখা নাম-কীর্ত্তনে গুণ-কীর্ত্তনে বিমোহিত হইয়া চির-জীবনের জন্য তোমার চরণে আত্ম-সমর্পণ!

এবার উৎসব-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তোমার দর্শন ও তোমার শ্রীহস্তের প্রসাদ-গ্রহণপথে কত বাধা বিঘ্ন মনে হইতেছিল, কিন্তু তুমি নিজ কৃপাগুণে সুকৌশলে আমাদের নূতন চক্ষু খুলিয়া দিলে, নূতন ভাব জাগাইয়া দিলে, সকল বাধা বিঘ্ন আমাদের পথ হইতে অপসারিত করিলে, তাই জমাট ভাবে এবার তোমার স্বর্গের উৎসব সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। এখন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা এই উৎসবে নব জীবনের যে আস্বাদন পাইলাম, যে নব আশা উৎসাহে পূর্ণ হইলাম, সেই জীবন ও আশা উৎসাহ লইয়া নিত্য নব নব ভাবে তোমার সঙ্গে আরও স্বর্গীয় মিলন সাধন করি, তোমারই নব নব ইঙ্গিতে তোমার চিহ্নিত সাধু আত্মা ভক্তাত্মাদের সঙ্গে মধুর নিত্য মিলনে মিলিত হই এবং ইহকালবাসী পরকালবাসী ছোট বড় তোমার সকল পুত্রকন্যাদিগের সঙ্গে নিত্য মধুর মিলন সাধন করিয়া, তোমার নববিধান আমাদের মধ্যে মহিমান্বিত

ও গৌরবান্বিত করি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—০—

ব্রহ্মোপাসনা।

উনষাট বৎসর পূর্ব্বে ৭ই ভাদ্র ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মোপাসনার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সেই বিশেষ স্মরণীয় দিন স্মরণার্থ আমাদের বার্ষিক ভাদ্রোৎসব। উপাসনা যদি মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত হয়, মানব-সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান হয়, তবে উপাসনা-প্রতিষ্ঠার দিন অবশ্যই বিশেষ স্মরণীয় দিন। বিশেষ ভাবে যে উপাসনা ইহকালবাসী পরকালবাসী সকলকে লইয়া, যে উপাসনা মানবাত্মাকে ঈশ্বরের সঙ্গে কত বিবিধ সম্পর্কে নিত্য নব নব ভাবে মিলিত করিবে, যে উপাসনার ভিতর দিয়া সমগ্র মানব-মণ্ডলী জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে এক স্বর্গীয় মধুর মিলনে মিলিত হইবে, যে উপাসনার ভিতর দিয়া ইহলোক পরলোক একলোকে পরিণত হইবে, যে উপাসনার ভিতর দিয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে উপাসনার প্রতিষ্ঠার দিন যদি স্মরণীয় না হইবে, তবে আর কোন দিন স্মরণীয় হইবে? কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, আমরা দেখিতেছি, এই পবিত্র উপাসনা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, অথবা মণ্ডলীগত জীবনে যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, তাহা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না, যেরূপ আদৃত হওয়া উচিত, সেরূপ আদৃতও হইতেছে না, এজন্য আমরা প্রত্যেকেই দায়ী। এ বিষয়ে কাহার দায়িত্ব অধিক, কাহার দায়িত্ব কম, কাহার ত্রুটী অধিক, কাহার ত্রুটী কম, সে দিকের বিচারে আমরা মন না দিয়া, আমরা এ সময়ে উপাসনার উদ্দেশ্য ও উপায় সম্পর্কে, উপাসনার গুরুত্ব ও গৌরব সম্পর্কে যথাসম্ভব আলোচনা করিয়া, উপাসনার প্রতি নিজের মনকে আকৃষ্ট করিতে যত্ন করিব, অন্যের মনকে উপাসনার প্রতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিব। পরম দেবতা এ বিষয়ে আমাদের সহায় হউন।

জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক ও মিলন সংস্থাপন উপাসনার সর্ব্বপ্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য। তৎপর এই উপাসনা-যোগে, সর্ব্ব-মূলাধার ঈশ্বরের যোগে অগণ্য অসংখ্য মানবাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপন দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। এবং এই দুই উদ্দেশ্য সংসাধনের ভিতর দিয়া যেমন পরলোকে, তেমনই ইহলোকে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর, উচ্চ হইতে উচ্চতর, প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর স্বর্গরাজ্য-স্থাপন, প্রেম-পরিবার-গঠন তৃতীয় উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য উপাসনা কত আকারেই প্রণালী-বদ্ধ হইয়া মনুষ্য-সমাজে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্ম্মের অতীত ইতিহাস পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়, মানুষ দেবানুগ্রহ প্রত্যাশা করিয়া আপন মনে কত ভাবে উপাসনা আরম্ভ করিয়াছে, প্রাচীন ভারতের আদিযুগের গৃহস্থের গৃহে অনুষ্ঠিত যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান তাহার প্রমাণ। অন্য সময়ে যাহারা সত্য ঈশ্বরের সত্য সংবাদ সহজে না পাইয়াছে, তাহারা কেহ কাল্পনিক মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া, কেহ বিশেষ বিশেষ সাধু মহাজনকে বা অন্য কিছুকে ঈশ্বরের অবতার রূপে গ্রহণ করিয়া, আপনাদের পূজা-প্রবৃত্তি ও ভক্তি বিশ্বাস চরিতার্থ করিয়াছে। মানব-কুলের এ সকল আচরণ দ্বারা প্রমাণিত হয়, মানুষ অভাবগ্রস্ত হইয়া ঈশ্বরকে চায়, সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরকে গ্রহণ করিতে না পারিলে ঈশ্বরের স্থলবর্ত্তিরূপে অন্য কিছু আশ্রয় করিতে চায়। অপরদিকে দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরও মানবকে আপনার করিয়া লইতে চান। মানুষ যেমন সাক্ষাৎ ভাবে বা পরোক্ষভাবে ঈশ্বরকে পাইবার জন্য লোলুপ, ঈশ্বরও তেমনই মানব-হৃদয়ে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া, রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মানব-জীবনকে আপনার লীলাস্থল করিবার জন্য ব্যস্ত। ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, অমূল্য স্বাধীনতা-ধনে ধনী করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। মানুষ ঈশ্বরের প্রদত্ত স্বাধীনতার উপর কখনও হস্তক্ষেপ করে না। মানবকুল আপনাদের মনুষ্যত্ব-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ভাবে, যে যেরূপে পারিল, কখন যাগ যজ্ঞের ভিতর দিয়া, কখন কাল্পনিক মূর্ত্তির অবলম্বনে, কখন কোন অবতারকে আশ্রয় করিয়া, পূজা বন্দনা দ্বারা অন্তরে পূজা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিল, এবং শ্রেষ্ঠ পূজা, সত্য-পূজা-বৃত্তির উন্মেষ সাধন করিতে লাগিল।

বিভিন্ন দেশ ও কালের প্রয়োজন বুঝিয়া, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বর আপনার বক্ষ হইতে কত সাধুভক্ত মহাজনদিগকে জীব-শিক্ষার জন্য পাঠাইলেন। তাঁহারা কত ভাবে মানবকুলকে পূজা বন্দনা শিক্ষা দিলেন। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"। তাঁহারা জীবনে আপনারা আচরণ করিয়া মানব-মণ্ডলীকে পূজা বন্দনা,

ব্রত নিয়ম শিক্ষা দিলেন। কিন্তু মানুষ অল্প দিন মধ্যেই ধর্ম্ম-সামগ্রী মধ্যে আপনাদের মানবীয় রুচি বুদ্ধির সিদ্ধান্ত মিশাইয়া মহাজন-প্রবর্ত্তিত স্বর্গের বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে পুনঃ পুনঃ ভেজাল করিয়া ফেলিল। সাধু-মহাজনরূপ গণ্ডীর ভিতরে, ধর্ম্ম-শাস্ত্ররূপ গণ্ডীর ভিতরে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আবদ্ধ হইয়া পড়িল। পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে তাই কত দলাদলি, কত মারামারি, কত যুদ্ধ বিগ্রহ। না পূর্ণ হইল ঈশ্বরের সাধ, না পূর্ণ হইল জীবের সাধ।

তাই এবার নবযুগে নব উপাসনা নবভাবে প্রতিষ্ঠা। এবার ঈশ্বর কোন মানুষের হাতে আর উপাসনা-শিক্ষার ভার দিলেন না। এবার স্বয়ং জীবন্ত ঈশ্বর জীবন্ত জাগ্রত দেবতারূপে মানব-কুলকে শিক্ষা দিবার ভার আপনি লইলেন। তাই যিনি এই ধর্ম্ম-বিধানে নব উপাসনা সাধনে নব উপাসকরূপে আমাদের অগ্রণী এবং অগ্রজ হইলেন, ঈশ্বর তাঁহাকে বলিলেন, তোমার গ্রন্থও নাই, গুরুও নাই, প্রার্থনা-যোগে আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকলই শিখাইব, জানাইব। জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত পরিচালনে, জীবন্ত গুরুর বিচিত্র শিক্ষায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে বর্ত্তমান যুগের নবীন উপাসনা প্রকাশিত হইল। এই উপাসনাযোগে পবিত্রাত্মার পরিচালনায় ঈশ্বরের কত বিচিত্র দর্শন তিনি জীবনে লাভ করিলেন। অতীতের সকল ধর্ম্ম-বিধান, সকল সাধু মহাজন তাঁহার জীবনে সমন্বিত হইয়া নব যুগের মহা সমন্বয়ের ধর্ম্ম-বিধানে পরিণত হইল। অনন্ত আয়োজনে অনন্তের মহাপূজা এই নবযুগে প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা এই পথের পথিক হইয়া, আমাদের সামান্য জীবনেও কি এই পবিত্র উপাসনা সম্ভোগ করিয়া অল্লাধিক কৃতার্থ হই নাই, এই জীবন্ত উপাসনায় জীবন্ত সাক্ষ্য কি আমরা পাই নাই? আমাদের জীবনে, আমাদের মণ্ডলীতে যদি উপাসনা আশানুরূপ প্রতিষ্ঠিত না হইয়া থাকে, উপাসনা যদি আশানুরূপ ফলপ্রদ না হইয়া থাকে, তবে তাহা এজন্য নয় যে, আমাদের মধ্যে ঈশ্বর নিদ্রিত, বা নিষ্ক্রিয়; কিন্তু এই জন্য যে, আমরা ঈশ্বরের হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে, ঈশ্বরের পরিচালনে পরিচালিত হইতে এবং ব্রহ্মানন্দের আদর্শে ধর্ম্ম-সাধনে তেমন এখনও অভ্যস্ত নই। পক্ষান্তরে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ভাব, রুচি ও সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত হইয়া, উপাসনাকে কখন নীরস শ্রীহীন করিয়া ফেলি, কখন নববিধানের মূলতত্ত্ব গুলির কদর্থ করিয়া মণ্ডলীর মধ্যে মনান্তর, ভাবান্তর ও বিবাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি করি এবং মহা অপরাধে অপরাধী হই। তাই এখন অন্তর বাহির হইতে ধ্বনি উঠিতেছে, ঈশ্বরে ভাল করিয়া আত্ম-সমর্পণ কর, ভাল করিয়া ঈশ্বরের পরিচালনে পরিচালিত হইতে শিক্ষা কর, আত্ম-সমর্পণের মন্ত্র ভাল করিয়া গ্রহণ কর।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

উৎসব কি?

ঊর্দ্ধে অগ্রসর হওয়া, নীচ হ'তে উপরে উঠা, পৃথিবী হইতে স্বর্গে আরোহণ করা, পৃথিবীর জীবনের মধ্যে ভগবজ্জীবনে জীবিত হওয়া, ইহাই উৎসবের প্রকৃত অর্থ। আমি পবিত্র হব, ভাল হব, প্রেমে বিশ্বাসে উন্নত হব, এই আশা ও বিশ্বাস লইয়া যাঁহারা উৎসবে ভগবানের প্রেমের স্রোতে আপনাকে ছেড়ে দেন, তাঁরা সত্যই উৎসবের যথার্থ ফল লাভ করিয়া ধন্য হন।

উৎসবে সঙ্কল্প।

প্রত্যেক অবস্থাতেই সঙ্কল্প চাই। বিশেষ বিশেষ অবস্থাতে দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রয়োজন। উৎসব একটা বিশেষ বিধান। জীবনের সকল সময়ে উৎসব-সম্ভোগ সম্ভব হয় না। বিধাতার অপার করুণায় যখন স্বর্গের উৎসব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, তখন পাপী তাপীর পক্ষে মহা সঙ্কল্প নিয়া উৎসবে প্রবেশ করিতে হয়। পাপ ছাড়ব, অপ্রেম আর থাকবে না, শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করে নেব, ভাই ভগ্নীর সঙ্গে স্বর্গীয় নিত্য প্রেমে আবদ্ধ হব, এইরূপ বলবতী ইচ্ছা ও ব্যাকুলতা নিয়া উৎসবে গেলে নিশ্চয়ই সঙ্কল্প পূর্ণ হয়।

উৎসবের প্রসাদ।

ইহা পৃথিবীর উৎসব নহে, স্বর্গের উৎসব, অনন্ত উৎসব, অনন্ত প্রেমময়ী জননীর বিরাট প্রেমের লীলাখেলা। তুমি আমি পাপী হই, নরাধম হই, সকলের জন্যই এই উৎসব। স্বর্গের দেবতা তাঁর অনন্ত ভাণ্ডার খুলে অকাতরে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করেন। কাঙ্গাল মাত্রই প্রসাদ পায়। কাঙ্গাল হয়ে যারা আসে, তাদের শূন্যপ্রাণ পূর্ণ হয়। কাঙ্গালেরাই মহাধনে ধনী হয়। ধন্য কাঙ্গালেরা! কাঙ্গাল হওয়া মহা সৌভাগ্য। কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গালদিগকে প্রচুর অন্নজলে তাদের ক্ষুৎ পিপাসা দূর করে দেন। আর ক্ষুৎ পিপাসা থাকে না, পরম নির্ব্বাণ, পরম শান্তি। এই উৎসবের মহাপ্রসাদ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

(২৯শে জুলাই, রবিবার, সন্ধ্যায় ভাই গোপালচন্দ্র গুহের নিবেদন)

ব্রাহ্মসমাজের আদিযুগে, মহাত্মা রামমোহনের সময়ে, ব্রাহ্মসমাজের লক্ষণ বলিতে গিয়া বলা হইয়াছে, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলে মিলিত হইয়া এখানে সকলের উপাস্য দেবতা একেশ্বরের উপাসনা করিবেন। আমাদের উপাস্য দেবতা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা। আমাদের উপাস্য দেবতার কৃপাতে তাই আমরা অতীতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-বিধানের স্বরূপ-লক্ষণ অবগত আছি। অতীতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আচরণের প্রতি মনোনিবেশ করিলে আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় আপনাদিগের ধর্ম্ম-বিধানের বিশেষ স্বরূপ-লক্ষণকে ব্যক্তিগত ও মণ্ডলীগত জীবনে বিশেষ ভাবে জাগ্রত করিয়া, তাহা ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, মণ্ডলীগত জীবনে ও দেশের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণগত চেষ্টা করিয়াছেন এবং বিবিধ উপায় অবলম্বনে সেই বিষয়ে কৃতকার্য্য যতই হইয়াছেন, ততই আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের নববিধান-ক্ষেত্রে বিপরীত ভাবই লক্ষিত হয়। অন্যান্য বিধানের যেরূপ বিশেষ স্বরূপ-লক্ষণ আছে, আমাদের নববিধানেরও বিশেষ স্বরূপ-লক্ষণ আছে। পরস্পরের সঙ্গে মিলনে আমাদের সাধন। এক ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন-সাধনের ভিতর দিয়া পরস্পরের সঙ্গে মিলনে মহা-সম্মিলন-সংস্থাপন আমাদের ধর্ম্মের স্বরূপ-লক্ষণ। কিন্তু আমাদের মণ্ডলীর এবং আমাদের পরস্পরের সাধনের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই ধারণা হয়, আমরা কোথায় উপাসনা, সাধন ভজন, পাঠ প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া দিন দিন মিলনের দিকে অগ্রসর হইব, না, আমরা ভাবতঃ কার্য্যতঃ ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর অমিলনের দিকে অগ্রসর হইতেছি। অন্যের সঙ্গে মিলনকে তুচ্ছ করিয়া, বরং অমিলন বৃদ্ধি করিয়া, আত্ম-ভাবের প্রাবল্য ও প্রতিষ্ঠাস্থাপন, এরূপ প্রতিষ্ঠায় তৃপ্তি ও আনন্দ, এরূপ প্রতিষ্ঠাই কৃতার্থতা, ইহাই হইয়াছে আমাদের মণ্ডলীর সাধনের স্বরূপ-লক্ষণ। মিলনের ভূমি নববিধান-ক্ষেত্রে এখন অমিলনের আতিশয্য এতই বাড়িয়া যাইতেছে যে, তাহা মনে হইলে দুঃখ ও বিষাদে মন ভাঙ্গিয়া যায়।

এ বিষয়ে আজ বিশেষ ভাবে আমার শ্রদ্ধেয় ভাই ভগ্নীগণের চরণে একটী কথা নিবেদন করিবার আছে। প্রাচীন হিন্দু-সমাজে ধর্ম্ম-সাধনের উপায় বিষয়ে উল্লেখ হইয়াছে, "আদৌ শ্রদ্ধা"—ধর্ম্মসাধনের প্রথম আয়োজন শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবিহীন পূজা বন্দনা—পূজা বন্দনাই নয়, শ্রদ্ধা-বিহীন ব্রত-নিয়ম-পালন—ব্রত-নিয়ম-পালনই নয়। শ্রদ্ধা-বর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে কোন ফলের সম্ভাবনা নাই। হিন্দুশাস্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে, "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ"। শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞান লাভ করেন। কোন্ জ্ঞান? যিনি শ্রদ্ধাবান্, তিনি ঈশ্বর-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন, আত্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন, তিনি ভাই ভগ্নীদিগের জীবন-সম্পর্কেও সত্যজ্ঞান-লাভের অধিকারী হন। ধর্ম্মরাজ্যে শ্রদ্ধার বড় মূল্য। কিন্তু নববিধানক্ষেত্রে আমাদের জীবন পরীক্ষা করিলে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের তো কত দিকে অভ কত ত্রুটী দুর্ব্বলতা আছেই ও কত অভাবগ্রস্ত আমরা, কিন্তু আমাদের জীবনে শ্রদ্ধার অভাব অত্যন্ত বেশী। এই শ্রদ্ধার অভাব দুই এক দিনে হয় নাই, দীর্ঘ কালের ফল। কেন আমরা এত শ্রদ্ধাবিহীন হইলাম? পরস্পরের অত্যধিক দোষ-দর্শন ও দোষের বিচার এরূপ শ্রদ্ধাবিহীন হইবার কারণ। আমার মত, আমাদের মত, নানা-ত্রুটী-দুর্ব্বলতাপূর্ণ যাহাদের জীবন, সেরূপ মণ্ডলী বা দলের মধ্যে শ্রদ্ধা রক্ষা করা তো সহজ কথা নয়। প্রাচীন সাধক-দলে প্রচলিত কথা আছে, গুরুর কাছেও সর্ব্বদা বাস করিতে নাই, সাধু সঙ্গে মাঝে মাঝে যাওয়া ভাল, কারণ সদা সর্ব্বদা গুরুর নিকট বা সাধুদের নিকট থাকিলে, তাঁহাদের আচরণেও সময় সময় অভাব ত্রুটী প্রকাশ পাইতে পারে এবং তাহার ফলে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির হ্রাস হইতে পারে। শ্রদ্ধা ভক্তির হ্রাস যেন কিছুতেই না হয়।

দলগত জীবনে বাস যখন নববিধানের বিশেষ ব্যবস্থা, তখন দলে বাস করিতেই হইবে। সে দলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ, কত বিভিন্ন অধিকারের, বিচিত্র ভাবের লোক থাকিবেই, কত দোষ-দুর্ব্বলতাপূর্ণ লোক থাকিবেই। এ অবস্থায় অন্যের দোষ পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা কি সম্ভব? এ তো কখন সম্ভব নয়। এই অসম্ভব সম্ভব করিতে হইবে নববিধানের নব সাধনে। সে সাধন-ধারা প্রদর্শন করিলেন ব্রহ্মানন্দ, যিনি নববিধানের নূতন সাধন জীবনে আচরণ দ্বারা প্রদর্শন ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখাইবার জন্য স্বর্গ হইতে নিয়োগ-প্রাপ্ত। ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র বলিলেন, "পরের বিচার করিতে আমি নই, পরের কাল দিক দেখিতে আমি নই"। অপরের জীবনে কাল দিক সত্ত্বেও, কাল দিককে উপেক্ষা করিয়া তাহার জীবনের দেব দিকে দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখা, এটী অবশ্যই বিশেষ যত্ন-সাধ্য সাধন-সাধ্য ব্যাপার। তিনি আপনার জীবনে দৃঢ়তার সহিত এ সাধনে কৃতকার্য্য হইলেন। বড় বড় সাধু ভক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় সকলের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করিলেন, সকলের দেব দিক গ্রহণ করিতে যাইয়া সকলের সঙ্গে এক অকাট্য আধ্যাত্মিক প্রেম-বন্ধনে তিনি মিলিত হইলেন। ছোট বড় সাধু অসাধু সকলের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট থাকাতেই তাঁহার জীবনে মহাসম্মিলন-সাধন সম্ভবপর হইল। তিনি এ পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। এ পথ আশ্রয় করিয়া দলগত জীবনে পরস্পরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা রক্ষা করিতেই হইবে। অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে এই শ্রদ্ধা রক্ষা এবং সাধন করিতে হইবে।

শ্রদ্ধা যখন জীবনে স্থায়ী হইবে, তখন শ্রদ্ধাই শ্রদ্ধার মূল্য বুঝাইয়া দিবে, শ্রদ্ধাই শ্রদ্ধার আদর জানাইয়া দিবে। শ্রদ্ধা ক্রমে শুদ্ধা ভক্তি ও উচ্চ অনুরাগে পরিণত হইয়া জীবনকে সরস করিবে, সুন্দর করিবে। শ্রদ্ধা দূরকে নিকট করিবে, পরকে আপনার

করিবে। তখন সকলের পক্ষে সম্মিলনে স্থিতি, উচ্চ সম্মিলন-সাধন কত স্বাভাবিক হইবে। নববিধানের জীবন্ত লীলাময় ঈশ্বর এ পথে আমাদের সহায় হউন।

ভক্তিতত্ত্ব।

(২৬শে আগষ্ট, সমস্তদিনব্যাপী উৎসবে, ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতঃকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবেদন)

বন্ধুগণ! যাঁহারা বেদী হইতে নিবেদন করেন এবং যাঁহারা তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা বলিবার ও শুনিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। কাজেই বহু কথা না বলাই ভাল এবং বহু লোকের ভিতর অন্যের কথিত নিবেদন গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তিও যখন দেখা যায় না, তখন বহু কথা বলিবার অপরাধ অর্জ্জন না করাই সঙ্গত। তবে আজকার দিনে ভক্ত-জীবনের দুএকটী কথা বা ভক্তিতত্ত্বের দুই একটী অমৃতময় বাণীর পরিচয় যদি লাভ করি, ইহাতে কাহারও আপত্তি না হইবারই কথা। কথা বলিবার ও শুনিবার মধ্যে যে অচ্ছেদ্য যোগের পথ পড়িয়া আছে, সেই পথে প্রবেশ না করিলে, কথা বলিবার যে অপরাধ, শুনিবার অপরাধ তাহা অপেক্ষা লঘু নহে। অতএব আমরা একান্ত হইয়া নিবিষ্ট-চিত্তে নিবেদন ও শ্রবণ সাধনে বিধাতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব জগন্নাথ-ধামে যখন ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত, ভক্তির প্রবল উচ্ছাসে যখন বঙ্গ উৎকল টলমল করিতেছে, গৃহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া যখন নব ভক্তির নব লীলা দর্শন করিবার জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন, তখন ভক্তের দাসানুদাস বসু রামানন্দ কুলীন গ্রাম থেকে ৩৫০ মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং ভক্তিতত্ত্বের গূঢ় রহস্য ভেদ করিবার জন্য প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু! ভক্ত কে? প্রভু বলিলেন, যিনি একবার মুখে হরিনাম উচ্চারণ করেন, তিনিই ভক্ত। রামানন্দ প্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত বেদবাণী শ্রবণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন, ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত দিবসে একবার করিয়া হরিনাম সাধন করিতে লাগিলেন। বৎসর কাটিয়া গেল, রামানন্দ আবার শ্রীক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, একবার হরিনাম সাধন ত অনেকেই করেন, তাঁহারা কি ভক্ত? শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা হরিনাম করেন, তিনিই ভক্ত। রামানন্দ প্রভুর বেদবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং একনিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম সাধন করিতে লাগিলেন। এক বৎসর অতীত হইল, বসু মহাশয়ের প্রাণ মহাপ্রভুর বিরহে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, দুর্গম দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া পুরীতে প্রবেশ করিলেন। অতি কাতরে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু! সর্ব্বদা হরিনাম করেন, এমন লোকও ত আছেন, তাঁহারা কি ভক্ত? তখন মহাপ্রভু বলিলেন, 'যাঁহাকে দেখিলে মুখে আসে হরিনাম, তাঁহাকে জানিহে তুমি ভক্তের প্রধান"। রামানন্দ গৃহে ফিরিলেন, তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার চেহারায় হরিনাম ফুটিয়া উঠিল। যে কেহ তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন, সেই হরি-ভক্ত হইলেন। সাধনায় সিদ্ধি হইল জীবনে। কেমন করিয়া মুখ দেখিলে হরিনাম করিবার ইচ্ছা হয়, সে তত্ত্ব তুমি আমি জানি না। যে মহাপ্রভু বসু রামানন্দকে এই মহাতত্ত্ব শিখাইলেন, তাঁহার জীবনেই এই মহাতত্ত্বের স্পষ্ট নিদর্শন, সাক্ষাৎ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

মহাপ্রভু মান্দ্রাজে প্রচার করিতে গেলেন, মান্দ্রাজের ভাষা জানিতেন না, কিন্তু ভাষা না জানিলে কি হয়? যে দেব ভাষা তাঁহার ললাটে শিশির-স্নিগ্ধ-কুসুম সৌরভের মত সৌগন্ধে দিক পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল, যে অশ্রুসিক্ত প্রেমের চিত্রখানি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যে স্বর্গের বিদ্যুৎলহরী দীপালোকের ন্যায় প্রতি রোম-কূপে খেলা করিতে লাগিল, তাহা দেখাইয়া তিনি জগৎকে মুগ্ধ করিলেন সে ভাষার তীক্ষ্ণ শরে মান্দ্রাজের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। সত্যবাই, লক্ষ্মীবাই দুই পতিতা নারী সেই প্রেমের মূর্ত্তিখানি দেখিয়াই পাপপথ পরিত্যাগ করিলেন, নব জীবন প্রাপ্ত হইলেন। বাঙ্গালার জগাই মাধাইএর মত মান্দ্রাজ এই দুই নারীর চরণে ফুল চন্দন দিয়া এখনও পূজা করেন। মান্দ্রাজের দুরন্ত দস্যু ভীল পন্থ এবং সৌরজী এই মূর্ত্তি দেখিয়াই সাধু হইলেন। যে ভাষা এক বিন্দু প্রেমের অশ্রুতে লুকান আছে, তাহা পৃথিবীর ধর্ম্ম-শাস্ত্র একত্র করিলেও পাওয়া যায় না। যে ভাষা ভক্তিময় অশ্রুসিক্ত মূর্ত্তিখানিতে অমিয় ধারার মত ঝরিয়া পড়ে, তাহা সহস্র সুবক্তার রসনায় প্রস্ফুটিত হয় না।

তবে যে লীলা বৈদিক যুগে ঋষিদিগের কণ্ঠে প্রণব-মন্ত্রের আকার গ্রহণ করিল, জ্ঞানের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ ভারতে প্রতিষ্ঠা করিল, সেই লীলাই চৈতন্য-যুগে ভক্তির নূতন ভাগবত সৃষ্টি করিল। আবার সেই লীলাই নব যুগে নূতন বিধানের সমন্বয়-ধর্ম্ম প্রকটিত করিল।

সবে মাত্র বাল্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি, ভক্ততত্ত্ব অথবা ভক্তিতত্ত্বের প্রথম অক্ষরও শিখি নাই; হঠাৎ শ্রীকেশব চন্দ্রের উপাসনা শুনিতে আসিলাম। সে যে কি শুনিলাম, কি বুঝিলাম, কি দেখিলাম, আজও তাহার রহস্য ভেদ করিতে পারিলাম না। তাই তাহার স্মৃতিটুকু পড়িয়া আছে। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এক একটী শব্দ যেন তীরের মত আমার প্রাণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল, চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুপাত হইতে লাগিল, যেন কোন স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম। উপাসনা ভাঙ্গিয়া গেল, কীর্ত্তনের মহারোল নিস্তব্ধ হইল, উপাসকেরা স্থান পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু আমার ঘুমের ঘোর আর ভাঙ্গিল না। গৃহে ফিরিলাম, দুই দিন দুই রাত্রি আহার নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্রা নাই, সেই স্বপ্ন-রাজ্যেই বিহার করিতেছি। সেই সব যেন আমার চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, সেই সঙ্গ যেন আমাকে ঘিরিয়া

রহিয়াছে, কেবল মাঝে মাঝে প্রাণের আবেগ উপস্থিত হইতেছে, প্রাণ উচ্ছ্বাসে ভরিয়া যাইতেছে, মাঝে মাঝে অশ্রুজল গঙ্গা যমুনার ধারার মত বক্ষকে প্লাবিত করিতেছে। তখনও মূর্ত্তি দেখিবার শক্তি হয় নাই। যে জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইলে মানুষ মানুষকে মুখ দেখিয়া চিনিতে পারে, সে জ্ঞান আমার ছিল না। তবে বাণীর স্পর্শ পাইয়া মানুষ রূপান্তরিত হয়, তাহার পরিচয় কিঞ্চিৎ পাইলাম।

দু'দিনের অনাহার অনিদ্রা, ভাবের আবেগ, প্রাণের উচ্ছ্বাস, অজস্র অশ্রুজল আমার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নির্দ্ধারণ করিল। পতঙ্গ যেমন আলোকে ঝাঁপাইয়া পড়ে, আমিও তেমনি ধনজন পরিত্যাগ করিয়া, মা বাপের বুকভরা স্নেহের ডোর ছিন্ন করিয়া আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। আমি প্রতাপ চন্দ্রের সহিত পরিচিত হইলাম। মুখে যে হরিনাম ফুটিয়া উঠে, তাহার আভাস পাইলাম। তাঁহার সুগম্ভীর শান্ত মুখশ্রীতে ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল, তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টির জ্যোতিতে স্বর্গের প্রতিভা ফুটিয়া উঠিল। যখন প্রাত-র্ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, মনে হইত, যেন অঙ্গের প্রত্যেক স্পন্দনের সঙ্গে ধর্ম্ম ঝরিয়া পড়িতেছে। মুখ দেখিলে যে ভক্তের হরিনাম করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা ঋষি-প্রবর প্রতাপচন্দ্রের জীবনে সার্থক হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের বেদবাণী নববিধানে পূর্ণ হইয়াছে। যে লীলা দর্শন করিয়া নারদ ভক্ত হইলেন, শুক বৈরাগী হইলেন, জনক অনাসক্ত রাজা হইলেন, ঋষিগণ বেদ উচ্চারণ করিলেন, বৈষ্ণবের রসনায় ভাগবত গীত হইল, শ্রীবুদ্ধের হৃদয়ে নির্ব্বাণ প্রতিষ্ঠিত হইল, শ্রীচৈতন্য-যুগে বঙ্গে ভক্তি-গঙ্গা প্রবাহিত হইল, সেই লীলাই নবযুগে নূতন যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের সমন্বয় স্থাপন করিল, কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহসাধকদের জন্ম দান করিল।

ভক্তির উন্মাদনা আছে, সুরার ন্যায় ভক্তির মাদকতা আছে, ভক্তিতে সমাধি আসে, বাহ্য জ্ঞান শূন্য হয়, ক্লোরফরমের নেশার মত শরীরের সাড় থাকে না, বেদনা-বোধ থাকে না। ভক্তির আবেশে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা বা সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া শ্রীচৈতন্যে শোভা পায়। ইহা তোমার আমার ধর্ম্ম নয়। আমরা সন্ন্যাসী নই, গৃহী। আমাদের জীবনে আসক্তি আছে, বেদনা-বোধ আছে, প্রবৃত্তির তাড়না আছে, রোগের যাতনা আছে, শোকের তীব্র দংশন আছে, ক্ষুধার বেগ আছে। এই সকল ক্ষুদ্রতার কূপের ভিতর বাস করিয়া ভক্তের আত্মদানের মহাধর্ম্ম কিরূপে লাভ করিব? তাহার উপর নববিধানের আদর্শ কেবল ভক্তি-যুগের আদর্শ নয়। এ যুগে সংসার-ধর্ম্মের সমন্বয়ের সাধনার ভিতর কিরূপে আত্মদান করিতে হইবে, তাহা আলোচনা করিবার বিষয়। তবে সাধনার মূল মন্ত্র ত্যাগ। সকল ধর্ম্মেই তাহা পালন করিতে হইবে। হে সাধকগণ, আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি ত্যাগ করিবে? অর্থত্যাগ, বিত্ত-ত্যাগ, গৃহ-ত্যাগ, স্ত্রীপুত্র-ত্যাগ? এই কি ত্যাগের আদর্শ? নববিধানের সাধক কি প্রাচীন ত্যাগের আদর্শকে সম্মুখে ধ্রুব-তারার মত পথ-প্রদর্শক করিয়া চলিবে? না। মনের টান কোন বিষয়ে থাকিলেই তার জন্য মানুষ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে। অনেক পাষণ্ড নরনারী নীচ স্বার্থের খাতিরে সন্তান সন্ততি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। সে ত্যাগ নববিধানের ত্যাগ নয়। সকলের চেয়ে বড় ত্যাগ, সকলের চেয়ে বড় আত্মদান মানুষের ইচ্ছা-ত্যাগ। স্ব-ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছাকে ভগবানের নামে বলিদান দেওয়াই জীবের শ্রেষ্ঠ বলিদান। কিন্তু মানুষ যতক্ষণ না বুঝতে পারে যে, তার নিজের ইচ্ছার চেয়ে আর এক ইচ্ছা, বলবতী ইচ্ছা, মহাশক্তিশালী ইচ্ছা আছে, যে ইচ্ছা তাকে ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, তুলিতেছে, চালাইতেছে, যে ইচ্ছার কাছে সে অকিঞ্চন ও অপদার্থ, যে ইচ্ছার নিকট সে ধূলি-সম অসহায়, দুর্ব্বল, নিরাশ্রয়: ও নিঃসম্বল, ততক্ষণ সে নিজের ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে পারে না। মানুষ আর কাহারও নিকট মাথা হেঁট করতে পারে না। এই ইচ্ছার কাছেই ঈশা যখন মাথা হেঁট করিলেন, তখন ক্রুশে প্রাণ দেওয়া সহজ হইল। এই ইচ্ছার ইঙ্গিত পেয়েই সক্রেটিশ স্বহস্তে বিষপান করিলেন। এই ইচ্ছার প্রেরণায় শিখগুরু তেগ বাহাদুর নিজের শিরটী ঘাতকের তরবারির নিকট বাড়াইয়া দিলেন। হে নববিধান-বিশ্বাসিগণ, এই মহতী ইচ্ছার ইঙ্গিত যদি পেয়ে থাক, তবে তোমরা গৃহী হয়েও সন্ন্যাসী, সংসারী হয়েও অনাসক্ত। কিন্তু এতে বিপদ আছে। নিজের ইচ্ছাকে ভগবানের ইচ্ছার নামে প্রতিপন্ন করিবার প্রলোভন আছে। এই জন্য সাধনার প্রয়োজন। কোনটী তোমার ইচ্ছা, কোনটী ভগবানের ইচ্ছা, তাহা বাছিয়া লইবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হয়।

নিত্য উপাসনা, ব্রহ্মচর্য্য, অবিশ্রান্ত প্রার্থনা, কঠোর আত্ম-সংযম প্রভৃতি সাধনায় প্রবৃত্ত হও। দেখিবে, সন্দেহ-ভঞ্জন হইবে। প্রভুর ইচ্ছা তোমার বক্ষে উজ্জ্বল আলোকের মত ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠবে। তখন তাঁর নামে সর্ব্বস্ব বলি দেওয়া, আহার পানের মত সহজ হবে। তাঁর ইচ্ছার ভিতর নিজ ইচ্ছাকে ডুবাইয়া না দিলে সংসারে ধর্ম্ম-সাধন অসম্ভব। যে সকল বিবাদ, বিসম্বাদ, মতভেদ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ আমাদের মধ্যে মাথা উঁচু করে, আমাদের বিনাশের পথকে প্রশস্ত করে দিতেছে, ভগবানের ইচ্ছা বুঝে চালতে শিখলে, সে সব আর আমাদিগকে পথভ্রান্ত করিতে পারিবে না; আমাদের মধ্যে সদ্ভাব ও শান্তি বিরাজ করিবে। শ্রীহরি আমাদের হৃদয়ে বল দিন, যেন তাঁর ইচ্ছাকে ধ্রুব-তারা করে চলিতে পারি।

ঊনষষ্টিতম ভাদ্রোৎসব।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী ঊনষষ্টিতম ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। উৎসবে বিধাতার প্রসাদ অজস্র বর্ষিত হইয়াছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

১৫ই আগষ্ট, ৩০শে শ্রাবণ, বুধবার, ভক্তিভাজন স্বর্গগত ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণের দিনে প্রাতে ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে

উপাসনা হয়। শ্রীমান্ প্রেমেন্দ্রনাথ রায় উপাসনার কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ শী সঙ্গীত করেন। উপাসনায় নববিধানের আলোকে, একেশ্বর-বাদের বিধান Islam ধর্ম্মের বিশেষত্ব উদ্ভাসিত হইয়াছিল। উপাসনা বেশ সরস হইয়াছিল।

আজ সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ভক্তিভাজন ভাইয়ের স্মৃতিসভা হয়। বক্তা মৌলবী আক্রাম খাঁ এই সভায় আহূত হইয়া উপস্থিত হন। একটী সঙ্গীত হইলে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করিয়া, গিরিশচন্দ্রের আত্ম-জীবনীর বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার জীবনের বিশেষ বিশেষ দিক প্রকাশ উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ অংশ পাঠ করেন। তৎপরে মহা সমন্বয়ের ধর্ম্ম নববিধান অতীত কালের বিভিন্ন বিধানগুলিকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়া কেমন পূর্ণতম, শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম-বিধানরূপে পরিণত হইয়াছে এবং এই প্রশস্ত-বক্ষ নববিধানে একেশ্বর-বাদের বিশেষ বিধান এসলাম ধর্ম্মের বিশেষ স্থানের কথা উল্লেখ করিতে যাইয়া তিনি বলেন, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যোগ ভক্তির দেশ। ভারতের উত্তর ভাগে হিমাচল যোগের গুরু হইয়া প্রাচীন ভারতের ঋষি আত্মাদিগকে যোগ শিক্ষা দিয়াছে। ভারতের দক্ষিণে বিশাল-বক্ষ সমুদ্র এবং সমুদ্র-জাত ভারতের বিশাল নদনদী যেমন বাহিরের প্রাকৃতিক ভারতকে শস্য-শ্যামলা করিয়াছে, সরস সুন্দর করিয়াছে, তেমন ভারতের আত্মাকে সরস সুন্দর করিয়া, ভারতের সাধক বক্ষে ভক্তির তরঙ্গ তুলিয়া কত মাতাইয়াছে, নাচাইয়াছে, কাঁদাইয়াছে। এই ভারতে কত ঋষি আত্মা, যোগী আত্মা, ভক্তাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া, ভারতকে কত আধ্যাত্মিক উচ্চ সম্পদ দান করিয়াছেন, সেই ভারতে, সেই ভারত-জাত বিভিন্ন ও বিচিত্র ধর্ম্ম-বিধান-ক্ষেত্রে এসলাম ধর্ম্মের সমাদর কেন? এসলাম ধর্ম্মের গ্রহণ কেন? এসলাম ধর্ম্মের প্রয়োজন কি? বিশ্ব-দেবতা, বিশ্বের ঈশ্বর যিনি, তিনি যথার্থ সংস্কারক। এদেশের বিশেষ কল্যাণের জন্য, এদেশের বিশেষ সংস্কারের জন্য এবং ধর্ম্ম-বিধানের পূর্ণতার জন্য এই ভারতে এসলাম ধর্ম্মকে অন্যান্য ধর্ম্ম-বিধানের সঙ্গে স্থায়িভাবে গ্রহণ প্রয়োজন হইয়াছে। এসলাম ধর্ম্ম একেশ্বর-বাদের ধর্ম্ম। ভারতে কি ঋষিগণ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মন্ত্র উচ্চারণ করেন নাই? কিন্তু ভারত বড় ভাবুকের দেশ, এখানে পুনঃ পুনঃ "একমেবাদ্বিতীয়ম্"কে অবহেলা করিয়া বহু-দেববাদ স্থান লাভ করিয়াছে। ইয়ুরোপও এ বিষয়ে দোষমুক্ত নহেন। তাই এই যোগ-ভক্তির স্থান ভারতে চির দিনের জন্য "একমেবাদ্বিতীয়ম্"এর বিশেষ বিধান এসলাম ধর্ম্ম এই নবযুগের নবধর্ম্ম নববিধানে সমগ্রভাবে গৃহীত হইয়াছে। সুধু "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মন্ত্র নয়, এই বিশেষ বিধানের মহাপুরুষ, এই বিশেষ বিধানের ব্রত নিয়ম বিধি ব্যবস্থা সকল গৃহীত না হইলে বিধানরূপে সামগ্রী গৃহীত হয় না। নববিধানে এই মহৎ কার্য্য সাধনের ভার বিধান-প্রবর্ত্তক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রচারক গিরিশচন্দ্রের উপর অর্পিত হইয়াছিল। তিনি অতি নিষ্ঠা ও নিপুণতা সহকারে, এই ঈশ্বরের আদিষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া, এদেশের অগণ্য অসংখ্য হিন্দু মুসলমান সকলের কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাই আজ তাঁহার জীবনের মহৎ কার্য্য আলোচনা করিয়া, তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া আমরা ধন্য হই। করুণাময় ঈশ্বর এ বিষয়ে আমাদের সহায় হউন।

তৎপর মৌলবী আক্রাম খাঁ সাহেব অতি সরল ও নিষ্ঠা-যুক্ত ভাবে তাঁহার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতা করেন। মৌলবী সাহেব প্রথমেই বলেন, কোরাণের সর্ব্ব প্রথমের কথা গুলি আপনাদের নববিধানের কথাই বলে। কোরাণে প্রেরিত পুরুষ মহম্মদের উক্তি এই, "তাঁহার পূর্ব্বে যত মহাপুরুষ জগতে আগমন করিয়াছিলেন, সকলকেই স্বীকার করিবে, সম্মান করিবে, সকলকেই গ্রহণ করিবে। যাঁহাদের নাম শাস্ত্র-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিবে, গ্রহণ করিবে, যাঁহাদিগের নাম কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই, তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিবে, গ্রহণ করিবে"। এযুগে এই একশত বৎসর মধ্যে যে সকল সাধু মহাত্মা ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও গ্রহণ করিতে হইবে। এযুগে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে ঈশ্বর-প্রেরিত জানিয়া গ্রহণ করিতে হবে, যেমন প্রেরিত পুরুষ মহম্মদকে গ্রহণ করিতে হইবে। সাধু মহাজনদিগের জীবন যোগে যে সকল ধর্ম্ম-সংবাদ জগতে সমাগত হয়, তাহা নির্ম্মল, স্বচ্ছ, তাহাতে কোন প্রকার অসত্য, আবর্জ্জনা থাকে না। সে সকল সত্যালোক যথাযথ গ্রহণে জীবন ধন্য হয়, বদ্ধ জীবন মুক্ত হয়, অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন স্বর্গের দিব্য জ্যোতি লাভ করিয়া নব মুক্ত জীবনে সঞ্জীবিত হয়। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই মানুষ আপনার ভাব, রুচি ও বুদ্ধির আবরণের আবেষ্টনে এই স্বর্গের সামগ্রীকে আবেষ্টিত করিয়া ফেলে। এবং সেই সীমাবদ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে নিজেরা পড়িয়া, ধর্ম্ম-ক্ষেত্রেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে পৃথিবীতে প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ক্ষুদ্র সীমায় গণ্ডিবদ্ধ হইয়া একে অন্যকে পর ভাবে, একে অন্যের সহিত ঝগড়া কলহে মাতিয়া যায়, এবং মানব-মণ্ডলীতে কত অকল্যাণের কার্য্য করে। মানুষ আর এই সাম্প্রদায়িক গণ্ডির বদ্ধাবস্থা হইতে সহজে মুক্ত হইতে পারে না। সে যদি ঈশ্বর-কৃপাতে কোন মুক্তালোকের সন্ধান পাইয়া, কি মুক্তালোক-সন্ধানে ব্রতী হইয়া, একেবারে বদ্ধাবস্থার গণ্ডি ছাড়াইয়া, আপনাকে গণ্ডীর বাহিরে লইয়া গিয়া, গণ্ডি-মুক্ত অবস্থায় দাঁড়াইতে পারে, তখন সে সকল প্রকার পূর্ব্ব সংস্কার ও ধারণা হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমাগত স্বর্গের মুক্তালোক লাভে সচেষ্ট হয়। সাম্প্রদায়িক গণ্ডি হইতে মুক্ত হইলে, আশ্চর্য্যরূপে সে জীবনে স্বর্গের আলোক ও শক্তি উদ্ভাসিত হয় এবং তখন বিদ্যা বুদ্ধির বলে নয়, কিন্তু সাধন-লব্ধ অন্তরালোকে অসম্ভব কার্য্য সকল করিয়া ধন্য হয়।

মৌলবী সাহেব আরও বলেন, প্রেরিত প্রচারক গিরিশচন্দ্র সেন আপনার জীবনে বিদ্যা বুদ্ধি সামান্যই ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রেরিত পুরুষ মহম্মদও কিছুই লেখা পড়া জানিতেন না,

অথচ মহম্মদের জীবনে কি বিপুল ধর্ম্মালোক ও ধর্ম্মজ্ঞান স্বর্গ হইতে সমাগত হওয়া সম্ভব হইল ; তাহারই ফলে এসলাম জগতে বিপুলধর্ম্ম-সাধনা ও শিক্ষা সভ্যতার এত আলোক বিস্তার। গিরিশচন্দ্র পৃথিবীর বিদ্যা বুদ্ধির হিসাবে গণ্য মান্য বড় লোক ছিলেন না, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ও কেশবচন্দ্রের আশীর্ব্বাদে সাধন-লব্ধ অন্তরালোক ও দেব প্রভাবের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার জীবনে এরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম সম্ভব হইল। এই বাঙ্গালা দেশে আড়াই কোটী মুসলমানের বাস। এই এত বড় মুসলমান সম্প্রদায় কখনও মনে করিতে পারে নাই যে, আরব্য ভাষার মত কঠিন ভাষায় লিপিবদ্ধ কোরাণ কখনও বাঙ্গালায় অনুবাদ সম্ভব হইতে পারে। এই গিরিশচন্দ্রের জীবনে সেই অসম্ভব কার্য্য সম্ভব হইল। আমি বাল্যকালে আমার পিতা ও অন্যান্য এরূপ অভিভাবক শ্রেণীর লোকের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের কোরাণ সরিফের তর্জ্জমার আলোচনা শুনিয়াছিলাম। আমিও এখন এই কোরাণ সরিফের বাঙ্গলা অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছি। গিরিশচন্দ্রের কোরাণের বঙ্গানুবাদ এখনও আমার টেবিলের উপর রাখিয়াছি। আমি সংস্কৃত ভাষা জানি না বলিলেই হয়। কিন্তু গীতার অনুবাদ করিতে আমি সঙ্কল্প করিয়া ঈশ্বরের কৃপা-জনিত অন্তরালোকে আমি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। গীতায় উল্লিখিত অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শন প্রভৃতি অংশ আরব্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া আমি ইজিপ্টে (Egipt) পাঠাইয়াছি। সেখানে এই অনুবাদের এত সমাদর হইয়াছে যে, তাঁহারা এই অনুবাদের কর্ম্ম-সম্পাদন জন্য কর্ম্মচারীর বেতন বাবদ মাসিক ২০০৲ টাকা সাহায্য-দানে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এবং তাঁহারা বলিয়াছেন, যে জাতি এবং যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হইতে এমন উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্বের সমাগম সম্ভব হইয়াছে, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কখনও কলহ হইতে পারে না।

মৌলবী সাহেব আরও বলেন, তিনি প্রেরিত পুরুষ মহম্মদকে অতি-মানুষ বলিতে প্রস্তুত নহেন, মহা মানুষ বলিতে প্রস্তুত। ইনি এবং ইঁহাদের শ্রেণীর যাঁহারা, তাঁহারাও আমাদের মত মানুষ, তবে তাঁহারা মহৎ ব্যক্তি, মহা পুরুষ। কিন্তু তাঁহারা অতি-মানুষ নহেন। তিনি বলেন, মুসলমান শ্রেণীর মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা প্রেরিত পুরুষ মহম্মদকে অতি-মানুষ বা অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু আমি তাহা করি না। তিনি বলেন, এ যুগের রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মহাজনগণ এবং পূর্ব্ব যুগের যেমন মহম্মদ—ইঁহারা ধর্ম্মক্ষেত্রের এক একটী স্বর্গীয় নক্সা অঙ্কিত করিয়া পরবর্ত্তীদের জন্য রাখিয়া যান। পরবর্ত্তিগণ তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন, এই তাঁহাদের আশা। তাই হে নববিধানের বন্ধুগণ, যেমন আপনাদের উপর, তেমনই আমাদের উপর গুরুতর দায়িত্ব। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র ইঁহারা শুধু আপনাদের নন, ইঁহারা আমাদের সকলের এবং জগতের। মহম্মদ আমাদের শুধু নন, আপনাদের এবং জগতের। অদ্য স্বর্গারোহণের দিনে যাঁহার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি, সেই সাধু আত্মা গিরিশচন্দ্রও আমাদের সকলের। পূর্ব্ব-কথিত মহাজনগণ এবং ইনি যে মহৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়া গেলেন, তাহার অবশিষ্ট ভাগ সম্পাদন করিতে আমরা দায়ী। তাই আমার এ পথে প্রচেষ্টা। আমরা যখন পরলোকে যাইব, তখন ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করিবেন, আমার আদিষ্ট কার্য্য ভালরূপে সম্পন্ন করিয়াছ তো? এই সকল সাধু মহাপুরুষগণও জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা যে কার্য্য আরম্ভ করিয়া আসিয়াছি, তাহা তোমরা কতদূর সুসম্পন্ন করিয়াছ? তখন আমরা কি উত্তর দিব? আমরা যদি এ পথে দৃঢ়-ব্রত না হইয়া অলস ও শিথিল ভাবাপন্ন হই, আমাদের দ্বারা এ পথে কিছুই হইতে পারে না। এ পথে কত কণ্টক, কত বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এ পথে কত ব্যাঘ্র, ভল্লুক, দস্যু, দানব উপস্থিত হইয়া আমাদের ধর্ম্ম-জীবনকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হয়। কত আকারে কত কিছু উপস্থিত হয়। আমার অবস্থা সচ্ছল নয়। তাই বলিয়া কি আমি, আমার অথবা আমার পরিবার পরিজনের গ্রাসাচ্ছাদনের বিষয় ভাবিয়া, এই ধর্ম্ম-পথে সেবা-কার্য্যে শিথিল হইব? আমি আমার পুত্রকে বলিয়াছি, তোমরা কাজ করিয়া খাও, আমি আমার সময় শক্তি সম্পূর্ণ এই ধর্ম্ম-কার্য্যে নিয়োগ করিব, আমার উপর আর তোমরা সাংসারিক বিষয়ে নির্ভর করিও না।

বন্ধুগণ, আমি সরল অন্তরে প্রকাশ করিতেছি, আপনাদের মণ্ডলী ও আমাদের মণ্ডলী, আমরা একই ভাবে ধর্ম্ম-বিষয়ে বড় পশ্চাৎপদ, বড় শিথিল। আমাদিগকে জাগিতেই হইবে, এ পথে অগ্রসর হইতেই হইবে, অন্যথা আমরা পরলোকে যাইয়া কি উত্তর দিব?

এইরূপে মৌলবি সাহেব উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সরল অন্তরে আমাদিগকে নব-জাগরণ-মূলক, সহানুভূতিপূর্ণ উপদেশ বাক্যে জাগ্রত করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন। তাঁহার সারগর্ভ সরল হৃদয়ের বাক্যাবলী উপস্থিত সকলের প্রাণকে বিশেষ স্পর্শ করিয়াছিল। বাবু অনুকূল চন্দ্র রায় উঠিয়া অল্প কয়েকটী কথায় মৌলবী সাহেবকে ধন্যবাদ দিলে সভার কার্য্য শেষ হয়।

১৬ই আগষ্ট, ৩১শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, যুবক-সঙ্ঘের দিন ছিল। কিন্তু এদিন যুবক-সঙ্ঘের কোন কার্য্য হয় নাই।

১৭ই আগষ্ট, ১লা ভাদ্র, শুক্রবার, স্বর্গগত রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রাতে ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র রায় উপাসনা করেন। শ্রীমদাচার্য্যদেবের উপদেশ হইতে সাধুদিগের গ্রহণ বিষয়ে উপদেশ পাঠ করেন।

সন্ধ্যায় প্রসঙ্গাদি হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। পরমহংসদেবের দলের ভাবাপন্ন কয়েকটী বন্ধুও উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন প্রথমে পরমহংসদেবের জীবন-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া অতি সংক্ষেপে দুইটী সারগর্ভ কথা বলেন। ১ম কথা, সব বিষয়ে ত্যাগ

স্বীকার করিয়া ঈশ্বরে পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ পরমহংসদেবের জীবনের বিশেষ শিক্ষা। এই শিক্ষাকে জাগ্রত রাখিবার উদ্দেশ্যে বেলুড় মঠে কয়েকটী ত্যাগী সন্ন্যাসী আশ্রম-অবলম্বনকারী ব্যক্তি বাস করেন; কিন্তু সকলেই সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম পালন করিবে, ইহা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। গৃহে থাকিয়া ধর্ম্ম-পালনও তাঁহার শিক্ষা। দ্বিতীয় কথা তিনি বলিয়াছেন, দুধে জল মিশাইলে অল্প সময় মধ্যে দুধ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু দুধ হইতে সার বস্তু মাখম তুলিয়া জলে ফেলিয়া রাখিলে মাখম নষ্ট হয় না। এই দুইটী বিশেষ কথা বলিয়া প্রথম বক্তা শেষ করেন। আর কেহ বলিতে অগ্রসর না হওয়ায়, নববিধান-বিশ্বাসী বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত মহাশয়কে কিছু বলিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি বলেন, ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের বাটীতে পরমহংসদেবকে আনিবার ভার অনেক সময় তাঁহার উপর পড়িত। একবার তিনি পরমহংসদেবকে আনিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে আসিবার জন্য অনুরোধ করা হইলে, তিনি যেন আকাশের দিকে অথবা শূন্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বল্, যাব কিনা? তিনি তাঁহার মায়ের নিকট শিশুর মত জিজ্ঞাসা করিলেন, বল্, যাব কিনা? তাহার পর রওনা হইলেন, আসিয়া কেশবের বাড়ী উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এ কোথায় আনিলি ইত্যাদি। তারপর জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া হইল, কেশবচন্দ্রের বাড়ী। তখন বলিলেন, ওরে কেশব কোথায় রে? এই বলিয়া তাঁহার সমাধি হইল ইত্যাদি। তারপর পরমহংসদেব কেশবচন্দ্রের বাড়ীতে আহার করিতে করিতে কেমন রগড় করিয়া বলিয়াছিলেন, "ওরে তোরা বলিস্‌নে বলিস্‌নে, আমি যে কেশব চন্দ্রের বাড়ী খাইলাম বলিস্‌নে। ওরা বলে, কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ী খাইও না, জাতি যাবে। ওরে তোরা বলিস্‌নে, আমি যে খাইলাম।" তৎপরেই বলিলেন, "ওরে শালারা, যা বল গিয়ে, আমি কেশবের বাড়ী খাইয়াছি, আমার জাত গিয়াছে"। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি হইতে পরমহংসদেবের আচরণ সম্পর্কে অনেকক্ষণ বলেন। পরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় কিছু কিছু বলিলে অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়।

১৮ই আগষ্ট, শনিবার, অপরাহ্ণে ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, নববিধান-প্রচার-কার্য্যালয়ে প্রীতি-সম্মিলন হয়। মণ্ডলীর পুরুষ মহিলা অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একটী সঙ্গীত হইলে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন, তৎপর প্রসঙ্গ হয়। শ্রীমতী অশোকলতা প্রভৃতি মহিলাগণ, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায়, ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ প্রভৃতি পুরুষগণ আলোচনায় যোগদান করেন। পরে সঙ্গীত হইলে সকলকে মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া জলযোগ করান হয়। অদ্যকার আলোচ্য বিষয়—নববিধান-মণ্ডলীর নব জাগরণ ও নব উত্থান জন্য এখন কি করা কর্ত্তব্য।

১। প্রত্যেক পরিবারে যাহাতে উপাসনার প্রতিষ্ঠা হয়, নববিধানের বিধি ব্যবস্থার, ব্রত নিয়মের অনুসরণ হয়, এজন্য প্রতি পরিবারের অভিভাবক অভিভাবিকা যাঁহারা, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা এ বিষয়ে দায়িত্ব অনুভব করিয়া, দায়িত্ব বহন করিয়া, পরিবারে নববিধানের প্রতিষ্ঠা করুন, ছেলে মেয়েদের চরিত্র ও ধর্ম্ম-জীবন-গঠনে নিজেরা মনোযোগী হউন, এ সময়ে এটী বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

২। নববিধানমণ্ডলীমধ্যে যাহারা স্বেচ্ছাচারের পথ ধরিয়া পাপ ব্যভিচারে লিপ্ত, তাহাদের সম্পর্কে কোন প্রকার শাসন—সে সকল জীবনের জন্য ও মণ্ডলীর কল্যাণের জন্য—প্রয়োজন, এ বিষয়েও কিছু কথাবার্ত্তা হয়। শাসন দ্বারা হউক, সৎ দৃষ্টান্ত ও প্রেম দ্বারা হউক—এ সকল জীবনের সংশোধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করা উচিত, প্রশ্রয়ের পথে সর্ব্বনাশ আনয়ন কর্ত্তব্য নহে, এরূপ ভাবে আলোচনা হয়। এ বিষয়ে বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত হয় না।

৩। ইহার পর প্রতি সপ্তাহে এইরূপ প্রীতি-সম্মিলনের ভিতর দিয়া পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, ভাবের আদান প্রদান ও প্রসঙ্গাদি হয়, এইটী কেহ কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করায় স্থির হইল, প্রতি শনিবার অপরাহ্ণ ৬টায় এই প্রচার-কার্য্যালয়ে এইরূপ প্রীতি-সম্মিলনের সাপ্তাহিক অধিবেশন হইবে।

১৯শে আগষ্ট, ৩রা ভাদ্র, রবিবার—সন্ধ্যা ৭টায়, ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। উৎসবের জন্য প্রস্তুতি বিষয়ে আত্ম-নিবেদন করেন।

২০শে আগষ্ট, ৪ঠা ভাদ্র, সোমবার—স্বর্গগত জেনারেল বুথের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে ৭টায় উপাসনা শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় নির্ব্বাহ করেন। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গাদি হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় কলিকাতা-প্রবাসী জেনারেল বুথের দল আগমন করেন। তাঁহারা তাঁহাদের ভাবে সঙ্গীত, প্রার্থনা, বক্তৃতা করেন। জেনারেল বুথ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর জীবন-কাহিনী বক্তৃতার বিষয় ছিল। ইংলণ্ডের পতিত ও নিম্নশ্রেণীর নানা প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকের উদ্ধার-ব্যাপারে জেনারেল বুথ সস্ত্রীক বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। ছেলে মেয়ে ও পরিবারের সকলকে লইয়া দলবদ্ধ হইয়া সেবা আরম্ভ হয়। ক্রমে ইহা বিশ্ব-সেবায় পরিণত হইয়াছে। তাঁহাদের জীবনের অনু-প্রাণন, দৃঢ়তা, আত্মত্যাগ, কর্ম্মোৎসাহ, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, বিশ্বাস ও নির্ভরের বিষয় সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া বিশদরূপে বলা হয়।

প্রথমে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হইলে, প্রসঙ্গ আরম্ভের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় নববিধান-মণ্ডলীর পক্ষ হইতে উপস্থিত মুক্তি-ফৌজের দলকে সাদরে গ্রহণ করা উপলক্ষে, নববিধানে ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে ঈশার স্থান উল্লেখ করিয়া এবং কেশবচন্দ্রের বর্ত্তমানে বোম্বে সহরে যখন জেনারেল টকার দলবলে তথাকার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিচারিত হইয়াছিলেন এবং কারাবাসে দণ্ডিত

হইয়াছিলেন, তখন সেই বিচার নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্র কলিকাতা টাউনহলে বিরাট সভা করিয়া যোধে গবর্ণমেণ্ট বিরুদ্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া ইংরেজী ভাষায় একটী লেখা পাঠ করেন।

২১শে আগষ্ট, ৫ই ভাদ্র, মঙ্গলবার—স্বর্গগত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের ও বলদেব নারায়ণের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টার উপাসনা ভাই গোপালচন্দ্র গুহ নির্ব্বাহ করেন। ভৃত্যের আত্ম-পরিচয় হইতে কতকাংশ পঠিত হয়। উভয়ের জীবন অবলম্বন করিয়া প্রার্থনা হয়। অদ্য এবং গত রবিবারের সন্ধ্যায় উপাসনার কার্য্য ভাই অক্ষয় কুমার লধ করার কথা ছিল, তিনি অসুস্থ থাকাতে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এ দুদিনের উপাসনা কার্য্য করেন।

২২শে আগষ্ট, ৬ই ভাদ্র, বুধবার—অপরাহ্ণ ৫॥টার ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল শত বর্ষের সাধনা বিষয়ে ইংরাজিতে বক্তৃতা দান করেন। তিনি রাজা রামমোহনের কার্য্যকে Philosophy and Theologyতে আবদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রামমোহন কোন Religion প্রদান করেন নাই। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সকল সম্প্রদায়কে অথবা প্রত্যেক বিভিন্ন সম্প্রদায়কে আপনাদের Peculiarity বা বিশেষত্ব মন্দিরের বাহিরে রাখিয়া এক সার্ব্বভৌমিক একতার ভূমিতে, যাহা সকলের পক্ষে সাধারণ, তাহা লইয়া একেশ্বরের পূজা করিতে আহ্বান করিলেন, তাহা Abstract ব্যাপার। Abstract সামগ্রী লইয়া কেহ তৃপ্ত হইতে পারে না। যাহার যাহা তাহা সমগ্র লইয়া ধর্ম্ম-জীবনের কার্য্য না করিলে তৃপ্তি হয় না। তৎপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উপরে নহে, Intuition এর উপরে ধর্ম্মের ভিত্তি করিয়া বেদান্ত বা উপনিষদের বাণীতে তিনি National Religion প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলেন। রামমোহনের সার্ব্বভৌমিকতা দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মে রহিল না, তাহা হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। তৎপর কেশবচন্দ্র আসিয়া বিবেকের উপর জীবনের ও মণ্ডলীর ধর্ম্মকে স্থাপন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন এবং তিনি দেবেন্দ্রনাথের হিন্দু-গণ্ডি হইতে মুক্ত হইয়া রামমোহনের সার্ব্বভৌমিক ভাব আশ্রয় করিলেন। তিনি প্রত্যেক ধর্ম্ম-বিধানের Religionকে সমগ্রভাবে সাধন ও গ্রহণ করিয়া সকলের সমন্বয়ে এক নবধর্ম্ম New Religion, New Dispensation প্রতিষ্ঠিত ও প্রচার করিলেন। বক্তৃতান্তে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন।

২৩শে আগষ্ট, ৭ই ভাদ্র, পূর্ব্বাহ্ণ ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৪॥০টার পর পাঠ ও আলোচনা হয়। রাত্রিতে শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনার কার্য্য করেন।

(ক্রমশঃ)

(প্রাপ্ত)

বারিপদা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।

তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব।

মা বিধান-জননীর কৃপায় বিগত ২৩শে জুলাই হইতে ৩০শে জুলাই পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত প্রকারে উৎসব হইয়াছে।

২৩শে জুলাই, স্থানীয় মন্দিরে আরতি, সংকীর্ত্তন ও আচার্য্যের আরতির প্রার্থনা পঠিত হয়।

২৪শে জুলাই, কলিকাতা হইতে সেবক অখিলচন্দ্র রায় এখানে আগমন করেন। ঐদিন স্বর্গীয় ভক্ত ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁর পৌত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথের ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সকাতরে প্রার্থনা করেন। উড়িষ্যায় যাহাতে নববিধান প্রচার হয় ও পরিবারে পরিবারে নববিধান প্রতিষ্ঠিত হয়, এইজন্য ভক্ত নন্দলাল এই উড়িষ্যায় প্রাণপাত করিয়াছেন, সেবক অখিলচন্দ্রের প্রার্থনায় এই ভাব প্রকাশ পায়। ঐ দিন অপরাহ্ণে আলোচনা ও সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন ও নববিধান-ধর্ম্মের সহজ তত্ত্ব বিষয়ে সেবক অখিলচন্দ্র রায় কিছু আত্ম-নিবেদন করেন।

২৫শে জুলাই, প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, অপরাহ্ণে "বিজয় পূর্ণচন্দ্রপুর" গ্রামে অনুন্নত শ্রেণীর বালকদিগের বিদ্যালয়ে ব্রহ্মোৎসব। প্রায় ৬০।৭০ জন বালক ও তাহাদের অভিভাবক ও প্রতিবাসীদের লইয়া সংগীত, আবৃত্তি ও সংকীর্ত্তন এবং প্রার্থনা ও সরল ভাষায় ধ্রুব প্রহ্লাদের উপাখ্যান ও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যখেলা বিষয়ে সেবক অখিলচন্দ্র রায় ও নগেন্দ্রবাবু কিছু কিছু বলেন। শ্রীযুক্ত হরিমোহন দাস প্রার্থনা করেন। আমাদের মণ্ডলীর মহিলা ও বালিকারা তথায় আমাদের সঙ্গে যাইয়া বালকদের এক এক ঠোঙ্গা জল খাবার দিয়া উৎসাহিত করেন।

২৬শে জুলাই, এই বারিপদা নববিধান ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা, সেবক অখিলচন্দ্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। এই মন্দির-প্রতিষ্ঠান ময়ূরভঞ্জবাসীদের প্রতি মা বিধান-জননীর বিশেষ কৃপার নিদর্শন, সেই বিষয়েই আত্ম-নিবেদন ও সকাতর প্রার্থনা হয়। অদ্য সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে নববিধানের "নব যোগতত্ত্ব" সম্বন্ধে সহজ ব্যাখ্যা হয়। সেবক অখিলচন্দ্র, সত্য যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত বিধাতার অপূর্ব্ব কৃপা এই বিধানের ভিতর কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে এবং নববিধানই যে মহাযোগ সমন্বয় দেখাচ্ছেন, তাহা সরল ভাষায় বলিয়াছিলেন। সঙ্গীত সংকীর্ত্তনও খুব সুন্দর হইয়াছিল। নববিধানের যোগতত্ত্ব ও সংকীর্ত্তনাদি শুনিবার জন্য অনেকগুলি ভদ্র মহিলা ও ভদ্র যুবক, বালক সমবেত হইয়াছিলেন।

২৭শে জুলাই, প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য সেবক অখিলচন্দ্র করেন। আচার্য্যের প্রার্থনা হইতে "রূপ দেখিয়া উন্মত্ত"

প্রার্থনাটী পাঠ এবং ঐভাবেই সকাতর প্রার্থনা হয়। অদ্যই নগর-সংকীর্ত্তনের দিন, লোকাভাবে নগর-সংকীর্ত্তন কিরূপে হইবে, এই চিন্তায় আমরা একটুকু বিচলিত হইতে ছিলাম। এমন সময় মার কৃপায় বালেশ্বর সিদ্ধিয়া হইতে কয়েকটী ভক্ত গায়ক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা, বালক মধু প্রভৃতি সহ আগমন করিলেন। সংকীর্ত্তনের আয়োজন হইল, সায়ংকালে নববিধান ব্রহ্মমন্দির হইতে নগর-কীর্ত্তনের দল বাহির হইল। প্রথমে সেবক অখিলচন্দ্র কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিলে, "হরি কাঙ্গালের ধন, বিপদ-ভয়-ভঞ্জন, ভক্ত-বৎসল দয়াময়" এই বাঙ্গালা কীর্ত্তনটী গাইতে গাইতে রাজপথ দিয়া ক্রমে ময়ূরভঞ্জ রাজবাটীতে গমন করা হয়। রাজবাটীর সদরে কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর, রাজবাটীর মহিলাদিগের বিশেষ আগ্রহে তৃতীয় মহলে দেব-মন্দিরের উঠানে কিছুক্ষণ জমাট কীর্ত্তনের পর, সেবক অখিলচন্দ্র রায় "আত্মার অমরত্ব, সকল নরনারীর পবিত্র প্রেমের মহামিলনে ধরায় স্বর্গ-ভোগ" বিষয়ে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন ও পরে কীর্ত্তন হয়। এই সংকীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া বর্ত্তমান মহারাজের পূজনীয়া কাকিমা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। এই সংকীর্ত্তন দলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভক্ত নন্দলালের কন্যা ভাগিনী রাজকুমারী ৩৪টী বালিকা সহ শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে গমন করায় কীর্ত্তনকারীদের উৎসাহ আরো অধিক হয়। রাজবাটী হইতে পুনরায় কীর্ত্তন করিতে করিতে সদর রাস্তা দিয়া প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কীর্ত্তনের দল শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তথায় একটী প্রার্থনা হইয়া কীর্ত্তন শেষ হয়। এই সংকীর্ত্তনে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। কীর্ত্তনান্তে প্রীতি-ভোজন হয়। এই সংকীর্ত্তনে অনুন্নত শ্রেণীর বালকগণ, স্কুলের ছাত্র ও ভদ্রযুবকগণ প্রায় ৫০ জন গায়ক উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। মা বিধান-জননীর কৃপায় অনেক দিন পরে স্বর্গীয় মহারাজার ও শ্রীযুক্তা মহারাণী সুচারু দেবীর প্রাণের সাধ মিটিল। রাজবাটীতে এরূপ সংকীর্ত্তন ও নববিধানের বিজয়-বার্ত্তা অনেক দিন পরে ঘোষিত হইল। ধন্য মা বিধান-জননী।

২৮শে জুলাই, প্রাতে উষাকীর্ত্তন। আজও প্রাতে খোল করতালযোগে মধুর হরিগুণ-কীর্ত্তন ও ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। সায়ংকালে ময়ূরভঞ্জ মহারাজার হাই স্কুলের দ্বিতল গৃহে বালিকাদিগের দ্বারায় নববিধানের গীতাভিনয় ও সংকীর্ত্তন হয় এবং সেবক অখিলচন্দ্র রায় "নববিধানের বিশেষত্ব মানব-প্রেম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই গীতাভিনয় ও বক্তৃতাটী শুনিবার জন্য প্রায় তিন শত পুরুষ মহিলা ও বালক বালিকা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

২৯শে জুলাই, রবিবার—প্রাতে উষাকীর্ত্তন ও "নববিধানের মহামেলায়" কীর্ত্তনটী রাজপথ দিয়া গান করিতে করিতে ব্রহ্মমন্দিরে যাওয়া হয়। অদ্যই দিনব্যাপী উৎসব। সেবক অখিলচন্দ্র রায় পুতগম্ভীর ও ভক্তিবিগলিত প্রাণে উপাসনার কার্য্য করেন। প্রথমে ২।৩টী সংগীতের পর উপাসনা আরম্ভ হয়। উদ্বোধন ও আরাধনা ও আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠ ও আত্মনিবেদন খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এই গম্ভীর ও ভক্তিভাবপূর্ণ আরাধনা ও প্রার্থনায় আমরা অনেকেই নিমগ্ন হইয়া স্বর্গীয় আনন্দ ও তৃপ্তি-লাভ করিয়াছি। সত্যই প্রাণে যখন ব্রহ্মস্পর্শ হয়, তখন যে পৃথিবীর কথা মনেই থাকে না, কাহারও কাহারও সেই অবস্থা হইয়াছিল। বেলা প্রায় ১১টার সময় উপাসনা শেষ হয়। অদ্য অপরাহ্নে সেবক অখিলচন্দ্র কলিকাতা যাত্রা করেন। স্বর্গীয় ভক্ত ফকিরদাস রায়ের সাম্বৎসরিক জন্য সেবক অখিলচন্দ্রকে বাধ্য হইয়া যাইতে হইল। অদ্য সায়ংকালে প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী জমাট সংকীর্ত্তন ও শ্রীমদাচার্য্য দেবের উপদেশ ও প্রার্থনা পাঠ করিয়া রাত্রি প্রায় ১১টার সময় কার্য্য শেষ হয়।

৩০শে জুলাই, সোমবার—সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে সংকীর্ত্তন ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা করিয়া শান্তিবাচন করা হয়।

৩১শে জুলাই, মঙ্গলবার—প্রাতে উৎসবের যাত্রিগণসহ আবার উষাকীর্ত্তন জমাটভাবে হইয়াছিল।

মা কৃপা করিয়া এবার উৎসবে আমাদের স্বর্গের প্রসাদ দান করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাঁর এই প্রসাদ-বলে আমরা নবজীবন প্রাপ্ত হই।

জনৈক উৎসবযাত্রী।

স্বর্গীয় রমণীকান্ত চন্দ।

আজ সে কত দিনের কথা। ব্রহ্মপরায়ণ সংসারে যোগি-জীবন রমণীকান্ত চন্দ পূর্ব্ববঙ্গকে নববিধানের আলোকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ২৬ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে শ্রীহট্টে জেল হাসপাতালের সরকারী ডাক্তার ছিলেন। সঙ্গত-সভা, সদলে সংকীর্ত্তন, রবিবাসরীয় সাপ্তাহিক উপাসনা ইত্যাদি সকলই তাঁহার বাড়ীতে হইত। তিনি ভগবানের কার্য্য করিতে করিতে হঠাৎ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট, শুক্রবার, স্বর্গে গেলেন। তিনি যখন ১৩।১৪ বৎসরের বালক, স্কুলের ছাত্রমাত্র, তখন কুচবিহার বিবাহ লইয়া দলাদলি হয়। ঢাকা সহরের বিস্তর লোক শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের বিপক্ষে নাম স্বাক্ষর করেন। কেবল শ্রদ্ধেয় ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়, শ্রদ্ধেয় গোপীকৃষ্ণ সেন প্রভৃতি অতি অল্পজন শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের দিকে নাম স্বাক্ষর করিলেন। রমণীকান্তকে নাম সহি করিতে বলিবামাত্র দ্বিধা না করিয়া শ্রীকেশবচন্দ্রের দলে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেন।

রমণীকান্ত প্রেরিত প্রচারকগণকে এত ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন যে, নিজে ত জীবনে তাঁদের বিরুদ্ধে কখনও কিছু বলেন নাই, অন্য কেহ বলিলে তাঁহার মুখে এমন একটী দুঃখ ও ঘৃণার ভাব প্রকাশ পাইত, যাহা না দেখিলে বুঝা যায় না।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবকে সাক্ষাৎ না দেখেও এত ভালবেসেছিলেন যে, অধ্যাত্ম-যোগে চিরদিন যুক্ত ছিলেন। একবার কলিকাতা এসে আচার্য্যদেবের পরিবারের সকলেরও খুব স্নেহ ভালবাসা পেয়েছিলেন। পৃথিবী থেকে যাবার মুহূর্ত্তে ডাক্তারেরা বলিলেন, এখন লোক চিনিতে পারছেন তো? শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের একখানি ছবি বিছানার সম্মুখস্থ দেওয়ালে টাঙ্গান ছিল। ছবি খানি কার, জিজ্ঞাসা করা মাত্র, রমণীকান্ত তৎক্ষণাৎ করজোড়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—শ্রীআচার্য্যদেবের।

এ জগতে রাগবিহীন ব্যক্তি দেখিতে পাই না। কিন্তু রমণীকান্তের চরিত্রে কখনও রাগের চিহ্নটী পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইতে দেখি নাই। এমন একটী মিষ্টতা ছিল যে, সকলেই ভালবাসিত। খৃষ্টান মিশনরি, আমেরিকার সাহেব, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতি সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোক তাঁহার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আনন্দে ধর্ম্মালাপ করিত।

আজ চত্বারিংশত্তম সাম্বৎসরিক দিনে সেই নববিধানের উৎসাহী বীর রমণীকান্তের আত্মার সহিত মিলিত হইয়া আমরা ব্রহ্মোপাসনা সংকীর্ত্তনাদি করিলাম। এই উপলক্ষে শ্রদ্ধার সহিত ১৫৲ দান করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ১০৲ এই মজঃফরপুরের দরিদ্র ফকির ইত্যাদিকে বাড়ীতে ডাকিয়া ছোলা, চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হইয়াছে। আর কলিকাতার ভাদ্রোৎসবে ২৲, প্রচার ভাণ্ডারে ২৲, শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারী বাবুর সেবার্থ ১৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

আমরা যেন চিরদিন এই যোগীর জীবন স্মরণে রাখি ও স্বর্গে মিলিত থাকি।

২৪-৮-২৮
মজঃফরপুর। } সেবিকা—হেমলক্ষ্মী।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ২৮শে আগষ্ট, মঙ্গলবার, সন্ধ্যার সময়, ২৮।১ চক্রবেড়ে লেনে, স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা হয়। ডাঃ সত্যানন্দ রায় মধুর উপাসনা করিয়া পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তি দিয়াছেন। স্বর্গীয় আত্মার বিশ্বাসী জীবনের বিশেষ গুণ বর্ণনা করিয়াছেন।

গত ১১ই আগষ্ট, হ্যারিসন রোডে, শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র ধ্রুবেন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী উপাসনা করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ—গত ১৯শে আগষ্ট, ২৮।১ চক্রবেড়ে লেনে, কুমার বিকাশেন্দ্র নারায়ণের শিশু কন্যার নামকরণ উপলক্ষে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন, এবং শিশুকে "সুচিত্রা" নাম প্রদান করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

শিলচর—শিলচর হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই বিহারীলাল সেন লিখিয়াছেন, গত ১৫ই আগষ্ট, স্বর্গগত ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের সাম্বৎসরিক দিনে, শ্রাবণের সংক্রান্তি দিনে পরমহংসদেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, ২১শে আগষ্ট স্বর্গগত ভাই কান্তিচন্দ্রের সাম্বৎসরিক দিনে, মেজর জ্যোতিলাল সেনের গৃহে উপাসনা, কীর্ত্তন, পাঠ, প্রসঙ্গাদি হইয়াছে। ৭ই ভাদ্র, শিলচর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে দুই বেলা মন্দিরে উপাসনা হইয়াছে।

বিলাত যাত্রা—ময়মনসিংহের ডাঃ বৈদ্যনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, বিদ্যাময়ী হাই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী সুপ্রভা রায় গত ১৮ই আগষ্ট, S. S. Merkara ষ্টীমারে ট্রেণিং সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ কলিকাতা হইতে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার এই কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং এ যাত্রাকে শুভ করুন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

ইংলণ্ড—কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী (সি, আই) এখন ইংলণ্ডে আছেন। সেখানে তিনি ২১নং ক্রমওয়েল রোডে, লণ্ডনপ্রবাসী অনেক বাঙ্গালী মহিলার অনুরোধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

রাঁচি হইতে শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার লিখিয়াছেন:—বিগত মে মাস হইতে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ হরিপ্রসাদ মজুমদার সস্ত্রীক লণ্ডন নগরে অবস্থান করিতেছেন। সেখানে তিনি অনেক বড় বড় আফিস ও Reformatory School পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি বিগত ১৮ই আগষ্ট তারিখে তত্রত্য Church Army কর্ত্তৃক চাপানার্থ আহূত হইয়াছিলেন। এই সুযোগে তিনি সেই ধর্ম্মমন্দির-সংক্রান্ত তিন শত সভ্যের নিকট পরিচিত হন। এখানে যে সমস্ত বিশিষ্ট মনীষিগণ এই মন্দির-সংক্রান্ত কার্য্য-নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অবসরপ্রাপ্ত জজ্ Justice Sir Holmwood I.C.S. একজন। তিনি শ্রীমান্ হরিপ্রসাদকে নববিধান সমাজের সভ্য এবং সমাজের নেতা স্বর্গগত কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁহার অনুগামী শিষ্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের আত্মীয় ও অনুগামী বলিয়া পরিচিত করাইয়া দেন। চা পানান্তে শ্রীমান্ হরিপ্রসাদ সমগ্র সভ্য কর্ত্তৃক নববিধান ও আচার্য্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরুদ্ধ হয়েন। শ্রীমান্ হরিপ্রসাদ ইহা বিধাতার ইচ্ছা বুঝিয়া সভ্যগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া এ সম্বন্ধে কিছু বলেন। তাঁহারা নববিধানের ও আচার্য্যদেবের জীবন-কাহিনীর একটা আভাস প্রাপ্ত হইয়া খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বক্তাকেও ধন্যবাদ দিলেন। নববিধান-কাহিনী শুনিতে তাঁহারা আরও ইচ্ছুক। শ্রীমান্কে তাঁহারা আর একদিন আহ্বান করিয়াছিলেন। পৃথিবী নববিধানতত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছুক, কিন্তু আমাদের লোক নাই। পরবর্ত্তী রবিবারে শ্রীমান্ হরিপ্রসাদ ও বধূমাতা লণ্ডনস্থ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই দিন আমাদের মাননীয়া ও শ্রদ্ধাস্পদা মহারাণী সুনীতি দেবী, সি, আই, মহোদয়া উপাসনা করেন। উপাসনায় অনেকগুলি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা উপস্থিত ছিলেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ২৭শে ভাদ্র, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্তাতে॥

৬৩ ভাগ। ১৭শ সংখ্যা। | ১লা আশ্বিন, সোমবার, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক, ৯৯ ব্রাহ্মাব্দ। 17th September, 1928. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা, আমাদিগকে পূর্ণ বিশ্বাসী কর। অর্দ্ধ বিশ্বাস, আংশিক বিশ্বাস, বিষয়-বুদ্ধি-মিশ্রিত বিশ্বাস আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিল। আমরা তোমার নববিধান মানিয়াও মানিতে পারিতেছি না, আমরা তোমাকে ও তোমার নব-বিধান-প্রবর্ত্তককে পূর্ণ বিশ্বাস দিতে পারিতেছি না। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচার-মিশ্রিত যে ধর্ম্ম শিখিয়াছি, তাহার প্রভাবাধীনতা হইতে কই আমরা মুক্ত হইতে পারিতেছি? পূর্ণ বিশ্বাস বিনা বিধানই যে মানা হয় না। বিধান মানে সম্পূর্ণ তোমার ধর্ম্ম, তাতে আমার বিচার বুদ্ধি চলে না। কিন্তু আমি আমার বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝি, ততটুকু গ্রহণ করিতে পারি, যাহা বুদ্ধি বিচারে পাই না, তাহা মানিতে, গ্রহণ করিতে ত পারি না। ইহাই ত আমাদের অবস্থা হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই জন্যই ত তোমার নববিধানের পূর্ণ সত্য, পূর্ণ মহত্ব, পূর্ণ উদারতা, অসাম্প্র-দায়িকতা আমরা ধারণাই করিতে পারিতেছি না। তাই অর্দ্ধ বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের অন্ধকূপে পড়িয়া আমরা হাবুডুবু খাইয়া মরিতেছি। দয়া করিয়া আমাদিগের এই দুরবস্থা দূর কর এবং পূর্ণ-বিশ্বাস-দানে তোমার নববিধানের উপযুক্ত কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

নববিধানে পূর্ণ বিশ্বাস।

সময় আসিয়াছে, আসিতেছে, যখন গোলমাল করিয়া দিন কাটাইলে আর চলিবে না। নববিধান-সম্বন্ধে অবিশ্বাস, অর্দ্ধ বিশ্বাস, বুদ্ধি-মিশ্রিত বিশ্বাস, সন্দেহ-যুক্ত বিশ্বাস এখন আর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। হয় পূর্ণ বিশ্বাস কর, না হয় পরিত্যাগ কর। ইহার মধ্যে সন্ধি হইতে পারে না।

নববিধান-বিশ্বাসী বিশ্বাসিনীদিগের নিকট নববিধান-বিধায়িনী জননী চান পূর্ণ বিশ্বাস। তিনি চান না যে আমরা কেবল নববিধান-মতবাদী হই। নববিধান-মতাবলম্বী বহু-সংখ্যক অপেক্ষা যদি একজন দেড় জনও নববিধানে পূর্ণ-বিশ্বাসী হয়, তাঁহাদের দ্বারাই নববিধান-রাজ্যের বিস্তার হইবে, নববিধানের কার্য্য সংসাধিত হইবে, সমগ্র বিশ্ব-জীবনে নববিধান-জীবন সঞ্চালিত ও সঞ্চারিত হইবে।

অগ্নিকণা ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গবৎ হইলেও তদ্দারা সমগ্র বিশ্বে মহা দাবানল প্রজ্বলিত হয়। এমনই নববিধানের নবজীবন একটি দুইটী জীবনেও যদি পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হয়, তাহাতে সমস্ত দেশ, সমস্ত জাতি, সমস্ত পৃথিবী নব-বিধানের নবজীবনে সঞ্জীবিত হইবে।

তাই নববিধানকে কেবল মতে, তর্কে, বিচারে, শাস্ত্রে, কিম্বা কোন ব্যক্তি বিশেষে নিবদ্ধ রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইলে আমাদিগের চলিবে না; আমাদের প্রত্যেককেই

বিশ্বাসে ও জীবনে নববিধানকে পূর্ণভাবে গ্রহণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।

নববিধান কেবল মতের ধর্ম্ম নহে, ইহা জীবনের বিধান। ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া মানিলেও, আমরা মতে তাহা মানিয়া তৃপ্ত হইতে পারি, কিন্তু ইহাকে বিধান বলিয়া স্বীকার করিলে, বিশ্বাস করিলে, আর কেবল মতে চলিতে পারি না; কেননা বিধাতার বিধান যাহা, তাহা জীবন্ত বিধাতার প্রত্যাদেশ ও পরিচালনায় নিত্য ক্রিয়াশীল। বিধান কোন ব্রাহ্মের বা মানবের হাতে নয়। ধর্ম্ম যতক্ষণ আমার হাতে থাকে, ততক্ষণ তাহা আমি মানিতেও পারি, নাও পারি, জীবনে পালন করিতেও পারি, নাও পারি, অথবা মতে মানিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে; কিন্তু যখনই বিধান স্বীকার করিলাম, অমনই আর তাহা আমার ইচ্ছাধীন রহিল না।

ব্যবস্থাপক-সভার পাণ্ডুলিপি যতক্ষণ পাণ্ডুলিপি থাকে, ততক্ষণ তাহাতে কলম চলে, কিন্তু যখনই তাহা বিধিতে পরিণত হইল, তখন আর তোমার আমার হাতে তাহা মানা না মানা রহিল না। তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন নববিধানে পরিণত হইয়াছে, যাই তাহা বিশ্বাস করি, অমনি ধর্ম্মের ভার আর আমার হাতে নাই, আমার হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে। আমি বিধাতার সম্পূর্ণ ইচ্ছার অধীনে পড়িয়া গিয়াছি, ধরা দিয়া ফেলিয়াছি। এইজন্যই আচার্য্য বলিলেন, "যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম মানিতাম, তখন অবস্থা এক, যখন বিধান মানিলাম, তখন অবস্থা আর এক। বিধান মানা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এখন আর আপন ইচ্ছায় কিছু করা চলে না।" অতএব নববিধানে বিশ্বাস অর্থ—আমি আমার ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ভগবানের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহারই প্রত্যাদেশে ও পরিচালনায় নিত্য নব নব জীবন যাপন। ইহা করিতে যিনি প্রস্তুত, তিনিই কেবল নববিশ্বাসী।

কিন্তু হায়, আমরা নববিধানবাদী বলিয়া পরিচয় দিয়া নববিধান-সম্বন্ধে বড় অপরাধ করিতেছি। ইহাকে অন্য ধর্ম্মের মত মনে করিয়া, ছাড় রক্ষা করিয়া, বাদ সাধ দিয়া, তর্ক যুক্তি করিয়া, সুবিধা-মত ইচ্ছা-মত আপন আপন রুচিমত এক এক নববিধান গঠন করিয়া, তাহাই নববিধান বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছি।

এই অবস্থা দেখিয়াই নববিধানাচার্য্য কতই আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "যাঁর মনে যে ছাপ আছে, তাই দিয়া নববিধান গড়িতেছেন এবং বলিতেছেন, এই আমার নববিধান। তাঁরা তাঁদের নববিধান বলুন, কিন্তু আমি তাহাতে সই দিব না।" বাস্তবিক তাঁহার সহিত আমাদেরও এখন বলিতে হইবে, আমরা নিজ নিজ মনঃকল্পিত ভাবে সুবিধা-মত নববিধান গড়িব না, কিন্তু নববিধান যাহা, তাহাতেই পূর্ণ বিশ্বাস স্বীকার করিব এবং পূর্ণ-বিশ্বাসিদলভুক্ত হইয়া নববিধান-মূর্ত্তিমান-জীবন হইব।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আত্মহত্যা।

আপনাকে আপনি হত্যা করা পাপ, কেননা এ দেহকে আমি জন্ম দিই নাই, ইহার উপর আমার অধিকারও নাই। তাই ইহাকে হত্যা করারও আমার অধিকার কি? যাহা আমার অনধিকার, তাহা করাই আমার পাপ।

আমিত্ব-বিনাশ।

আমিত্ব-বিনাশ উচ্চ ধর্ম্ম। কিন্তু ইহা আমার আকাঙ্ক্ষিত হইলেও আমি আমার আমিত্ব বিনাশ করিতে পারি না। যদি মনেও অহঙ্কার করি, আমি আমার আমিত্ব বিনাশ করিতে পারি, তাহাতেও আত্মহত্যার পাপ হয়। আমার আমিত্ব-বিনাশ, আমার "আমির" কর্ত্তা যিনি, তিনি বিনা কেহ করিতে পারে না, কাহারও হাতে সে অধিকার তিনি দেন নাই। আমি যথার্থ আমিত্ব-বিনাশের বা আত্ম-বলিদানের প্রার্থী হইলে, তিনি স্বয়ং তাহা সংসাধিত করিতে শক্তি দান করেন। তখনই আমি আমিত্ব-মুক্ত হই, নতুবা হইতে পারি না। যখন যাহার আমিত্ব তিনি বিনাশ করেন, তখন তার "আমি" তিনি হন। আমিত্বশূন্য জীবনকে সেই স্বয়ং "আমি আছি" যিনি, তিনি পূর্ণ করেন। এই জন্য শ্রীঈশা বলিলেন, "যে আমাকে দেখেছে, সেই আমার পিতাকে দেখিয়াছে। আমি আমার পিতা এক"। শ্রীব্রহ্মানন্দও বলিলেন, "ঈশ্বরকে দেখ নাই? আমাকে দেখিলেই হইবে, দুই বস্তু এক হইয়া গিয়াছে, 'আমি' আমার নাই।" ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলেন, "এমন একদল চাই, যাদের 'আমি' তুমি হবে।"

জন্ম জন্মান্তর।

হিন্দু বিশ্বাস করেন, এ দেহান্তে সকলকেই জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ সাধু ভক্ত যাঁহারা, তাঁহাদিগকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধানের আবিষ্কার কিন্তু অন্যরূপ। মনুষ্য মাত্রকেই বর্ত্তমান জীবনে এই জীবনের উদ্দেশ্য যাহা, তাহা সংসাধন করিতে হইবে। যদি কেহ তাহা না করে, তাহাকে অদেহী অবস্থায় সেই উদ্দেশ্য

সাধন করিতে হইবে, আর জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে না। তবে সিদ্ধ সাধু ভক্ত মহাপুরুষগণের আধ্যাত্মিক জীবন ও শক্তি তাঁহাদের অনুবর্ত্তী বিশ্বাসীদের জীবনে নব জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সম্ভবামি যুগে যুগে।" শ্রীঈশাও শিষ্যদিগকে বলিয়া গেলেন, "আমি আবার আসিব"। ইহা কিন্তু দৈহিক ভাবে নয়, অদৈহিক আত্মরূপেই মানবে সাধু ভক্তগণ যুগে যুগে যে জন্মলাভ করিয়া থাকেন, ইহা অভ্রান্ত সত্য।

জলো দুধ ও খাঁটী দুধ।

খাঁটী দুধ অমিশ্রিত দুধ। খাঁটী দুধের দাম অনেক। তাই সাধারণ লোকে অধিক দাম দিয়া খাঁটী দুধ গ্রহণ করিতে পারে না। খাঁটী দুধে জল মিশ্রিত করিলে দুধের রং যেমন তেমনি থাকে, তাই তাহা অনায়াসেই দুধ বলিয়া বিক্রয় হয়, অথবা তাহার জন্য অধিক দাম দিতে হয় না। আবার জল-মিশ্রিত পাতলা দুধ পানে যাহারা অভ্যস্ত হয়, তাহাদের খাঁটী দুধ সহ্য হয় না। ধর্ম্ম-বিধানেও এইরূপ উচ্চ খাঁটী ধর্ম্ম অনেক উচ্চ সাধনে লাভ হয় এবং তাহা সাধারণতঃ হজম করা কঠিন। তাই ভেজাল মেশাল পাতলা ধর্ম্ম ধর্ম্মের রঙ্গে এ সংসারে প্রচলিত হয়, এবং তাহাই সকলে গ্রহণ করিতে আগ্রহান্বিত হয়। আচার্য্য তাই বলিলেন, "সকলে জলো দুধ খাইয়াছে, এবার খাঁটী দুধ খাওয়াইবার ইচ্ছা"।

শরীর ব্রহ্মমন্দির।

(আচার্য্যের উপদেশের সার সঙ্কলন)

মন্দিরের ভিতর মন্দির। ব্রহ্মমন্দিরের ভিতর ভক্তদিগের দেহ-মন্দির। যেমন এই জড় মন্দিরের মধ্যে ঈশ্বর বাস করিতেছেন, দেহের মধ্যেও সেইরূপ ঈশ্বর বাস করিতেছেন।

এই দেহ-মন্দির সামান্য নহে। কেননা শরীরের মধ্যে কেবল জীবাত্মা বাস করে তাহা নহে, শরীর আবার ঈশ্বরের আবাস-স্থান। শরীরের মধ্যে ঈশ্বর থাকেন বলিয়া শরীর পবিত্র এবং অমূল্য বস্তু। একদিকে শরীর নানাপ্রকার ব্যাধির আলয়, অন্যদিকে ইহা আবার ব্রহ্মমন্দির। মনুষ্যের শরীর দেব-মন্দির। যাঁহারা শরীরকে অবহেলা করেন, তাঁহারা যথার্থ দেহতত্ত্ব জানেন না।

শরীরের প্রত্যেক রক্ত-বিন্দু "ঈশ্বর, ঈশ্বর" এই নাম উচ্চারণ করিতেছে, আর দৌড়িতেছে। মস্তকের একটি কেশকে শতখণ্ড কর, প্রত্যেক খণ্ড হরিনাম উচ্চারণ করিবে। সমস্ত শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে ঈশ্বরের শক্তিতে। শরীরের প্রত্যেক অংশে ঈশ্বরের বল কার্য্য করিতেছে। বাহুবলে, রক্তবলে সেই পরম প্রভু পরমেশ্বরের শক্তি কার্য্য করিতেছে। আমাদিগের শক্তি সামর্থ্যের মূলে সেই সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি সামর্থ্য কার্য্য করিতেছে। সমস্ত শরীরে ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মতেজ। আমাতে আর "আমি"কে দেখিতে পাই না।

সাধক হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ক্রিয়ার কর্ত্তা আমাকে দেখিতে পাইতাম। এখন দেহাধিকারীর পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। সেই "আমির" মৃত্যু হইয়াছে এবং বিশ্বপতি দেহপতি হইয়াছেন।

শরীর-মন্দিরের ভিতরে ঈশ্বর বিরাজমান রহিয়াছেন। ব্রহ্ম-সাধকের আর অন্য তীর্থে যাইবার প্রয়োজন হইল না। প্রত্যেক মনুষ্যের শরীর দেবালয়।

সকলের দেহ-মন্দিরে সেই দেহপতিকে দেখিব। শরীর স্পর্শ করিলে ঈশ্বরের মন্দির স্পর্শ করা হয়। তখনই সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারি। যতদিন "আমি" শরীরের কর্ত্তা ছিল, ততদিন শরীর ঘৃণিত ছিল। আমি আগে আমার সেবা করিতাম, এখন আমার কার্য্য রহিত হইয়াছে। এখন শরীর ব্রহ্মসেবা করিতেছে, ব্রহ্মের অভিপ্রায়-সাধনের জন্য শরীরের সমুদয় কার্য্য ব্রহ্ম-তেজ দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। এখন আমার শরীর বলিয়া আমি গর্ব্ব করিতে পারি না। যদি ব্রহ্মকে দেখিতে চাও, তবে ব্রাহ্মদিগের দেহ মধ্যে তাঁহাকে দেখ। প্রত্যেক দেহ ব্রহ্মতেজ, ব্রহ্মাগ্নিতে পরিপূর্ণ।

হে পাপী ভ্রাতঃ, তুমি পাপী থাকিতে পারিবে না, কেননা তোমার শরীরে ব্রহ্ম বাস করিতেছেন।

কাহার শরীর লইয়া তুমি পাপ করিতে যাইতেছ? পাপাচার করিয়া কাহার শরীর তুমি কলুষিত করিতে যাইতেছ? কাহার চক্ষু লইয়া তুমি কুদর্শন করিবে এবং কাহার কর্ণে তুমি কুকথা শ্রবণ করিবে? দাঁড়াও, তুমি কাহার সম্পত্তি লইয়া পাপ করিতে যাইতেছ? কাহার রসনা দ্বারা মিথ্যা অথবা কটু কথা বলিবে? যখনই তুমি তোমার শরীরে ব্রহ্মকে দেখিলে, তখনই তুমি বুঝিতে পারিলে, তোমার শরীর আর তোমার নাই।

ব্রহ্ম-শক্তিতে তোমার শরীর সঞ্জীবিত। যতদিন অহঙ্কার থাকে, ততদিন মনুষ্য বলে, তুমি, আমি। কিন্তু যখন বিশ্বাসের রাজ্যে প্রবেশ করে, তখন সে দেখিতে পায়, তাহার সমুদয় শরীর ব্রহ্মের। সে আর মন্দ কর্ম্ম করিতে পারে না।

যতদিন অহং শরীরের মালিক ছিল, ততদিন শরীর পাপ করিত; কিন্তু যখন ঈশ্বর শরীরের অধিকারী হইলেন, তখন আর শরীরের পাপ করিবার ক্ষমতা রহিল না। ব্রহ্মের আবির্ভাবে শরীর তেজোময় হয়, ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে রসনা পবিত্র হয়। সেই রসনা সত্য ভিন্ন আর মিথ্যা বলিতে পারে না।

দেহতত্ত্ব অতি চমৎকার শাস্ত্র। যাহারা ঈশ্বর-নির্ম্মিত শরীরকে অবহেলা করে, তাহারা অপরাধী। তুমি যখন আহার কর, আমি বলিব, তুমি ব্রহ্মতেজকে প্রবল রাখিবার জন্য ব্রহ্মের অভিপ্রায় সাধন করিতেছ। ব্রহ্মপূজা এবং ব্রহ্ম-সেবার জন্য এ সমুদায় শারীরিক ব্যায়াম আবশ্যক।

সাধু-শরীর স্পর্শ করিবার জন্য দূরে যাও কেন? ব্রহ্ম-সন্তান, সঙ্কেত বলি, শোন। ঘরে বসিয়া থাকিয়া হরিনাম করিতে করিতে আপনার শরীরকে সতেজ কর। জয় ব্রহ্মের জয়, জয় হরির জয়,

জন্য ব্রহ্মজ্যোতি-বিশিষ্ট শরীরের জন্য, বলিতে বলিতে তোমার সমস্ত রক্ত মাংস এবং অস্থি পবিত্র হইবে। ব্রহ্ম-অর্চনা করিতে করিতে ভিতরের ব্রহ্মাগ্নি বাহিরে আসিবে, বাহিরের ব্রহ্মাগ্নি ভিতরে প্রবেশ করিবে। এইরূপ সাধন করিতে করিতে সমস্ত পাপ-বন্ধন ছিন্ন হইবে এবং জীবাত্মা পরিত্রাণ লাভ করিবে।

—•—

ধর্ম্মপিতামহ মহাত্মা রামমোহন রায়।

আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর আমাদের ধর্ম্ম-পিতামহ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের দিন। স্বর্গারোহণের দিন উপলক্ষে পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করা ভারতবর্ষের আর্য্যজাতির বিশেষ জাতীয় ভাব। যাঁহারা উপযুক্তরূপে হৃদয় মনকে প্রস্তুত করিয়া, স্বর্গস্থ স্মরণীয় পূজনীয় আত্মগণের দেব গুণ বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া ও জীবনে গ্রহণ করিয়া, শ্রদ্ধা ভক্তির অঞ্জলি তাঁহাদের চরণে অর্পণ করিতে পারেন, তাঁহারাও ধন্য হন, না জানি স্বর্গস্থ স্মরণীয় আত্মগণও কত প্রীতি ও প্রসন্নতার সহিত আপনার এরূপ প্রিয়জনদিগকে আত্মিক আলিঙ্গনে, বিশেষ আপনার জন, আপনার বংশধর বলিয়া গ্রহণ করিয়া কতই আশীর্ব্বাদ করেন। আমরা প্রায়ই পার্থিব পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনবর্গের স্বর্গারোহণের দিন অথবা কোন সাধু ভক্তের স্বর্গারোহণের দিন সমাগত হইলে, সেই উপস্থিত দিনেই তাঁহাদের স্মরণ মননের কার্য্য আরম্ভ করিয়া সেই দিনেই প্রায় শেষ করিয়া ফেলি। কচিৎ এ প্রথার অন্যথা হয়, অর্থাৎ স্মরণ মননের সময় দীর্ঘ হয়। আমাদের ধর্ম্ম-পিতামহ রামমোহনের জীবন অসাধারণ জীবন। এ জীবনের মহত্ত্ব গৌরব একটু বেশী দিন অনুধ্যান না করিলে, এ জীবন লইয়া একটু বেশী সময় পাঠ প্রসঙ্গ না করিলে, এ বিচিত্র জীবনের সকল মহৎ দিক্ আমাদের মন প্রাণে স্মরণীয় করিয়া তোলা এবং স্মরণ মননের ভিতর দিয়া আমাদের জীবন-দর্পণে তাহা প্রতিফলিত করিয়া লওয়া সহজ নহে। পৃথিবীর পিতা মাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগকে দেহে বর্ত্তমানে দেখার সৌভাগ্য অনেকেরই হয়, তাই তাঁহাদের গুণ-গৌরব, মহিমা ও মহত্ত্ব সকলের হৃদয়ে প্রতিফলিত করিবার বিষয় সহজেই হয়; কিন্তু পৃথিবীর পিতামহকে দেহে বর্ত্তমান দেখিবার ও দেখিয়া তাঁহার গুণ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য অনেকেরই হয় না। আমাদের মণ্ডলীর যাঁহারা এখন দেহে বিদ্যমান, তাঁহাদের কাহারও মহাত্মা রামমোহনকে দেহে বর্ত্তমান দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে; কিন্তু মহাত্মা রামমোহন ধর্ম্ম-পিতামহরূপে আমাদের ধর্ম্ম-জীবনের মূলদেশ অধিকার করিয়া বর্ত্তমান। আমাদের কর্ম্ম-জীবনের উপরও তাঁহার প্রভাব কম নহে, তাই তাঁহার জীবনের স্মরণ মনন যেমন আমাদের প্রীতিকর, তেমন লাভজনক। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার মহজ্জীবনের স্মরণীয় অতি অল্প কয়েকটী বিষয়ই উল্লেখের স্থান হইবে। তাঁহার বিরাট জীবনের বিভিন্ন দিকের স্মরণ মনন ও গ্রহণ-প্রচেষ্টায়, আমাদের প্রবন্ধের লিখিত বিষয়গুলি মণ্ডলীর ভাই ভগ্নীদিগকে যদি কিঞ্চিৎ সহায়তা করে, তবেই আমরা কৃতার্থ হইব।

মহাপুরুষগণ জীবনে স্বর্গের যে বিশেষ অগ্নি লইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তাঁহাদের জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে থাকে, তখন কোন বিরুদ্ধ বায়ু, কোন বিরুদ্ধ শৈত্যবৃষ্টি সে অগ্নিকে নির্ব্বাপিত বা দমিত করিতে সক্ষম হয় না।

স্বাধীন ভাবে বুঝিয়া, স্বাধীন ভাবে সত্য-গ্রহণ ও স্বাধীন ভাবে সত্য-প্রচারের স্বর্গীয় অগ্নি রামমোহনের কৈশোর বয়সেই প্রধূমিত হইয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। এক অদ্বিতীয় নিরাকার সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনাই মানবকুলের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠানের বিষয়, ইহা রামমোহনের ১৬ বৎসর বয়সেই ধারণার বিষয় হইল। তিনি উৎসাহের সহিত তাঁহার সেই কৈশোর জীবনের নব উদ্যমের লেখনী পরিচালন করিয়া তাহা প্রচার আরম্ভ করিলেন। সে উৎসাহের অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য তাঁহার নিকট আত্মীয়গণ যেই একটু চেষ্টা করিলেন, সে অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইয়া প্রবল আকার ধারণ করিল। তিনি ধর্ম্মের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ জন্য দেশ-ভ্রমণে বাহির হইলেন। ক্রমে স্বদেশ ছাড়িয়া, দুর্লঙ্ঘ্য তুষার-মণ্ডিত হিমালয়-প্রদেশ পার হইয়া, তিনি সুদূর তিব্বতে গেলেন। তথায় লামাগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়া স্বাধীন ভাবে আপনার ধর্ম্ম-মত সমর্থন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবন বিপদগ্রস্ত হইল। কয়েকটী সহৃদয় মহিলার সহায়তায় তিনি প্রাণ-রক্ষা করিয়া দেশে ফিরিলেন। এই একেশ্বরবাদের সংবাদ বিভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে গ্রহণ ও সমর্থনের উপায়-স্বরূপ তিনি আরবী, পারস্য ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা, তৎপর ইংরাজী, হিব্রু প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিয়া এবং সেই সকল বিভিন্ন ভাষায় লিখিত অগাধ ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল গভীরভাবে পাঠ, আলোচনা ও আত্মস্থ করিয়া, কিরূপ জীবনব্যাপী উদ্যম ও উৎসাহের সহিত কত প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া, তাহা দেশে ও বিদেশে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অনেকেরই তাহা বিশেষ জানা আছে। তিনি বিবিধ ধর্ম্ম-শাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মধ্যে ধর্ম্মের মূল কথা দুইটী। প্রথম কথা—ঈশ্বরের উপাসনা, দ্বিতীয় কথা—মানবের প্রতি সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার। তিনি প্রত্যেক ধর্ম্ম-শাস্ত্র এবং সাধু মহাজনদিগের উক্তি ও আচরণ সকল পাঠ করিয়া দেখিলেন, প্রত্যেক ধর্ম্ম-বিধানের মূল লক্ষ্য প্রথম ঈশ্বরোপাসনা, দ্বিতীয় মানব-কুল মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার। অথচ প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ব্যবহারিক জীবনে তিনি দেখিতে পাই-লেন, ধর্ম্ম লইয়াই পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ, ধর্ম্ম লইয়া প্রবল যুদ্ধ বিগ্রহ, কত হিংসা, দ্বেষ, নরহত্যা, রক্তারক্তি, অসৌজন্য ও অসদ্ব্যবহারের চরম অভিনয়।

তিনি তাঁহার শিক্ষা ও কর্ম্ম-জীবনের সংস্পর্শে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্ট সম্প্রদায় এই তিনের সঙ্গেই বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই তিন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই নানা অবস্থার ভিতর দিয়া তিনি গূঢ় বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাই সাম্প্রদায়িক ভাবের পরিবর্ত্তে সহজে তাঁহার জীবনে অসাম্প্রদায়িক ভাবের, সার্ব্বভৌমিক ভাবের উদয় হইয়াছিল। তাই এক ঈশ্বরের উপাসনার ভিতর দিয়া পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মধ্যে মিলন-স্থাপন তাঁহার জীবনের বিশেষ ব্রত হইয়াছিল। সে সময় কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্ট সম্প্রদায়, সকলেই আপন আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও অন্য ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা প্রতিপন্ন করিয়া একে অন্যকে বলিতেছিলেন, "এস, তোমার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার ধর্ম্ম গ্রহণ কর"। সেই সময়ে মহাত্মা রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ রূপ নবযুগের নবধর্ম্ম নববিধানের লীলাক্ষেত্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়া বলিলেন, "জাতি, বর্ণ, ধর্ম্মসম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলে এখানে এস, আসিয়া তোমাদের সকলের উপাস্য দেবতা এক বিশ্বেশ্বরের পূজায় মিলিত হও; এই পূজার ভিতর দিয়া সকলের সঙ্গে স্বর্গীয় মিলন, সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার স্থাপন কর। এই পূজা-মন্দিরের সকল কার্য্য মিলনকেই বৃদ্ধি ও পরিপুষ্ট করিবে, কোন প্রকার অমিলনের কারণ হইবেনা।" পৃথিবীতে ইহা কি নূতন ব্যাপার নয়? ইহা কি নবযুগের নবধর্ম্মের অভ্যুদয় নয়?

মহাত্মা রামমোহনের জীবনের অন্য কার্য্য দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-কল্পে সেবা করা। ধর্ম্ম-সংস্কারে, সামাজিক সংস্কারে, রাজনৈতিকক্ষেত্রে, সুশিক্ষা-প্রবর্ত্তনে, তৎকালের সর্ব্বপ্রকার দেশ-হিতকর কর্ম্মেই রামমোহনের ঐকান্তিক যত্ন, সেবা ও উদ্যম ছিল।

ভারতের ও বঙ্গের পরাধীনতার নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত মৃত জাতিকে চিন্তার স্বাধীনতা, কর্ম্মের স্বাধীনতা, ধর্ম্মের স্বাধীনতা-মন্ত্রে মন্ত্রপূত করিয়া নবযুগের এই বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিবার উচ্চ-নিনাদ-পূর্ণ প্রবল ভেরী রামমোহন রায়ের জীবন।

ধন্য রামমোহন! তুমি নবযুগের সুপ্রভাতের দিব্য নবজীবনপ্রদ, আশা ও উৎসাহপ্রদ কিরণমালা-বিকিরণকারী কি অমিত-তেজঃ-পূর্ণ প্রবল পরাক্রান্ত ভাস্কর।

—•—

প্রেরিত ভাই কেদারনাথ দে।

কর্ম্মক্ষেত্র।

ব্রহ্মগীতোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, মনোগমন অথবা বন-গমন সাধকগণকে একবার করিয়া লইতে হয়। নতুবা ধর্ম্ম-সাধনে যথার্থ সিদ্ধি-লাভ হয় না। প্রথমে বাহির হইতে ভিতরে, তৎপর ভিতর হইতে বাহিরে গেলে, তখন সাধক সংসার, পরিবার ও বাহিরের সকলই ব্রহ্মময় দেখেন। সংসার-পালন বা পরিবারে ধর্ম্ম-সাধন তাঁহার নিকট তখন আর কঠিন থাকে না। তিনি নিজে ব্রহ্মগত-জীবন হইয়া যান। ঋষি কেদারনাথ এই সাধনার পর, ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া পুনরায় লাহোরে গিয়া Govt.-এর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সেখানে সপরিবারে তিনি ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত রাম চন্দ্র সিংহের সহিত এক বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ মহাশয় পরে প্রচারকব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও সপরিবারেই লাহোরে থাকিতেন। সেই সময় এই দুই পরিবার বিশেষ সুখ-সম্মিলনে বসতি করিয়াছিলেন। উভয়েরই শ্বশ্রূমাতা সঙ্গে আসিয়া ছিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে তথাকার পাঞ্জাবীগণ কেদারনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর মধ্যেই কেদারনাথ সেখানে এতাদৃশ গৌরবান্বিত ও পরিচিত হইলেন যে, সমুদয় পাঞ্জাব অঞ্চলে ঋষি কেদার নামে বিখ্যাত হইতে লাগিলেন। আজিও ঋষি কেদার বলিলে সেখানকার লোকে কেদার নাথকে চিনিতে পারে। পাঞ্জাবী স্বর্গীয় লালা কাশীরামের সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। এই লালা কাশীরাম সেই সময় হইতে যে ধর্ম্ম-বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি চিরদিন স্মরণে রাখিয়া, লাহোর ব্রহ্মমন্দিরে ও সিমলা পর্ব্বতে ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্য করিয়াছেন। সংসার-ধর্ম্মে নববিধান-সাধনে লালা কাশীরাম পাঞ্জাবীদিগের মধ্যে অগ্রণী। শ্রীমদাচার্য্যদেব যখন মাঘোৎসব করিতেন, সেই সময় লালা কাশীরাম সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং কেদার নাথের গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। লালা কাশীরামের উপাসনা সিমলা ব্রহ্মমন্দিরে শুনিয়াছিলাম, কি মিষ্ট তার হিন্দি উপাসনা। সেই সময় তিনি সিমলা ব্রহ্মমন্দিরস্থিত একটী ছোট দ্বিতল বাটীতে পুত্রকন্যাগণ সহ বাস করিতেন। দেখিয়া পূর্ব্বকালের আশ্রমবাসী মুনি বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাঁহার সতী সহধর্ম্মিণী শিশুদিগকে রাখিয়া অগ্রে স্বর্গে গিয়াছেন। আর একবার তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার সময় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে আমরা লাহোরে যাই। কেদারনাথের পুত্র কন্যা আসিয়াছে শুনিয়া, লালা নিজে আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। যখন দ্বিতলে উঠিলেন, তাঁহার হাঁপ হইতেছিল; কিন্তু আমাদের দেখিয়া বড় সুখী হইলেন এবং পিতৃদেবের কথা বলিতে বলিতে যেন তন্ময় হইয়া গেলেন। কি ভ্রাতৃভাব, কি ধর্ম্ম-সম্মিলন! দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। লালা কাশীরামও এখন পরলোকে, সেখানে ব্রহ্মানন্দ-দলে তাঁরা আজ কত আনন্দে আছেন। ধর্ম্ম-যোগ অনন্তকালের, কখনও তাহা ছিন্ন হয় না। লালা কাশীরামের ভিতর একটী আশ্চর্য্য গুণ দেখিয়াছি, তিনি বাঙ্গালী বা অন্য জাতি বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য করিতেন না; কিন্তু নববিধানের লোক পাইলেই তাহাকে আপন করিয়া লইতে চাহিতেন। নববিধানের উদার ভাব তাঁহাতে ছিল।

এই সময় হইতে কেদারনাথ ধর্ম্ম-সমাজের সঙ্গে পূর্ণ মাত্রায় সম্মিলন রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। লাহোরের ব্রহ্মমন্দিরেও সকলে মিলিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। Mirror নামক ইংরাজি কাগজ এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন পত্রিকাদি লইয়া কলিকাতার সঙ্গে যোগ রাখিতেন। এই সময় প্রেরিত ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার ও ভাই মহেন্দ্র নাথ বসু প্রচার

উপলক্ষে সপরিবারে লাহোরে তাঁহার আবাসে উপস্থিত হন। প্রেরিত ভাইদিগকে এই বিদেশে কর্ম্ম-সংগ্রাম-স্থলে লাভ করিয়া ঋষি কেদার এতাদৃশ সুখী ও উৎফুল্ল হইয়াছিলেন যে, সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সেবায় রত থাকিতেন ও উপাসনা বক্তৃতাদির সুব্যবস্থা ইত্যাদি যতকিছু কার্য্য সাধন করিয়া কৃতার্থতা বোধ করিতেন। সেইবারেই ভাই প্রতাপ চন্দ্র ঋষি কেদার নাথের দ্বিতীয় সন্তান প্রথমা কন্যার অন্নপ্রাশন ও নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এইটী তাঁহার ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে প্রথম কার্য্য। অনেক সম্ভ্রান্ত পাঞ্জাবী নিমন্ত্রিত হইয়া, উপস্থিত হইয়া, বিশেষ আনন্দিত হয়েন। বহুলোক-সমাগম ও বিশেষ সমারোহ হইয়াছিল। কেদার নাথ পশ্চিমাঞ্চলের নানা প্রদেশে এই বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে ভ্রমণ করিয়াছেন। লাহোরে বদলী হইয়া আর একবার আসিয়াছিলেন। লুধিয়ানা, মেলের কোটলা, রাউলপিণ্ডি, মুলতান, জলন্ধর, উজিরাবাদ, দিল্লী, কর্ণাল প্রভৃতি আরও অনেক স্থানে তাঁহার বদলী হইয়াছিল।

লাহোরে আর একটী কন্যা জন্মিবার প্রায় একবর্ষ পরে, দেশে দেশে সংবাদ আসিল, শ্রীমদাচার্য্যদেব ভারতাশ্রম স্থাপন করিতেছেন, যে সমুদায় ব্রাহ্ম বিদেশে কর্ম্ম করেন, তাঁহারা যদি ইচ্ছা করেন, ধর্ম্ম-জ্ঞান ও বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত পরিবার প্রেরণ করিতে পারিবেন। সকল প্রকারের বন্দোবস্ত অতি সুন্দররূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই সংবাদ-প্রাপ্তি মাত্র কেদারনাথ পরিবারের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি-মানসে আগ্রহাতিশয়-সহকারে পরিবারকে ভারতাশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন।

মনুষ্য জীবনে প্রেম-পরিবার কি প্রকারে গঠিত হইতে পারে, পরে সঙ্গে স্বর্গীয় প্রেমে কিরূপে এক হইয়া বাস করা যাইতে পারে, এই ভারতাশ্রম সংগঠন করিয়া শ্রীমদাচার্য্যদেব জগতে তাহার উজ্জ্বল চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। নানা দেশের, নানা জাতির চির অপরিচিত নরনারী কেমন করিয়া এক সঙ্গে বাস করিয়া ধর্ম্ম ও সংসার পালন করে, কলিকাতার ভারতাশ্রম তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত ও লীলাভূমি। শুনিয়াছি, শত শত স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা একটী বিশ্বজনীন পরিবারে মিলিত হইয়া, আনন্দে তথায় বসতি করিতেন। মার কাছে শুনিতাম, সে নিঃস্বার্থ স্নেহ প্রেমের উদাহরণ আর কোথাও পাওয়া যায়না, তুলনাও হয় না। সে স্বর্গীয় দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন বা সম্ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব করিতে পারিবেন। সেই সময় ভাবের সঙ্গে মিলাইয়া সঙ্গীত-প্রচারক প্রেমদাস গাহিলেন —

"পিতা এই কিহে সেই শান্তি-নিকেতন?
যার তরে আশা করে আমরা করি এত আয়োজন।
তব পুত্র কন্যাগণে,
পবিত্র ভাবে যেথানে,
প্রেম-পরিবারের সুখ করে আস্বাদন;
সেই ত স্বর্গের শোভা,
ভক্ত-জন-মনোলোভা,
ভূমণ্ডল মাঝে যাহা দেখে নাই কেহ কখন।
দেখে যার পূর্ব্বাভাস,
মনেতে বাড়ে উল্লাস,
বাক্যেতে না হয় প্রকাশ বিচিত্র শোভন;
নরনারী সবে মিলে,
ভাসে প্রেম-অশ্রুজলে,
ডাকে তোমায় পিতা বলে আনন্দে হয়ে মগন।"

এই সঙ্গীত দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, পবিত্র আনন্দের স্রোত কিরূপ ভাবে এই ভারতাশ্রমে প্রবাহিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় প্রেরিত ভাই উমানাথ গুপ্তের হাতে খাওয়া ইত্যাদি বন্দোবস্তের যত কিছু ভার ছিল। ভাই মহেন্দ্র নাথ বসু School সম্বন্ধে সকল কার্য্য পরিচালন করিতেন। এইরূপ এক একটী ভার এক এক জনের হস্তে ন্যস্ত ছিল। শুনিয়াছি, বিজয় গোস্বামীর শ্বশ্রুমাতা ভাণ্ডার ইত্যাদি তদারক করিতেন। প্রতিদিন যেন কোন বিবাহাদির ভোজের ব্যাপার চলিত। ঘণ্টার নিয়মে শৃঙ্খলা মতে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইত। কেহ অনিয়মিত ভাবে চলিতে পারিতেন না। প্রতিদিন প্রাতে শ্রীমদাচার্য্যদেব আশ্রমস্থ সকলকে লইয়া উপাসনা করিতেন। সন্ধ্যায় আবার সঙ্গীত প্রার্থনাদি হইত ও প্রতিদিন এক এক জন মহিলার প্রার্থনা করিবার নিয়ম ছিল। সেখানে ধর্ম্ম জ্ঞান নীতি বিদ্যা, সকল প্রকার শিল্প-বিজ্ঞান, আবার মেয়েদের তাহাদের ঠিক উপযুক্ত শিক্ষা সকল দেওয়া হইত। আবার এই সকল আধ্যাত্মিক বিষয়ের সঙ্গে পবিত্র আমোদ-সম্ভোগের প্রথা বড়ই সুন্দর ছিল। এই ভারতাশ্রমের নিকটবর্ত্তী অন্য একটী স্থানে ব্রাহ্মযুবকদিগের ছাত্রাবাস ছিল। সে বাড়ীর নাম নিকেতন রাখা হইয়াছিল। পরে ইহা যখন উঠিয়া যায়, তখন অনেকেই নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেই সময়কার গল্প যাহা মাতৃদেবীর কাছে শুনিতাম, মনে হইত, যেন বৈকুণ্ঠ-ধাম। ঝি চাকরগুলি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য রকম ভাল থাকিত। কত যেন স্নেহ দয়া তাহাদেরও ভিতর সকলে প্রাপ্ত হইতেন। দাস দাসীদের জন্য সে সময় আরও সুখে বাস করিতে পারিয়াছিলেন। মাতৃদেবীর কাছে সে সময় একটী ঝি ছিল, সে বড় যত্নে পুত্র কন্যাগুলির পরিচর্য্যা করিত। মাকে উপাসনা ইত্যাদি সকল প্রকার বিষয়ে যোগ দিবার সুবিধা করিয়া দিত। দিবানিশি ছেলেদের ত করিতই, আবার নিজ হাতে জলখাবার লইয়া মাকে খাওয়াইয়া দিত। আশ্রমের বালক বালিকাদিগকে কত সুন্দর গল্প বলিয়া সুখী করিত। মহারাণী সুনীতি দেবী প্রভৃতিও তাহার গল্প ভালবাসিতেন। যখন ভারতাশ্রম উঠিয়া যায়, মা পশ্চিমে যাইবার কালে তাহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং বর্দ্ধমানের নিকট মেমারী ষ্টেশনে সে নামিয়া গেল। ছোটদের সম্বন্ধে ঘুম পাড়াইয়া যাইবার সময় খুব কাঁদিয়াছিল। মা এবং দাদাও সেই শৈশবকালেই এত ভাল ঝিয়ের জন্য

চক্ষের জল ফেলিয়াছিলেন। এ সংসারে কত প্রকৃতির ভিতর যে কত মধুরতা ও মহৎ প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা আশ্চর্য্য। শুনিয়াছি, ভাই উমানাথ গুপ্তকে প্রয়োজন সময়ে সেই ঝি কোথা হইতে প্রচুর অর্থ কর্জ্জ করিয়া আনিয়া দিত। মহাজনেরা পর্য্যন্ত বিনা সুদে তাহাকে টাকা দিত। আশ্চর্য্য বিশ্বাসী লোক! পরে কোন সময়ে বা কি প্রকারে এই আশ্রমের কার্য্য বন্ধ হইয়াছিল, যথাযথ জ্ঞাত নহি; কিন্তু ইহার পরই কমল কুটীর ক্রয় করা হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে মঙ্গলবাড়ী ও শান্তি-কুটীরের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রচারকেরা অনেকেই মঙ্গলবাড়ীতে আসিলেন। ভাই অঘোরনাথ গুপ্ত, গৌর গোবিন্দ রায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, মহেন্দ্র নাথ বসু, রামচন্দ্র সিংহ এই সকল প্রেরিতগণ নব নির্ম্মিত মঙ্গলবাড়ীতে আসেন। শ্রীমদাচার্য্যদেব বড় আদর করিয়া তাঁর দলকে সঙ্গে লইয়া, নূতন বিধানে ভারতকে আহ্বান করিলেন। কি সুখের সেই নববৃন্দাবন-লীলা দেখিয়াছি! তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন ও সম্ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, অন্যথা অনুভব করা কঠিন। ভারতাশ্রমে থাকা কালীন মাতৃদেবী অন্য কয়েকটী ভগিনীর সহিত মিলিয়া শ্রীমদাচার্য্যদেবের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, পিতৃদেব ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার অনতিকাল পরেই দীক্ষিত হন। তাঁহার হিন্দু-ধর্ম্মের গুরু বলিয়াছিলেন, কেদার যে মন্ত্র লইয়াছে, সেই ত হিন্দু-ধর্ম্মের মূল মন্ত্র। সে অতি উৎকৃষ্ট কাজ করিয়াছে। হিন্দুদিগের ভিতর যাঁহারা প্রকৃত ধার্ম্মিক, তাঁহারাই ব্রাহ্মধর্ম্মকে সমাদর করেন। কেদারনাথও আপন গুরু-দেবকে চিরদিন ভক্তি করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে শীতবস্ত্র বা অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীহেমলতা চন্দ।

বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালার ধর্ম্ম।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভগবান যেন মানুষকে সৃষ্টি করিবার জন্যই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অসংখ্য রূপ রসের মধ্য দিয়া, অসংখ্য জীব-প্রবাহের ভিতর দিয়া, সুন্দরের প্রতিকৃতিরূপে, সকল সৃষ্ট বস্তুর পূর্ণ প্রতীকরূপে, বিধাতা মানুষকে গঠন করিয়াছেন। ইহা এই সৃষ্টিযোগের লীলাভূমি! একটী তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া একটী প্রকাণ্ড মহীরুহ, একটী সামান্য গ্রহ উপগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশাল জ্যোতিক মণ্ডল, একটী জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ মানবদেহ, এক সাক্ষাৎ যোগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, বিধাতা আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। আকাশ বাতাস জল নদ নদী পাহাড় সমুদ্র সবই এক সূত্রে গাঁথা। আমরা সৃষ্টির মহা-যোগের ভিতর জীবনধারণ করিয়া, কি সমাজ, কি জাতি, কি ধর্ম্ম, যে কোন বিষয়েরই আলোচনা করি না কেন, সেখানেই এই মহাযোগের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করিব।

এই ধূলিময় জগৎ হইতে যেমন উদ্ভিদ্ জগৎ সৃষ্ট হইল এবং উদ্ভিদ্ জগৎ হইতে যেমন জীব-জগৎ সৃষ্ট হইল, সেইরূপ মানব-জগতেও তিনটী সামাজিক অবস্থা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সামাজিক অবস্থা বলিতে সমাজের উচ্চস্তরে মানব-সভ্যতার মধ্য দিয়া যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে সকল বিষয় বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মানবের আদি অবস্থা যে তিনটী প্রধান ধারার ভিতর ক্রমোন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহার বিষয় দু'একটী কথা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। প্রথম অসভ্যাবস্থা, যে সময় মানুষ বন্য পশুর ন্যায় বিচরণ করিত, ছোট ছোট পশু পক্ষী ধরিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। নিজের স্বজাতির উপর হিংসা বিদ্বেষ এত প্রবল ছিল যে, নরহত্যা করা বা নর-মাংস ভোজন করা তাহাদের পক্ষে অসঙ্গত বোধ হইত না। এখনও আফ্রিকার জঙ্গলে এমন অনেক জাতি আছে, যাহারা গাছের উপর বাসা বাঁধিয়া রাত্রি যাপন করে এবং কাঁচা পশু পাখীর মাংস খাইয়া জীবন-ধারণ করে।

দ্বিতীয় অর্দ্ধসভ্যাবস্থা, যে সময় মানুষ দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, পর্ব্বতগুহায় বা অরণ্যে গাছ পালা দিয়া গৃহনির্ম্মাণ করে এবং ফল মূল সংগ্রহ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করে। তাহাদের মধ্যে রন্ধন করিয়া খাইবার প্রথা এখন পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আসামের জঙ্গলে এরূপ জাতি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় সভ্যাবস্থা, যখন মানুষ চাষ বাস করিয়া নিজের খাদ্য উৎপন্ন করিতে শিখিল, লজ্জা নিবারণের জন্য গাছের বল্কল ব্যবহার করিল এবং স্ত্রী পুত্র লইয়া সপরিবারে বাস করিতে অভ্যস্ত হইল। কত যুগ যুগান্তরের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া মানবের ভিতর এই পারিবারিক জীবন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত ইতিহাস আমরা জানি না। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, এক এক দল বা এক এক জাতি ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে তাহারা বর্ত্তমান সভ্যতার উচ্চ আশীর্ব্বাদ সম্ভোগ করিতেছে। ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে, আদিতে মানুষ একাধিক পরিবারে মিলিত হইয়া যখন বাস করিতে লাগিল, তখন সকল সময় তাহাদের জন্মস্থান তাহাদের যথেষ্ট খাদ্য দিতে পারে নাই। অনেক দল বা জাতি-কেই বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইয়াছে। এই উপ-নিবেশ-স্থাপন নির্ব্বিঘ্নে সংঘটিত হয় নাই, ঔপনিবেশিকদিগের সহিত স্থানীয় লোকেদের বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এই সংঘর্ষের ফলে এক জাতি আর এক জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং বহুদিন একত্র বাস হেতু এক জাতির স্বার্থ অন্য জাতির স্বার্থের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দুই বা বহু জাতি মিলিত হইয়া এক মহা জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

এই জাতি-সঙ্ঘ সৃষ্টি করিবার দুটী বিশেষ উপকরণ দৃষ্টি-গোচর হয়, একটী ভৌতিক, অপরটী আধ্যাত্মিক। ইউরোপের এক একটী দেশে যে এক একটী প্রবল জাতি সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার মূল কারণ, জল, বায়ু, দেশের নৈসর্গিক অবস্থা, খাদ্যের অপ্রাচুর্য্য ও বৈবাহিক সম্বন্ধ। সে দেশের ভূমি বৎসরের অধিকাংশ সময় তুষারাবৃত থাকে, সুতরাং সহজে খাদ্য উৎপন্ন হয় না; খাদ্য উৎপন্ন করিতে হইলে বহু চেষ্টায় ও বহু যন্ত্রের সাহায্যে খাদ্য উৎপন্ন করিতে হয়। ইহার জন্য মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন। তার পর দেশে যে খাদ্য জন্মায়, তাহাতে দেশবাসীর সম্বৎসর চলে না, সুতরাং মানুষের ব্যবহারার্থ বহু শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয়। এই সকল শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে বহু লোকের একত্র সমাবেশ প্রয়োজন হয়। এজন্য জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হয়। শিল্পজাত দ্রব্যাদি একবার খরিদ করিলে তাহা বহুদিন ব্যবহার করা চলে, অতএব জাতিকে প্রতিদিন নূতন অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইলে দেশের বাহিরে তাহা প্রেরণ করিতে হয়। দেশের বাহিরে তাহা প্রেরণ করিতে হইলে, মানুষকে সহজে দলবদ্ধ হইতে হয়। পৃথিবীর নানা স্থানে তাহা বিক্রয় করিতে হইলে, পৃথিবীর নানা অসভ্য, অর্দ্ধসভ্য ও দুর্ব্বল সভ্য জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে হয় এবং এজন্য জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হয়। সমুদ্র পাহাড় প্রভৃতি নৈসর্গিক অন্তরায়গুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে হইলে, নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক কল কারখানা, জাহাজ ও রেলের প্রবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এই সকল প্রতিষ্ঠান ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইতে জাতি যেমন এক দিকে প্রবল শক্তিশালী হইয়া উঠে, অন্য দিকে প্রবল সঙ্ঘবদ্ধ জাতি-রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে।

বৈবাহিক সম্বন্ধও জাতি-গঠনের পক্ষে কম অনুকূল নহে। বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির আদি ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, স্যাক্সন নর্ম্মান ডেন্স প্রভৃতি বহু জাতি এক বিবাহ-সূত্রে মিলিত হইয়া এক মহাজাতি সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক বিভিন্ন জাতির সদ্গুণ, দৃঢ়তা, কর্ম্মপটুতা, সৎসাহস ও স্বার্থ এই মহাজাতির ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। একটী স্রোতস্বিনী যখন অন্যটীর সহিত মিলিত হয়, তখন তাহার স্রোত প্রবল-বেগে বহিতে থাকে। এক জাতীয় শোণিতধারা যখন অন্য জাতীয় শোণিতধারায় মিলিত হয়, তখন এক প্রবল শক্তিশালী জাতি সৃষ্টি করে। ইংরাজ জাতি তাহার সাক্ষী। এই জাতি বাহিরের উপকরণ বা যোগের দ্বারা যেমন সৃষ্ট হইয়াছে, ভারতে আত্মিক উপকরণের দ্বারা সেইরূপ নূতন জাতি গঠিত হইয়াছে।

বৌদ্ধযুগের সাম্যবাদের ভিতর দিয়া বহু বৈদেশিক জাতি, যাহারা ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, যথা সিথিয়ান, গ্রীক্, ইরান, হুন, শক প্রভৃতি, এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুজাতি তাহারই সংমিশ্রণের ফল। ভারতের যেমন একটা জাতীয় ইতিবৃত্ত আছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যেমন জাতি-গঠনের ইতিহাস আছে, বাঙ্গালা দেশেরও একটী স্বতন্ত্র জাতীয় ইতিহাস আছে। অবশ্য আমরা এই জাতীয় ইতিবৃত্তের যথার্থ তত্ত্ব ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিতে পারি না। তবে আমাদের আলোচিত বিষয় পাঠ করিলে সাধারণের ধারণা হইবে যে, বাঙ্গালী একটী মিশ্র-জাতি এবং বহু যুগযুগান্তরের মধ্য দিয়া এবং ক্রমবিকাশের ভিতর এই বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। দুই একটী প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব এস্থলে বলিলে, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। বাঙ্গালার প্রাচীন জাতি বলিতে আমাদের অনার্য্য প্রতিবাসী কোল ভীল সাঁওতালকেই মনে পড়ে। বাঙ্গালার বহু প্রাচীন জাতির পৃথক্ ইতিহাস আছে। বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণার ফলে জানা যায় যে, এই সকল অনার্য্য জাতি এক ধারা হইতে উৎপন্ন হয় নাই। এই সকল অনার্য্য জাতিকে বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাদের সকলকেই আমরা আর্য্য নামে অভিহিত করিয়া থাকি; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালায় অসভ্য অনার্য্য জাতি ব্যতীত এক সভ্য জাতি বাস করিত। আর্য্যগণ যখন ভারতের নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন রঘুরাজ সেই কার্য্যে ব্রতী হইয়া বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। তাঁহার কার্য্যে বাধা দিবার জন্য যে সকল বাঙ্গালী অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে সম্মুখ-সমরে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি আর্য্য বাঙ্গালী? বঙ্গের সমতট-ভূমিতে যে সকল বাঙ্গালী ভীমসেনের গতিরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি আর্য্য বাঙ্গালী? বর্ত্তমান যুগে ইংরাজ বা ফরাসী জাতি যখন কোন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, তখন সেই দেশের প্রাচীন জাতির সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে এবং স্থল বিশেষে সংগ্রামও অনিবার্য্য হইয়াছে; কিন্তু কোন ইংরাজ বা ফরাসী স্ব স্ব জাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন নাই। এজন্য আমাদের অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, যে সকল বাঙ্গালী আর্য্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহারা আর্য্য-পূর্ব্ব বা প্রাচীন বাঙ্গালী জাতি। মহাভারতের সময়ও সমস্ত বাঙ্গালা দেশ আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত বা উপনিবিষ্ট হয় নাই। আর্য্যাবর্ত্তের সহিত সে কালের বঙ্গদেশের সংস্রব থাকিলেও তাহা গণনার মধ্যে ধরা হইত না। বাঙ্গালা দেশকে ঘটোৎকচের লীলাভূমি বলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে, বঙ্গদেশ অনার্য্য বা প্রাচীন বাঙ্গালী জাতির আবাস-স্থান ছিল। মহাভারত ও রামায়ণ হইতেও বাঙ্গালার প্রাচীন জাতি-তত্ত্বের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। যে গৌড়ীয়গণ সুদূর কাশ্মীরে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং গৌড়ের রাজাকে হত্যা করিবার জন্য ভীষণ প্রতিশোধ লইয়া ছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষুদ্রকায় ছিলেন, নীলপ্লান পর্ব্বত সদৃশ তাঁহাদের বর্ণ কাল ছিল, কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস রাজ-তরঙ্গিণীতে ইহা

বর্ণিত হইয়াছে। আর্য্য বাঙ্গালীরা যে এরূপ কৃষ্ণবর্ণ ছিল, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত। অতএব আর্য্য উপনিবেশ এদেশে স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এখানে একটী প্রাচীন জাতি বাস করিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাচীন ইতিহাস দৃষ্টিগোচর হয়। কাশ্মীরে রামস্বামীর মন্দির ও মূর্ত্তি প্রাচীন গৌড়ীয়গণ যখন চূর্ণ করিয়াছিলেন, তখন সেই প্রাচীন জাতি যে প্রতিমা-উপাসক ছিলেন না এবং বাঙ্গালা হইতে যে জাতি কাশ্মীরে গিয়া প্রতিশোধ লইতে পারে, সে জাতি যে বীর জাতি ছিল, তাহাও অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সিংহল, এনাম ও ক্যাম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালার প্রাচীন অধিবাসী যে অধিক ছিল, একথা বোম্বাই গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। (Bombay Gagette, Vol 1, Part 1, P. 493) অতএব বাঙ্গালার শোণিত ধারার সহিত বহুপূর্ব্ব প্রাচীন জাতির শোণিত ধারা মিলিত হইয়া বর্ত্তমান জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, একথা সন্দেহ করিবার কারণ নাই; এবং অন্যান্য জাতির সহিত যে বাঙ্গালার প্রাচীন জাতি মিলিত হইয়াছে, একথাও অস্বীকার করিবার যো নাই। এই জাতির ধারা এখন নব নব জাতির সহিত মিলিত হইয়া এক অভিনব জাতি সৃষ্টি করিতেছে। বাঙ্গালার বর্ত্তমান জাতীয় শোণিতের সহিত এখনও প্রতিনিয়ত কত বিদেশীয় শোণিত মিলিত হইতেছে, ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাহা প্রমাণ করিবে। আমাদের একথা আলোচনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যেমন বিশ্ব-সৃষ্টির ভিতর, জীব-সৃষ্টির ভিতর ক্রম-বিকাশের ধারা প্রবাহিত হইতেছে, সেইরূপ জাতি-সৃষ্টির ভিতরও ক্রম-বিকাশের ধারা অবিরাম গতিতে চলিতেছে, এবং এই ধারার ভিতর দিয়া প্রাচীন বিধান হইতে নূতন বিধানের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে।

নর্ম্মদার জলের যেমন একটী গুণ আছে যে, তাহাতে গাছ পালা কাঠ বাঁশ যাহা কিছু পতিত হয়, তাহাই পাথর হইয়া যায়; সেইরূপ বাঙ্গালার জল বায়ুতে যাহারা আসিয়া বাস করে, তাহারাই বাঙ্গালী হইয়া যায়, বাঙ্গালীর স্বভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাদের শরীর, মন ও আত্মা অন্যান্য দেশবাসী নরনারী হইতে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। বাঙ্গালীর একটী জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালীর শরীর, মন ও আত্মার ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আমরা বারান্তরে বাঙ্গালার জাতীয় ধর্ম্ম-বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•—

নববিধানের আদর্শ মনুষ্য।

(আচার্য্যদেব নববিধানের যে "আদর্শ চরিত্রের" কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার পদ্যানুবাদ)

[১]

পৃথিবীতে যত নারী আছে বর্ত্তমান।
সকলেই ব্রহ্মকন্যা ব্রহ্মের সন্তান॥
ব্রহ্মকন্যা দেবী জ্ঞানে তাঁহাদের প্রতি।
হৃদয়ে পোষণ করি সম্মান সুপ্রীতি॥
তাঁদের সম্বন্ধে কভু আমার হৃদয়।
অপবিত্র চিন্তা কিম্বা ইচ্ছা পাপময়॥
নাহিক পোষণ করে জানিও নিশ্চিত।
স্ত্রীজাতি-সম্পর্কে শুদ্ধ এ দাসের চিত॥

[২]

মম শত্রুগণে আমি সদা প্রীতি করি।
ক্ষমা করি তাহাদেরে দিবা বিভাবরী॥
উত্যক্ত হলেও ক্রোধ করি না কখন।
শত্রু প্রতি প্রেমে পূর্ণ এ দাসের মন॥

[৩]

অপরের সুখে আমি সদা সুখী হই।
তাদের উন্নতি হেরি আনন্দেতে রই॥
কোনরূপ ঈর্ষা হিংসা করি না পোষণ।
পর-প্রেমে পরিপূর্ণ এ দাসের মন॥

[৪]

অতীব বিনীত নম্র আমি নিরন্তর।
দম্ভ-অহঙ্কার-শূন্য আমার অন্তর॥
উচ্চপদ ধন মান বিষয় বিভব।
ক্ষমতা অথবা ধর্ম্ম লইয়া যে সব॥
অহঙ্কার উপজয় মানব-হৃদয়ে।
তাহা হতে মুক্ত আমি সকল সময়ে॥

[৫]

বিষয়ে বৈরাগী আমি, এ দাসের মন।
কল্যকার তরে চিন্তা করেনা কখন॥
পৃথিবীর ধন নাহি করি অন্বেষণ।
নাহি করি সংসারের অর্থ পরশন॥
বিধাতা যে ধন মোরে করেন প্রদান।
তাই মাত্র লই আমি করিয়া সম্মান॥

[৬]

অভিভাবক আমি হই যাদের সংসারে।
সেবি আমি যথাশক্তি নিয়ত তাদেরে॥
মম পত্নী আর মম সন্তান-নিকরে॥
নীতি ধর্ম্ম উপাসনা শিখাই সাদরে॥

[৭]

আমি অতি ন্যায়বান্ সতত সংসারে।
প্রত্যেকের প্রাপ্য দেই যত্ন সহকারে॥
দ্রব্যাদির মূল্য আর ভৃত্যের বেতন।
যথাকালে দেই আমি রাখিনা কখন॥

[৮]

সদা সত্য বলি আমি সত্য ভিন্ন আর।
বলেনা রসনা মম বচন অসার॥

সকল মিথ্যাকে আমি অতি ঘৃণা করি।
সত্যে প্রতিষ্ঠিত মোরে করেছেন হরি॥

[৯]

দরিদ্রের প্রতি আমি দয়ালু সতত।
মোচিতে তাদের দুঃখ ব্যাকুল এ চিত॥
আমার সঙ্গতি মতে দাতব্য ভাণ্ডারে।
ধন দান করি আমি বিনম্র অন্তরে।

[১০]

অপরেরে প্রীতি আমি করি কায়মনে।
যত্ন করি মানবের কল্যাণ সাধনে॥
স্বার্থপর নহে কভু আমার অন্তর।
সাধিতে জীবের হিত ব্যস্ত নিরন্তর॥

[১১]

পরম ঈশ্বরে আর স্বর্গীয় বিষয়ে।
স্থাপিত আমার চিত্ত সকল সময়ে॥
সংসারে আসক্ত আমি নহি কদাচন।
অনাসক্ত ব্রহ্মগত আমার জীবন॥

[১২]

এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পরম ঈশ্বরে।
করি হে বিশ্বাস আমি সরল অন্তরে॥
পৌত্তলিক উপাসনা সম্পূর্ণ প্রকারে।
অননুমোদিত মম সকল আকারে।

[১৩]

মানবের ভ্রাতৃত্বেতে বিশ্বাস আমার।
জাতি-ভেদ তাই আমি করি না স্বীকার॥

[১৪]

সব সম্প্রদায় আর সব শাস্ত্র হতে।
সত্যধন লই আমি আনন্দেতে মেতে॥
সব সত্যে করি আমি পরম আদর।
সাম্প্রদায়িকতা-হীন আমার অন্তর॥
কোন এক মণ্ডলীতে সত্য পবিত্রতা।
নহেক আবদ্ধ কভু জানিয়া সর্ব্বদা॥
সব সম্প্রদায় হতে সত্য আহরণ।
করিয়া পবিত্র পূর্ণ করি প্রাণ মন॥

[১৫]

যে সব বিধান আর সাধু মহাজনে।
নিজ অভিপ্রায়ে হরি আত্ম-কৃপা গুণে॥
করেছেন নানাকালে ব্যক্ত এ সংসারে।
সে সব বিধান আর প্রেরিত-নিকরে॥
করিহে বিশ্বাস আমি একান্ত অন্তরে।
বিধানে বিশ্বাসী হরি করেছেন মোরে॥

[১৬]

বিজ্ঞান ব্রহ্মের ভাব করয়ে প্রকাশ।
তাই করি বিজ্ঞানেতে সুদৃঢ় বিশ্বাস॥
বিজ্ঞান-বিরোধী যাহা ঘৃণা করি তায়।
কুসংস্কার আমা হতে লয়েছে বিদায়॥

[১৭]

নববিধানের বহু ভাব সুধাময়।
প্রেম পুণ্য কর্ম্ম জ্ঞান যোগে সমন্বয়॥
বৈরাগ্যাদি যত কিছু সাধ্য ভাব আছে।
সকলের সামঞ্জস্য বিধানে বিরাজে॥
সমন্বয় করি আমি এ সব জীবনে।
একত্র সাধন করি নিত্য নিশি দিনে॥
ইহাদের একটীকে করিয়া গ্রহণ।
অপর ভাবের আমি করি না বর্জ্জন॥

[১৮]

শ্রীঈশা প্রভৃতি আছে যত মহাজন।
তাঁদেরে বিশ্বাস আমি করি অনুক্ষণ॥
ব্যক্তিগত ভাবে আমি প্রতি মহাজনে।
প্রীতি ও সম্মান করি কায়-বাক্য-মনে॥

[১৯]

আমার জীবনে আর সমগ্র জগতে।
ধর্ম্মের বিজ্ঞান ধর্ম্ম-সমন্বয় যাতে॥
প্রতিষ্ঠিত হয় নিত্য, তাহার কারণ।
প্রাণপণে করি আমি যত্ন অনুক্ষণ॥

[২০]

করিয়াছি আমি প্রাণে ব্রহ্ম দরশন।
শুনিয়াছি সুধাময় তাঁহার বচন॥
তাঁহাতে পরম সুখী হইয়াছি আমি।
আমার সর্ব্বস্বধন সেই অন্তর্য্যামী॥

শ্রীশশিভূষণ তালুকদার।

ঊনষষ্টিতম ভাদ্রোৎসব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২৪শে আগষ্ট, ৮ই ভাদ্র, শুক্রবার, ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টায় সঙ্কীর্ত্তন। শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে মধুর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

২৫শে আগষ্ট, ৯ই ভাদ্র, শনিবার কেবল মহিলাদিগের জন্য উপাসনার ব্যবস্থা ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টায় হয়। শ্রীমতী মনিকা মহলানবিশ উপাসনা করেন।

২৬শে আগষ্ট, ১০ই ভাদ্র, রবিবার সমস্ত-দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭টায় কীর্ত্তন, ৮টায় উপাসনা। ডাক্তার শ্রীযুক্ত কাদম্বিনী

নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি যে উপদেশ দান করেন, তাহা গত বারের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

মধ্যাহ্নের উপাসনার কার্য্য অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র রায় করেন। তৎপর পাঠ, আলোচনান্তে ৬টায় কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যা ৭টায় আবার উপাসনা আরম্ভ হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন।

২৭শে আগষ্ট, ১১ই ভাদ্র, সোমবার প্রাতে ৭টার সময় ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্গগত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে আলোচনা ও প্রসঙ্গ হয়।

সংবাদ।

জন্মাষ্টমী—জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হিমালয় ব্রহ্মমন্দিরে লাল কানশী রাম বৈষ্ণ-কাবরত্ন, অধ্যাপক দেওয়ান চাঁদ এম্ এ, পণ্ডিত হৃদয় নাথ কুঞ্জরু এম্ এল্ এ, প্রভৃতি বিশেষ বক্তৃতাদি করেন। এই উপলক্ষে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেও বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে নববিধানের যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের সমন্বয়ের পত্তন বেশ উপলব্ধ হয়।

জন্মদিন—গত ১৮ই আগষ্ট, আচার্য্যদেবের পুত্র শ্রীমান্ সরলচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নীতা দেবীর জন্মদিন উপলক্ষে কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। এই শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে কন্যার মাতা প্রচার ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করেন।

গত ২১শে আগষ্ট, ভ্রাতা মন্মথ নাথ সিংহের পত্নী ও কনিষ্ঠা কন্যার জন্মদিন স্মরণে তাঁহাদের বাড়ীতে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৫ নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর কন্যা 'রাণুর' জন্মদিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

স্বর্গারোহণ—গত ১৭ই আগষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে হিমালয় ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ সভা হয়। বাগনান ব্রহ্মানন্দাশ্রমেও বিশেষ উপাসনা হয়।

সাম্বৎসরিক—প্রাচীন ব্রাহ্ম ভ্রাতা শশিভূষণ চক্রবর্ত্তীর স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে গত ১৯শে আগষ্ট বাগনান চন্দ্রপুর গ্রামে তাঁহার ভবনে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক বিশেষ উপাসনা করেন। ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সত্যভূষণ শ্রাদ্ধকারীর বিশেষ প্রার্থনা করেন।

২১শে আগষ্ট, শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে ভাই কান্তিচন্দ্র ও ভাই বলদেব নারায়ণের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ১লা সেপ্টেম্বর, কোচবিহারের মহারাজা শ্রীরাজরাজেন্দ্র নারায়ণের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে, রাজ্যের ব্যবস্থানুসারে কেশবাশ্রমস্থিত সমাধি-মণ্ডপে প্রাতে জনসাধারণ সহ বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। রাজনন্দন যে বলিয়া গেলেন "My mission is fulfilled, my call has come" ইহাই অবলম্বনে বিশেষ প্রার্থনা হয় এবং রাজ্যের কল্যাণের জন্যও প্রার্থনা করা হয়। সন্ধ্যায়ও সমাধিতে সংকীর্ত্তন হয়। পরদিন মন্দিরে নববিধানের অসাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে উপদেশ হয়। ৩রা সোমবার, প্রাতে শ্রীনৃপেন্দ্র নারায়ণের সমাধি পার্শ্বে উপাসনা হয়।

গত ২০শে ভাদ্র, ভাই প্রিয়নাথের স্বর্গস্থ পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয় ও সন্ধ্যায় প্রার্থনাপূর্ব্বক দরিদ্র ভোজন করান হয়।

গত ১২ই সেপ্টেম্বর, নবদেবালয়ে ভ্রাতা অখিলচন্দ্রের মাতৃদেবীর দিন স্মরণে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন।

গত ৬ঠা সেপ্টেম্বর, ৩৬নং হ্যারিসন রোডে, ডাঃ জগন্মোহন দাসের কনিষ্ঠ পুত্র "পান্নার" সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন, পিতা বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ৪৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর, হাওড়ায়, ২১নং জয়দেব কুণ্ডু লেনে, শ্রীযুক্ত দিননাথ সরকারের গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

উৎসব—গত ৬ই ভাদ্র, রাজা রামমোহন যে ব্রাহ্মসভা স্থাপন করেন এবং ৭ই ভাদ্র ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যে প্রথম ভাদ্রোৎসব হয়, তাহাই স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়।

২৮শে ও ২৯শে আগষ্ট, শ্রীমহম্মদের জন্ম ও স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উৎসব হয়। হিমালয় ব্রহ্মমন্দিরেও স্মৃতিসভা হইয়াছিল। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি বক্তৃতা করেন। ২৯শে আগষ্ট, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরেও বিশেষ সভা হয়। মৌলবী আবদুল আলি বি এল্ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

কৃতজ্ঞতা-পূজা—ডাঃ ডি, এন, মল্লিকের পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ জন্য গত ৩০শে আগষ্ট তাহার রংপুর আবাসে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ২রা সেপ্টেম্বর, কোচবিহারে ভ্রাতা কেদার নাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্নীর রোগমুক্তি উপলক্ষেও বিশেষ উপাসনা হয়।

পুনরাগমন—ভাই প্রমথ লাল কয়েক মাস হিমালয়ে বাস ও উৎসবাদি করিয়া অনেকটা সুস্থ শরীর লইয়া পুনরাগমন করিয়াছেন। সে দিন নবদেবালয়ে এজন্য কৃতজ্ঞতানন্দ-সূচক প্রার্থনা করা হয়, ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির—গত ২রা সেপ্টেম্বর, ভাই অক্ষয় কুমার লধ এবং ৯ই ও ১৬ই অধ্যাপক রাজেন্দ্র নাথ সেন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনার কার্য্য করেন।

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত নিম্নলিখিত পরলোকগমন সংবাদ পত্রিকাস্থ করিতেছি:—

গত ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৪নং এণ্টনী বাগান লেনে, প্রাচীন ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ দেব পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সমসাময়িক লোক ছিলেন। সে সময়কার দৃশ্য ভাবে গদগদ হইয়া যখন বলিতেন, তখন সকলে শুনিয়া খুব আনন্দ পাইতেন। তিনি "অতীতের ব্রাহ্মসমাজ" নামে একখানি বহিতে সেই সময়কার লীলা কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বয়স আশি বৎসরের উপর হইয়াছিল। ইদানীং কয়মাস রোগে একরূপ শয্যাশায়ী ছিলেন। এখন আনন্দধামে ব্রহ্মানন্দ-দলে মিলিয়া খুব আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন।

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১১এ ভুবন মোহন সরকার লেনে, শ্রীযুক্ত রাজকুমার চন্দ রায়, ৭৯ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি সরল বিশ্বাসী, উপাসনাশীল, শান্ত-প্রকৃতি ছিলেন। নববিধানে তাঁহার নিগূঢ় বিশ্বাস ছিল। রোগ-শয্যায় খুব বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাসীর মৃত্যুতে গৃহ যে উৎসবময় হয়, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বৃদ্ধামাতা এখনও জীবিত আছেন। দুইমাস পূর্ব্বে বৃদ্ধামাতার অপর পুত্রও পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। মৃত্যু সময় শ্রীমান্ রাজেন্দ্র কুমার রায় ব্যতীত আর সকল সন্তান সন্ততি উপস্থিত ছিলেন। বৃদ্ধামাতা, সহধর্ম্মিণী, সন্তান সন্ততি, নাতি, নাতনী, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি বহু পরিজনবর্গের মধ্যে বিশ্বাসী আত্মা ভগবানের নাম, মা নাম শুনিতে শুনিতে অমরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে তাঁহার অমৃতবক্ষে স্থান দান করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

শুভযাত্রা—গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, অপরাহ্ণে ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের লেডি প্রিন্সিপাল শ্রীমতী নির্ভর প্রিয়া ঘোষ আমেরিকাভিমুখে এবং পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী ইংলণ্ডাভিমুখে শুভযাত্রা করিয়াছেন। উভয়ে মাদ্রাজ হইতে একই জাহাজে যাইবেন। শ্রীমতী নির্ভর প্রিয়া ঘোষ আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের বিশেষ আহ্বানে এবং অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী অধ্যয়নার্থ যাইতেছেন। ইঁহাদের জন্য শুভকামনা করিয়া ১১ই সেপ্টেম্বর, ৫১।১ নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে শ্রীমতী নির্ভর প্রিয়ার গৃহে, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১।৫ নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। উভয় স্থানেই ভাই প্রমথ লাল সেন উপাসনা করেন। ১৩ই প্রাতে অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগীর শ্বশ্রূমাতার গৃহে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটেও এই উপলক্ষে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত কামাখ্যা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। হাওড়া ষ্টেসনে ইঁহাদের বিদায় দিবার জন্য অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ষ্টেসনে প্রার্থনা করিয়া শ্রীমতী নির্ভর প্রিয়া ঘোষকে নববিধান নিশান উপহার দান করেন। নববিধানের জয় হউক, ইঁহাদের যাত্রা শুভ হউক।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে ধর্ম্মতত্ত্বের নিম্নলিখিত মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি:—

জুন।—শ্রীযুক্ত হৃদয়বিহারী ঘোষ ৩৲, শ্রীমতী স্নেহলতা বীর ১১৲, শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী ৩৲, শ্রীমতী হৈমবতী সেন (লেডি ডক্তার) ৩৲, শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র কুণ্ডু ২৲, শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষ ৩৲, শ্রীযুক্ত বিপনবিহারী শালমল ৫৲, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ ৩৲ টাকা।

জুলাই—সেক্রেটারী, কেদারনাথ লাইব্রেরী ১৲, শ্রীমতী কৃপাকণা মূল্য ৩৲ ও পিতৃ-সাম্বৎসরিকে ধর্ম্মতত্ত্বের ঋণশোধার্থ বিশেষ দান ২৲, Mrs. Hari Sundar Bose ৩৲, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সাহু ৩৲, সেক্রেটারী, রাঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজ ৬৲, শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস ১৷৹ টাকা।

আগষ্ট—শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার ঘোষ ৩৲, শ্রীমতী মনোরমা চাটার্জি ৩৲, মেজার জ্যোতি লাল সেন I.M.S. ৩৲, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র মোহন সেন ৩৲, ডাঃ বিধান প্রসাদ মজুমদার ৩৲, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার হালদার ৩৲ টাকা।

শ্রীমদ্গীতাপ্রপূর্ত্তি।

শ্রীমদ্গীতাপ্রপূর্ত্তি বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থ সাত্বত-সংহিতা (শ্রীমদ্ভাগবত) হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। গীতা-প্রপূর্ত্তি নাম কেন হইল, তাহা উপক্রমণিকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে যাহা সূত্রাকারে আছে, ভাগবতে তাহা পরিস্ফুটাকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গীতা এবং ভাগবতের এই সম্বন্ধ অদ্যাপি কাহারও দৃষ্টিগোচরে আসে নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্যই শ্রীমদ্গীতাপ্রপূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইল। এই গীতা-প্রপূর্ত্তি দ্বাদশ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে; এবং তাহার প্রত্যেক অধ্যায়ের শ্লোক-সমষ্টির সহিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কেমন সামঞ্জস্য আছে, সুধীগণ তাহা দেখিতে পাইবেন। আমরা উপক্রমণিকা বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে নিবৃত্তিযোগ ও প্রবৃত্তিযোগ সম্বন্ধে যে সকল পদ্য আছে, তাহা উপক্রমণিকাতে প্রথমেই প্রদত্ত হইয়াছে; এবং তৎসহ শ্রীমদ্গীতা-প্রপূর্ত্তির নিবৃত্তি-মূলক প্রবৃত্তিযোগও সূত্রাকারে বিবৃত হইয়াছে। উপক্রমণিকাস্থ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ ও অন্যান্য বিষয়গুলি সুধীগণ অধ্যায়ানুসারে দেখিতে পাইবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পদ্য-সংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র। সুতরাং তাহা সকলের পাঠায়ত্ত নহে। এই গীতাপ্রপূর্ত্তি এক সহস্র পদ্যে পরিসমাপ্ত। অতএব আশা করা যায়, যাঁহারা অপরোক্ষ ভগবৎ-সাক্ষাৎকারে অভিলাষী এবং যত্নশীল, তাঁহাদের নিকট ভক্তি-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক পারমহংস্য-ধর্ম্ম-সম্ভূত শ্রীমদ্গীতাপ্রপূর্ত্তি সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার অধ্যায়গুলি এই ভাবে সন্নিবিষ্ট, যথা:—

১ম। বস্তু-নির্দ্দেশ। ২য়। ব্রহ্ম-নির্দ্দেশ। ৩য়। পরমাত্ম-নির্দ্দেশ। ৪র্থ। ভগবন্নির্দ্দেশ। ৫ম। বিষয়ি-নির্দ্দেশ। ৬ষ্ঠ। বিষয়-নির্দ্দেশ। ৭ম। দর্শন-শ্রবণ-নির্দ্দেশ। ৮ম। সাধন-নির্দ্দেশ। ৯ম। বিষয়বিষয়িসম্বন্ধ-নির্দ্দেশ। ১০ম। ভক্তি-নির্দ্দেশ। ১১শ। প্রীতি-নির্দ্দেশ। ১২শ। পারমহংস্যধর্ম্ম-নির্দ্দেশ।

বিধানপল্লী, পোঃ রমনা, ঢাকা। — শ্রীমহিমচন্দ্র সেন। অনুবাদক।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কালকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ৮ই আশ্বিন, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৩ ভাগ। ১৮শ সংখ্যা।
১৬ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক, ৯৯ ব্রাহ্মাব্দ।
2nd October, 1928.
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা, যদি আমাদিগকে নববিধান-বিশ্বাসিদল করিতে চাও, আমাদিগকে নববিধানের উপাসনায় উপাসনাশীল কর। আমরা কতই উপাসনা করিতেছি, কতই উৎসব করিতেছি, কতই হয়ত সাধন ভজনও করিতেছি, কিন্তু কই তাহার প্রভাব আমাদিগের জীবনে প্রকৃতরূপে প্রতিফলিত হইতেছে? আমরা যে উপাসনা করি, তাহা যেন পুরুষকার-সম্ভূত, জ্ঞান-বুদ্ধি-মিশ্রিত। যে কোন মূর্ত্তি-উপাসক যেমন কল্পিত মূর্ত্তির নিকট কামনা বাসনা চরিতার্থার্থ পূজা দান করেন, প্রার্থনা করেন, আমাদেরও উপাসনা প্রার্থনা মানস পূজা হইলেও অনেকটা যেন সেইরূপ মনঃকল্পিত হইয়া থাকে। এই জন্যই তাহা দ্বারা জীবনের পরিবর্ত্তন হয় না, জীবন সমুন্নত হয় না। নববিধান যে জীবনের বিধান। জীবন দান করিতেই ত নববিধান সমাগত, নববিধানের উপাসনাও জীবনপ্রদ। কেন না, সে উপাসনা, মা, তুমি তোমার পবিত্রাত্মার প্রেরণায় করাইয়া থাক। নববিধানে তাই আমাদের পুরুষকার বা কামনা-বাসনা-সম্ভূত ও বিচার-বুদ্ধি-মিশ্রিত উপাসনা কার্য্যকরী হয় না। আমরা তাহা করি বলিয়াই আমাদের জীবনও সমুন্নত হয় না। আশীর্ব্বাদ কর, এখন হইতে আর যেন আমরা আমাদের পুরুষকার-সম্ভূত-উপাসনার পক্ষপাতী না হই, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তোমার পবিত্রাত্মার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, তাঁহারই প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া, উপাসনা, প্রার্থনা ও উৎসব করি এবং তদ্দ্বারা জীবনে তাহার প্রভাব ও ফল অনুভব করিয়া তোমার নববিধানকে গৌরবান্বিত করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নববিধানে পূর্ণ বিশ্বাস কি?

শ্রীনববিধানাচার্য্য প্রার্থনায় বলিলেন, "যদি মানিতে হয়, ষোল আনা মানিতে হইবে। নববিধান সম্পূর্ণ লইতে হইবে। তা এতে একজন থাকুন, দেড় জন থাকুন। মা আমায় ধমক দিলেন, বল্লেন, এই দেড় আনা, এক আনা, তিন আনা যে যা দিয়েছে, সকলকে এর ভিতর আনলি; আমি বলেছি, ষোল আনা যে দেবে, সেই আস্‌বে। হে প্রাণেশ্বর, গতিনাথ, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকলে এই ষোল আনা বিধি পালন করিয়া, ষোল আনা বিশ্বাস তোমাকে, তোমার বিধানকে, তোমার প্রত্যাদেশকে, তোমার ভক্তকে দিয়া স্বর্গের উপযুক্ত হইতে পারি।"

নববিধানে পূর্ণ বিশ্বাসের প্রথম লক্ষণ, জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস। প্রকৃত বিশ্বাসের অর্থ ই নববিধান-মতে "প্রত্যক্ষ দর্শন"। নববিধানের ঈশ্বর কেবল ঈশ্বর নন, কেবল ক্লীবলিঙ্গ-বাচক "ব্রহ্ম" বস্তুও নন, কিন্তু যিনি "চলেন,

বলেন, খেলা করেন, ভক্তসঙ্গে নিরন্তর"। তিনি দূরবর্ত্তী আদি যুগের "তিনি" নন, মধ্য যুগের জ্ঞান-বুদ্ধি-সিদ্ধ "তুমিও" নন, কিন্তু স্বয়ং জীবন্ত "আমি আছি" বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। "হে সত্যস্বরূপ, আমাদের নিকট প্রকাশিত হও" এই প্রার্থনার তিনি অপেক্ষা করেন না। শিশু না চিনিলে, না জানিলে, না ডাকিলেও যিনি "মা" হইয়া সন্তানকে লালন পালন করিতে সদা ব্যস্ত, এমন যিনি; তাঁহার দর্শন শ্রবণ যে সহজ-সিদ্ধ, ইহাই নববিধানের প্রথম পূর্ণ বিশ্বাস।

দ্বিতীয় বিশ্বাস, নববিধান যথার্থ নববিধান। ইহা বিধাতার বিধান, ইহাতে কোন মানুষ মধ্যবর্ত্তী নাই, মানুষের হাতে এ বিধান নয়। বিধাতা স্বয়ং পবিত্রাত্মা-রূপে মানবাত্মাকে অধিকার করিয়া, তাঁহারই পরিচালনায় ধর্ম্মের পথে, পরিত্রাণের পথে পরিচালন করেন। এঞ্জিনের কলে যেমন রেলগাড়ী চলে, মানুষকে বা কোন জীব জন্তুকে তাহা ঠেলিয়া লইয়া যাইতে হয় না, তেমনি নববিধানের রথ পবিত্রাত্মার ইচ্ছায় চলে, মানবের পুরুষকার বা সাধন-বলে চলে না। এইটী পূর্ণ বিশ্বাস করিলে তবে নববিধানে ধর্ম্মসাধন হয়। ধর্ম্মসাধনে বা নববিধানের জীবনলাভে পবিত্রাত্মা স্বয়ং সহায় ও পরিচালক। মানুষ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলে জীবনরথ বন্ধ হইয়া যায়। নববিধান কোন বিশিষ্ট দল, মত, সম্প্রদায় নয়; ঈশ্বর যেমন সর্ব্বময়, নববিধান তেমনি সর্ব্বধর্ম্মময়, সর্ব্বদেশময়, সার্ব্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক। সকল সত্য, সকল ধর্ম্ম, সকল সাধু, সকল শাস্ত্র, সকল সাধন ইহার অন্তর্গত; ইহা অখণ্ড, অদ্বৈত ও নিত্য নূতন। ক্রমোন্নতির প্রবাহ ইহার বিশেষত্ব।

নববিধানের তৃতীয় বিশ্বাস, জীবন্ত প্রত্যাদেশ। বিবেক বুদ্ধি বিচারের দ্বারা নববিধান সিদ্ধান্ত হইবার নহে, ইহার সকল কর্ম্ম, সকল ব্যবস্থা জীবন্ত ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে সিদ্ধ। নববিধান-বিশ্বাসী হুকুমের চাকর, তাহার নিজের বলিতে কোন ইচ্ছা, রুচি, মত, ধর্ম্ম কিছুই নাই। এই পূর্ণ বিশ্বাস।

নববিধানের চতুর্থ বিশ্বাস, নববিধানের মানুষে বিশ্বাস, নবভক্তে বিশ্বাস। নববিধান এক মানবাকারে মূর্ত্তিমান হইয়াছে, জীবনে প্রমাণিত হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস বিনা নববিধান আকাশ কুসুম মাত্র। ইনি ঈশ্বরস্থানীয় ত ননই, ইনি আপনাকে গুরু, মধ্যবর্ত্তী বা ভক্ত-স্থানীয়ও বলিয়া ঘোষণা করেন নাই; সুতরাং তাঁহাকে সে ভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়া কাহারও ভ্রান্তিতে পড়িবার আশঙ্কা নাই। যাঁহারা তাহা মনে করেন, তাঁহারা নববিধান-বিশ্বাসী নন। তবে ভক্তগণ-স্থানীয় না হইলেও, ইনি জীবনে নববিধানকে মূর্ত্তিমান করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে। তিনি তাই বলিয়াছেন, "সাধুদের সহিত কিছুতেই তুলনা হয় না, কিন্তু তাঁহাদের সহিত একই ব্যবসায়, তবে তাঁহারা ব্রাহ্মণ, আমি চণ্ডাল।" "আমি পাপী। পরিবর্ত্তিত পাপী এই বিধানে দেখা যায়।" "আমি পাপীর সর্দ্দার। একটা কালো ছেলে মার কাছে দৌড়ে যাচ্ছে।" ইঁহাকে পূর্ণ বিশ্বাস না দিলে, আমরা যে পাপী হইয়াও পরিবর্ত্তিত হইব, কালো ভাল হইব, কাল ছেলে হইয়া অনন্ত মার প্রেম-কোলের দিকে দৌড়িয়া গিয়া উন্নত হইতে আরও উন্নত হইতে পারিব ও জীবনে উদ্ধার পাইতে পারিব, কেমনে বিশ্বাস করিব? তিনি সমগ্র মানবকে আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া অখণ্ড মানবজীবন লাভ করিয়াছেন, ইহাও পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার সহিত "সমবিশ্বাসী, সমযোগী, সমভক্ত হইয়া" ও তাঁহাকে সেই একই মার সন্তান ভাই বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক, পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইব, ইহা পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস না করিলে আমরা নববিধান-মূর্ত্তিমান-জীবন কেমনে লাভ করিব? এই জন্য নববিধানের ভক্তকে পূর্ণ বিশ্বাস দিতে হইবে, অন্যথা নববিধান-বিশ্বাসী হইতে পারিব না। এ সম্বন্ধে যে আশঙ্কা হয়, তাহা পূর্ণ বিশ্বাসের অভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। পূর্ণ বিশ্বাসীর ইহাতে আশঙ্কা কুত্রাপি নাই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

মনের চিন্তা।

সঙ্গ দ্বারা মানুষকে চেনা যায়, তেমনি চিন্তা দ্বারা আমরা কে কোন অবস্থায় অবস্থিত, বুঝিতে পারি। মন যদি সর্ব্বদা সচ্চিন্তাশীল হয়, ভগবচ্চিন্তায় রত রয়, কেমনে আমি তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিব, কেমনে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব, ইহাই যদি সর্ব্বদা চিন্তা করি, তবেই বুঝা যায়, মনের গতি স্বর্গের দিকে। যদি মন সর্ব্বদা বিষয়-চিন্তা করে, পার্থিব অর্থ-চিন্তা করে, কামনা বাসনা চরিতার্থ করিবার বিষয়ে চিন্তাশীল হয়, তাহা হইলেই বেশ বুঝা যায়, ধর্ম্মের প্রভাব মনের উপর পড়ে নাই। মনপ্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইলে কখনই অসার বিষয়-চিন্তায় ভুলিয়া থাকিতে পারে

না। সর্ব্বময় ঈশ্বর বিদ্যমান, যিনি ইহা বিশ্বাস করেন, তাঁহার চিন্তাও ঈশ্বরের দ্বারা অধিকৃত হইবেই হইবে।

প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা।

ব্রহ্মোপাসনায় প্রকৃত অর্থ ব্রহ্মের সমীপস্থ হওয়া। যথার্থ ব্রহ্মের সমীপস্থ যখনই মন হয়, তখনই তাঁহার প্রভাব, তাঁহার প্রেরণা দ্বারা মন অধিকৃত এবং অভিভূত হয়। তৃণখণ্ড যেমন অগ্নিকুণ্ড স্পর্শ-মাত্র অগ্নিময় হয়, তেমনি জীবন্ত ঈশ্বরের প্রভাব জীবন্ত অগ্নির ন্যায় মন প্রাণ জীবনকে অধিকার করিয়া থাকে। তাঁহার প্রভাবে আসিলে, আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম আর আমার থাকে না। যথার্থ ব্রহ্মোপাসনা করিলে ব্রহ্মগ্রস্ত হইতে হয়।

মৃত্যুতে ব্রহ্মপ্রাপ্তি।

দেহের মৃত্যুকে সাধারণ হিন্দুগণ বলেন, "কৃষ্ণপ্রাপ্তি"। আমিত্বের মৃত্যু হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এ জীবনে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। আমিত্ব থাকিতে কিছুতেই আমরা ব্রহ্মদ্বারা প্রাপ্ত বা অধিকৃত হইতে পারি না। 'আমি' মরিলেই আমি ব্রহ্মে সঞ্জীবিত হই, সেই প্রাণের প্রাণে প্রাণ বাঁচিয়া উঠে। এই জন্যই কবীর বলিলেন, "কবীর জা দিন হউ মুয়া পাছে ভাইয়া আনন্দ। মোহি মিলিউ প্রভু আপনা সঙ্গী ভজহি গোবিন্দ॥" কবীর কহেন, যেদিন আমার আমিত্বের মৃত্যু হইল, সেই দিন মৃত্যুর পর আনন্দ হইল। প্রভু আমার সহিত মিলিত হইলেন এবং আমার সঙ্গীরাও স্বর্গদাতা ঈশ্বরের ভজনা করিতে লাগিল।

শ্রীমহম্মদ।

"ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই" এই মহাসত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মহাপুরুষ শ্রীমহম্মদ প্রেরিত। যদিও প্রাচীন বৈদিক বিধানে "একমেবাদ্বিতীয়ং" ঘোষিত হইয়াছিল, ইহুদী বিধানেও একমাত্র জিহোভাই পূজিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী পৌরাণিক ধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের অপভ্রংশ ভাব হইতে জড়-পূজা ও পৌত্তলিকতা দ্বারা জগৎ ছাইয়া যায়। তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে, সম্পূর্ণ জড়-বাদ-বিবর্জ্জিত আধ্যাত্মিক এক ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে শ্রীমহম্মদের শুভাগমন। গত মাসে তাঁহার জন্মদিন ও তিরোভাবের দিন সাধনে নববিধানের নবালোকে আমরা ইহাই উপলব্ধি করিলাম, শ্রীমহম্মদ ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসের যে ভিত্তি স্থাপন করিলেন, নববিধান সেই ভিত্তির উপরই মানবের একত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্ম্ম-বিধানের পূর্ণতা সমাধান করিতে আসিয়াছেন।

জন্মাষ্টমী।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-তিথি জন্মাষ্টমী। খৃষ্ট-জগতে শ্রীখৃষ্টের স্থান যেমন, হিন্দু-জগতে শ্রীকৃষ্ণের স্থানও সেইরূপ। কিন্তু শ্রীখৃষ্টের জীবন ঐতিহাসিক ভিত্তিতে সংস্থাপিত, শ্রীকৃষ্ণের জীবন পৌরাণিক কাহিনীতে নিবদ্ধ। তাঁহার জীবন-কাহিনী বাস্তবিক এতই প্রহেলিকা-পূর্ণ যে, তাহার ভিতর হইতে সত্য ইতিহাস উদ্ঘাটন করা নিতান্তই কঠিন। তবে নববিধান কি না সকল মৃত বিধানকে নবজীবন দিবার জন্য সমাগত; তাহার প্রভাবে আমরা শিখিলাম, শ্রীকৃষ্ণ যোগ, বিশ্ব-প্রেম, সংসার-সংগ্রামে বিষয়-জ্ঞান ও নিষ্কাম-ধর্ম্ম একাধারে শিক্ষা দিবার জন্য ঈশ্বর-প্রেরিত। সুতরাং নববিধানের যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মের সমন্বয়ের ভিত্তি তাঁহার জীবনে বিলক্ষণ পাওয়া যায়। পৌরাণিক কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া এই মহাজীবন নবালোকে অধ্যয়ন ও অনুসরণ করিলে, আমরা নববিধানের পূর্ব্বাভাস এই জীবন হইতে উদ্ঘাটন করিতে পারি।

মহাত্মা রাজা রামমোহন বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ।

"প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজের কথা মনে হইলেই এই দেশের প্রথম বন্ধু রাজা রামমোহনকেই স্মরণ হয়। তাঁহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ ছিল, বুদ্ধিও তেমনই সারবান ছিল। শ্রদ্ধা ভক্তি হৃদয়ের ধনও তাঁহার সেই প্রকার ছিল। এখন প্রথমেই তাঁহার মুখশ্রী আমার চক্ষের সমক্ষে আবির্ভূত হইতেছে। তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধাতে উজ্জ্বল মুখ, তাঁর সেই উদারভাব, সমুদয় যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁর শরীরের বল, মনের বীর্য্য, হৃদয়ের ভাব সকলই অনুরূপ। ধর্ম্মের উন্নতির জন্য তিনি এখানে উদিত হন। তিনি জীবনের প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত একাকী অসংখ্য প্রকার পৌত্তলিকতার সহিত নিরন্তর যুদ্ধ করিলেন এবং সকলকে পরাভূত করিয়া অবশেষে গঙ্গা-স্রোতের উপর এই সমাজ-রূপ জয়-স্তম্ভ নিখাত করিলেন। * * তিনি যে সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়কার ভীষণ সামাজিক ভাব ও অবস্থা মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন অন্ধকারের কাল, রজনীর কাল, এখন আমরা সে সময়ের ভাব বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না, যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নামে সকলে খড়্গহস্ত হইত। বঙ্গভূমি নিবিড়ান্ধকারাবৃত অরণ্যভূমি ছিল; ভ্রষ্টাচারের পিশাচ সকল তাহাতে রাজত্ব করিত। তিনি একা শত সহস্র শত্রু দ্বারা আবৃত হইয়া কুঠার হস্তে সেই ঘোর অবিদ্যারণ্য সমভূমি করিয়া দেশোদ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অবশেষে তাহাতে ব্রাহ্মসমাজরূপ বীজ বপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংসারের মধ্যে আনয়ন করিলেন। এখন তো দিনে দিনে জ্ঞান-প্রভাবে বঙ্গদেশের ধর্ম্মক্ষেত্রে কৃষি-কার্য্যের সুবিধা ও ফলের প্রাচুর্য্য হইয়া আসিতেছে। তখন সে প্রকার ছিল না। তখন বিংশতি বৎসরে যাহা হইত, এখন এক বৎসরে তাহা সম্পন্ন হয়। যে সময়ে তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি ভিন্ন আর কেহই ব্রাহ্মধর্ম্মকে এ সংসারে

আনিতে পারিতনা। তাঁহার প্রখর জ্ঞানাস্ত্রে কুসংস্কাররূপ অরণ্য ছিন্ন ভিন্ন হইল। তাঁহারই দুর্দ্ধর কিরণে প্রথম আলোক তাহাতে প্রবিষ্ট হইল। * * ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের জন্য তাঁর কত যত্ন করিতে হইয়াছিল; তাঁর ধন গেল, সমুদয় বিষয় গেল, দিল্লির বাদসাহের বেতন-ভোগী পর্য্যন্ত হইয়া জীবন পোষণ করিতে হইয়াছিল! তখন তাঁর মনে এই আনন্দ ছিল যে, ভবিষ্যদ্বংশ আমার আশা সফল করিবে। তাঁর এই ভাব ছিল যে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন; আমরা একত্র হইয়া ইহাকে ব্যবহার করিব, আমরা কর্ষণ করিয়া ইহাকে উর্ব্বরা করিব। অতএব রামমোহন রায় আপনার গৃহকার্য্যে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার শতগুণ এক ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংস্থাপনের জন্য করিতে হইয়াছিল। একদিনের জন্য নয়, এক মাসের জন্য নয়, কিন্তু ষোড়শ হইতে উনষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত ইহাতে সমান ভাবে তাঁহার যত্ন ছিল। তাঁহার সেই যত্নের ফল দেখিয়া কি আমাদের উৎসাহ-বর্দ্ধন হইতেছেনা? যে মহাত্মা আপনার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, আমরা যেন তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করি। * * যখন কলিকাতায় তিনি প্রথম বাস করেন, যখন তিনি ১৭৩৬ শকে একাকী বিদেশী উদাসীনের ন্যায় এখানে আসিলেন, তখন কে তাঁহার সহযোগী হইয়া সাহায্য দিতে পারে? তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে ও ধর্ম্মের অনুরাগে বিষয়ী লোকদিগকে আপনার পথে আকর্ষণ করিয়া ছিলেন। যখন প্রথম তিনি কলিকাতা নগরে আসিলেন, তখন লোকেরা তাঁহাকে ধর্ম্মচ্যুত, ধর্ম্মভ্রষ্ট, নরকে পতিত বলিয়া তিরস্কার করিত; তাঁহার মুখ দর্শন করিতে নাই, এই প্রকার বাক্য সকল তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করিত। তাঁর কি এমন বল ছিল যে, সেই বলে লোকের হৃদয় ও মন আকর্ষণ করিতেন; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সে সময়কার কলিকাতার ক্ষমতাপন্ন অনেক বড় মানুষ তাঁহার সহচর ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিষয়ীদিগের কিসের সম্বন্ধ ছিল? আপনার ধর্ম্মমূর্ত্তিদ্বারা তিনি তো সকলকে বশীভূত করিতেনই, তদ্ব্যতীত, তিনি নানাপ্রকারে বিষয়ীদিগের বিষয়ের উন্নতি করিয়া দিতেন এবং বিষয়ীরা বিনিময়ে কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে সাহায্য করিতেন। ধর্ম্মের উন্নতি তাঁহাদের লক্ষ্য ছিলনা, কিন্তু তাঁহার সদ্ভাব দেখিয়া তাঁহারা বশীভূত হইতেন, এবং প্রত্যুপকার বলিয়া রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম-প্রচারে সাহায্য করিতেন। * * * * একদিন রামমোহন রায় বলিলেন যে, ভাল ভাল গায়ক সকল সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত দিলে ভাল হয়. অমনি গুণী গায়ক সকল সেখানে একত্রিত হইল এবং নানা ভাবের সঙ্গীত চলিল। রামমোহন রায় বলিলেন, ওসব কেন? "অলখ নিরঞ্জন" গাও, তখন ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে একটুকুও তখন কাহারও বুঝা হয় নাই যে, ব্রাহ্ম সমাজে সঙ্গীত গাইতে বলিলে ঈশ্বরের সঙ্গীত গাইতে হইবে।

১৭৫১ শকে ব্রাহ্মসমাজ এখানে উঠিয়া আইল, সেই শকে সতীদাহ হওয়াও নিবারিত হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী ধর্ম্ম-সভাও স্থাপিত হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব সেই সভার সভাপতি ছিলেন। তখন সমাজের প্রতি অনেকেই নিন্দাবাদ করিতেন। কেহ বলিতেন, তথায় নাচ, তামাসা, নৃত্য, গীত হয়; কেহ বলিতেন, তথায় সকলে মিলিয়া খানা খায়, ও শেষ এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের উপরে মনের দ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেন যে, ব্রহ্মসভার দল সহমরণ-নিবারণের দল। ধর্ম্মসভা সতীদগ্ধ করিবার দল। এই দুই দলের মধ্যে কে জয়ী, আর কে পরাজিত, তাহা আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু সে সময়ে ধর্ম্মসভা প্রবল ছিল, এবং ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অতি সঙ্কট কাল ছিল। কেহ বলিতেন, ব্রাহ্মসমাজ জ্বালাইয়া দিবেন, কেহ বলিতেন, রামমোহন রায়কে মারিয়া ফেলিবেন; কিন্তু তিনি গম্ভীর ভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন, কোন সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গা বা জগন্নাথের যাত্রী দূর হইতে পদব্রজে আইসেন, তেমনি তিনি তাঁহার শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মানিকতলা হইতে পদব্রজে এই সমাজে আসিতেন। যাইবার সময় গাড়ী করিয়া যাইতেন। এই একটী তাঁহার অতীব শ্রদ্ধার ভাব ছিল। তখন ইংরাজেরাও তাহাতে যোগ দিতেন। তখনকার লোকদিগের মধ্যে সমাজের সহিত এখন আর কাহারও যোগ দেখা যায় না; কেবল তখনও যে বিষ্ণু গান করিত, এখনও সেই বিষ্ণু আছে।"

—•—

প্রেরিত ভাই কেদার নাথ দে।

দৈনিক জীবন।

ঋষি কেদার প্রতিদিন কিরূপ ভাবে সারাদিন কর্ত্তন করিতেন, তাহা শুনিলে বুঝিতে পারা যায়, ব্রহ্মময় জীবন তিনি যাপন করিতেন। বিষয়ের মধ্যে ভগবানের আদেশ পালন করিয়া, প্রতি কার্য্যে তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া, ঋষি কেদার জীবনকে পবিত্র রাখিতেন। সচরাচর তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

গাত্রোত্থান করিয়া অতি প্রত্যূষে নাম গান করিতেন। তৎপরে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সংবাদ-পত্রিকাদি পাঠ করিতেন। পরে স্নান। তাঁহার প্রতিদিনের স্নান একটী পবিত্র জলাভিষেক বোধ হইত। ধৌত পরিষ্কৃত স্নানাগারে জপ করিতে করিতে প্রবেশ করিতেন। স্নানাবগাহনকে তিনি একটী পবিত্র তীর্থ-সম জ্ঞান করিতেন। মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে স্নান করিতেন। সাধু সাধ্বীগণের নাম, সকল দিকের নাম, নদ নদীর নাম, আবার হরি নামের নানাবিধ মন্ত্র সকল স্নানের সময় অনর্গল উচ্চারণ করিতে থাকিতেন। স্নানান্তে নালতে আদা ইত্যাদি ঔষধ হিসাবে মুখে দিয়া উপাসনায়

যাইতেন। দুই ঘণ্টা তাঁহার উপাসনার সময় ছিল। প্রাতে পারিবারিক উপাসনাও হইত এবং তাহার পরে আহারাদি করিয়া officeএ কর্ম্ম-স্থলে যাইতেন। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে ব্রত লইয়া স্বপাক আহারও করিতেন। তাহা হইতে প্রতিদিন একটী ক্ষুধিত দরিদ্রকে ভোজন করাইয়া পরে নিজে খাইতেন। দাস-গণের প্রতি আদেশ ছিল, প্রতিদিন তাহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া আসিত।

এ বিষয়ে একটা গল্প বলি। একদিন একটা ভিখারী আসিয়া খাইতে বসিল। তাহাকে অন্ন ব্যঞ্জন ডাল ইত্যাদি পার-বেশন করা হইলে, সে খাইতে আরম্ভ করিয়াই বলিল, "ঘন সারা লে আয়ো"। তৎপর বাড়ীতে আলাদা ঠাকুর যে সব অন্ন ব্যঞ্জন সকলকার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাও দেওয়া হইল। তখন পর্য্যন্ত ঐ বাণী শুনা যাইতে লাগিল, "ঘন সারা লে আয়ো"। তখন পরিচারকগণের যত রন্ধন হইয়াছিল, তাহাও সেই ভিখারীকে ঢালিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মার কাছে শুনেছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত নাকি সেই একই শব্দ সে উচ্চারণ করিয়াছিল। হয়ত এ ভবে এইরূপ অনাচারী ক্ষুধাতুর মানুষ কেহ কেহ থাকে, চির জীবন না খাইতে পাইয়া বা অল্প খাইয়া খাইয়া খাবার সামগ্রীর প্রতি এইরূপ আগ্রহ হয়।

কেদারনাথ যখন তখন বা যেখানে সেখানে কিছু খাইতে ইচ্ছা করিতেন না। Officeএ কখন জল খাবার খাইতেন না। সেজন্য office হইতে সায়ংকালে গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে আর খাওয়া হইত না। তাঁহার জীবন অত্যন্ত সাত্ত্বিক ছিল। office হইতে আসিয়া স্নানাদি সমাধা করিয়া তাহার পর কিছু জলপান করি-তেন। খাইতে বসিলে সকলকার হাতে না দিয়া কখনও প্রায় খাওয়ার অভ্যাস ছিল না। ভগবানের কৃপায় কেদারনাথ পাঁচটী পুত্র ও চারটী কন্যা লাভ করিয়াছিলেন। শিশু ও বালক বালিকা দিগকে বড় ভাল বাসিতেন। এমন কি, প্রতিবেশী অন্যান্য ছেলে মেয়েদের এবং নিজের ছেলে মেয়েদের তাঁহার চারিধারে বসাইয়া খাইতেন এবং তাহাদেরও দিতেন। তাহা না হইলে যেন তাঁর আহারই সুখে সম্পূর্ণ হইত না। ১৮৮২ অব্দে কমল কুটীরের সম্মুখে একটী বড় বাড়ীতে যখন Victoria College এবং School হইত, তাহাতে তিনি পড়াইতেন এবং থাকিবার জন্য Quarter পাইয়া ছিলেন। কমলকুটীর হইতে উপাসনার পর বাড়ী আসিয়া ভোজন করিতে বসিলে শ্রীমদাচার্য্যদেবের শিশু কন্যাটীও তাঁর ছেলেদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিত। তিনি তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং বলিতেন, সুজাতার পরমান্ন খাইয়া বুদ্ধের মত আমারও নির্ব্বাণ লাভ হবে, এই বলিয়া তাহার হাতে ভাত দিয়া আবার চাহিয়া খাইতেন। শিশুর মাতা শুনিয়া বলেছিলেন, বাড়ীতে খাওয়ান কঠিন, ভক্তের হাতে ওর মিষ্টি লাগে। তদানীন্তন প্রাতের উপাসনার পর কমল সরোবরের নিকট গাছতলায় প্রচারকেরা মিলিয়া স্বপাক অন্ন খাইতেন, আবার সময়ে সময়ে বন্ধও থাকিত। মনে পড়ে, আমরা তাহাকে গাছতলার খাওয়া বলিতাম। কতদিন জিজ্ঞাসা করিতাম, বাবা, তুমি আজ গাছতলায় খাবে?

ঋষি কেদারনাথের কাছে কত যে সাধু সন্ন্যাসী ফকির ইত্যাদি ধর্ম্ম-পিপাসু লোক আসিতেন, তাহার সংখ্যা হয় না। যথার্থ ধর্ম্ম-প্রার্থীদিগকে লইয়া তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্ম্মালোচনা করিতেন। ধর্ম্ম-কথা পাইলে তাঁহার অন্য বিষয় স্মরণে থাকিত না। কথাবার্ত্তা বলিয়া বা কোন দিন কাহারও বাড়ী গিয়া, ধর্ম্ম-মন্দির, দরবার-সভা এ সকলেতে সন্ধ্যা কর্ত্তন করিতেন। অনেক রাত্রে ছয়খানি ফুলকা লুচি তাঁহার আহার ছিল। শিশু বয়স হইতে কেদারনাথ মাতৃহীন হইয়া অতিশয় ক্ষীণজীবী এবং অল্পাহারী ছিলেন। পিতার কাছে কত গল্প শুনিতাম। একবার বলিয়াছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ী তাঁহারা নবরন্দাবন অভিনয় করিতে যাইতেছেন, সকলে কমলকুটীরে একত্রিত হইয়াছেন, এমন সময় কাকাবাবু বাসী লুচি লইয়া আসিলেন, খেজুরের গুড় দিয়া সকলে খাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন। প্রচারক-জীবনে কত অনাহারে গিয়াছে, কিন্তু এ রকম জিনিস খাইতেন না। তাই মহেন্দ্র নাথ ইত্যাদি কেহ কেহ বলিলেন, খাননা মশাই, বাসি লুচি গুড় দিয়ে যেমন ভাল লাগে, এমন আর কিছু না। সকলে অনুরোধ করায় তিনি এক আধখানা খেলেন। তারপর অত বড় লোকের বাড়ী থিয়েটার করিতে গিয়াছেন, সেখানে দেখেন, মহা আয়োজন। থিয়েটারে যেমন সাজ ঘরেই সব খাওয়া হয়, তেমনি পাত্র ভরিয়া ভরিয়া গরম লুচি তরকারি থেকে বড় বড় রাতাবি সন্দেশ ক্ষীরমোহন প্রভৃতি নানা উপাদেয় দ্রব্য আসিতে লাগিল। সকলেই খুব খাইতে লাগিলেন, কিন্তু বাবা সেই একটুখানি বাসী লুচি খাওয়ার দরুন সেখানে এত অসুখ বোধ করিলেন যে, আর কিছু খাইলেন না। মনে আছে, বাবার কাছে এ কথা শুনিয়া ভারী দুঃখ হইয়াছিল।

কেদার নাথ নিজে যেমন সাত্ত্বিক ভাবে দিনগুলি যাপন করিতেন, পরিবারের সকলকেও সেই ভাবে দেখিতে চাহিতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমনোমতধন এবং মেজ শ্রীমনোরথ ধনকে জন্মাবধি অনেকদিন পর্য্যন্ত নিরামিষ খাওয়াইয়া ছিলেন। কেদারনাথের সংসারের সকলই শুদ্ধতা-বিমণ্ডিত ছিল। তাঁহার স্বর্গের আশীর্ব্বাদ সেথায় আজিও বিভাসিত। উপমা দিয়া বলিতে গেলে বলা যায়, বাড়ীতে একটা পেঁয়াজের খোসা দেখিলেও দুঃখিত হইতেন। ইদানীং প্রচারক হওয়ার পর অনেকে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। একবার পশ্চিমে থাকা কালীন চারিদিকে খুব অসুখ হইতেছিল। ডাক্তার বলিলেন, পেঁয়াজ খাওয়া ভাল। বাবা জীবনে ইহা স্পর্শও করেননি, তবুও ডাক্তারের কথা বলিয়া বলিয়াছিলেন, আমি চেষ্টা করিব, একটু ঘি দিয়া ভাজিয়া রাখিও। কিন্তু তিনবার গিলিতে গিয়া উদ্‌বমন হইয়া আসিল, কাজেই আর খাওয়া হইল না।

কেদার নাথ সকল স্থানেই অবস্থান কালে ধর্ম্ম-বিষয়ে যোগ দিতেন। অমৃতসরে যখন বদলী হইয়া আসিলেন, প্রতিদিন গুরু-দরবারে কীর্ত্তনে উপস্থিত থাকিতেন। সঙ্গীত তাঁহার প্রিয় ছিল। সেই সময় শ্রীমদাচার্য্যদেব অনেকগুলি প্রেরিত ভাই এবং ব্রাহ্মবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া প্রচারে বহির্গত হন। নানাস্থান হইয়া অমৃতসরে কেদারনাথের আবাসে উপনীত হন। তাঁহাদের সঙ্গে মোড়পুকুরের প্রসন্ন বাবু এবং কলিকাতার ধনী ব্রাহ্ম জয়গোপাল সেন অমৃতসরে আসিয়াছিলেন। তৎকালে ঋষি কেদার গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া কিরূপে ভক্ত-সেবা ও আতিথ্য করিতে হয়, তাহার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছিলেন। সকলকে খাওয়াইয়া বড় সুখী হইতেন। দেশে বিদেশে অতি যত্নে সেবার জন্ম তাঁহার অনেক খ্যাতি শুনিয়া আসিয়াছি। ইদানীং প্রচারক-জীবনে অর্থের অসচ্ছলতা সত্ত্বেও হাতে কিছু পাইলেই খাওয়াইতেন। কিন্তু নিজ আহারে বিহারে সকল বিষয়ে সমভাবে চির জীবন বৈরাগ্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

যখন শ্রীমদাচার্য্যদেব কেদার নাথের আলয়ে ছিলেন, স্বদলে একদিন নানকের গুরুদরবার দেখিতে গেলেন। শ্রীনানকের শিষ্য গুণবান্ ও জ্ঞানী ভক্তগণের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধর্ম্মালাপ হইল। অতি প্রত্যূষে বাড়ীর ফটকে ডাকাডাকি শুনা গেল। কেদারনাথ গিয়া দেখিলেন, গুরুদরবারের কয়েকটী ভক্ত। তাঁহারা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে চান। বৈঠকখানায় তাঁহাদিগকে বসাইলেন। যথাসময়ে শ্রীমদাচার্য্যদেব উপস্থিত হইবামাত্র, এক অতি ব্যাকুল ভগবৎ-পিপাসু ব্যক্তি তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া ক্রন্দন-রত-বদনে বলিতে লাগিলেন, রাত্রে আমি ঘুমাই নাই, আপনাকে চিনিয়াছি, আপনি আমাকে ব্রহ্মকে চিনাইয়া দিন। শ্রীমদাচার্য্যদেব হাত ধরিয়া তুলিলেন, অনেক উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন, গুরু কেহই নাই, স্বয়ং হরি সকলকে দেখা দিতেছেন এবং সর্ব্ব বিষয় অন্তরে বুঝাইয়া দিবেন। পিপাসু ব্যক্তি সময়ে তাঁহাকে নিশ্চয় পাইবে। তুমি পিপাসিত, অতএব তুমি ভগবান্‌কে পাইয়াছ, ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীহেমলতা চন্দ।

সাকার ও নিরাকার।

(২য়)

বিগত ১৬ই আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে শীর্ষোক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে যাহা নিবেদ্য, তাহার কতকটা নিবেদন করিয়াছি। ভারতীয় ঋষি মুনির নিকট ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে যে বিশেষভাবে ঋণী, তাহা কেনা স্বীকার করিবেন? সাধক হিন্দু সাকার পথে গিয়াও নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছেন। সাকার মূর্ত্তির ভিতরেও নিরাকার ব্রহ্ম-দর্শন সাধকের ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সাকার মূর্ত্তিকে "জগন্নাথ" "বিশ্বনাথ" "বাগ্ময়" "চিন্ময়" "শিব" "নারায়ণ" "গৌরী" "হরি" প্রভৃতি নাম দিয়া সেই নিরাকার ভাবেরই ধ্যান ধারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের উচ্চারিত সেই "জগন্নাথ" "বিশ্বনাথ" নাম কি সেই জগদ্ব্যাপী অরূপ বিশ্বরূপের সাধনা নহে? যখন তাঁহারা তাঁহাকে "বাগ্ময়" "বাগ্দেবী" প্রভৃতির ভাবে পূজা করিয়াছেন, তখন কি তাঁহারা তাঁহাকে বাক্‌স্বরূপ অনুভব করিয়া পূজায় অঞ্জলি দান করেন নাই? তাঁহারা তাঁহাকে "শিব" বলিয়া চিনিয়া তাঁহার মঙ্গলময় ভাব সাধনের সাক্ষ্য দান করেন নাই? যখন তাঁহাকে "নারায়ণ" বলিয়া ভাবিয়াছেন, তখন নরের ভিতর তাঁহার প্রকাশ অনুভব করিয়াছেন। এই স্থানেই পাশ্চাত্যের "God in man এবং "Man in God" সাধনার পরিচয়। যখন তাঁহার "গৌরী" রূপ দর্শন করিয়াছেন, তখন সেই বাক্যময়ী ও বিশ্ব-বেষ্টন-রূপ মহাভাবের পরিচয় পাইয়াছেন। এই স্থানেই পাশ্চাত্যের "Logos" এবং "All-encompassing Being" ভাবের সাধনা। "গৌরী" শব্দ সংস্কৃত "গুর" এবং "গুড়" এই দুই ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই দুই ধাতুর অর্থ পর্য্যায়ক্রমে "কথা কহা" এবং "বেষ্টন করা"। যে ভাবে তিনি "শালগ্রাম" নামে অভিহিত হইয়াছেন, সে ভাবের অর্থ "Indwelling and Presiding Deity" অর্থাৎ যে দেবতা মানব-গৃহে বাস করিতেছেন। তাঁহার Saving grace এর অনুভূতি হইতেই "হর" ও "হরি" ভাব তাঁহাদিগের ভিতর আসিয়াছিল। ভারতীয় ঋষি মুনিদিগের মহাভাব ব্রাহ্মধর্ম্ম অর্থাৎ তাঁহার "নববিধান" পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীমদ্‌ব্রহ্মানন্দের ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভক্ত বৈষ্ণব পরিবারের ভক্তির দোলায় যিনি লালিত পালিত পরিপুষ্ট হইয়া ছিলেন, তিনি নববিধানেও এই ভাবের মধ্যেই আরও পরিপুষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম মতের ধর্ম্ম নহে। ইহা Dogmatic অথবা Theoretic নহে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ের সাধন-রাজ্যের ভিতরে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থান। "Gather ye the harvests of East and West." ব্রহ্মানন্দ-সাধিত এই মহাসাধনার ভিতরে নববিধান তাঁহার প্রাণপ্রদ মহাশস্য বিধান জন্য "Revelation" রূপে অবতীর্ণ। এই Revelationই বিধাতার নূতন দান রূপে পরিচিত হইলেন। তাঁহার পুরাতন ও নূতন সত্য এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত হইয়া তাঁহারই নামে নিবেদিত হইল। পুরাতনের ভিতর নূতন এবং নূতনের ভিতর পুরাতন মিশিয়া গেল। নদীর পুরাতন স্রোত পর্ব্বত নিঃসৃত নূতন ধারার সঙ্গে মিলিত হইয়া নদীর নূতন সৌন্দর্য্য বিধান করে। বহুধারা এক ধারায় মিলিত হওয়া সেই প্রকৃতি-পতির প্রাকৃতিক নিয়ম। গঙ্গা সপ্তধারা রূপে হিমালয়ের কঠিন দার্ঢ্য দেহ ভেদ করিয়া এক স্রোতে পরিণত এবং সাগরসঙ্গমে শত-মুখে সাগরের সঙ্গে মিলিত। ভক্তি-গঙ্গার স্রোত এই রূপই। এক ভক্তবৎসল হইতেই ভক্তি-গঙ্গার উৎপত্তি। ভক্তি-স্রোত যখন তাঁহার

সহিত মিলিত হইতেছে, তখন তাহা শতদিকে শতভাবে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবেই। ভক্তি-প্রধান ভারতভূমিতে ইহার পরাকাষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। ভক্ত ঋষি ও ভক্ত উপাসক ভগবৎ-পূজায় প্রকৃতির সঙ্গেও মিলিয়াছিলেন। প্রকৃতি-রাজ্যে যাহা সুন্দর, তাহারই সহিত মিলিত হইয়া শিবসুন্দরের পূজা করিয়াছেন। পুষ্পের সৌন্দর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারা সুন্দরের উপাসনা করিলেন। ভাবের সঙ্গে ও যোগে পুষ্পকেও সেই ভাবে নাম দিলেন। তরু লতার পত্রের সঙ্গেও এই যোগ রক্ষা করিয়া ব্রহ্মের পূজা করিয়াছেন। তাঁহাদের এ যোগ সম্বন্ধে দুই একটী পুষ্প ও পত্রের নামেই সে ভাব প্রাঞ্জল রূপে প্রকাশিত। জপের ভাবের সঙ্গে মিলিত হইয়া "জবা" নাম, তাঁহার অপরাজেয় শক্তির ভাব লইয়া "অপরাজিতা" নাম আসিয়াছে। তিনি যে অতুলনীয়, সেই মহাভাবের সঙ্গে মিলিত হইয়া তুলসী পত্রের "তুলসী" নাম এবং সাকার ভেদ করিয়া নিরাকার এই ভাবে বিল্বপত্রের "বিল্ব" নাম। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই তাহা প্রমাণ করিতেছে। দেবোপাসনায় ও দেবপূজায় প্রকৃতি-জাত যে যে বস্তু লইয়া দেব চরণে অঞ্জলি বিধান করিয়াছেন, সেই সেই বস্তুর সঙ্গে ভাব ও ভক্তির যোগ রক্ষিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যেও প্রকৃতির সঙ্গে যোগের ভাব আসিয়াছিল। এ ভাবের সামঞ্জস্য সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। পাশ্চাত্যও মিলনের ভাবে পরিচালিত। পাশ্চাত্য ক্রশের (cross) symbol অর্থাৎ প্রতিকৃতি রক্ষা করিলেন। প্রাচীনতম প্রাচ্য ভূমও মানবীয় রিপু-সংহারের ভাবে ত্রিশূলাস্ত্র ধারণ করিলেন। ত্রিশূল অর্থাৎ ত্রিতাপ-বিনাশের তিন অস্ত্রের সমাহার এক অস্ত্রে। প্রাচ্যে দেব-মন্দিরে অহোরাত্র দীপালোক রক্ষার ব্যবস্থা আছে। পাশ্চাত্যেও কোন কোন দেব-মন্দিরে Paschal candle রক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইসলাম-বাদও দেব-মন্দিরে "নূর" অর্থাৎ আলোক রক্ষা করেন। জল-দীক্ষার পবিত্র ভাবের সঙ্গেও ইসলাম-বাদ, হিন্দুবাদ, খ্রীষ্টবাদ প্রভৃতির ভাবের সমতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেই আরবভূম হজরৎ-সম্পৃক্ত জমজমের জল, ভারতে ঋষি-স্পৃষ্ট ভাগীরথীর পবিত্র সলিল এবং সেই তুরস্ক ভূমির মেরী-শিশু ঈশার অবগাহন-পূত জর্ডনের জল একই ভাবে প্রোক্ত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গৃহীত ও ব্যবহৃত হইতেছে। পবিত্রতার প্রতিকৃতি অর্থাৎ symbol স্বরূপ ইহা ব্যবহৃত। এই এই সম্প্রদায়ের ভিতর আরও ভাবের সমতা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে যেমন ভক্ত-দিগের মধ্যে জপমালার প্রথা চলিয়া আসিতেছে, ভক্ত মুসলমান এবং ভক্ত খ্রীষ্টবাদীদের ভিতরেও সে প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। মৌলবী ও পাদরী শ্রেণীর ভিতরেও জপমালার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতীয় ঋষি তাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ব্রহ্মদর্শন ও পাপরিপু পরাজয়ের symbol অর্থাৎ Kindergarten এর পরিস্ফুট ভাব ব্রহ্ম-শিক্ষার্থীর নিকট অন্তরের আবেগের সহিত দেখাইয়া গিয়াছেন। অগ্নি ও আলোক বর্ত্তমানে প্রচলিত Lantern slides এর মত ব্যবহৃত হইয়াছে। অগ্নি যেমন মলিন বস্তুকে দগ্ধ করে, সেই আদর্শে মানবীয় পাপ মলিনতা বিদগ্ধ করিবার symbol স্বরূপ ঋষিগণ হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। আলোক সম্বন্ধেও তাঁহাদের সেই ভাব জাগ্রত ছিল। দীপালোক গৃহের অন্ধকার বিনাশ করে। সেই আদর্শে ভক্ত হিন্দু পূজিত দেবমূর্ত্তির সমক্ষে পঞ্চপ্রদীপের আরতির প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। পঞ্চের অর্থ অত্যন্ত নিগূঢ়। মানব-জীবনে বিবেক, বৈরাগ্য, বিশ্বাস, প্রেম এবং পুণ্যের প্রকাশ ব্যতীত ব্রহ্মদর্শন অসম্ভব। তাই পঞ্চ প্রদীপে এক একটীর আদর্শ স্বরূপ পঞ্চের সমন্বয়ের ভাব দেখাইয়া দিলেন। কিণ্ডারগার্টেনের গুরু ফর্বেল (Fobel) যেমন শিশু-শিক্ষার্থে Kindergarten system এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন, ভারতীয় ঋষিগণও ব্রহ্মবিদ্যালয়ে সেই system এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম-জ্যোতি যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে "জ্যোতির্ম্ময়" বলিয়া ডাকিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্ম শব্দের অর্থই জ্যোতিঃ। নববিধানাচার্য্য ভক্ত ব্রহ্মানন্দও নববিধানে হোম, আরতি ও জল-দীক্ষার মহা আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। যাঁহারা symbol তত্ত্ব বুঝিলেন না, তাঁহারা তাহার ভিতরে Idolর বিভীষিকা দেখিলেন। Symbol Idol নহে। Symbol ব্রহ্মতত্ত্ব-শিক্ষার মানচিত্র। ভক্ত ও বিশ্বাসীর নিকট সাকার বলিয়া কিছুই নাই। সাকারে মহা নিরাকার। কঠিন পাথরের ভিতর নির্ম্মল জল-স্রোত। গুটীর ভিতরে প্রজাপতি। কজ্জলাঙ্কিত চক্ষুই শিশুর নির্ম্মলদৃষ্টির সাহায্য করে। কৃষকের একটী শস্যও তাহার অক্লান্ত শ্রমজাত বস্তু। খোসার ভিতরে সুন্দর উপাদেয় অন্ন। ব্রহ্ম-দর্শন সাধন-সাপেক্ষ। "It is no dogma of books" ইহা পুস্তকের মত নহে। ইহা সাধন-লভ্য বস্তু।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

কে তুমি?

সংসারের শত তীক্ষ্ণ ব্যথা আসি যবে,
অবসন্ন করে মোর অন্তর বাহির,
চারিদিক শূন্যময় হেরি যবে তবে,
কে তুমি ঢালহে প্রাণে আনন্দ গভীর!
ডেকেছ আমারে প্রভু যাই নাই কভু,
এসেছ নিকটে তুমি গেছি আমি সরে',
শত বাহু প্রসারিয়া হে হৃদেশ! তবু,
আমারে রেখেছ নিত্য তোমার ভিতরে।
জীবনের তুচ্ছ ক্ষুদ্র যাতনা সকল,
নিমেষে ভুলিয়া যাই তব মুখ হেরি,
ভুলে যাই আপনারে—হইয়া বিহ্বল,
দেখি শুধু তুমি আছ জগৎটী ঘেরি।

তোমার আনন্দ-মূর্ত্তি যুগ যুগান্তে,
নিত্য নব রূপে দেব উঠুক ফুটিয়া,
প্রেমের প্রতিমা খানি প্রতি প্রভাতে,
প্রেমময় কর যেন দীনের এ হিয়া।

শ্রীযোগীন্দ্র চন্দ্র দাস।

যুগধর্ম্ম।

(এলবার্ট হলে সার্ব্বজনীন ব্রহ্মোৎসবে নিবেদিত।)

যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই ভগবান্ অধর্ম্ম দূর করিবার জন্য তাঁর বিধান পাঠান। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহারই স্বর্গের বিধান। এই বিধানের কথা শুনিলে আমার প্রাণে যেন বিদ্যুল্লহরী খেলা করে, সমস্ত হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। আমি বিধান-ধর্ম্মের একজন অকিঞ্চন উপাসক, তাই সাধ হয়, বিধানের জয় ঘোষণা করি, যুগধর্ম্ম-ভাগবত-কাহিনী বর্ণনা করি। কিন্তু আমি সে দেবভাষা কোথায় পাইব, যাহা ঋষিদিগের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া বেদ রচনা করিল? আমার কি সে সঙ্গীত গাহিবার শক্তি আছে, যাহা বৈষ্ণবের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া বঙ্গে ভক্তির ধারা প্রবাহিত করিল? তথাপি ইচ্ছা হয় যে, আমার এক কণ্ঠ যদি সহস্র কণ্ঠে পরিণত হইত, আমার ক্ষীণ স্বরে যদি বজ্রের তেজ অবতীর্ণ হইত, তাহা হইলে দুই এক কথা বলিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতাম। মহাশক্তিশালী ভগবান্ যেমন এক ফুৎকারে প্রলয় সংঘটন করিতে পারেন, সেইরূপ এক মুহূর্ত্তে বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিতে পারেন। তাঁহার কৃপাই ভরসা।

যুগধর্ম্ম-ভাগবতের প্রথম কথা কি? বিশ্বাস। যে বিশ্বাস পাহাড়কে স্থানান্তরিত করিতে পারে, যে বিশ্বাস প্রস্তরকে অন্ন জলে পরিণত করিতে পারে, সেই বিশ্বাস। বিশ্বাসের এক ধারা ভগবানের বক্ষ হইতে উত্থিত হইয়াছে, আর এক ধারা মানবের বক্ষ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। শ্রীবুদ্ধদেব তাই বলিয়াছিলেন যে, আমার অঙ্গ হইতে মাংস যদি খসিয়া পড়ে, আমার অঙ্গ যদি ধূলির সহিত মিশিয়া যায়, তথাপি আমি সিদ্ধি-লাভ না করিয়া তপস্যার স্থান পরিত্যাগ করিব না। ভগবানে অনন্ত বিশ্বাস ও নিজের প্রতি অনন্ত বিশ্বাসের উপর যুগধর্ম্ম-ভাগবতের প্রকাণ্ড ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হে অমৃতের পুত্রগণ, আপনাদের যে কেহ এই নূতন ভাগবত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, বিশ্বাসের দৃঢ় ভূমিতে দণ্ডায়মান হউন।

এই যুগধর্ম্ম-ভাগবত প্রণয়ন করিবার জন্য বিধাতা যাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন, তাঁহারা কে? অকিঞ্চন ও অপদার্থ মানুষ, পৃথিবীর ধূলিকণা হইতেও ক্ষুদ্র ও শক্তিহীন। কে তাঁহাদের প্রাণে এত শক্তি দিল যে, তাঁহারা পৃথিবীতে বীরের যোগ্য আসন লা করিলেন! ব্রাহ্ম-সমাজের প্রাচীন কীর্ত্তি কি আপনাদের স্মরণে আছে? কেহ অর্থত্যাগ করিয়া, কেহ বিত্ত ত্যাগ করিয়া, কেহ স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া, কেহ ধন সম্পদ ত্যাগ করিয়া, কেহ বৃদ্ধ পিতা মাতার স্নেহ ডোর ছিন্ন করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন।

হে সাধক-বংশ, ঈশ্বরের গৃহ রচনা করিবার জন্য কত বিশ্বাসীর হৃদয়-শোণিত পাত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস কি আপনারা জানেন? কঠোর মৃত্তিকাকে কত নর নারীর অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া ব্রহ্ম-মন্দিরের দেওয়াল নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, তাহার সন্ধান কি আপনারা রাখেন? সে এক অপূর্ব্ব ইতিহাস, সে এক বিধাতার অদ্ভুত যুগলীলা!

বাঙ্গালায় এমন নগর ও উপনগর অতি অল্পই ছিল, যেখানে ব্রহ্মমন্দিরের শ্রীমুখ হইতে নবযুগের নূতন বার্ত্তা ঘোষিত না হইয়াছে। কত মন্দির, কত সাধন-কানন, কত আশ্রম, কত সঙ্গত-সভা, কত নীতি-বিদ্যালয়, কত নারী-সমাজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল, সে সব কথা যখন মনে পড়ে, তখন প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়। যখন মনঃপটে যুগধর্ম্ম-ভাগবতের এক মহাচিত্র দর্শন করি, যখন হৃদয়-রঙ্গভূমিতে অদ্ভুত-কর্ম্মা বিধাতার বিবিধ অভিনয়ের কথা স্মরণ করি, তখন আমি আশ্চর্য্য ও অবাক্ হইয়া যাই এবং সেই যুগধর্ম্ম-কাহিনী লোক-সমক্ষে প্রকাশ করিবার জন্য আমার ক্ষীণ রসনা যেন সহস্র কণ্ঠের উচ্চরবে পরিণত হয়।

বন্ধুগণ! আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, যুগধর্ম্ম-ভাগবতের স্বরূপ কি? কোন উপকরণে ইহার অভিনব দেহ গঠিত হইয়াছে, ইহার সুবর্ণ দেহ কোন হীরক খণ্ডে এতো উজ্জ্বল হইয়াছে? ইহার উত্তরে আমি এই বলিতে চাই যে, ইহা ঐকতান-বাদনের রূপ ধরিয়া, অমৃতের স্পর্শ বহন করিয়া, মর ধামে অবতীর্ণ হইয়াছে। শত শত বাদ্যযন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন শব্দ মিলিত হইয়া যখন এক মহাশব্দে বাজিয়া উঠে, তখন সে শব্দ-তরঙ্গে কাহার মন না ভাসিয়া যায়? যখন শত শত তান লয় মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব ঐকতান উৎপন্ন করে, তখন যে কেমন মনোহর, সুশ্রাব্য ও মধুর হয়! যুগধর্ম্ম-ভাগবতও এই ঐকতান-বাদনের মত ভিন্ন ভিন্ন সত্য, সাধনা ও ধর্ম্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া জ্যোতির্ম্ময় রূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন। হে মানব! এই মহাপ্রকৃতির অন্তঃ-প্রকৃতিতে যে দিন প্রকৃতির মহাদেবতা সঙ্গীতের প্রথম বীজ রোপণ করিলেন, যে দিন সৌর-মণ্ডল হইতে জ্যোতিষ্কগণ ধরায় সঙ্গীতের প্রথম প্লাবন সৃষ্টি করিয়াছিল, সে ইতিহাস কি তুমি আমি জানি? যে দিন প্রকৃতির মহাসঙ্গীত মূর্ত্ত হইয়া আকাশে বাতাসে ফলে ফুলে প্রস্ফুটিত হইয়া মানবের কণ্ঠে আদি শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিল, তার সন্ধান কি আমরা রাখি? আবার মানবের সেই আদি শব্দ ভাবে ভাষায় পূর্ণ হইয়া যে দিন গায়কের কণ্ঠে "সা রে গা মা"র সপ্ত সুরের ঝঙ্কার তুলিয়া পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল, তাঁহার ইতিহাসও আমরা জানিনা। আমরা কেবল এইমাত্র জানি যে, ঐ সপ্ত সুরের সংযোগ বিনা সভ্য জগতে কোন সঙ্গীতই রচিত হয় না।

কে পৃথিবীর জাতি-সমূহকে এই সপ্ত সুরের মধ্য দিয়া মিলিত করিল? ভাষা ও শব্দের বহু ভেদ সত্ত্বে কে এই সপ্ত সুরের ভিতর সকল জাতির মনোভাবকে পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিল? কে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সুখ, দুঃখ, আনন্দ, অবসাদ, প্রলয় ও সৃষ্টির জীবন-সঙ্গীত গান করিল? সেই সপ্তসুর। একই বিধি (law) যাহা প্রকৃতিতে কার্য্য করিতেছে, তাহাই অন্তর্জগতে শৃঙ্খলা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

সত্য একদিনে প্রস্ফুটিত হয় নাই। তাহাও ভাব, ভাষা ও সঙ্গীতের ন্যায় ক্রম-বিকাশের ধারা বহিয়া সভ্য জগতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর রূপ ধারণ করিতেছে, ক্রমশঃ অপূর্ণ হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। যে সকল সত্য, ভাব ও ধর্ম্মকে আজ আমরা নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, তাহা আমার ব্যক্তিগত সম্পদ নহে; তাহা যুগ যুগান্তর ও কাল কালান্তরের মধ্য দিয়া, অসংখ্য জাতি ও সম্প্রদায়ের রূপ ধারণ করিতে করিতে এবং নানা অবস্থার সংঘর্ষে তাহা রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া এবং এক অন্যের সহিত মিলিত হইয়া, আজ পূর্ণ সত্য বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে। আজ ঋষিদিগের যোগ, বৈষ্ণবের ভক্তি, ঈশার পুত্রত্ব, ইসলামের নিষ্ঠা, সক্রেটীসের আত্মজ্ঞান, শ্রীচৈতন্যের প্রগল্‌ভা ভক্তি ও নানকের শিষ্য ভাব "সা রে গা মা"র ন্যায় সপ্ত সুরে আমাদের কাণে বাজিয়া উঠিয়াছে। আজ সাধকের প্রাণে সমন্বয়ের সপ্ত সুরে যে নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়াছে, তাহাই যুগধর্ম্ম ভাগবতের নূতন অধ্যায়, পৃথিবীর ধর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। যেমন সপ্তসুর সঙ্গীতের ভিতর দিয়া মানব-জাতির ভাব-রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, সকল সভ্য জাতিকে অবস্থা-নির্ব্বিশেষে এক অখণ্ড সঙ্গীত-সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে এবং মানব-জাতির ঐক্য সম্পাদন করিয়াছে, সেইরূপ যুগধর্ম্ম-ভাগবতের সমন্বয়-সাধনাও ভবিষ্যৎ ধর্ম্মজগতে যে ঐক্য-সম্পাদন করিবে, ইহাও ধ্রুবসত্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•—

বীজ-মন্ত্র।

সত্য-শিব-সুন্দর দেব,
তোমার আমি! আমার তুমি!
তোমার আমার মিলন-মাঝে,
বিশ্ব-প্রেমের প্রকাশ-ভূমি!

সংসারে তুমি সাধন-পথের
সর্ব্বসিদ্ধি-মন্ত্র,
নিত্য নবীন বেদ, বাইবেল,
কোরাণ, পুরাণ, তন্ত্র।

"সত্যম্‌" রূপ ধরিয়া,
শূন্য আকাশ পূরিয়া,
নিখিলের মূলে করিছ বিরাজ,
সান্তে অসীম বসতি!
জীবন-ধারার একটী লক্ষ্য,—
এক গতি,—এক নিয়তি!

ভবান্ধকারে লুটিয়া,
মঙ্গলালোকে ফুটিয়া,
"শিবম্‌" তুমি করুণা ঘন,
শান্ত-দান্ত-মূর্ত্তি;
তৃষিত পরাণে বিতরিছ সুধা,
শ্রান্ত চিত্তে স্ফূর্ত্তি!

নির্ম্মল তুমি, মধুর তুমি,
চিররসময় "সুন্দরম্‌"!
চিদাকাশে পূর্ণ আনন্দ-চন্দ্র
যোগিজনচিত্ত-রঞ্জনম্‌!
তুমিগো আমার তৃপ্তি-ধাম,
তোমাতেই আমি পূর্ণকাম!
মরতের বুকে অমৃত তুমি,
জরা-মৃত্যু-শোক-নাশনম্‌!
যুগ যুগান্তে লোক লোকান্তে
ত্বং হি মম সাধনম্‌।

মঙ্গল কুটীর, ঢাকা। শ্রীমতিলাল দাস।

অষ্টচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক।

আমরা আজ অনেক দিন পরে, পূর্ব্ব বাঙ্গলা নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্যবিবরণ ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। অত্রত্য নববিধান-মণ্ডলী বিধান-জননীর শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

প্রস্তুতি।

১০ই ভাদ্র, রবিবার, ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে উৎসবের প্রস্তুতি বিষয়ে উপদেশ হয়। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার অনুসরণকারী আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র উভয়েই উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত সহসাধক ও উপাসকদিগের মনোযোগ দুইটী বিষয়ে আকর্ষণ করিতেন। (১) একটী, জীবনের পাপ স্মরণ করিয়া তজ্জন্য অনুতাপ করা। (২) দ্বিতীয়টী, কৃতজ্ঞতাতে পূর্ণ হওয়া। প্রথমতঃ, যাহা করা উচিত ছিল করি নাই, পক্ষান্তরে অনুচিত কার্য্য অনেক করিয়াছি; যাহা বলা উচিত ছিল বলি নাই, অথচ অনুচিত বাক্য বহু কহিয়াছি; যে সকল সাধু চিন্তা করা কর্ত্তব্য ছিল তাহা চিন্তা করি নাই, তদ্বিপরীতে অসাধু চিন্তা করিয়া হৃদয়কে কলুষিত

করিয়াছি ; এ সকল স্মরণ করিয়া অনুতাপ করা, ব্রহ্মানন্দ-ভোগার্থীর আবশ্যক। অনুতাপ কর, স্বর্গরাজ্য নিকটে। অনুতাপ ভিন্ন স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হয় না। মহর্ষি ঈশা অনুতাপ করিয়া অনুতাপের গুরু যোহনের নিকট যখন অভিষিক্ত হইলেন, অমনি স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইল। "ঈশ্বর অনুতপ্তাত্মাদের নিকটে স্থিতি করেন।" "ভগ্নহৃদয়বাসী আমি সকলে জানে।" দ্বিতীয়তঃ, কৃতজ্ঞতা-স্বীকার। জন্মদাতা, প্রতিপালক এবং পরিত্রাতা ঈশ্বরের নিকট এবং তাঁহার প্রেরিত প্রতিপালক ও পরিত্রাণের সংবাদবাহক সাধু সজ্জন, মহাজনগণের নিকট আমরা যে কত ঋণে ঋণী, তাহা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা-রসে প্রাণ, মন, হৃদয় এবং আত্মা পূর্ণ না হইলে কে উৎসব সম্ভোগ করিবে ? কে ব্রহ্মানন্দরস আস্বাদন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইবে ? এইভাবে উপদেশ হইয়া প্রস্তুতির ব্যাপার আরম্ভ হয়। সে দিনের কার্য্য ভাই মহিম চন্দ্র সম্পাদন করেন।

অতঃপর বিধান-পল্লীস্থ দেবালয়ে প্রতিদিনের উপাসনা প্রস্তুতির ভাবে সম্পন্ন হয়। প্রার্থনাতে প্রকাশিত বিষয় গুলি সংক্ষেপে এইরূপে বিবৃত হইতে পারে। সাধক যখন আপনার কৃত পাপ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হন, এবং ভগবানের দান, সাধু সজ্জনদিগের দান এবং দূরস্থ ও নিকটস্থ তাবৎ নরনারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত দান স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ হন, তখন তাঁহার অন্তরে দীনতা আসিয়া উপস্থিত হয়। আমি পাপী, আমি নরাধম, আমি পুণ্যময়ের পুণ্যরাজ্যে পাপ ও অশান্তি আনিয়া বহু অপরাধে অপরাধী হইয়াছি। "সবার প্রাণের ভিতর সুখের সাগর হরি গুণমণি" থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি। "আমি সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ এবং সকলে আমা অপেক্ষা ভাল", কেননা, আমার প্রাণের হরি সকলের সঙ্গেই আছেন, তিনি প্রতিজনেরই গুণে বশীভূত, অথচ আমি বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হইয়া ভাই ভগিনীকে তুচ্ছ করিয়াছি। এই সকল চিন্তা সাধককে একান্ত দীন ও অকিঞ্চন করিয়া দেয়। মহর্ষি ঈশা বলিলেন, "আমি দীন, আমি অকিঞ্চন"। পরমভক্ত কবীর কহিলেন, "আমি সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ, সকলে আমা অপেক্ষা ভাল, যিনি এরূপ দেখেন, তিনিই আমার মিত্র"। এই দীনতা সম্বন্ধে দেব-নন্দন ঈশা কহিয়াছেন, "দীনাত্মারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই"। ইহাই তাঁহার পাহাড়ে প্রদত্ত উপদেশের সর্ব্বপ্রথম উপদেশ। বস্তুতঃ দীনাত্মা না হইলে কেহ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এই দীনতাই সাধককে ব্রহ্মনিষ্ঠ করে। এই প্রার্থনার দিন হজরত মহম্মদের জন্ম ও স্বর্গারোহণ দিন ছিল। হজরতের নিষ্ঠারতি-প্রার্থনার সঙ্গে দীনতার এত নিকট সম্পর্ক, তাহা পূর্ব্বে এরূপ অনুভূত হয় নাই। "হ'লে নিষ্ঠাযুক্ত, ব্রহ্মভক্ত, পা'বে তাঁর অনুসন্ধান"। নিষ্ঠাযুক্ত না হইলে কে ব্রহ্মলোকে—ব্রহ্ম-সহবাসে বিচরণ করিতে পারে ? আর ব্রহ্ম-নিষ্ঠার অবশ্যম্ভাবী ফল—বিবেক, বৈরাগ্য ও নব বিশ্বাস। এজন্য রাজর্ষি রামমোহনে বিবেক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে বৈরাগ্য এবং নবভক্ত ব্রহ্মানন্দে নববিশ্বাসের প্রাধান্য দেখা যায়। ইহা ছাড়া পরমহংসের স্বর্গারোহণ দিন, জেনারেল বুথের দিন, ভক্তি-ভাজন ভাই কান্তিচন্দ্রের ও শ্রদ্ধেয় ভাই বলদেব নারায়ণের দিন, কলিকাতা ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে ভাদ্রোৎসব, রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মোপাসনার দিন ৬ই ভাদ্র, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-দিন এবং শ্রদ্ধাস্পদ গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের সাম্বৎসরিক দিন প্রভৃতি বিশেষ ভাবে আমাদিগকে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে উৎসবের জন্য প্রস্তুত করিয়া দেয়। পরমহংসের দিনে যে নূতন সঙ্গীত হয়, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ঝিঁঝিট—একতালা।

ধন্য রামকৃষ্ণ বলিহারি যাই তোমারে,
মাতৃভক্তি মিষ্ট কত, দেখালে সংসারে।
মা নামে তোমার কত যে আরাম, মা মা বলে হলে পূর্ণ-কাম ;
কেশবের সনে, মিশে প্রাণে প্রাণে, দেখিলে মায়েরে।
'তুই মা আমার', 'আমি যে তোর', এই মহাভাবে হইলে বিভোর ; হাসিলে কাঁদিলে, নাচিলে গাইলে, ডুবিলে সমাধি-সাগরে।

এই প্রস্তুতির সময়ে ব্রহ্মানন্দবিষয়ক যে সঙ্গীত হয়, তাহাও নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

কীর্ত্তন—একতালা।

ব্রহ্মানন্দে এনে দেও প্রাণে।
ওগো মা বিধান-জননী।
সমুত্থিত সাধু যত দেখালে যাঁহার জীবনে।
(এই ধরাতলে) (নববিধানেতে)
হলেন গৌর ঈশা, শাক্য মুষা, মিলিত যাঁর জীবনে।
হলেন দাউদ নারদ, পল মহম্মদ, মিলিত যাঁহার জীবনে।
হলেন যোহন জুডাস, কন্‌ফিউসাস, মিলিত যাঁহার জীবনে।
দেখি পবিত্রাত্মা, ধন্য এবার, হলেন নববিধানে।
প্রত্যাদেশে পূর্ণ রাখ নির্জ্জনে সজনে।
অনুতপ্ত থাকি সদা পাপবোধের আগুনে।
দগ্ধ করি এ পাপ জীবন নব ধর্ম্ম সাধনে।
বিবেক বৈরাগ্যের প্রভাব দেখাও প্রতি ভবনে।
মা মা বলে, প্রেমে গলে, যাই নিত্যানন্দ-সদনে।
(ব্রহ্মানন্দ সনে) (বঙ্গচন্দ্র সনে) (যত ভক্ত সনে)

প্রস্তুতির সময়ে অহৈতুকী ভক্তির জন্যও প্রার্থনা হয় এবং একটী নূতন সঙ্গীত রচিত হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ এক রবিবারে উপাসনা করেন এবং রিপু-সংহার বিষয়ে উপদেশ ও ব্রত-গ্রহণ নবসংহিতা হইতে পাঠ করেন।

উৎসবের কার্য্য-বিবরণ।

২৩শে ভাদ্র, শনিবার, আরতি হইয়া উৎসবের প্রারম্ভিক উপাসনা হয়। সে দিনের কার্য্য শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় সম্পাদন করেন।

২৪শে ভাদ্র, প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে ভাই মহিম চন্দ্র মন্দিরে উপাসনা করেন। সায়ংকালে এই মর্ম্মে উপদেশ হয়, "আমরা নবশিশু ব্রহ্মানন্দকে গ্রহণ করিয়া শিশু হইয়া যাই এবং স্বর্গের শিশুদের সঙ্গে মিশিয়া ব্রহ্মোৎসব, আনন্দময়ী মায়ের উৎসব সম্ভোগ করি।" এ সম্বন্ধে যে নূতন সঙ্গীত হয়, তাহা প্রস্তাবির শেষ ভাগে প্রদত্ত হইয়াছে।

২৫শে ভাদ্র, জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির হওয়ায় দেবালয়ে উপাসনা ব্যতিরেকে অন্য কোন কার্য্য হইতে পারে নাই।

২৬শে ভাদ্র, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার দাসের গৃহে সায়ংকালে উপাসনা হয়। গেণ্ডারিয়া হইতে বন্ধুরা আসিয়া উপাসনাতে যোগ দিয়াছিলেন। ভাই দুর্গানাথ উপাসনা করেন এবং গৃহস্থ ও গৃহিনীর উপযোগী একটী সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন।

২৭শে ভাদ্র, দেবালয়-প্রতিষ্ঠার দিনে কয়েকটি ভাই ভগিনী আসিয়া দেবালয়ে উপাসনাতে যোগদান করেন। উপাসনা ভাই দুর্গানাথ করেন। সায়ংকালে প্রথমতঃ বিধান-পল্লীতে ঘুরিয়া কীর্ত্তন হয়, তৎপর দেবালয়ে কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হইয়া কার্য্য শেষ হয়।

২৮শে ভাদ্র, নববিধানসমাজ-প্রতিষ্ঠার দিন। প্রাতঃকালে ভাই মহিম চন্দ্র উপাসনা ও প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার সার "আমরা প্রতিজন তোমার সন্তান, তোমার মত পূর্ণ হইব, এই আমাদের নিয়তি। তোমার প্রেমের স্বভাব এবং পুণ্যচরিত্র আমাদিগকে দিয়া তোমার সন্তান করিয়া লও।" সায়ংকালে শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন।

ক্রমশঃ

শ্রীমহিম চন্দ্র সেন।

সংবাদ।

সেবা—ডাঃ বিমল চন্দ্র ঘোষ দেরাদূনে মাতৃদর্শন করিয়া ফিরিবার সময়ে, হিমালয় ব্রহ্মমন্দিরে, ১৪ই সেপ্টেম্বর "Religious Problems", ১৫ই সেপ্টেম্বর "Religious Progress" ১৬ই সেপ্টেম্বর "Religious Consciousness" বিষয়ে তিনটী বক্তৃতা দান করেন।

রামমোহন-স্মৃতি—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে :—

কলিকাতায়—কমলকুটীরে নবদেবালয়ে প্রাতে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

সন্ধ্যায় এলবার্ট হলে মৌলবী আবদুল করিমের সভাপতিত্বে, রামমোহন লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের সভাপতিত্বে, ভবানীপুর সম্মিলনী সমাজে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের সভাপতিত্বে এবং হিন্দু মিশন গৃহে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে স্মৃতিসভা হইয়াছে। অনেকেই বক্তৃতা করিয়াছেন।

কুচবিহারে—সন্ধ্যায় ল্যান্সডাউন হলে, ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে স্মৃতিসভা হয়। কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্য রতন গুপ্ত, সভাপতি এবং কয়েকটী ছাত্র বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি পাঠ করেন।

সিলচরে—রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভা বেশ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

বাগনানে—ব্রহ্মানন্দাশ্রমে ঐদিন স্মরণে দুই বেলা বিশেষ উপাসনা হইয়াছে।

উৎসব—পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অষ্টচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব গত ২৩শে ভাদ্র হইতে ৭ই আশ্বিন পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের বিবরণ স্থানান্তরে দেওয়া গেল।

পরলোকগমন—আমরা অতীব দুঃখের সহিত নিম্নলিখিত পরলোকগমন সংবাদ পত্রিকাস্থ করিতেছি :—

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর, ঢাকা নগরীতে, স্বর্গীয় গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র মোহন সেন হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাওয়াতে, পলকের ভিতর সাজান ঘর বাড়ী, প্রিয়তম পুত্র কন্যা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নী এবং আত্মীয় স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে নিত্যসুন্দর ঘর বাড়ীতে গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাব বড়ই মিষ্ট ছিল; পারিস্কার. পরিচ্ছন্ন, শুদ্ধ সুন্দর তাঁহার জীবন ছিল। এখানকার ঘর বাড়ী কত সুন্দর করে সাজাইয়াছিলেন। নিমেষের মধ্যে সব ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন! মণ্ডলীর মধ্যে তিনি একজন নিপুণ কর্ম্মী ছিলেন। অনুষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে তাঁহার কর্ম্মের নিপুণতা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়াছেন। কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর বয়সে, জীবনের পূর্ণ কর্ম্মোদ্যমের মধ্যেই, বিধাতার বিচিত্র বিধানে এখানকার কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া, চিরবিরামের রাজ্যে পিতা মাতার সঙ্গে মিলিত হইলেন।

আমাদের মণ্ডলীর প্রাচীন বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই বৃদ্ধ বয়সে আবার একটী শোকের আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের প্রিয়তমা কন্যা শ্রীমতী সুপ্রভা ঘোষ গত ২৫শে সেপ্টেম্বর, কানপুরে, দুই তিন বৎসর রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, চিরশান্তিধামে আনন্দময়ী মায়ের প্রেমক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে ইনি এক পুত্র ও দুই কন্যা লইয়া বৈধব্যব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক, স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায় গুণে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া, কানপুর বালিকা বিদ্যালয়ে উত্তরোত্তর স্কুলের উন্নতির সহিত প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য সুখ্যাতি ও গৌরবের সহিত সমাধা করিয়া এবং পুত্রকন্যাদের প্রতিও যথোচিত কর্ত্তব্য সাধন করিয়া, সেই প্রিয় কর্ম্মস্থানেই "গুরু মা" রূপে কানপুরবাসী সর্ব্ব সাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়া পঞ্চাশ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। প্রথম বয়সে আদর্শ রমণী সাধ্বী দেবী অঘোর কামিনীর জীবনের স্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন। তাই ইঁহার জীবনেও নারী জীবনের পবিত্র

আদর্শ পরিস্ফুট আকার ধারণ করিয়াছিল। ধন্য সতী সাধ্বীর পবিত্র জীবন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদের প্রেমক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারের পিতৃমাতৃহীন সন্তানগণের ও আত্মীয়স্বজনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১১এ ভুবন মোহন সরকার লেনে পরলোকগত রাজকুমার চন্দ রায়ের পবিত্র আদ্য-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রপাঠ ও শেষ প্রার্থনা, জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার রায় জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। জনৈক আত্মীয় শ্রীযুক্ত অনাথ বন্ধু সরকারও তাঁহার জীবন সম্পর্কে কিছু পাঠ করেন এই উপলক্ষে পুত্র কন্যাগণ নববিধান প্রচার ভাণ্ডারে ২৫৲ টাকা, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচার বিভাগে ২৫৲ ও দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ভাণ্ডারে ২৫৲, ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজে ১০৲, ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজে ১০৲, গিরিধি নববিধান সমাজে ১০৲, গিরিধি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১০৲, অনাথ আশ্রমে ১০৲, উলটা ডাঙ্গা স্কুলে ১০৲ এবং স্থায়ী ভাণ্ডারের জন্য ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, কলিকাতায়, স্বর্গীয় কে, জি, গুপ্তের কন্যা, শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র সেনের পত্নী শ্রীমতী সৎযূবালা সেন বহুদিন রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য এবং কন্যা জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই অনুষ্ঠানে পুত্রকন্যাগণ বিভিন্ন বিভাগে ৩১০৲ দান করিয়াছেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদের কল্যাণবিধান করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, কুচবিহারে, স্বর্গীয় মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের ১৭শ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, প্রাতে কেশবাশ্রমস্থিত সমাধি-প্রাঙ্গণে জনসাধারণ সহ বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র নাথ রায় এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে কুচবিহারে গিয়াছিলেন, তিনিই উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় দেওয়ান ভক্ত শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র নাথ গুহের সভাপতিত্বে স্মৃতিসভা হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্য রতন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কান্ত বসু মজুমদার, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র নাথ রায় ও শ্রীযুক্ত সীতেশ চন্দ্র সান্যাল তত্ত্ববিনোদ মহারাজার গুণাবলী বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন। সভা-ভঙ্গ হইলে সভাস্থল হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া সমাধি-প্রাঙ্গণে যাইয়া শেষ হয়। স্বর্গীয় মহারাজার অমরাত্মার প্রতি সকলেই শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিয়া সুখী হইয়াছেন। বাগনানে ব্রহ্মানন্দাশ্রমেও এই দিন স্মরণে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ১২ নং আণ্টনী বাগানে, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ ঘোষের পিতৃদেব স্বর্গীয় বরদা প্রসাদ ঘোষের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের সহিত সেপ্টেম্বর মাসে ধর্ম্মতত্ত্বের নিম্নলিখিত মূল্য-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি:—

কলিকাতার—শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস ৩৲, ডাঃ চারুচন্দ্র বসু ২৷৹, শ্রীমতী অমিয় হাসি মিত্র ১৷৹, শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র রায় Bar-at-law ৩৲, Mrs. K. W. Bonnerjee ৩৲, J. C. Mukherjee Esq ৩৲, শ্রীযুক্ত হাজারি লাল ভড় ২৲, রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র রায় ৩৲, শ্রীযুক্ত অমৃত কৃষ্ণ দত্ত ২৷৹, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বসু (বাগবাজার) ৩৲, মিসেস কৈলাস চন্দ্র সেন ২৷৹, শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী চক্রবর্ত্তী ১৲, শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত ৩৲, শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ ৬৲, অধ্যাপক রাজেন্দ্র নাথ সেন ৩৲, শ্রীমতী উমারাণী দেবী ৩৲, মিসেস হরগোপাল সরকার ৩৲। বালেশ্বরের—শ্রীমতী প্রীতি রায় ৩৲, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সরকার এম, এ, বি, এল, ৬৲। গিডনির—শ্রীমতী সুচারু বসু ১৷৹। লক্ষ্ণৌর—অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ রায় ৬৲। ছাপরার—শ্রীযুক্ত হাজারি লাল ৩৲। সিমলার—শ্রীমতী সুহাসিনী বসু (Mrs. K. S. Basu) ৬৲। হাওড়ার—শ্রীযুক্ত দিননাথ সরকার ৩৲, ডাঃ শরৎ কুমার দাস ৩৲, শ্রীযুক্ত রামগতি রায় ২৲। পাটনার—শ্রীযুক্ত দামোদর পাল ৩৲। কাশিমবাজারের—মহারাজা স্যার মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর ১৮৲। কটকের—শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রাও ৯৲। হাজারিবাগের—অধ্যাপক খড়্গ সিংহ ঘোষ ৬৲। ঢাকার—শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস ৩৲। ফরিদপুরের—শ্রীযুক্ত বিনয় ভূষণ বসু ৬৲। এলাহাবাদের—শ্রীমতী কমলিনী রায় ২৲। মান্দ্রাজের—ডাঃ বিমান বিহারী দে ৬৲। কাঁথির—সেক্রেটারী, ব্রাহ্মসমাজ ৬৲।

বিশেষ দান—শ্রদ্ধাস্পদ ভাই বিহারী লাল সেন শিলচর হইতে তাঁহার তৃতীয় পৌত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে ধর্ম্মতত্ত্বের সাহায্যার্থ ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব এখন ঋণগ্রস্ত। পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে সকলে যদি এইরূপে কিছু কিছু দান করেন, তবে ঋণ-পরিশোধের বিশেষ সাহায্য হয়।

ধর্ম্মতত্ত্বের বৎসরতো শেষ হইতে চলিল। যাঁহাদের নিকট ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্য এখনও বাকী আছে, তাঁহারা যদি কৃপা করে মূল্যটা পাঠাইয়া দেন, বিশেষ বাধিত হইব।

বিনীত

শ্রীঅক্ষয় কুমার নধ

কার্য্যাধ্যক্ষ।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ২৪শে আশ্বিন, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৩ ভাগ। ১৮শ সংখ্যা। | ১লা কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক, ৯৯ ব্রাহ্মাব্দ। 18th October, 1928. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা, তুমিই ত সত্য আদ্যাশক্তি ভগবতী, বিচিত্ররূপে তুমি জগতে আত্মপ্রকাশ করিতেছ; তাই তোমার ভক্তগণ কখনও তোমাকে দুর্গতিহারিণী অসুর-নাশিনী দুর্গা, কখনও জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী, কখনও ধন-ধান্য-সৌভাগ্য-দায়িনী মা লক্ষ্মী, কখনও কালভয়-নিবারিণী মহাকাল-রূপিণী কালী, আবার কখনও বা তোমাকে দেবাদিদেব মহাদেব, জয়দাতা কার্ত্তিক, সিদ্ধিদাতা গণেশ, কখনও পাপহারী হরি, কখনও সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম, স্বয়ম্ভূ, খোদা, সর্ব্বনিয়ন্তা, জিহোভা ইত্যাদি নানা নামাভিধানে তোমার আরাধনা করেন, পূজা করেন। যিনি যে নামেই তোমাকে ডাকেন, যিনি যেরূপেই তোমার আরাধনা করেন, সত্য রূপে তুমি তাঁর নিকট সেই ভাবেই প্রকাশিত হও। তবে তোমার কোন বাহ্য রূপ নাই, বাহ্য মূর্ত্তি নাই, তুমি জ্ঞান-মূর্ত্তি; চিন্ময়-রূপে প্রত্যেক ভক্তের প্রাণে দর্শন দান কর। আমাদের পৌরাণিক পূর্ব্বপুরুষগণ ভক্তি-চক্ষে তোমাকে দেখিয়া, কল্পনা-যোগে অজ্ঞান সাধকদের শিক্ষার জন্য, নানা মূর্ত্তি তোমাতে আরোপ করিয়াছেন। সে বাহ্যমূর্ত্তি, সে জড়মূর্ত্তি, সে মূর্ত্তি বাস্তবিক তোমার মূর্ত্তি নয়; কিন্তু তাহার ভিতরের ভাব তোমার, তাহা যে যে নামে অভিহিত, তাহা যে তোমারই নাম, ইহাত আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। তাই এই সময়ে আমাদের দেশবাসিগণ যে দুর্গোৎসব, লক্ষ্মী-পূজা, কালী-পূজা ইত্যাদি করেন, তাহার আধ্যাত্মিকভাব আমরা কেননা গ্রহণ করিব? তোমার যুগধর্ম্ম নববিধান সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়-বিধান, সুতরাং সর্ব্ব ধর্ম্মই সত্য আমরা বিশ্বাস করি এবং সর্ব্বধর্ম্মের সকল প্রকার ধর্ম্ম-ভাব, সাধনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানই আমাদিগের গ্রহণীয়। অতএব আমাদিগের স্বদেশবাসীদিগের এই শারদীয় উৎসবের আধ্যাত্মিক গভীর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, আমরাও যেন এই সময় সত্য দুর্গোৎসব, সত্য লক্ষ্মী-পূজা, সত্য কালী-পূজা, সত্য জগদ্ধাত্রী-পূজা, সত্য কার্ত্তিক-পূজা করিয়া, সত্য ভাই ফোঁটা লইয়া, ভাইফোঁটা দিয়া, ধন্য হইতে পারি এবং তাহার আধ্যাত্মিক প্রসাদ মাতৃসন্তানত্ব ও ভ্রাতৃপ্রেম জীবনে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, মা, তুমি আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

—•—

দুর্গোৎসব।

দুর্গোৎসব বঙ্গের মহোৎসব। বঙ্গদেশ এ সময় সত্যই উৎসবের বেশ ধারণ করেন। ইহার বাহ্য আড়ম্বর যাহাই হউক না, ইহার আধ্যাত্মিক সাধনা, পারিবারিক এবং সামাজিক অনুষ্ঠান সুনীতিপূর্ণ ও অতি গভীর শিক্ষাপ্রদ। এই দুর্গোৎসবে আমাদিগের পৌরাণিক

পূর্ব্বপুরুষগণ কি একটী সুন্দর পত্তন-ভূমিই নববিধানের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

নববিধান যে আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শ সাধন করাইতে অবতীর্ণ, তাহারই প্রতিমা যেন এই দুর্গা-প্রতিমায় নিবদ্ধ রহিয়াছে। নববিধান যে পরিবারের ধর্ম্মাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রেরিত, দুর্গাপ্রতিমায় তাহাই কি কতকটা অঙ্কিত নয় ?

আমরা প্রতিদিন যে স্বরূপের আরাধনা করি, তাহাই ত কতক পরিমাণে দুর্গা-প্রতিমায় মূর্ত্তির আকারে গঠিত। আমরা যে সত্য-স্বরূপের আরাধনা করি, তাহাই আদ্যাশক্তি দুর্গামূর্ত্তিতে রচিত; আমরা যে জ্ঞান-স্বরূপের আরাধনা করি, তাহাই সরস্বতীর আকারে প্রকাশিত; আমরা যে অনন্ত-স্বরূপের আরাধনা করি, তাহাই দুর্গার বহুভুজা রূপে ও অনন্ত নাগপাশে প্রতিফলিত; আমরা যে প্রেম-স্বরূপের আরাধনা করি, তাহা মা লক্ষ্মী-রূপে প্রকটিত; আমরা যে অদ্বৈত-স্বরূপের আরাধনা করি, তাহা শিরোদেশস্থ দেবগণ মধ্যে মহাদেবের চালচিত্রে চিত্রিত; আমরা যে পুণ্য-স্বরূপের আরাধনা করি, তাহা দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের মূর্ত্তিতে ব্যক্ত; আমরা যে আনন্দ-স্বরূপের আরাধনা করি, তাহা রক্তবর্ণ সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশের আকারে প্রতিষ্ঠিত। মার পদতলস্থ কেশরী মার ভক্ত উপাসক সন্তান, মার বলে পাপাসুর-নিধনে রত। এই প্রতিমা উপমা মাত্র, কিন্তু এই প্রতিমা উপমা ত্যাগ করিয়া, চিন্ময়ী মার স্বরূপগুলি এই রূপ চিন্ময় মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলেই, যথার্থ আধ্যাত্মিক ভাবে আমাদিগের দুর্গোৎসব-সাধন হয়।

দুর্গোৎসবের উদ্দেশ্য, আদ্যাশক্তি মহাদেবীর শক্তি-প্রভাবে ভক্ত-সিংহ-বল লাভ করিয়া পাপাসুর-বিনাশ। আমাদের আমিত্বই আমাদিগের যত দুর্গতি, দুর্ম্মতি, দুষ্টতা, পাপ ও দুঃখের কারণ। এই পাপাসুর-নিধনের উপায় আদ্যাশক্তির পূজা এবং তাহার দ্বারা ভক্ত-সিংহ-বল-লাভ। ভগবানের কৃপাবল এবং ভক্তসঙ্গ-বলেই এই পাপাসুরের নিধন হয়, এবং তাহা হইলেই জীবন দিব্যজ্ঞানে, সৌভাগ্য-লক্ষ্মীতে, পুণ্য তেজের নব কার্ত্তিকত্বে এবং আনন্দ সিদ্ধিতে পূর্ণ হয়। ইহারই নিদর্শন দুর্গাপ্রতিমা। নব-বিধানের আধ্যাত্মিক পূজার ত ইহাই উদ্দেশ্য।

আবার অন্যদিকে এক এক দেবদেবী-ভাব এক এক পূজায় আরাধিত ও পূজিত হয়। দুর্গোৎসবে মা আদ্যা-শক্তি সপরিবারে পূজা গ্রহণের জন্য ভক্তের পরিবারে যেন অবতীর্ণ। তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি যেমন একা আসেন না, সপরিবারে শুভাগমন করেন, তেমনি আদ্যাশক্তি মার যথার্থ পূজাও এক একা হয় না, সপরিবারে তাঁর পূজা করিতে হয়। নববিধানে যে পারিবারিক পূজা-সাধনের ব্যবস্থা, ইহারও নিদর্শন এই দুর্গা-প্রতিমায়। মার পূজা করিয়া, আমাদের কন্যাগণ সন্তানগণ সকলে মিলিয়া মার ভক্ত-সিংহ-বল লাভ করিয়া, পাপ দুর্গতি অসুর বিনাশ করিয়া কন্যাগণ লক্ষ্মী সরস্বতী এবং পুত্রগণ কার্ত্তিক গণেশ হইয়া, মার পরিবারে নিত্য আনন্দোৎসবে দুর্গোৎসবে মগ্ন হইবেন, ইহাইত নব-বিধানের পরিবারগত ধর্ম্ম-সাধন।

এই [illegible] উপলক্ষে যে পারিবারিক মিলন, সামাজিক মিলন, আত্মীয় কুটুম্বগণের উপহার-বিনিময়, শিশু সন্তানদের নব-বেশভূষা-পরিধান এবং সকলকার দেবদর্শন, অঞ্জলিদান, আহার পান, আমোদ প্রমোদ, শান্তি-জল-গ্রহণ ও শুভ সিদ্ধি-পানে পরস্পরের সহিত প্রেম-মিলন, এই সকলই সত্য ধর্ম্মোৎসব-সাধনের নিদর্শন। নববিধানে এ সকল সর্ব্বথাই আদৃত। বঙ্গদেশ, ভারত, জগৎ করে এই বাহ্য মার পূজার দুর্গোৎসব হইতে আধ্যাত্মিক দুর্গোৎসব সাধন করিয়া নববিধানের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ব্রহ্ম-দর্শন।

ব্রহ্মদর্শন এতই সহজ, যে যখনই তাহা চায়, তখনই তাহা পায়। তিনি যে সদা সর্ব্বক্ষণই অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। কেবল মন তাঁকে দেখিতে না চাহিয়া এ ও সে তা চায় ও চিন্তা করে, তাই তাঁর দর্শন হইতে বঞ্চিত হয়। নতুবা চাহবামাত্র দেখা দিবার কারণে তিনি নিত্য বিদ্যমান। অনন্যমনা হইয়া দেখিতে চাও, নিশ্চয় তৎক্ষণাৎ দেখা পাইবে।

সংসার-কুরুক্ষেত্র।

মহাভারতে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিবরণ রহিয়াছে, তাহা এই সংসার-সংগ্রামের উপমামাত্র। বাস্তবিক এই সংসারই মহাসংগ্রাম-ক্ষেত্র। এখানে সদাই সংগ্রাম চলিতেছে। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই পঞ্চ পাণ্ডব। রিপুগণ কুরুবংশ। এই কুরুবংশ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, অর্থাৎ অজ্ঞান অন্ধতা হইতেই রিপুগণ জাত। এই রিপুগণের সহিত ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদাই সংগ্রামে রত। সংসারে

বাস এই সংগ্রাম-ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে বাস। বিপদ পরীক্ষা, রোগ শোক, অপমান নির্য্যাতন, দুঃখ দারিদ্র্য ও নানা অবস্থার বিপর্য্যয়ের অধীন হইয়া এই দেহ মন প্রাণকে সদাই সংগ্রাম করিতে হইতেছে। তবে সেই ব্যক্তিই জয়-লাভ করিতে সক্ষম, যাহার হৃদয়-রথে ভগবান্ স্বয়ং সারথি হইয়া রহিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে এই মহাসংগ্রামময় সংসারে নিষ্কাম-ধর্ম্ম-সাধনে সক্ষম করিলেই, আমরা রিপুগণ নিধন করিয়া সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারি।

বৈর-নির্য্যাতনের সহজ উপায়।

যখন যে ব্যক্তি শত্রুতা করিবে, মার পদতলে বসিয়া, তাহাকে স্মরণ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে ও যোগবলে একেবারে বুকের ভিতর তাহাকে খুব জড়াইয়া ধরিবে এবং যে দ্বেষ হিংসা, পাপ দুর্ম্মতি ও দুরাচার বশতঃ সে শত্রুতা করিতেছে, সেইগুলি এক এক করিয়া প্রার্থনা-যোগে মার কাছে বলিদান করিবে। যতদিন সে ব্যক্তি শত্রুতা না ছাড়িবে, ততদিন তাহাকে স্মরণ করিতে ছাড়িবে না। তাহার রিপুগুলি নির্ম্মূল হইলে, নিশ্চয় আর সে শত্রুতা করিতে পারিবে না। এই জন্যই আচার্য্যদেব প্রতিদিন উপাসনান্তে শত্রুগণকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করিবার বিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

ধর্ম্ম-সাধন ও সংসার-সাধন।

ধর্ম্ম-সাধন ও সংসার-সাধনের সমন্বয়ে পূর্ণ সাধন। ধর্ম্ম-সাধন সহজ, একবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, আত্ম-সংযম করিয়া, মার শরণাপন্ন হইতে পারিলেই ধর্ম্মসাধন সহজে সিদ্ধ হয়; কিন্তু সংসার-সাধন বড়ই কঠোর সাধন, সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য, শারীরিক বৈষয়িক সামাজিক, প্রত্যেকটী পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সম্পন্ন করিতে হইবে। কঠোর হইলেও, পরীক্ষা-বিপদ-সঙ্কুল হইলেও, অপ্রীতিকর এবং লোকনিন্দাকর হইলেও, নিষ্কামভাবে অসঙ্কুচিত-চিত্তে, একমাত্র ঈশ্বর-প্রীতি-কামনায় সমুদয় করিতে হইবে। তবে সংসার-সাধনে সিদ্ধি-লাভ হইবে। ফাঁকি দিয়া সংসার-সাধন কখনই হইতে পারে না।

ব্রহ্মাগ্নি নির্ব্বাপিত প্রায়।

আমাদের মধ্যে সে অগ্নি কোথায়, যে অগ্নির বলে,বলীয়ান হইয়া, যে অগ্নিতে অগ্নিময় হইয়া, আমরা অকুতোভয়ে সত্যের পথে, ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে পারি, জীবনে উচ্চ জীবন্ত ধর্ম্মকে জীবন্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, এবং তুরী, ভেরী বাজাইয়া জীবন্ত ধর্ম্মের জীবন্ত সংবাদ চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিতে পারি? যে ধর্ম্মের অগ্নি, সত্যের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া পুরাতন যুগকে নবযুগে, কলিযুগকে সত্যযুগে পরিণত করিয়াছিল, যে ধর্ম্মের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া এ দেশের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের শত শত বৎসরের সঞ্চিত অনাচারকে ধ্বংস করিয়া সত্যধর্ম্মের বিমল কিরণে বঙ্গ ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিল, ভারতের জাতীয় জীবনে নব সুপ্রভাত আনিয়াছিল, সে অগ্নি কি এত অল্প সময় মধ্যে নির্ব্বাণ-প্রায় হইতে চলিল? ধর্ম্মের অগ্নি কত যত্নে জীবনে, পরিবারে, মণ্ডলীতে প্রজ্বলিত করিতে হয়, কত যত্নে রক্ষা করিতে হয়, কত যত্নে কত সাবধানে বৃদ্ধি করিতে হয়, আবার একটু অযত্ন, অসাবধানতা, শিথিলতা উপস্থিত হইলেই, বাহিরে নানা আয়োজন সত্ত্বেও, ধর্ম্মের অগ্নি কিরূপে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তাহার প্রমাণ ধর্ম্মের অতীত ইতিহাস, তাহার প্রমাণ বর্ত্তমানেও আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং মণ্ডলীগত জীবন। নবযুগের নব প্রভাতে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সমবিশ্বাসী, সহকর্ম্মী, দৃঢ়নিষ্ঠ দল, কত পূজা বন্দনা, ব্যাকুল প্রার্থনা, কত সাত্ত্বিক আহার, জমাট সাধু-সঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ, সদাচার ও ব্রত নিয়মের ভিতর দিয়া তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মাগ্নি দেবাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশে তাহা যাহাতে রক্ষিত হয়, তজ্জন্য কত ব্রত নিয়মের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান মণ্ডলীর কে না অবগত আছেন? পুণ্যভূমি এই ভারতে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ধর্ম্মের অগ্নি জীবনে ও গৃহ-পরিবারে কিরূপে প্রজ্বলিত করিতে হয়, কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, কিরূপে জীবনের বিভিন্নস্তরে বৃদ্ধি করিতে হয়, প্রাচীন ভারতের ঋষি আর্য্যগণ, প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থগণ তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা সঙ্গীতে গান করি, "প্রাচীন বিধান, নূতন বিধান, আমাদের প্রণম্য"। কিন্তু এই ভোগ বিলাসিতার যুগে, স্বাধীনতার নামে এই স্বেচ্ছাচারিতার যুগে, অতি অল্প লোকেই বিধি ব্যবস্থার যথার্থ ভাব আপনাদিগের জীবনে জাগ্রত করিয়া, ধর্ম্ম-বিধি, ব্যবস্থা ও ব্রত নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে উৎসুক। জীবনে, গৃহে, পরিবারে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, ধর্ম্ম-বিধি-ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া চলিলেই যে জীবনের যথার্থ স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত জীবনে, গৃহে ও পরিবারে যথার্থ কল্যাণ, তাহা অল্প লোকেই বুঝিতে পারেন, এবং অল্প লোকেই তাহা স্বীকার করেন। সমাজের পরিবারের অধিকাংশ লোকেরই যেন উচ্ছৃঙ্খলার-দিকেও বিধি নিয়ম অগ্রাহ্য করার দিকেই গতি। বিশেষতঃ পরিবারের বালক বালিকা, যুবক যুবতীদিগের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা বিষয়ে বর্ত্তমানে অবহেলা ও উদাসীনতা দেখিয়া আমরা দুঃখিত ও শঙ্কিত। এ সময়ে প্রাচীন ভারতের ঋষিদিগের পুত্র কন্যা ও তাঁহাদের শিক্ষাধীন শিষ্যদিগের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা-দানের বিধি ব্যবস্থা ভাল করিয়া আমাদের স্মৃতি-পথে জাগাইয়া, তাহা আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া রাখা প্রয়োজন। কখন কখন নবযুগের নব নব বিধি, নব সংহিতার নব নব অধ্যায় অনুসরণ ও প্রতিপালন করিতে যাইয়া প্রাচীন কালের অনেক ধর্ম্ম বিধি-ব্যবস্থার মূল্য বুঝা যায়, তৎপ্রতি আদর উপস্থিত হয়; আবার কখন কখন প্রাচীনকালের ধর্ম্ম-বিধি-ব্যবস্থার আলোচনা ও অনুধ্যানের ভিতর দিয়া নবযুগের নব নব ধর্ম্ম বিধি ব্যবস্থা-পালনে নিষ্ঠা ও অনুরাগ

উপস্থিত হইতে পারে। আমাদের ধর্ম্ম-জীবনের পথে প্রয়োজনীয় এবং প্রতিপাল্য বিধি ব্যবস্থার অভাব নাই, এ বিষয়ে নব ভারত ও অতীত ভারত দুইই প্রচুর সামগ্রী আমাদিগকে দান করিয়াছেন। সাধুভক্তগণের জীবন্ত দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। বর্ত্তমানের এই ভোগ বিলাসিতার যুগে আমাদের ধর্ম্ম-জীবনের পথে বিশেষ অভাব কি? গ্রহণের অভাব, পালনের অভাব। সংসারে, গৃহ-পরিবারে ধর্ম্ম-প্রতিপালন চিরদিনই বিশেষ পরীক্ষা-সঙ্কুল এবং বিশেষ যত্ন সাধ্য ও সাহায্য ও সহানুভূতি-সাধ্য। সংসারে, পরিবারে ও গৃহে ধর্ম্ম-প্রতিপালনে সমবায়-প্রণালী অতি আবশ্যক, বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান যুগে। আমরা সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিতে পারি। একটী চুল্লিতে শুক্না একখানা কাঠ লইয়া আগুন জ্বালাইবার চেষ্টা হইতে পারে; একখানা অপেক্ষা দুইখানা, দুইখানা অপেক্ষা তিনখানা শুক্না কাঠ মিলাইয়া আগুন জ্বালাইলে সহজে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। ততোধিক কাঠ মিলিত করিলে আগুন প্রবল অগ্নিতে পরিণত হয়, তখন সামান্য প্রতিকূল বায়ু বা শৈত্যের আক্রমণে নিবিয়া যায় না। আবার এরূপ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে দুই চারিখানা ভিজা কাঠ ফেলিয়া দিলেও তাহা শুষ্ক হইয়া শীঘ্রই মিলিত অগ্নিতে অগ্নিময় হইয়া উঠে। তেমনি ধর্ম্ম-পথে পাঁচটী জীবন সমান-ব্রতধারী হইয়া প্রাণে প্রাণে মিলিলে, পাঁচটী দশটী পরিবার সমান-ব্রতধারী হইয়া প্রাণে প্রাণে ধর্ম্ম-ব্রত-পালনে মিলিত হইল, ধর্ম্মের অগ্নি অদম্য আকার ধারণ করিয়া প্রবল বেগে প্রজ্জ্বলিত হইবে, প্রজ্জ্বলিত থাকিবে। তখন ধর্ম্মের বিধি-পালন সহজ ও স্বাভাবিক হইবে, ধর্ম্ম-পথে জনতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে; ধর্ম্মাগ্নিও তখন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইবে, অগ্নি সময় সময় দাবাগ্নিতে পরিণত হইবে, অগ্নি আর নির্ব্বাণ-প্রায় হইবে না।

—০—

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা।

(১৭৮৩ শকের চৈত্রের তত্ত্ববোধিনী হইতে উদ্ধৃত)

১১ই মাঘে (১৭৮৩ শক) ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক সমাজ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর অন্তঃপুরে যে ব্রহ্মোপাসনা হয়, তাহাতে শ্রীকেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ এই প্রার্থনা করেন।—

জগদীশ! আমি অদ্য পিতা মাতা ভগিনী ও স্ত্রীতে পরিবেষ্টিত হইয়া তোমাকে পরম পিতারূপে সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি আমার পরম পিতা, হৃদয়ের ঈশ্বর। চিরকাল তুমি আমারদিগকে তোমার ক্রোড়ে লইয়া মাতার ন্যায় লালন পালন করিয়াছ, কত প্রকার সুখে সুখী করিয়াছ, কত রাশি রাশি বিঘ্ন হইতে আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছ। গত বর্ষে এই পরিবারে কতপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, কতলোকে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক আমারদিগের কোন বিঘ্নই হয় নাই। যেখানে মঙ্গলময় স্বয়ং আশ্রয় দিতেছেন, সেখানে আবার বিঘ্ন কি? অনেকেই আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু তুমি যখন এ পরিবারের গৃহদেবতা, তখন আর আমারদিগের ভয় কি? তুমি যখন আমারদের সহায়, তখন আমারদিগের মঙ্গলই হইবেক, সন্দেহ নাই। এ পরিবার তোমারই পরিবার। অদ্য আমরা সেই জীবনদাতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন সার্থক করিতেছি। আমরা এখন কি দেখিতেছি না, চতুর্দ্দিকে মঙ্গলের উন্নতি, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি। আমারদের যে একটী আশা আছে যে, সমুদায় পৃথিবী এক পরিবারে বদ্ধ হইবে, এ আশা বৃথা হইবার নহে। সময় ক্রমে গৃহে গৃহে যোগ হইয়া সকলেই প্রীতিরসে মিলিত হইবে, সকল পরিবারই এক হইবে। এক ঈশ্বরের রাজ্যে দুই পরিবার কখনই থাকিবে না, সকল পরিবারই এক হইবে। অদ্য এই বঙ্গদেশের মধ্যে তাহার সূত্রপাত হইল। হে জগদীশ! এ সংসারে এ পরিবারকে রক্ষা করিবার আর কেহই নাই, তুমিই ইহাকে রক্ষা কর। তুমি যে গৃহের অধিদেবতা, তাহার আর অমঙ্গল কোথায়? এ পরিবারই তাহার প্রমাণ। সহস্র সহস্র বিঘ্ন আসিয়া ইহাকে পরিবেষ্টন করিতেছে, অথচ ইহা সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তোমারই ক্রোড়ে অগ্রসর হইতেছে। এত বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যেও আমারদিগের ক্লেশ নাই, ভয় নাই। কেবল আনন্দেরই উৎস উৎসারিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! আমরা মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী সকলেই এখানে একত্র হইয়া ঈশ্বরের চরণে পূজা উপহার দিতেছি। ধন্য পরমপিতা, আশ্চর্য্য তোমার করুণা। পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত তোমারই মহিমা ঘোষণা হউক, বিশুদ্ধ প্রেম ও পবিত্র ভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হউক। আমরা যেন লোকভয়ে ভীত না হই, আমরা যেন সাংসারিক সুখের জন্য লালায়িত না হই, আমারদের আত্মা যেন সাংসারিক সকল বিষয়েই শান্তভাব অবলম্বন করে। তোমাকে পাওয়াই যেন আমারদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য থাকে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

—০—

অষ্টচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক।

[নববিধান ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা।]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২৯শে ভাদ্র, সন্ধ্যার পূর্ব্বে করোনেশন পার্কে সঙ্গীত ও বক্তৃতা হয়। বিষয় ছিল, "ঈশ্বর তোমার সঙ্গে"। বক্তৃতার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল না। অতঃপর মালাকার টোলা স্বর্গীয় অধরচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে উপাসনা ও উপদেশ হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন। একটি অন্ধ মিষ্ট সঙ্গীত করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। অনেক গুলি ভাই ভগিনী উপাসনাতে যোগদান করিয়াছিলেন। গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র দাস সকলকে ষোড়শোপচারে জলযোগ করাইয়া ছিলেন।

৩০শে ভাদ্র, শনিবার, পূর্ব্বাহ্নে হাটখোলায় শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদার গৃহে উপাসনা ও মধ্যাহ্ন ভোজন হয়। সায়ংকালে

মন্দিরে রায় বাহাদুর ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ইংরাজী ভাষাতে সংক্ষেপে উপাসনা করিয়া, মেরী ও মার্থার জীবন অবলম্বনে একটী উপাদেয় উপদেশ পাঠ করেন। কার্য্যারম্ভের প্রাক্‌কালে এবং উপদেশের শেষে একটী সুগায়ক যুবক মধুর সঙ্গীত করিয়া ছিলেন। তৎপরে একটী নূতন সঙ্গীত গীত হয়। সঙ্গীতটী উপদেশের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল। তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

কিবা পুণ্যরূপিণী, মার্থা মেরী দুই ভগিনী।
স্মরিলে তাঁদের দোঁহে, হৃদে হেরি গুণমণি।
মেরী দেখ নিষ্ঠাযুত, পান করে কথামৃত ;
সদা যিশুর অনুগত, মধুর মৃদু-ভাষিণী।
মার্থা সদা কর্ম্মে রত, সাধন করে সেবাব্রত ;
যাহে প্রভু তুষ্টচিত, সেই কর্ম্মানুসারিণী।
এরা কি সৌভাগ্যবতী, নবধর্ম্মে হল মতি ;
(ভ্রাতা) লেজারসের সদ্‌গতি, মরিয়া পেল জীবনী।
দেখ নূতন বিধানে, মিলিয়াছে দুই বোনে ;
সেবা করে নিশিদিনে, শ্রীমুখের কথা শুনি।

৩১শে ভাদ্র, রবিবার সমস্ত-দিনব্যাপী উৎসব। পূর্ব্বাহ্নে শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় বেদীর কার্য্য করেন এবং প্রেম বিষয়ে একটী সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। উপাসনান্তে সাধু-সেবা হয়। ন্যূনাধিক ১০০ জনের সেবা করা হইয়াছিল। মাধ্যাহ্নিক উপাসনা মৈমনসিংহ হইতে সমাগত ভ্রাতা ডাক্তার বৈদ্যনাথ রায়, গৃহস্থ প্রচারক, সম্পাদন করেন। তৎপরে ভাই দুর্গানাথ সেবকের নিবেদন হইতে পাঠ করেন। পাঠান্তে আলোচনা হয়। আলোচনার বিষয় ছিল, "আমাদের প্রেমের উচ্ছ্বাস হইতে পারে কি রূপে ?" অনেকে আলোচনাতে যোগ দিয়াছিলেন। আলোচনান্তে ভাই মহিম চন্দ্র ধ্যানের উদ্বোধন করিয়া সকলকে ধ্যানের গূঢ় রাজ্যে আহ্বান করেন। ধ্যানান্তে ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়। প্রার্থনা শেষ হইলে ভ্রাতা অখিল চন্দ্র রায় এবং অবিনাশ চন্দ্র দাস জমাট কীর্ত্তন করেন। সায়ংকালীন উপাসনা ভাই মহিমচন্দ্র সেন করেন এবং উপদেশে ব্রাহ্মসমাজে প্রেমিকের অভাব উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। প্রেম ধর্ম্ম-জীবনের সার বস্তু। সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে সাধু সজ্জনেরা প্রেমেই জগৎ মোহিত করিয়াছেন। প্রেমের একটী সংক্রামিকা শক্তি আছে। একটী লোক সত্য সত্যই প্রেমে মগ্ন হইলে তাহার সংযোগে অন্যান্য লোক জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মগ্ন না হইয়া যায় না। এইরূপ সংক্ষেপে অল্প কয়েকটী কথা বলিয়া, তিনি আগামী বর্ষের জন্য "প্রেমের ব্রত" গ্রহণ পূর্ব্বক, বিনীত ভাবে সকলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন।

১লা আশ্বিন, সায়ংকালে সংকীর্ত্তনে উপাসনা হয়। মন্দিরে অনেকগুলি ভাই ভগিনী উপস্থিত ছিলেন এবং অন্যান্যবার অপেক্ষা এবার কীর্ত্তন অধিকতর জমাট ও গম্ভীর হইয়াছিল।

২রা আশ্বিন, সায়ংকালে সঙ্গত-সভার সাম্বৎসরিক এবং উপাসক-মণ্ডলীর বার্ষিক সভা হয়। প্রথমতঃ উপাসক-মণ্ডলীর বার্ষিক সভা হইয়া তাহাতে সম্পাদকের আয় ব্যয় হিসাব পঠিত হয়। তৎপর সঙ্গত-সভার উপযোগিতা ও কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া প্রার্থনান্তে সে দিনকার কার্য্য শেষ হয়।

৩রা আশ্বিন, বুধবার পূর্ব্বাহ্নে ভয়ানক বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তা ঘাট কর্দ্দম ও জলময় হইয়া পড়িয়াছিল। অপরাহ্নে নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইতে পারিবে, এরূপ আশা করা যাইতেছিল না। সমস্ত দিন আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন ছিল। সঙ্কীর্ত্তনের দল যথাসময়ে আসিয়া মন্দিরে সমবেত হন এবং কীর্ত্তন করিতে থাকেন। কেহ কেহ কীর্ত্তন লইয়া বাহির হইতে একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন। অবশেষে ভাই দুর্গানাথ আসিয়া প্রার্থনা করিলে কীর্ত্তনের দল নগরের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ক্রমে বাবুর বাজার, আমপট্টী, ইস্‌লামপুর, পাটুয়াটুলী হইয়া, পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তত্রত্য বন্ধুগণ সাদরে কীর্ত্তনের দলকে গ্রহণ করেন। তথায় কিছুকাল কীর্ত্তন করিয়া, পরে শাঁখারী বাজার, তাঁতি বাজার, কামার নগর, নূতন বাজার ও আর্ম্মাণিটোলা হইয়া, কীর্ত্তন করিতে করিতে পুনরায় মন্দিরে প্রবেশ করিলে, কীর্ত্তন ও নৃত্য হইয়া কার্য্য শেষ হয়। বিশ্রামান্তে সকলে খেচড়ায় ভোজন করেন।

৪ঠা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্নে নিশান ও খোল করতাল সহ একদল নৌকাতে কীর্ত্তন করিতে করিতে বাবুর বাজারের ঘাট হইতে বুড়ী গঙ্গার বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে ফরাসগঞ্জ পৌছেন। তথায় স্বর্গীয় আনন্দ মোহন দাস মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হয়। সুসজ্জিত এবং সুবিস্তৃত গৃহে অনেক গুলি উপাসনাশীল বৃদ্ধ বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। ভাই মহিম চন্দ্র সেন উপাসনা করেন এবং স্থানোপযোগী একটী গভীর উপদেশ দান করেন। উপদেশের সংক্ষিপ্ত ভাব এইরূপে লিপিবদ্ধ হইতে পারে। মহর্ষি ঈশা বলিলেন, "একটী সূচীর ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের যাতায়াত সম্ভব হইলেও ধনীর পক্ষে স্বর্গ-প্রবেশ সম্ভব নহে"। পরমহংস রামকৃষ্ণ বলিলেন, "কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না করিলে কিছুই হবে না"। পরমহংসের এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার এক শিষ্য বলিয়াছিলেন, "আপনি কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলেন, কৈ কেশব সেন ত তাহা ত্যাগ করেন নাই ?" তদুত্তরে পরমহংস বলেন, "কেশব সেনের কথা ছেড়ে দাও, ও সিদ্ধ ধান। সিদ্ধ ধান কোন অবস্থাতেই আর গজায় না"। বন্ধুগণ, আমাদিগকে এই কেশব চন্দ্রের মত সিদ্ধ ধান হইতে হইবে। কিরূপে সিদ্ধ ধান হওয়া যায় ? ভক্তিযোগে। বিষয়-প্রবণতা অর্থাৎ আসক্তি এবং ব্রহ্মানুরাগ দুই মানব-হৃদয়ে স্থিতি করিতেছে। বিষয়াসক্ত হইলে নরক এবং অন্তরতর অন্তরতম দেবতাতে অনুরাগ যুক্ত হইলে ভূমানন্দ বিমলানন্দ। শঙ্করদশীতে আছে, ঋষিগণ সাম-ধেনী-মন্ত্রযোগে কাষ্টের ভিতর হইতে অগ্নি বাহির করিতেন। ভক্তি-যোগে যখন ভক্ত

প্রহলাদের ন্যায় হুঙ্কার দিয়া বলেন, "হে আমার হরি প্রাণনাথ, সর্ব্বভূতময় বিভু, তুমি প্রকাশিত হও", তখন আর তিনি লুক্কায়িত থাকিতে পারেন না। ভক্তিতেই জলে হরি, স্থলে হরি, স্ত্রী পুত্র পরিবারে হরি, টাকা কড়িতে হরি-দর্শন হয়। উপদেশান্তে ভ্রাতা অবিনাশ চন্দ্র দাস, "কি সুখ জীবনে মম, ও হে নাথ দয়াময় হে। যদি চরণ-সরোজে পরাণ-মধুপ চিরমগন না রয় হে।" এই সঙ্গীত করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন।

৫ই আশ্বিন, শুক্রবার, নারায়ণগঞ্জে প্রচার-যাত্রা হয়। তথায় দুই স্থানে কীর্ত্তন হইয়া উকীল বাবু যতীন্দ্র নাথ দাসের গৃহে ভ্রাতা অখিল চন্দ্র রায় উপাসনা করেন। উপাসনান্তে যাত্রিদল চা ও মিঠাই পান ভোজন করিয়া ঢাকাতে ফিরিয়া আসেন।

৬ই আশ্বিন, শনিবার, বাবু অবিনাশ চন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্ "নববিধান ও শ্রীমদ্ভাগবত" বিষয়ে একটী ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন।

৭ই আশ্বিন, রবিবার, পূর্ব্বাহ্ণে মহিলাদিগের উৎসব হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন, এবং উপদেশ প্রদান করেন। ঐ দিন প্রাতঃকালে একদল যুবক, বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় ব্রাহ্ম নৌকাযোগে ভ্রমণ, কীর্ত্তন ও উপাসনা করেন। শুনিয়াছি, তাঁহাদের সংখ্যা অন্যূন ২৫ জন হইবে। ভ্রাতা অখিল চন্দ্র রায় ও অবিনাশ চন্দ্র দাসের সমাগমে স্থানীয় যুবকদিগের এই নবোৎসাহ আশা-জনক। অপরাহ্ণে বালক বালিকাদের উৎসব হয়। সন্ধ্যার পর ভ্রাতা অখিল চন্দ্র রায় বেদী গ্রহণ করিয়া উপাসনা করেন, এবং সুন্দর উপদেশ দেন। তৎপর কীর্ত্তনান্তে শান্তিবাচন হয়। ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ভ্রাতা অখিল চন্দ্রের মিষ্ট উপাসনা ও উপদেশ অনেকের নিকট ভাল লাগিয়াছিল। দয়াময়ী বিধান-জননীর ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তাঁহার পুণ্য নাম মহীয়ান্ হউক।

শ্রীমহিম চন্দ্র সেন।

মাতৃদেবীর জীবনের দু' একটী কথা।

(৭ই অক্টোবর, শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

আমাদের পরমারাধ্যা জননী দেবী সুপ্রভা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর, রবিবাসরে, কলিকাতা ৯নং ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটে, ভোর ৫টার সময় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের দ্বিতীয়া কন্যা।

মা আমাদের অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। শৈশবকাল হইতেই তাঁহার লেখাপড়া শিখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ ছিল, কিন্তু সুযোগ ও সুবিধার অভাবে বিশেষ উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। সামান্য যাহা কিছু শিখিয়া ছিলেন, আপনার অসামান্য বুদ্ধি ও প্রতিভা-বলে তাহার যথাসাধ্য উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। শৈশবে মাতৃদেবী, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ খৃষ্টীয় মিশনারীদিগের যে স্কুল আছে, তাহাতেই প্রথম বিদ্যারম্ভ করেন। শৈশব হইতেই তাঁহার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল, যাহা একবার শিখিতেন, তাহা কখনও ভুলিতেন না। তিনি আপনার ক্লাসে সর্ব্বদা প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। খৃষ্টীয় মিশনারীদিগের স্কুল ছাড়িয়া বর্ত্তমানের ভিক্টোরিয়া স্কুলেও কিছুদিন বিদ্যাভ্যাস করেন। তাহার পর তাঁহার পিতৃদেব কলিকাতা ছাড়িয়া নারকেল ডাঙ্গায় গিয়া বসবাস করাতে, মাতৃদেবীর বিদ্যাশিক্ষা কিছুদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়।

মাতৃদেবীর বয়স যখন ১২।১৩ বৎসর, তখন তিনি বাঁকীপুরের স্বর্গগত প্রকাশ চন্দ্র রায়ের পত্নী দেবী অঘোরকামিনীর পরিচালিত স্কুলে পড়িতে যান ও প্রায় বৎসরাধিক কাল সেই মহীয়সী মহিলার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া শিক্ষালাভ করেন। এই সময়েই সেই পুণ্যবতী নারীর প্রভাবে তাঁহার সকল গুণের বিকাশ হয়, যাহা পরবর্ত্তী কালে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। দেবী অঘোরকামিনীর প্রভাব মাতৃদেবীর জীবনে এক জলন্ত ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল, যাহা কালের প্রবাহেও মলিন হয় নাই। মাতৃদেবীর নিকট তিনি আদর্শ রমণী ছিলেন। কতদিন তাঁহার নিকটে সেই দেবীর কতই পুণ্যকাহিনী শ্রবণ করিয়াছি। অধিক দিন তাঁহার সংসর্গে থাকিতে পারেন নাই, ইহা তাঁহার এক মহা দুঃখ ছিল। তথাপি সেই দেবীর উপদেশে ও দৃষ্টান্তে যে পবিত্রতা, আত্মচেষ্টা ও আত্মত্যাগের শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা মাতৃদেবীর ভবিষ্যৎ জীবনে যেমন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এমন বোধ হয় আর কাহারও জীবনে লক্ষিত হয় নাই।

বাঁকীপুরের স্কুল ছাড়িয়া, কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া, শ্রদ্ধেয় প্রচারক গৌরগোবিন্দ রায়ের নিকটে কিছুকাল শিক্ষা লাভ করেন। এই সকল সাধু ও সাধ্বীর সংস্পর্শে মাতৃদেবীর জীবন-কুসুমটী স্বর্গের পবিত্রতার সৌরভে সুরভিত ছিল। শৈশবে যে মহাশিক্ষার বীজ গভীর ভাবে তাঁহার জীবনে নিহিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী জীবনে তাহা মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়া অপূর্ব্ব ফুল ফলে পরিশোভিত হয়।

মাতৃদেবীর যে শুধু বিদ্যালাভের জন্য আগ্রহ ছিল, তাহা নহে। আপনার মাতার ক্রোড়স্থ ৪৫টী ভাইকে জননীর ন্যায় স্নেহে প্রতিপালন করেন। সাংসারিক সকল কর্ম্ম এমন ক্ষিপ্রগতিতে ও আশ্চর্য্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন করিতেন যে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হইত। যেমন তেমন করিয়া 'দায় সারা গোছে'র কাজ তিনি জীবনে কখনও করেন নাই। যাহাতে সকল কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার কোন কাজে খুঁত থাকিত না। নূতন যাহা কিছু যখনই দেখিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা শিখিতে চাহিতেন। গৃহকার্য্যের সুব্যবস্থা করা ও রন্ধনাদি কার্য্যে তাঁহার বিশেষ নিপুণতা ছিল। সীবন গান বাজনা কোন কিছুতেই তাঁহার আগ্রহ কম ছিল না। আত্মচেষ্টায় তিনি সকল বিষয়েই লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিক লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার বড়ই দুঃখ ছিল। গুরুজনের প্রতি

শ্রদ্ধা, দীন দুঃখীর প্রতি দয়া ও সেবার ভাব শৈশব হইতে তাঁহার জীবনে বিশেষ ভাবে ছিল।

মাতৃদেবী উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের নিকটে উপযুক্ত বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মা আমাদের অত্যন্ত ধার্ম্মিকা ছিলেন। দীক্ষালাভের পর হইতে তিনি উপাসনাকে জীবন-ধারণের এক প্রধান অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন। প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে সর্ব্বাগ্রে তিনি উপাসনা করিয়া তবে অন্য কার্য্যে হস্ত নিক্ষেপ করিতেন। উপাসনার অন্যথা তাঁহার জীবনে কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। জীবনের শেষভাগে নিদারুণ রোগশয্যায় যখন শায়িত ছিলেন, তখন সর্ব্বদা নাম-জপ করিতেন। প্রার্থনাকে জীবনের সম্বল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, জীবনের সকল শোক, দুঃখ ও সংগ্রামের ভিতর দিয়া, স্থির ধীর ভাবে আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, কলিকাতা খিদিরপুরস্থ ৺কেদার নাথ দাস ঘোষের পুত্র ক্ষেত্রমোহন দাস ঘোষের সহিত মাতৃদেবীর শুভবিবাহ হয়। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় পুরোহিতের কার্য্য করেন। মাতৃদেবী যথাক্রমে দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যার মাতা হন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রটী অতি শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মঙ্গলময় বিধাতার বিধান বড়ই রহস্যময়! তাঁহার লীলা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। তাঁহারই বিধানে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মাতৃদেবী বিধবা হইলেন। স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে পিতৃদেব প্রায় এক বৎসর অতি কঠিন পীড়ায় পীড়িত ছিলেন। আমার পুণ্যবতী সাধ্বী সেবাপরায়ণা জননী এমন একাগ্রচিত্তে ধৈর্য্য সহকারে পিতার সেবা করিয়া ছিলেন যে, যাঁহারা তাঁহার সেই অক্লান্ত ভাবে সেবা করা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন। বিশ্ব-নিয়ন্তার লীলা অতি অপূর্ব্ব! তিনিই শোকাগ্নি প্রজ্বলিত করেন; আবার তিনিই তাহাতে সান্ত্বনা-বারি সেচন করেন। তাঁহারই কৃপায় মাতৃদেবী এই মহাশোকভার ধৈর্য্য সহকারে বহন করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, শোক দুঃখ আসিয়া মানুষের মনকে একেবারে অভিভূত করিয়া দেয় ও সকল প্রতিভা মলিন করে। কিন্তু এই শোক মাতৃদেবীর নবজীবন-লাভের উপায়-স্বরূপ হইয়াছিল। শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া তাঁহার জীবন সমধিক উজ্জ্বল ও নির্ম্মল হইল। বিধবা হইবার কিছুকাল পর হইতেই মাতৃদেবীর জীবন-প্রভাব ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, মাতৃদেবী তিনটী শিশু সন্তান লইয়া কানপুর বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী রূপে গমন করেন। তাঁহার মাতাপিতা দূরদেশে তাঁহাকে একাকী পাঠাইতে আপত্তি করেন, কিন্তু আত্মনির্ভরশীলা জননী ভগবানের উপর ভরসা করিয়া প্রবাসে যাত্রা করিলেন। মাতৃদেবী যখন কানপুর বালিকা-বিদ্যালয়ে গমন করেন, তখন মাত্র কয়েকটী বালক বালিকা লইয়া "হিন্দু শিশু-বিদ্যালয়" নামে বালিকা-বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়। এই বালিকা-বিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার কর্ম্মজীবনের সম্বন্ধ এমনই ঘনিষ্ঠ ও অচ্ছেদ্য যে, সে বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ বলিতে হইলে বিদ্যালয়ের ইতিহাস লিখিতে হয়। যদিও তিনি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে কেহই ছিলেন না, তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ সেই "শিশু" তরুটি এক ফলবান মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। মাতৃদেবী যখন প্রথম কানপুরে গমন করেন, তখন ঐ প্রদেশ স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল; কিন্তু মাতৃদেবীর একান্ত চেষ্টায় আজ সেই বালিকাবিদ্যালয় হাইস্কুলে পরিণত হইয়া তাঁহার কর্ম্মজীবনের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কানপুরের সর্ব্বসাধারণের নিকট তিনি "গুরুমা" নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি যে সামান্য লেখাপড়া জানিতেন, সর্ব্বদা তাহার উৎকর্ষ করিতেন। কানপুর বালিকা-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালী এবং হিন্দুস্থানী উভয়-জাতীয়া বালিকা-গণই শিক্ষা লাভ করে। মাতৃদেবী দেখিলেন, হিন্দুস্থানী প্রদেশে বাস করিতে হইলে, তাহাদের ভাষা শিক্ষা না করিলে, কাজ করা অসম্ভব। তৎক্ষণাৎ তিনি মহা উৎসাহে হিন্দি আরম্ভ করিলেন এবং ২।১ বৎসরের মধ্যে তিনি এমন শুদ্ধ হিন্দি বলিতে ও লিখিতে শিখিলেন যে, সেই দেশের বাঙ্গালী মেয়েরা ত দূরের কথা, ঐ দেশে জন্ম এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক বাঙ্গালী পুরুষ মানুষের মুখেও তেমন শুদ্ধ হিন্দি খুব কমই শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দির সহিত উর্দ্দু ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়া, তিনি উর্দ্দুও শিখিতে আরম্ভ করেন।

মাতৃদেবীর কর্ত্তব্য-জ্ঞান অত্যন্ত প্রবল ছিল। কানপুর বালিকা-বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ সেন মহাশয়কে এ বিষয়ে প্রায়ই বলিতে শুনিয়াছি। তিনি উপর্য্যুপরি আট বৎসর আটবার Influenza রোগে আক্রান্ত হয়েন, কিন্তু রোগশয্যায় পড়িয়াও বিদ্যালয়-সম্বন্ধে যথাসম্ভব নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতে ত্রুটী করিতেন না। অবশেষে যখন শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল, তখন স্কুল ছাড়িয়া দিতে মনস্থ করিলেন। অনেকে তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য ছুটী লইতে অনুরোধ করেন, কিন্তু "ফাঁকি দিয়া টাকা লওয়া অন্যায়" বলিয়া, কর্ত্তৃপক্ষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, দীর্ঘ ১৭ বৎসর বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া, স্ব ইচ্ছায় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু সন্তানের প্রতি জননীর যেমন গভীর স্নেহ থাকে, তেমনি কানপুর বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার আন্তরিক টান ছিল। কানপুর বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীরূপে তিনি কানপুরে গমন করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাই ছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়টী যখন 'হাই স্কুলে' পরিণত হইল, তখন তিনি বারংবার কোন গ্রাজুয়েটকে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী করিবার জন্য সেক্রেটারী মহাশয়কে অনুরোধ করেন; কিন্তু মাতৃদেবী নিজগুণে এমনই সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়াছিলেন যে, স্কুলকমিটী তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। অগত্যা তাঁহার অধীনেই গ্রাজুয়েট শিক্ষয়িত্রী-গণকে কাজ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি নিজ ক্ষমতার কখনও

অপব্যবহার করেন নাই, এজন্য সকল শিক্ষয়িত্রীগণ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন।

মাতৃদেবী যে শুধু বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেন, তাহা নহে। আপনার শিশু সন্তানগণের প্রতি কর্ত্তব্যও পূর্ণ মাত্রায় পালন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কখনও সন্তানদের গায়ে হাত তুলিতেন না। অবোধ শিশুদিগকে কেহ মারিলে, তাহা যে কিরূপ গর্হিত কর্ম্ম, তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া অতিরিক্ত রকম আদর দিয়া সন্তানদের কোন অন্যায় আবদারে প্রশ্রয় দেন নাই। আমাদের শৈশবাবস্থায় পূজনীয় পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন, কিন্তু আমাদের প্রেমময়ী মার অতুল স্নেহে কখনও পিতার অভাব বোধ করি নাই। তিনি একাধারে আমাদের পিতা মাতা উভয়ই ছিলেন। আজ স্নেহময়ী জননীর তিরোধানে, উভয়ের অভাব অতি তীব্ররূপে বোধ করিতেছি, জগৎ শূন্য বোধ হইতেছে।

সন্তান-পালন ও বিদ্যালয়ের কর্ম্ম সমাপনান্তে যে অবসর পাইতেন, সেই সময়টুকুতে প্রতিবেশী ও বন্ধুবর্গের সাহায্য করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। যেখানে রোগ, শোক, বিপদ, মাতৃদেবীকে সেইস্থানে সর্ব্বাগ্রে দেখিতে পাওয়া যাইত।

বিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করিয়া এক বৎসর কানপুরে ও তাহার পরে নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া, ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু "ভাঙ্গা জোড়া লাগে না"। আপনার কর্ম্মক্ষেত্র কানপুরের প্রতি তাঁহার প্রাণের টান ছিল, তাই নানা স্থানে ঘুরিয়া কোন স্থানও তাঁহার মনঃপূত হইল না এবং অবশেষে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পুনরায় কানপুরে গিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি কানপুরের স্বনাম-ধন্য ডাক্তার সুরেন্দ্র নাথ সেনের পিতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সেন মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "কানপুরেই আমার মাটী আছে, তাই ফিরে এলাম। কানপুরে যাইবার অল্পদিন পরেই তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়েন ও প্রায় ৩ মাস পরে জ্বর ছাড়ে; কিন্তু heart দিন দিন অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়াতে ক্রমেই শক্তিহীন ও রক্তশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন। স্থানীয় হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী চিকিৎসকগণ বিনা পারিশ্রমিকে ও বিনামূল্যে ঔষধ দিয়া মাতৃদেবীর যথাসাধ্য চিকিৎসা করেন। বালিকা-বিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করিলেও, মাতৃদেবী যে কানপুরের জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে ভদ্র অভদ্র, ধনী নির্ধন, সকলের হৃদয়ে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা তিনি রোগ-শয্যায় শায়িতা হইলে পরে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সুদীর্ঘ নয় মাস তিনি নিদারুণ রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করেন, এই সুদীর্ঘ কাল সকল শ্রেণীর সকল জাতীয় লোক প্রত্যহ তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। শেষের কয়দিন যখন রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, তখন প্রত্যহ প্রায় ১৫।২০ জন করিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। এমনই তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্রী ছিলেন। কানপুরের সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলেই হাতজোড়ে করিয়া মাতৃদেবীকে বলিতেন, "আপনার কি সেবা করিতে হইবে, আদেশ করুন"। তাঁহার জন্য কেহ কোন কাজ করিতে পাইলে আপনাকে যেন অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করেন, এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। সমস্ত কানপুরবাসিগণ যে আমাদের জন্য কি করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁহাদের নিকট আমরা চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম। মাতৃদেবী যে শুধু আমাদের মা ছিলেন তাহা নহে, তিনি যে সমগ্র কানপুরবাসিগণের অতি শ্রদ্ধার "গুরুমা" ছিলেন। তাই তাঁহার রোগশয্যায়, বলিতে গেলে, সমগ্র দেশবাসী আসিয়া, তাঁহার সেবা করিয়া, আপনাদের কৃতার্থ বোধ করেন। কিন্তু হায়! সকলের সকল সেবা, যত্ন, চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, আপনার স্নেহের সন্তানগণকে অনাথ করিয়া, মাতা পিতা ভাই বন্ধুকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া, মাতৃদেবী অমরধামে অমরবাসিগণের নিকট চলিয়া গেলেন। শুধু কি আমরাই অনাথ হইলাম? সমগ্র কানপুরবাসিগণ আপনাদের শুভার্থিনী "গুরুমা" হারা হইলেন। বিধান-জননী একটী বিশ্বাসী ধর্ম্মনিষ্ঠাবতী কন্যাকে আপনার প্রেমক্রোড়ে টানিয়া লইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুহাস ঘোষ।

যুগধর্ম্ম।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

পূর্ব্বাপর যোগের ভিতর দিয়াই মানব-জগৎ অগ্রসর হইতেছে। সঙ্গীতের পূর্ণ বিকাশের যুগে কেবল "সা রে"র উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যেমন সভ্য জগতে কোন গীত রচিত হইতে পারে না এবং রচিত হইলেও প্রাণের সকল ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারে না, সেইরূপে কেবল যোগ অথবা কেবল ভক্তির উপর যুগধর্ম্মের প্রশস্ত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না এবং সে ধর্ম্ম আত্মার সকল অভাব পূর্ণ করিতে পারিবে না। নবযুগের এই সাধন-সমন্বয়ের ভিতর দিয়াই পৃথিবীতে ধর্ম্ম-সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। এই সমন্বয়ই যুগধর্ম্ম-ভাগবতের নূতন সঙ্গীত, ইহাই নবযুগের পূর্ণ ধর্ম্ম।

এই যুগধর্ম্ম-ভাগবত বর্ত্তমান ধর্ম্ম-জগতে এক অভিনব সৃষ্টি! পৃথিবী অবিরাম গতিতে যেমন নূতনত্বের দিকে চলিয়াছে, ধর্ম্মও তেমনি নব নব রূপ ধারণ করিতেছে। নদীর স্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতেছে, সমুদ্রের তরঙ্গ ক্রমাগত সীমা-রেখা অতিক্রম করিয়া অনন্তের পানে ছুটিয়াছে, বায়ু উত্তর হইতে দক্ষিণে ও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ক্রমাগত ছুটাছুটি করিতেছে, সৌর-মণ্ডলে জ্যোতিষ্কগণ স্বগতিতে দিবারাত্র ঘুরিতেছে। পৃথিবীর গতি যদি থামিয়া যায়, তখনি প্রলয় উপস্থিত হইবে। কার সাধ্য পৃথিবীর গতি রোধ করিতে পারে? অসম্ভব। এ সকল গতির অর্থ কি? পুরাতন পরিহার করিয়া প্রকৃতি নূতনকে বরণ করিতে চায়। প্রকৃতির

স্বভাবই রূপ-পরিবর্ত্তন। মানব-প্রকৃতিও এইরূপই। অবিশ্রান্ত-গতিশীল মানব-প্রকৃতি নিত্যই নিজকে নূতন করিয়া গড়িতে চায়। তাহাকে পুরাতনে বাঁধিয়া রাখ, মৃত্যু অনিবার্য্য। মানুষ চায় যে নূতন সমাজ গড়িতে, নূতন শিক্ষা বিস্তার করিতে, নূতন সাধনা প্রবর্ত্তন করিতে, নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে, নূতন বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে। এই নূতন সৃষ্টিই যুগধর্ম্মের প্রকৃতি। সঙ্গীত-জগতের সপ্ত সুরের ভিতর দিয়া মানবের মনোভাব যেমন একই তালে নাচিয়া উঠিতেছে, এই সমন্বয়ের সপ্ত সুরের মধ্য দিয়া জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে মানব-মণ্ডলী একদিন অখণ্ড পরিবারে নিবদ্ধ হইবে।

ভগবান্ যেমন সত্য-স্বরূপ, সত্যের আরাধনা যেমন মানবের ধর্ম্ম, মিলনও তাঁহার একটী স্বরূপ। জড় জীব পশু পক্ষী মানুষ সব তাঁহাতে মিলিত হইয়াছে এবং তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে। মিলনই প্রকৃতির ধর্ম্ম। মিলন অর্থে আমি এ কথা বলিতেছি না যে, সব ফুলই গোলাপ হইবে, সব পাখীই ময়না হইবে, সব নারীই পুরুষ হইবে, অথবা সব পুরুষই নারী হইবে এবং সব ধর্ম্ম-শাস্ত্রই বেদ হইবে। গোলাপের কাছে শতদল রাখিলে একের রূপ অন্যের শোভাকে বর্দ্ধিত করিবে, একের সৌরভ অন্যের সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তুলিবে। ময়নার স্বর-লহরী পাপিয়ার সঙ্গীতকে মধুময় সুস্বরে পরিণত করিবে। বেদের ধর্ম্মজ্ঞান বাইবেলের সহিত মিলিয়া অপূর্ব্ব সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিবে। নর নারীর সমন্বয়ে নূতন মনুষ্যত্ব প্রস্ফুটিত হইবে। হর-গৌরীর মিলনের প্রাচীন আদর্শ পূর্ণ হইবে। প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তি, ধর্ম্ম বা মত, শাস্ত্র বা সাধনা স্ব স্ব সত্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমন্বয়ের ভিতরে এক অভিনব সত্তায় ফুটিয়া উঠিবে। ইহাই প্রকৃত মিলন। বিচিত্রতার মধ্যে একত্বের সমাবেশ-সাধনই মিলন, বৈষম্যের ভিতর সাম্য-প্রতিষ্ঠাই যথার্থ সমন্বয়। এই সমন্বয়-শাস্ত্র প্রচার করিবার জন্যই যুগধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে। এই যুগধর্ম্ম-ভাগবতে এই সনাতন সত্য যুগযুগান্তরের মধ্য দিয়া আমাদের নিকট আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। পূর্ব্বাপর যোগের মধ্য দিয়া যেমন জড় জগতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই সৃষ্টির ক্রিয়া যেমন এখনও চলিতেছে, ধর্ম্ম-জগতেও সেই রূপ সকল ধর্ম্ম-বিধানের পূর্ব্বাপর যোগের ভিতর দিয়া এই যুগধর্ম্ম আমাদের নিকট পূর্ণাবয়ব ধারণ করিয়াছে। ইহাই ভগবানের নূতন প্রকাশ বা নূতন বিধান।

যুগধর্ম্ম-ভাগবতের প্রত্যেক ছত্রে প্রেমের বাণী ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রেমে যেমন ইহার আরম্ভ, সেই রূপ প্রেমেই ইহার পূর্ণতা। একজনের রসনা যে এই দেবলীলা বলিয়া শেষ করিবে, তাহা সম্ভব নয়। অথবা এক বংশ যে ইহার মহাকীর্ত্তি লিখিয়া শেষ করিবে, তাহাও অসম্ভব। কত বংশ আসিবে, কত বংশ চলিয়া যাইবে, তথাপি ইহার প্রেম-লীলার সমাপ্তি হইবে না। ইহাতে কি তোমার আমার পার্থিব প্রেমের আদর্শ লিখিত হইবে? না। সেই অপার্থিব প্রেম, যে প্রেম সাম্রাজ্য ও রাজ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলে নিজের গৃহ রচনা করে, যে প্রেম ধূলিতে আপন বিশ্রাম শয্যা নির্ম্মাণ করে, যে প্রেম আহত পক্ষীটীর জন্য নিজের প্রাণ বলিদান করিতে প্রস্তুত, যে প্রেমের স্পর্শ পাইয়া হিংস্র জীব হিংসা ভুলিয়া যায়, যে প্রেম মৈত্রীর সংবাদ প্রচার করিয়া অচল সচল জীব জন্তু সকলের কল্যাণ কামনায় রত, সেই প্রেমের আদর্শ ইহাতে লিখিত হইবে। যে প্রেম একদিন ঘোষণা করিয়াছিল যে, ধরিত্রীর বক্ষ হইবে আমার ভোজন-পাত্র এবং এই দুই কর হইবে আমার পান-পাত্র, আর আমার কিছু থাকিবে না, সেই মহা-প্রেমের আদর্শের স্বর্ণ ছবিতে ভাগবতের প্রতি অক্ষর উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। বন্ধুগণ, যে কেহ পার অগ্রসর হও, হৃদয়ের লাল রক্ত দিয়া ভাগবতের পবিত্র অধ্যায় লিখিতে আরম্ভ কর।

শ্রী রামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিবৃত্তি-যোগ।

ভবপুর হোতে পাগলের মত
চলিনু একাকী ছুটিয়া,
বাসনা কামনা রহিল পড়িয়া
শ্মশানের কোলে লুটিয়া।

সম্বল শুধু রহিল চিত্তে
অতীতের অনুশোচনা,
শিরায় শিরায় বহ্নি-শিখায়
জাগায়ে তীব্র বেদনা।

কাল-সিন্ধু-বুকে দিনমান সনে
ডুবিল মায়ার রবিটী,
মুছিল নিমেষে বিজন-পরশে
ছায়া-জীবনের ছবিটী।

দিগন্ত-প্রসার অনন্ত আঁধার
শূন্যে করিছে খেলা,
দূরে অতি দূরে, অসীমের পরে,
গুপ্ত আলোর মেলা!

ধেয়ানের পথে ধাইছে পরাণ
অসীমের ডাকে উতলা,
সমাধির দেশে মহাচিদাকাশে
একের বক্ষে একলা!

শ্রীমতিলাল দাস
মঙ্গলকুটীর, ঢাকা।

—•—

সংবাদ।

জাতকর্ম্ম—গত ২০শে সেপ্টেম্বর, ল্যান্‌স্‌ডাউন রোডে, মিঃ এবং মিসেস বাত্রার কনিষ্ঠ সন্তানের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন।

গত ৬ই অক্টোবর, ৮৩।১।১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাসের নবজাত শিশু কন্যার জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। শিশুটী গত ৭ই সেপ্টেম্বর, ২২শে ভাদ্র, শুক্রবার জন্মগ্রহণ করে।

স্নেহময়ী জননী নবজাত শিশু ও তাহাদের পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ—গত ১৫ই অক্টোবর, হাওড়াতে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র প্রসাদ বসুর কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য উপাসনা করেন এবং শিশুকে "উৎসাহ প্রসাদ" নাম প্রদান করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১১নং পদ্মনাথ লেনে, স্বর্গীয় অদ্বৈত্য নারায়ণ গুপ্তের সাম্বৎসরিক দিনে ডাঃ কামাখ্যা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর, রায় সাহেব স্বর্গীয় বিপিন মোহন সেহানবিশের সাম্বৎসরিক দিনে, ৩৫।১ নং পোলিস হাসপাতাল রোডে, জ্যেষ্ঠা কন্যার গৃহে ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করের।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ৭ই অক্টোবর, ৬৭।২নং হ্যারিসন রোডে, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের কন্যা স্বর্গীয়া সুপ্রভা ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার পুত্র-কন্যাগণকর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রমথ লাল সেন উপাসনা করেন। ডাঃ সত্যানন্দ রায় ও ভাই অক্ষয় কুমার লধ শ্লোক-পাঠে সাহায্য করেন। কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী সুহাসি ঘোষ মাতৃ-জীবনের দু' একটী কথা লিখিয়া পাঠ করেন। একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ প্রতিভা কুমার ঘোষ প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। পবিত্র অনুষ্ঠানটী অতীব গম্ভীর-ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। শোকোচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে ও অশ্রুসিক্ত-হৃদয়ে কন্যার পাঠটী এতই করুণাত্মক ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, উপস্থিত সকলকেই অশ্রুবর্ষণ করিতে হইয়াছিল। সতী সাধ্বী পুত্রবতী নারীর আত্মিক জীবনের প্রভাব সকলেই অনুভব করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত দান করা হইয়াছে :—

কানপুর :—বালিকা বিদ্যালয় ১০০৲, বিধবাশ্রম ১০৲, হিন্দু অনাথ আশ্রম ১০৲, মুসলমান অনাথাশ্রম ১০৲, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ১০৲। কলিকাতা :—নববিধান প্রচারাশ্রম ১০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০৲, হিন্দু অনাথাশ্রম ১০৲, মুসলমান অনাথাশ্রম ১০৲, বালিগঞ্জ বিধবা শিল্পাশ্রম ১০৲, কুষ্ঠাশ্রম ৫৲, আতুরাশ্রম ৫৲, ভগ্নী-সমিতি ৫৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ (দাতব্য বিভাগ) ৫৲। লক্ষ্ণৌ—অযোধ্যা ব্রাহ্মসমাজ ১০৲।

১টা ভোজা, ১খানা থালা, ১টা গেলাস, ১টা বাটী, থান ৬খানা, ১টা ছাতা, ১জোড়া বিনামা, ১খানা আসন, ১খানা সতরঞ্চ।

গত ১০ই অক্টোবর, ঢাকা নগরীতে, উয়ারীস্থিত স্বর্গীয় গোপীকৃষ্ণ সেনের বাড়ীতে, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় দেবেন্দ্রমোহন সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন, শ্রদ্ধেয় ভাই মহিম চন্দ্র সেন শ্লোকাদি পাঠ করেন। শ্রাদ্ধের বিবরণ হস্তগত হইলে পরে প্রকাশ করা হইবে।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে তাঁহার অনন্তধামে প্রেমবক্ষে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্তগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বর্ষণ করুন।

শ্রদ্ধার্পণ—গত ২রা অক্টোবর, স্বর্গগত ভক্তিভাজন বঙ্গচন্দ্র রায়ের স্বর্গারোহণ-দিনে তাঁহার আত্মাকে স্মরণ করিয়া ৩ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, প্রচার-কার্য্যালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। এইদিন ভক্তিভাজন প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জন্মদিন ও শ্রদ্ধেয় নববিধান-সাধক নন্দলাল সেনের স্বর্গারোহণের দিন ছিল। অদ্যকার উপাসনা প্রার্থনা যোগে এই তিন আত্মার সঙ্গে বিশেষ যোগ সম্ভোগ ও এই তিন আত্মার প্রতি যথাযথ ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয়। ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। অদ্য প্রাতে কমলকুটীরের নবদেবালয়েও বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল।

জন্মদিন—গত ১লা আশ্বিন, শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে সেবিকার জন্মদিন স্মরণে বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ২রা অক্টোবর, সন্ধ্যায়, শান্তিকুটীরে, ভক্তিভাজন প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

পুরস্কার বিতরণ—গত ১০ই অক্টোবর, ১৪৮নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে, কেশব একাডেমী স্কুলের পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষে, বাঙ্গলার স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টার ডাঃ বেণ্টলীর সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সভার কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। আমরা এই স্কুলের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির—গত ২৩শে ও ৩ শে অক্টোবর অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। ৭ই অক্টোবর ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। বাকী অক্টোবর মাসে ও নভেম্বর মাসে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ ও শ্রীযুক্ত কামাখ্যা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করিবেন।

—•—

গিরিডি নববিধান ব্রহ্ম-মন্দির।

চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

সাদর নমস্কার ও নিবেদন,

আগামী ২৫শে অক্টোবর, ৮ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার হইতে আরম্ভ করিয়া, ২৯শে অক্টোবর, ১২ই কার্ত্তিক, সোমবার পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে গিরিডি নববিধান ব্রহ্ম-মন্দিরের

চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইবে। বিনীত প্রার্থনা যে, মহাশয় সপরিবারে এই উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত ও সুখী করিবেন।

কার্য্য প্রণালী।

২৫শে অক্টোবর, ৮ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার :—
সন্ধ্যা ৬টায় আরতি।

২৬শে অক্টোবর, ৯ই কার্ত্তিক, শুক্রবার :—
প্রাতে ৭॥০ টায় উপাসনা এবং অপরাহ্ণ ৫টায় মহিলা-দিগের উপাসনা।

২৭শে অক্টোবর, ১০ই কার্ত্তিক, শনিবার :—
প্রাতে ৭॥০ টায় উপাসনা এবং অপরাহ্ণ ৫টায় বক্তৃতা।

২৮শে অক্টোবর, ১১ই কার্ত্তিক, রবিবার :—
সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৮টায় কীর্ত্তন, ৮॥০ টায় উপাসনা, অপরাহ্ণ ৩ টায় প্রসঙ্গ, ৫টা হইতে ৬ টায় কীর্ত্তন এবং পরে উপাসনা।

২৯শে অক্টোবর, ১২ই কার্ত্তিক, সোমবার :—
প্রাতে ৭॥০ টায় উপাসনা এবং সন্ধ্যা ৬ টায় শান্তিবাচন।

আবশ্যক হইলে কার্য্য-প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

গিরিডি
নববিধান ব্রহ্ম মন্দির,
১৫ই অক্টোবর, ১৯২৮।

শ্রীযোগানন্দ রায়,
সম্পাদক।

--০-

শারদীয় উৎসব।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক-মণ্ডলী ব্রহ্মমন্দিরে নিম্ন-লিখিত প্রণালী অনুসারে শারদীয় উৎসব সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি ও যোগদান প্রার্থনীয়।

ষষ্ঠী—৩রা কার্ত্তিক, ২০শে অক্টোবর, শনিবার :—
সন্ধ্যা ৬টায় আরতি।

সপ্তমী—৪ঠা কার্ত্তিক, ২১শে অক্টোবর, রবিবার :—
সন্ধ্যা ৬ টায় "মাতৃপূজা"।

অষ্টমী—৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর, সোমবার :—
সন্ধ্যা ৬টায় "মাতৃ-অর্চ্চনা ও বন্দনা"।

নবমী—৬ই কার্ত্তিক, ২৩শে অক্টোবর, মঙ্গলবার :
সন্ধ্যা ৬টায় "মাতৃ-স্তব ও স্তুতি"।

দশমী, বিজয়া—৭ই কার্ত্তিক, ২৪শে অক্টোবর, বুধবার :—
সন্ধ্যা ৬টায় "মাতৃ নাম-সঙ্কীর্ত্তন"।

প্রতিদিন প্রাতে ৮॥০ টায় কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে উপাসনা হইবে।

এই উৎসবের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ভক্তির অঞ্জলি-রূপে যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা ৮৪ নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, এই ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে কৃতজ্ঞ অন্তরে গৃহীত হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
৮৯ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা;
১৬ই অক্টোবর, ১৯২৮।

বিনীত,
শ্রীপ্রমথলাল সেন
সম্পাদক।

—•—

(প্রেরিত)

বিনীত নিবেদন।

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, মঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপায় এবং তাঁহারই করুণায় এ দাস শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃত-সিন্ধু নামক তিন খণ্ড সুবৃহৎ কাব্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছে। মহাত্মা কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের অনুসরণে সরল কবিতায় সমস্ত জগতের ধর্ম্মের ইতিহাস এবং যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের জীবনী এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে প্রাচীন আর্য্য-ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত ভারতীয় বিধান এবং মহাত্মা ইব্রাহিম হইতে আরম্ভ করিয়া মহাপুরুষ মহম্মদ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য ধর্ম্ম-বিধান বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বিবিধ ধর্ম্ম-বিধানের সঙ্গে দেওয়ান হাফেজ, কবীর, তুকারাম, লুথার, নানক এবং শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তক দুই খণ্ডই বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে সমাদৃত ও প্রশংসিত হইয়াছে। চৌদ্দ বৎসর হইল আমি ওকালতী ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, প্রায় দশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড রচনা করিয়াছি। ইহাতে রাজর্ষি আকবর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগের সমুদায় ঋষি, সাধু মহাত্মা এবং যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ দিগের প্রচারিত ধর্ম্ম এবং তাঁহাদের জীবনী লিখিত হইয়াছে। এই সুবিস্তৃত গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে সহস্রাধিক টাকার প্রয়োজন। আমি দীর্ঘকাল ওকালতী ব্যবসায় পরিত্যাগ করায় নিঃস্বাবস্থায় নিপতিত হইয়াছি। আমার এরূপ সাধ্য নাই যে, আমি নিজ ব্যয়ে এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করি। তজ্জন্য আমি বিনীত ভাবে করযোড়ে বঙ্গদেশীয় আমার সদাশয় ও সদাশয়া ব্যক্তিগণের নিকট নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা কৃপা করিয়া যদি এই গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কণের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করেন, তবে এই গ্রন্থখানি প্রচারিত হইতে পারে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে টাঙ্গাইলের সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকা "টাঙ্গাইল হিতৈষীর" সম্পাদক তাঁহার ১৩৩৫ সালের ২০শে জ্যৈষ্ঠের পত্রিকায় এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা সাধারণের অবগতির জন্য তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ভরসা করি, বঙ্গের দানশীল ব্যক্তিগণ এ দাসের এই বিনীত নিবেদনে কর্ণপাত করিবেন এবং গ্রন্থখানি প্রচার-কল্পে সাহায্য করিয়া এ দাসকে কৃতার্থ ও বাধিত করিবেন।

চিরদাস—শ্রীশশিভূষণ তালুকদার
বিধান-নৈমিষারণ্য, আশাকুটীর, টাঙ্গাইল।

টাঙ্গাইল হিতৈষীর মন্তব্য।

শ্রদ্ধেয় শশী বাবু এক্ষণে রুগ্ন ও বৃদ্ধ। ইনি অনেকদিন টাঙ্গাইলের সাহিত্য-সংসদের সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন এবং নানা প্রকারে টাঙ্গাইলের সেবা করিয়াছেন। শশীবাবু দীর্ঘকাল অক্লান্ত শ্রমসহকারে শ্রীশ্রীহরিলীলারস মৃত-সিন্ধুর তৃতীয় খণ্ড রচনা করিয়াছেন। আমরা উক্ত গ্রন্থের বিস্তৃত পাণ্ডুলিপি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। যদি অর্থাভাব বশতঃ এই বৃহৎ ও মূল্যবান্ গ্রন্থখানি অপ্রকাশিত থাকে, তাহা হইলে বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি এবং টাঙ্গাইলবাসীর অত্যন্ত পরিতাপের কারণ হইবে। তজ্জন্য আমরা বিনীতভাবে টাঙ্গাইলের শিক্ষিত জমিদার এবং সদাশয় ধনী মহোদয়গণের নিকট অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা শশীবাবুর উক্ত গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কণ-কল্পে যথাসাধ্য অর্থ-সাহায্য করিয়া টাঙ্গাইলের এই সাহিত্য গ্রন্থখানি রক্ষা করুন।

—•—

শ্রীমদ্গীতা-প্রপূর্ত্তি।

(উপাধ্যায়কৃত সংস্কৃত বিজ্ঞাপনের অনুবাদ)

ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হইলে প্রকৃত পক্ষে কখন জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির বিরোধ দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব অপরোক্ষ ব্রহ্ম-দর্শনে সেই বিরোধ মীমাংসা করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্ত হইয়াছে। সমভাবাপন্ন সাধকদিগের অন্তরে নিরন্তর যে সকল ভাবের অনুভূতি ক্রমান্বয়ে হইয়া থাকে, তাহা শ্রীমদ্গীতাতে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত হয় নাই; শ্রীমদ্ভাগবতে হইয়াছে। গীতাতে যাহা সূত্রাকারে আছে, ভাগবতে তাহাই পরিস্ফুটাকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গীতা এবং ভাগবতের এই সম্বন্ধ অদ্যাপি কাহারও দৃষ্টি-গোচরে আসে নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্যই শ্রীমদ্গীতা-প্রপূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইল। এই গ্রন্থে শ্রীমৎ শঙ্করের সহিত বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের মত-বিরোধ যথাসম্ভব পরিহৃত হইয়াছে।

অনুবাদকের নিবেদন।

শ্রীমদ্গীতা-প্রপূর্ত্তির রয়েল আট পেজি ফর্ম্মার ত্রয়োদশ ফর্ম্মা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। অনুমান ১০ কি ১৫ ফর্ম্মায় গ্রন্থ শেষ হইতে পারে। গ্রাহকদিগের এবং মুদ্রাঙ্কণের সুবিধার জন্য অগ্রিম গ্রাহকদিগকে বঙ্গানুবাদ সহ সমগ্র গ্রন্থ (মূল গীতা-প্রপূর্ত্তি) ৪৲ চারি টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবে। এই গ্রন্থ দ্বাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রতি চারি অধ্যায়ে এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে। তাহার মূল্য ডাক মাশুল ব্যতিরেকে প্রতিখণ্ড ১৷৷৹ দেড় টাকা পড়িবে। যাঁহারা পশ্চাতে গ্রন্থ ক্রয় করিবেন, তাঁহাদের জন্য গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন মূল্য স্থির করা গেল না। গ্রন্থ-প্রাপ্তির ঠিকানা নিম্নে দেওয়া গেল। ইতি—

ঠিকানা :—

বিধানপল্লী; পোঃ রমণা (ঢাকা)। শ্রীমহিম চন্দ্র সেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

পুরাতন বইয়ের তাড়া খুঁজিতে গিয়া স্বর্গীয় উপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত, কয়েকখানা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বাঙ্গালা সংস্করণ) পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা লইতে ইচ্ছা করেন, সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিলেই পাইবেন। মূল্য ৫৲ টাকা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। পূর্ব্বে অনেকেই বইখানা লইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আমরা তখন দিতে পারি নাই। এখন তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিবেন।

নববিধান-প্রচার-কার্য্যালয়,
৩ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট;
কলিকাতা।

শ্রীঅক্ষয় কুমার লধ।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ধর্ম্মতত্ত্বের বৎসর শেষ হইতে চলিল। গ্রাহকদিগের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, তাঁহারা আপন আপন দেয় মূল্য অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সত্বর পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করিবেন। ধর্ম্মতত্ত্বের জন্য আমরা ঋণগ্রস্ত। এই ঋণ-মুক্তির জন্য গ্রাহক, অনুগ্রাহক সকলের নিকটই আমরা কৃপা ও সাহায্য ভিক্ষা করি।

শ্রীঅক্ষয় কুমার লধ
কার্য্যাধ্যক্ষ।

—•—

বিজ্ঞাপন।

শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ মজুমদারের জীবনী "দীনচরিত" বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, নববিধান প্রচার-কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিলেই পাইবেন। মফঃস্বলবাসিগণ ৵৹ আনা মূল্যের ডাক টিকিট সহ আবেদন করিলে পাইবেন।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবেরও কতকগুলি পুরাতন ও ছিন্ন পুস্তক বিতরণ করা হইবে। ৮৪নং অপার সারকুলার রোড, নববিধানা-শ্রমে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গণেশ প্রসাদের নামে আবেদন করিবেন।

সেবক—শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক,
ব্রহ্মানন্দাশ্রম, বাগনান, হাবড়া।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস", বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ৩রা কার্ত্তিক, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৩ ভাগ। ২০শ সংখ্যা। | ১৬ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক, ৯৯ ব্রাহ্মাব্দ। 2nd November, 1928. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

দুর্গতিনাশিনী চিন্ময়ী দুর্গে! তুমি জীবন্ত জাগ্রত দেবতা, মাটি কাঠ পাথরের দ্বারা গঠিত দেবতা তুমি নও। তুমি যদি এ সময় বিশেষ ভাবে বঙ্গ ও ভারতে মাতৃ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তবে ভারতের ও বঙ্গের দুর্গতির দিকে একবার ভাল করিয়া তাকাও। এদেশে ধনীর গৃহে মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে তোমার পূজা এ সময়ে কতই বাহ্য জাক্ জমকে হয়; সে সকল ধনী সন্তানগণ তো তাঁহাদের দুর্গতি দেখিয়া ব্যাকুল ভাবে তোমার নিকট দুর্গতি-নাশের জন্য কাতর প্রার্থনা করেন না। অভাব-বোধ থাকিলে তো প্রার্থনা করিবেন? যদি তাঁহাদের কোন প্রার্থনার ভাব অন্তরে উদিত হয়, তবে প্রায়ই তাঁহাদের প্রার্থনা হয়, "ধনং দেহি, জ্ঞানং দেহি, যশং দেহি মে, দুর্গে!" ইত্যাদি। মা, এ দেশে দুঃখ দৈন্যে কাহারা যথার্থ ক্লিষ্ট, একবার ভাল করিয়া দেখ। মা, এই দুঃখ ভরা বর্ষায় বঙ্গের গরিব, কাঙ্গালগণ অর্দ্ধ আহারে, অনাহারে আপনার প্রিয় পুত্রকন্যাগণ লইয়া কি ভাবে দিন কাটাইল, একবার দেখ। বর্ষার ঘনবৃষ্টি, কিন্তু তাহাদের বাসগৃহের চালে ছাউনী নাই, বাড়ী ঘর জলে বেষ্টিত, ঘরে অন্ন নাই, শীতবাতে ক্লিষ্ট, গায়ে বস্ত্র নাই; ঘরে পুত্র কন্যা রোগে শয্যাশায়ী, উপযুক্ত ঔষধ পথ্য নাই। কত প্রাণে দারুণ শোকের আঘাত, সান্ত্বনা দিবার লোক নাই। মা! এই সকল গৃহে অবতীর্ণ হইয়া, রোগে তুমি স্বয়ং ঔষধ হও, শোকে সান্ত্বনা হও, অন্নদায়িনী জননী হইয়া গরিবের ঘরে অন্ন দান কর, শক্তিরূপিণী জননী হইয়া দুঃখ দৈন্য দূর করিবার উপযুক্ত শক্তি বল সঞ্চার কর, জ্ঞানদায়িনী রূপে তুমি স্বয়ং তোমার অভাবগ্রস্ত সন্তানদের জীবনে সুশিক্ষা দান কর। সর্ব্বোপরি, বঙ্গ ও ভারতের জীবনে দেবশক্তি, দেব বলের বিশেষ অভাব। তুমি এ দেশের সমগ্র জাতীয় জীবনে দিব্য দেবশক্তি, দেববল প্রদান করিয়া সমগ্র দেশকে, জাতিকে দেবত্বের ভূষণে ভূষিত কর। এ দেশের ঘরে ঘরে, পরিবারে পরিবারে তোমার কার্ত্তিক গণেশ, লক্ষ্মী সরস্বতী দেব পুত্র কন্যাগণের জন্ম হউক। সকলে আমরা তোমার হাতের গড়া পুত্র কন্যা হইয়া, স্বর্গের দেব পরিবারে পরিণত হইয়া ধন্য হই, কৃতার্থ হই, কৃপা করিয়া তুমি এই কাতর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

শারদীয় উৎসব।

বঙ্গে শারদীয় উৎসব তো তিন দিনে ফুরায় না; মাসাধিক কাল নানা আকারে, বঙ্গের ঘরে ঘরে, এই বিমল উৎসবানন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়া বালক বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে, ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে, রাজা প্রজা নির্ব্বিশেষে নরনারীর প্রাণকে বিমল আনন্দ-রসে

অভিষিক্ত করে। শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ করিয়া কত আকারে, বঙ্গের বিভিন্ন অবস্থার নরনারীর প্রাণের আরামপ্রদ, আনন্দপ্রদ, শান্তিপ্রদ আয়োজন সকল উপস্থিত হয়, একবার এ সময় আলোচনার বিষয়।

প্রথমত :—যাঁহারা সরল ধর্ম্ম-পিপাসু ভক্ত, তাঁহারা এ সময় সকল ভুলিয়া, সজনে সবান্ধবে মাতৃ-চরণ বন্দনা করিয়া, মাতৃচরণে ভক্তি, অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি প্রদান করিয়া, আপনাদিগকে কতই ধন্য মনে করেন, স্বর্গের কত সুখ শান্তি আনন্দ সম্ভোগ করিয়া আপনারা কৃতার্থ হন এবং অন্যেরও এরূপ সুখ, শান্তি, আনন্দ সম্ভোগের কারণ হইয়া তাঁহারা বিমল আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন।

দ্বিতীয়ত :—এ উৎসব উপলক্ষে প্রীতি-সম্মিলনের ব্যাপার একটা সত্যই পরম প্রীতিকর ব্যাপার, নিঃস্বার্থ প্রীতির ব্যাপার। এই উৎসব উপলক্ষে কত বিরহ-বিচ্ছেদ-প্রপীড়িত পিতামাতার সঙ্গে দূরদেশস্থিত উপার্জ্জনশীল পুত্রের মিলন, বিরহ-বিধুরা সতী স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ প্রবাসের পর পতির মিলন, তেমনই ভায়ের সঙ্গে ভাইয়ের, ভগ্নীর সঙ্গে ভাইয়ের, পাড়াপ্রতিবাসীর সঙ্গে পাড়াপ্রতিবাসীর সুখ মিলন। এ সময়ে এসব মিলন প্রায়ই উচ্চ, নিঃস্বার্থ, পবিত্র মিলন। এ সব ক্ষেত্রে কোন কোন স্থলে সাংসারিক স্বার্থ-ঘটিত, বৈষয়িক বা আর্থিক স্বার্থ-ঘটিত মিলন না হইতে পারে, তাহা বলিতেছিনা; সে মিলন আমাদের লক্ষ্যের বিষয় বা গণনার মধ্যে আনিবার বিষয় নয়। স্বার্থ, পরার্থ ভুলিয়া নির্ম্মল প্রীতি-সম্মিলন এ সময়ে খুবই সম্ভব হয়, খুবই সম্ভোগের হয়, তাহাই আমাদের স্মৃতিপথে জাগাইবার দিবস, তাহারই মহিমা ও গুণ-কীর্ত্তন করিবার দিন।

এই উৎসব উপলক্ষে আর একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য মিলনানন্দের ব্যাপার, পিতার গৃহে বৎসরান্তে কন্যার আগমন। যাঁহাদের বাড়ীতে পূজা, তাঁহাদের বাড়ীতে তো স্নেহের কন্যাগণ আপনাদের ছোট ছোট প্রিয়দর্শন পুত্রকন্যাসহ আসিবেনই; এরূপ গৃহস্থের সাংসারিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল হইলে ও মন বড় হইলে, এই উৎসব উপলক্ষে নিজ নিজ কন্যা ছাড়াও অনেক আত্মীয় আত্মীয়া আসিয়া গৃহকে উৎসবময় করেন। কিন্তু যাঁহাদের বাড়ীতে বাহ্যতঃ পূজা নাই, তাঁহাদেরও অনেকেরই বাড়ীতে বৎসরান্তে এসময়ে প্রিয়তমা কন্যাগণ, ভগ্নীগণ আসিয়া গৃহকে উৎসবানন্দে পূর্ণ করেন। তাঁহাদেরও গৃহে উৎসবানন্দের কত ভোজে, ভক্তি, স্নেহ, প্রীতির আদান প্রদানে, গৃহের আকাশ, বাতাস, চতুর্দ্দিক বিমল আনন্দের ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই, মা দুর্গা স্বামীর অনুমতি লইয়া তিন দিনের জন্য পিত্রালয়ে আগমন করেন। তাই এসময়ে বঙ্গের অনেক সুগৃহস্থের ঘরে মৃন্ময়ী দুর্গা-মূর্ত্তির আকারে পিত্রালয়ে জগজ্জননী দুর্গার আগমন। বঙ্গের অল্প-সংখ্যক ঘরেই মৃন্ময়ী দুর্গার আকারে মেনকার গর্ভজাত কন্যা দুর্গার আগমন হয়; কিন্তু রক্ত মাংসের শরীর-ধারিণী প্রকৃত কন্যা দুর্গার আগমন, এই শারদীয় উৎসব সময়ে অনেক ঘরেই হয়। অনেক ঘরেই কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী আকারে দৌহিত্র দৌহিত্রীগণ আসিয়া গৃহকে উৎসবময় করে। বর্ত্তমানে বঙ্গের সামাজিক জীবনে দুঃখ, দৈন্যের, অভাব অনটনের অনেক চাপ আসিয়া পড়িয়াছে। তথাপি দীর্ঘ দিন পরে পিতৃগৃহে কন্যা সন্তান দিগের আগমনে মিলনানন্দের স্রোত একবারে বন্ধ হয় নাই।

প্রত্যেক নরনারী অনন্তের সন্তান, অনন্তের পুত্র কন্যা। অনন্তের পথে ক্রম-বিকাশ, ক্রম-প্রকাশ তাঁহাদের জীবনের নিয়তি। কিন্তু সাধারণ মানব-সমাজে কয়টা লোক আপনার জীবনের এই উচ্চ নিয়তি, উচ্চ গতি ও ক্রম বিকাশ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারেন? কিন্তু যাঁহারা আপনার জীবনের এ উচ্চ খবর তেমন করিয়া রাখেন না, তেমন করিয়া জীবনের উচ্চ নিয়তি, উচ্চ গতি পাঠ ও প্রসঙ্গ করেন না, তাঁহারাও অন্তরস্থ স্বভাবের প্রেরণায় সময় সময় উচ্চ নিয়তি ও অন্তরস্থ উচ্চ স্ফূরণের সাক্ষ্য দান করেন। তাই বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে সাধারণ মানুষেরও স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থে প্রীতি উপস্থিত হয়। গণ্ডিবদ্ধ সংসারের সেবা ছাড়িয়া মুক্ত মানব-প্রাণের নিঃস্বার্থ সেবা-কার্য্যে মানুষ আপনাকে কৃতার্থ মনে করে।

মানব-হৃদয়ের ভক্তি, প্রীতি, সেবা ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া যখনই ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে, তখনই তাহা উৎসবের আকার ধারণ করে। শারদীয় উৎসব বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব, ভক্তি, প্রীতি ও সেবার উৎসব। এখানে মানব-হৃদয়ের ভক্তি, প্রীতি ও সেবার বিশেষ উচ্চ সাক্ষ্য-দান। তিন দিনে নয়, মাস ভরিয়া নানা আকারে এই উৎসবের তরঙ্গ তরঙ্গায়িত হইয়া বঙ্গের পুত্র কন্যাদিগকে আনন্দ দান করে; তাই বঙ্গে শারদীয় উৎসব তিন দিনে শেষ হয় না।

—০—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

দুর্গোৎসব।

সাধারণ হিন্দুগণ দুঃখ দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি-লাভের উদ্দেশ্যে, সংসারের সুখ-সৌভাগ্য-লাভের কামনায় দুর্গোৎসব সম্পাদন করেন। মা দুর্গা বলিয়া আদ্যাশক্তি ভগবতীকে পূজা করিলে সকল দুঃখ দুর্গতি দূর হইবে, এই বিশ্বাসেই দুর্গোৎসব আনন্দোৎসব হয়। সাধারণভাবে দুর্গোৎসবের অর্থ তাহাই বটে, কিন্তু রোগ, শোক, দুঃখ, দুর্গতির অবস্থাতেও এক মহা উৎসব হইয়া থাকে, তাহাকেও আমরা দুর্গোৎসব নামে অভিহিত করিতে পারি। বাস্তবিক যখন পরিবারস্থ কাহারও কঠিন রোগ হয়, যখন কোন শোকের আঘাত, দুঃখ দারিদ্রের পীড়ন, পরীক্ষা বিপদের দুর্গতি আসিয়া পরিবারস্থ সকলকে ও আত্মজন প্রিয়জনদিগকে সহানুভূতি-যোগে সমবেদনায় ব্যথিত করে, সুস্থতা, শান্তি, সান্ত্বনা দিবার জন্য বা তাহা লাভের জন্য মন ব্যাকুল, অন্তরে অহর্নিশি প্রার্থনায় রত হয়, সেবা করিতে ও সহায়তা দান করিতে অশ্রুপূর্ণহৃদয়ে সকলে ব্যস্ত সমস্ত হয়, তখন যেমন উৎসব হয়, সুখ সৌভাগ্য আনন্দ উৎসবে কি তেমন উৎসব হয়? এই উৎসবই যথার্থ দুর্গোৎসব। এসময় প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রত্যেক ঘটনায়, সকল অবস্থায় জীবন্ত মাতৃ-রূপ দুঃখ দুর্গতির ভিতরও উপলব্ধি ও দর্শন হয়। এই জন্যই নব-বিধানাচার্য্য বলিলেন, "আমার সুখ দেওয়া মাকে সকলে ভালবাসে, কিন্তু দুঃখ দেওয়া মাকে ঈশা আর সাধুরা [illegible]।" অবে সত্যই সুখোৎসবে যেমন, দুঃখোৎসবেও তেমনি উৎসবানন্দ সম্ভোগে আমরা দুর্গোৎসব করিয়া ধন্য হইব।

নববিধানের ভিত্তি।

নববিধানের ভিত্তি এক অদ্বিতীয় জীবন্ত পরব্রহ্মে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। পর্ব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত গৃহ যেমন কখনও ভগ্ন হইবার নহে, নববিধান অট্টালিকাও কোন কালে ভগ্ন হইবে না। এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর ব্রহ্ম নাই এবং তিনিই সকল সত্যের মূল, তিনিই প্রত্যক্ষ দিব্যজ্ঞানদাতা গুরু, তিনি অনন্ত জীবনের পথের নিয়ন্তা, তিনি সর্ব্বমঙ্গল-বিধাতা, [illegible] তিনি বই আর অন্য ঈশ্বর নাই; এবং তিনিই সকল [illegible] উপাস্য উদ্দেশ্য, তিনিই পুণ্যের আবহ ও পাপীর পরিত্রাতা এবং নিত্য আনন্দ-শান্তি-বিধাতা আনন্দস্বরূপ। এই ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাসের উপরেই নববিধান উদ্গত। সকল ধর্ম্ম, সকল শাস্ত্র, সকল সাধু, সকল সাধনের এই একই ভিত্তি; তাই সকলের সমন্বয়-বিধি ইহা দ্বারাই সম্পাদিত।

দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য।

আচার্য্য বলেন, যে আপনার দুর্ভাগ্য দেখে, সে অবিশ্বাসী। বিশ্বাসিগণ কেবল আপনাদের সৌভাগ্যই দর্শন করিয়া থাকেন। বাস্তবিক যদি আমরা আমাদের দুঃখ কষ্ট বিপদ দুর্ভাগ্যের কথা ভাবি এবং তাহার জন্য চিন্তিত ও ব্যাকুল হই, আপনাদিগকে তজ্জন্য ধিক্কার করি ও অভিসম্পাত দিই, আমরা কখনই মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরে বিশ্বাসী বলিয়া পরিচয় দিতে পারিনা। কেননা, কুইনিন তিক্ত হইলেও ফলে যেমন তাহাতে বিষম জ্বর নিবারণ করে, তেমনি বিপদ পরীক্ষা আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ না হইয়া ফলে সৌভাগ্যই আনিয়া দেয়। তাহাতে আকুল প্রার্থনা ও ঐকান্তিক নির্ভর আনিয়া দিয়া কতই আত্মার কল্যাণ বিধান করে। এইজন্য প্রকৃত বিশ্বাসী বলেন, মা আমাকে জীবনে কখনই দুঃখ দেন নাই। কারণ, সত্যই মা মঙ্গলময়ী সকল অমঙ্গল অকল্যাণ হইতেই কল্যাণ বিধান করিয়া বিশ্বাসীকে আনন্দিত করেন।

নির্ব্বাণ-শান্তি ও ব্রহ্মানন্দ।

শ্রীবুদ্ধ কামনা বাসনার নির্ব্বাণে শান্তির পথ আবিষ্কার করিলেন। বাস্তবিক কামনা বাসনার ও আমি আমার নিবৃত্তি না হইলে যথার্থ শান্তি হয় না। মনের শান্তি-লাভ ধর্ম্মের প্রথম সাধন, ধর্ম্মের উচ্চ পরিণতি ব্রহ্মানন্দ-লাভ। ব্রহ্মেতে আনন্দ অথবা সর্ব্বথা, সকল অবস্থায়, দুঃখ দুর্ভাগ্যে, ক্লেশ পরীক্ষাতেও আনন্দ, ইহাই ব্রহ্মানন্দ। নববিধান এই ব্রহ্মানন্দ দান করিতেই সমাগত।

দুর্গোৎসবের সাধন।

নববিধানাচার্য্য-কৃত দুর্গোৎসবের সাধনায় সপ্তমীর দিনে দেশের পৌত্তলিকতা নিবারণের জন্য প্রার্থনা, অষ্টমীর দিনে দুর্নীতি পাপ ব্যভিচারের বিনাশের জন্য প্রার্থনা, নবমীর দিনে মৃন্ময় হইতে চিন্ময়ী দেবীর আবির্ভাব উপলব্ধি এবং দশমীতে চিন্ময়ী দুর্গার চির-রাজ্যপ্রতিষ্ঠার প্রার্থনা। আচার্য্য-সঙ্গে আমরাও এবার বিশেষ ভাবে এই ভাবে দুর্গোৎসব-সাধনে ধন্য হইলাম।

আত্মজ্ঞানের লক্ষণ।

যাবৎ আপনাকে জানিতে পারা না যায়, তাবৎ পরাধীনতা বা অন্যদীয়-সাহায্য-সাপেক্ষতা থাকে। কিন্তু আত্মাকে অবগত হইলে তৎক্ষণাৎ লোকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইয়া থাকে।

পরমপদপ্রাপ্তি-রূপ চরম অভীষ্ট লাভের উপায় মনীষিগণ বহুরূপে অনুসন্ধান পূর্ব্বক নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন যে, বাসনা ত্যাগ করিয়া মৌনব্রত অবলম্বন না করিলে পরমপদ-প্রাপ্তি-রূপ চরম অভীষ্ট লাভ করা যায় না।—৺অদ্বৈতনারায়ণ গুপ্ত।

অভাব ও স্বভাব।

অভাব দুঃখ, স্বভাব সুখ। আজ সম্বৎসর পরে হিন্দু ভাই জগজ্জননীকে আহ্বান করিতেছে। কেন আহ্বানে

করিতেছে? তাহাদের অভাব ও দুঃখ দূর করিবার জন্য দুর্গাকে ডাকিতেছে। দুর্গা অর্থাৎ স্বভাব অর্থে আত্মভাব বা আত্মোপলব্ধি. মা দুর্গা আসিলে অর্থাৎ জীব স্বভাবে আসিলে আর দুঃখ থাকে না।

যে কোনও প্রকারের অভাব হউক না কেন, অর্থের অভাব, শান্তির অভাব, শক্তির অভাব, মা দুর্গার পূজা করিলে অর্থাৎ আত্মস্থ হইলে পূরণ হয়; কারণ আত্মাই সকল শক্তির কেন্দ্র। শ্রীরামচন্দ্র যখন রাক্ষস-নিধনে নিজের শক্তির অভাব অনুভব করিলেন, তখন তিনি মা দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। ইঁহার পূজা হইতেই বর্ত্তমান শারদীয় পূজার প্রতিষ্ঠা। মহাত্মা গান্ধী, যিনি বর্ত্তমান যুগের অবতার, তিনিও দেশের শক্তির অভাব, অন্ন বস্ত্রের অভাব দেখিয়াই আমাদের এই মাতৃ-পূজাই করিতে বলিয়াছেন। তিনি দেখিলেন, দেশের অধঃপতনের মূলে এই শক্তিহীনতাই প্রধান কারণ। আমাদের হাত থাকিতেও হাত নাই। কৃষি ও বয়ন দ্বারা সেই আত্মনির্ভর ও আত্মশক্তির স্ফুরণ হইবে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা সর্ব্বস্বান্ত উচ্ছৃঙ্খল যুবকের ন্যায়। যখন কপর্দ্দকশূন্য হয়, তখন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। মানব যখন এই অশেষ যন্ত্রণা আর ভোগ করিতে না পারিয়া জীব-যন্ত্রণার লাঘব করিতে প্রয়াসী হয়, তখনই সে স্বভাব বা দুর্গার পূজা করিতে আরম্ভ করে এবং আত্মতত্ত্ব অবগত হয় ও ক্রমে শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শান্তি ও শান্তি লাভ করে ও নিজ স্বভাব হইতে পরম স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।—৺অদ্বৈতনারায়ণ গুপ্ত।

—০—

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা।

(১৭৮৩ শকের চৈত্রের তত্ত্ববোধিনী হইতে উদ্ধৃত)

"২৮শে মাঘ, ১৭৮৩ শক, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে কাটখোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসুর পুত্রের নামকরণ হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ যে প্রার্থনা করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"হে পরমেশ্বর! তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনোদ্দেশে আমরা এই স্থানে সমাগত হইয়াছি, তোমার প্রসাদে এই শুভ কর্ম্ম আমরা সম্পন্ন করিলাম। কত প্রকার বিঘ্ন, কত প্রকার প্রতিবন্ধক আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল; কেবল তোমার প্রসাদেই আমরা সেই রাশি রাশি বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলাম। কে জানিত যে, এই অন্ধকার গৃহের মধ্যে জাজ্বল্যমান ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিঃ সমুত্থিত হইবে? কে জানিত যে, এমন পৌত্তলিক পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা বিকীর্ণ হইবে? কত যে তোমার করুণা, তাহা বাক্যেতে শেষ করা যায় না; মনেতে চিন্তা করা যায় না। সকল স্থানেই তোমার আশ্চর্য্য করুণা নয়নগোচর হয়। আমাদিগের প্রিয়সুহৃদ্ আমাদের সম্মুখে যে প্রকারে তাঁহার স্বীয় নবকুমারকে ক্রোড়ে করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে ক্রোড়ে রাখিয়া নিয়তই লালন পালন করিতেছ। হে পরমসুহৃদ্! চিরজীবনসখা! যখন এ পরিবারেও তোমার মহিমা জাজ্বল্যরূপে প্রকাশিত হইল, তখন তুমি যে সকল স্থানেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে লইয়া যাইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? তুমি আমাদিগকে চিরদিন লালন পালন করিতেছ, ক্ষুধা তৃষ্ণার সময় অন্ন পান পরিবেশন করিতেছ; রাত্রিকালে যখন অসহায় শয্যাতে শয়ান থাকি, তখন সকল বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিতেছ, তুমি নিয়তই আমাদিগের আনন্দ বিধান করিতেছ। তুমি ইহাতেই ক্ষান্ত নও, তুমি তোমার মঙ্গল স্বরূপ এমনি বিকীর্ণ রাখিয়াছ যে, যেখানে যাই, তোমারই মঙ্গলভাব প্রচার দেখি। যখন পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে তোমাকে দেখিতে যাই, তখনও চিত্ত পুলকিত হয়; কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হয়। যখন একাকী নির্জ্জনে তোমার শরণাপন্ন হই, সেখানেও তোমার আনন্দমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া হৃদয়কে আনন্দরসে প্লাবিত করে। আমরা যখন এই বন্ধুগৃহে আসিয়া মিলিত হইয়াছি, তখনও তোমাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছি। কোথায় না তুমি প্রকাশিত রহিয়াছ। হে পরমাত্মন! তুমি কেন আমাদিগের এত আনন্দ বিধান করিতেছ, তুমি মহান হইয়া এই ক্ষুদ্রকীট যে আমরা, কেন আমাদিগকে স্মরণে রাখিয়াছ। তুমি আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন নিরাশ হইয়া কেহ ফিরিয়া না যাই। যখন এই গৃহের মধ্যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম একবার প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছে, যখন এই অন্ধকারের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়াছে, তখন আর ইহার অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। যখন তুমি এই পরিবারকে তোমার পরিবার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তখন ইহার সকলই মঙ্গল হইবে। পূর্ব্বে কেহই জানিত না যে, এত অল্পকালের মধ্যে আমাদের বিশ্বাস ও আচরণ সমান ভাব ধারণ করিবে। আজি যেমন এখানে তোমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল, এইরূপ যেন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মতানুযায়ী অনুষ্ঠান সকল গৃহে গৃহে আচরিত হয়; কাল্পনিক ধর্ম্ম যেন বিনাশ পায়; বিদ্বেষ ভাব যেন ক্রমে ক্রমে চলিয়া যায়; যেন সকল ভ্রাতা ভগিনী মিলিত হইয়া তোমারই চরণে আসিয়া অবনত হয়; এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের মধ্যে যেন তোমারই সত্য ধর্ম্ম প্রচার হয়। কবে সেই দিন উপস্থিত হইবে, যবে প্রতি গৃহেই তোমার নাম কীর্ত্তিত হইবে ও প্রতি হৃদয়েই তোমার সিংহাসন স্থাপিত হইবে, প্রত্যেক পরিবারই ব্রাহ্ম পরিবার হইবে। কবে সেই দিন উপস্থিত হইবে, যবে বিশ্বাস ও কার্য্য একই ভাব ধারণ করিবে, কপটতা ভস্মীভূত হইবে, সকলে বিনয়ী হইবে, মন বীর্য্যবান হইবে ও সকলে তোমার চরণের মঙ্গলচ্ছায়াতে বাস করিয়া তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে জীবন অবসান করিবে। হে নাথ! তুমি এ প্রকার আশীর্ব্বাদ কর যে, যে সকল পুত্র কন্যারা তোমার অনুষ্ঠান দেখিতে সমাগত হইয়াছে, তাহাদের কেহই যেন শূন্যহৃদয়ে ফিরিয়া না যায়।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

জীবন ও মৃত্যু।

জীবন মরণ দুইটি বিপরীত ভাবের কথা। একের জ্ঞান না থাকিলে অপরের জ্ঞান হ'তেই পারেনা। মৃত্যু কি জানিতে হইলে. জীবনও কি, জানা আবশ্যক। জীবন মরণ এত দুর্ব্বোধ্য এবং নিগূঢ় যে, উহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করা এক প্রকার অসম্ভব। কাজেই জীবন কি জানিতে হইলে, জীবনের কার্য্য, বাহ্য লক্ষণ এবং জীবন-রক্ষার উপকরণাদি হইতে আমরা যে টুকু বুঝিতে পারি, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। যে আন্তরিক শক্তি বাহ্য বস্তু সমূহের সহিত বিবিধ সম্বন্ধের উপযোগিতা রক্ষা করে, জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকে জীবনী-শক্তি বলেন। জীব সর্ব্বদা পঞ্চভূত দ্বারা পরিবেষ্টিত। জীবের শারীরিক যন্ত্র সকল যতক্ষণ ঐ পঞ্চভূতের পরিবর্ত্তনের সহিত উপযোগিতা রক্ষা করিতে পারে, ততক্ষণ ঐ জীবকে জীবিত বলা যায়। এই ব্যাপার জবনী-শক্তি দ্বারা জীবের বিনা আয়াসে, বিনা ইচ্ছায়, অজ্ঞাতসারেই হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিক শীতোষ্ণাদির সহিত উপযোগিতা রক্ষার্থে পশুর লোম ও পাখীর পাখা কখন ঘন, কখন পাতলা হয়। মানুষের রোমকূপ কখন সঙ্কুচিত, কখন বিস্ফারিত হয়। বাহ্য বস্তুর সহিত আন্তরিক সম্বন্ধ রক্ষা করিতে না পারিলেই জীবের মৃত্যু। অতএব এই মৃত্যু বা সংযোগিতার অভাব কখন আংশিক, কখন পূর্ণ। অন্ধ যখন আলোকের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে পারে না, তখন তাহাকে আলোক সম্বন্ধে মৃত বলা যায়; সেই রূপ বধির শব্দ-সম্বন্ধে মৃত। নিদ্রাবস্থায় জীব নিশ্বাস, প্রশ্বাস ও রক্ত-চলাচলের সম্বন্ধ ব্যতীত অপর সমস্ত বাহ্য বিষয়-সম্বন্ধে মৃত। যখন বাহ্য বস্তুর সহিত জীবের আন্তরিক যন্ত্রাদির সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়, তখন জীবের পূর্ণ মৃত্যু হয়, ইহা জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন।

আত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ এরূপ মৃত্যুকে জীব-দেহের মৃত্যু বলেন, জীবের মৃত্যু বলেন না। তাঁহাদের মতে জীব অমর, অজর এবং চিদাকার। এই জীব যে কোন পঞ্চভূতময় দেহে বাস করিতে পারে। এই পঞ্চভূত কখন সাকার, কখন নিরাকার অবস্থায় থাকে। এই কারণে উঁহারা জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ, তিন প্রকার শরীর স্বীকার করেন। এই পঞ্চভূতের ধ্বংস হয় না, অবস্থান্তর-প্রাপ্ত মাত্র হয়। স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মের মধ্যে কারণ দেহে চিদাকার জীব বাস করেন। কাশীর কৌটার মত একটির ভিতরে আর একটি, তার ভিতরে আর একটি, এই রূপ ক্রমান্বয়ে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম দেহে জীবের বাসস্থান। বাহিরের কৌটার তিরোভাবে ভিতরেরর কৌটার আবির্ভাব। জন্ম এবং মৃত্যু এই রূপই আবির্ভাব ও তিরোভাব। জীবের স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্য ইহাই বিধাতার বিধি। জীবদেহেরও এই বিধি নিত্যই জগতে হইতেছে। বীজের তিরোভাবে উদ্ভিদের আবির্ভাব, অণ্ডের তিরোভাবে অণ্ডজের আবির্ভাব এবং জরায়ুর তিরোভাবে জরায়ুজের আবির্ভাব। এই আবির্ভাব ও তিরোভাব এত সমসাময়িক যে, উহাদের অগ্র পশ্চাৎ নিরূপণ করা যায় না। বীজ বুঝি, অঙ্কুরও বুঝি, কিন্তু ঠিক কোন সময় বীজটি ফুটিয়া অঙ্কুরটি দেখা দেয়, উহার আগু পিছু বোঝা যায় কি? অতএব এই অবস্থান্তর-প্রাপ্তিকে জন্ম বা মৃত্যু উভয়ই বলা যাইতে পারে।

কোন একটী বস্তুর উন্নতি বা অবনতি সেই বস্তুটীর অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে হইতে পারে না। অতএব ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়াই অবস্থান্তর-প্রাপ্তি। উত্থান পতনের মধ্য দিয়া উন্নতির গতি হয়। এ জগতে উন্নতি ও অবনতি সত্ত্বেও জগৎ ক্রমাগতই উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে। আবির্ভাব ও তিরোভাব, জন্ম ও মৃত্যু এই জগতের ক্রমোন্নতির নিয়ম, বিধাতার বিধি, অনন্ত উন্নতির সোপান। একই চির উন্নতিশীল বাস্তব বস্তুর দুইটী দিক, একটী দৃশ্য, অপরটী অদৃশ্য। দৃশ্য অবস্থাটী সম্মুখ ভাগ, অদৃশ্য অবস্থাটী পশ্চাৎভাগ। জন্ম এবং মৃত্যু সেই এক বাস্তব বস্তু আত্মার ক্রমবিকাশের অব্যর্থ নিয়ম, ইহাই অনন্ত নিত্য জীবনের সোপান। দেখ, এ জগতে ধ্বংস ছাড়া সৃষ্টি নাই এবং সৃষ্টি ছাড়া ধ্বংস নাই। আপদ, বিপদ এবং ধ্বংসের ভিতর দিয়া জগৎ ক্রমশঃই উন্নতির পথে, কোন এক মঙ্গল অভিপ্রায়-সিদ্ধির পথে ক্রমাগতই অগ্রসর হইতেছে। জীবন মরণ এক সঙ্গেই চলিতেছে। এমন কি, অপরের জীবন নাশ করিয়া তার দেহ গ্রাস না করিলে, কেহই জীবন ধারণ করিতে পারে না। শাক সবজী, মাছ মাংস, দুধ ঘী, যা কিছু খাওনা কেন, সমস্তই জীবের ধ্বংসাবশেষ দেহ। আমাদের প্রত্যেকের শরীর মধ্যে কত জীব বাস করিতেছে, উহাদের মধ্যে একদল শরীরকে ধ্বংস করিবার জন্য আক্রমণ করিতেছে, আর একদল উহাদিগকে গ্রাস করিয়া শরীরকে রক্ষা করিতেছে। পরস্পর পরস্পরকে গ্রাস করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। সৃষ্টি-কর্ত্তার বিধানই এই, এক জীবদেহ অপর জীবদেহ দ্বারা পরিপুষ্ট। ধ্বংসের দ্বারা সৃষ্টি এবং ধ্বংসের দ্বারাই সৃষ্টি-রক্ষা। ধ্বংস না হইলে সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি-রক্ষাও হয় না, আবার সৃষ্টি না হ'লেও ধ্বংস হয় না। এ বড়ই মজার কথা, বুঝা দুষ্কর। একই অবস্থাকে জীবিত ও মৃত দুই বলা যায়, অথচ দুই এক নয়, এ যেন ভেল্কী বাজী।

যেই ভক্ষক, সেই ভুক্ত হয়। উপনিষদে জড়ের নাম খাদ্য, জীব ইহাকে খায় এবং ইহা জীবকে খায়। বুদ্ধদেব একদিন তাঁর পিতার সহিত বেড়াইতে গিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন যে, টিকটিকি পিঁপড়েকে খাচ্চে, সাপ টিকটিকিকে খাচ্চে, বেজী সাপকে খাচ্চে; বুলবুলি প্রজাপতিকে খাচ্চে, বুলবুলিকে বাজ খাচ্চে, বাজকে শীকরে খাচ্চে। এইরূপে পরস্পর খাদ্য-খাদক-সম্বন্ধে আপন আপন জীবনের নাশ ও রক্ষা করিতেছে। জীবের জীবন জীবের মরণের উপরই নির্ভর করিতেছে। সামান্য কীট হইতে উচ্চশ্রেণী মানব পর্য্যন্ত প্রত্যেক জীব পরস্পরকে হত্যা করিবার জন্যই যেন ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়া গোপনে অপেক্ষা করিতেছে। ইহা দেখিয়া বুদ্ধদেব বলেছিলেন, "হায়! এই কি সেই সুখের সংসার, যা আমাকে দেখাইবার জন্য পিতার এত আগ্রহ?" এই বলিয়া তিনি সকলের

অলক্ষ্যে জামগাছের তলায় বসিয়া এই প্রতীয়মান জীবন মরণের প্রহেলিকা সমাধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে বহুসাধনা দ্বারা জীবন মরণের ঊর্দ্ধ স্তরে অক্ষর পুরুষের সন্ধান পাইয়া জীবের অমরত্ব জগতে প্রচার করিয়াছিলেন।

আমরা কিন্তু বিষয়ের প্রতি বিশেষ আসক্তি ও মমতা বশতঃ জগতের এই নিত্য ধ্বংস-লীলার দিকটা দেখিতে ভয় পাই। এই রুদ্র-মূর্ত্তির মধ্যে কি এক অনুপম শিবমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন, তাহা দেখিতে চাহি না। বিশ্বের এই প্রকৃত রূপ দেখিবারও সাহস যদি আমাদের না হয়, তবে এই জীবন মরণের বিরোধের সমাধান কে করিবে? সুসভ্য জাতির শিক্ষা দীক্ষা দ্বারাও এই মৃত্যুভয় তিরোহিত হয় নাই। এতাবৎকাল প্রায় কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্র মৃত্যুর ভয় ও অপবাদ হইতে মৃত্যুকে মুক্ত করিতে পারে নাই, বরং অধিকাংশ ধর্ম্মশাস্ত্রে মৃত্যুকে মানুষের পাপের ফল ও ভয়ানক শত্রু বলিয়া উপস্থিত করায়, মৃত্যুভয় এত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, উহার নাম শুনিলেও মানুষ ভয়ে কাঁপে; অথচ সবাই জানে, উহাকে এড়াইবার উপায় নাই। যদি ইহা শত্রু হয়, তা হ'লেও ইহাকে অবহেলা করা উচিত নয়, কারণ শত্রুকে না জানিলে শীঘ্রই শত্রু-হস্তে পড়িবার সম্ভাবনা। আর এই মৃত্যুর মধ্যে কোন বীভৎস-জনক ব্যাপার, অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা, অথবা কোন ক্রোধের প্রকাশ, পাপের শাস্তি, ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা যদি না থাকে, তাহা হইলে ইহার তত্ত্ব জানা আরও আবশ্যক। হিন্দু এই মৃত্যুকে ধর্ম্মরাজ নামে অভিহিত করিয়াছেন, কারণ মৃত্যুই অনন্ত জীবনের প্রবেশ-দ্বার, মৃত্যুই অমৃতের পথ।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীহলধর সেন।

—•—

মাতৃদেবীর জীবনের দু' একটী কথা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

সামান্য অবস্থা হইতে অবশেষে তিনি যে কিরূপে সমস্ত কানপুর-বাসিগণের শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়াছিলেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাঁহার তিরোধানের সংবাদ শুনিয়া এমন কেহই ছিলেন না, যিনি সেই স্বর্গীয় আত্মার উদ্দেশ্যে অশ্রুপাত করেন নাই। মাতৃদেবী অসামান্যা বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রায়ই বলিতেন, উপযুক্তরূপ লেখাপড়া শিখিতে পারিলে এ এক অসাধারণ মেয়ে হইত। সামান্য লেখাপড়া যাহা জানিতেন, তাহারই জোরে তিনি এত উচ্চ সম্মান ও সাধারণের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি এমনই আকর্ষণ করেন যে, তাঁহার নামে সকলে শ্রদ্ধার সহিত মস্তক অবনত করিত।

বালিকাবিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ সেন মহাশয় বলিতেন, "গুরুমার মত এমন বুদ্ধি আমি আর কাহারও দেখি নাই। স্কুলের কত জটিল সমস্যার মীমাংসা তিনি এমনই সুন্দর রূপে সমাধান করিতেন যে, আমি পুরুষ হইয়া তাঁহার বুদ্ধির নিকটে পরাজিত হইতাম।" ইহা কি সামান্য গৌরবের কথা?

কানপুর বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা কানপুরের স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত, রহিল এবং স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের সহায়ক অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার নাম কানপুরে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সংসারে থাকিয়াও জননী আমাদের সন্ন্যাসিনী ছিলেন। জ্ঞান-লাভ করিয়া অবধি চিরকাল তাঁহার একই প্রকার বেশ দেখিয়াছি। ধর্ম্ম-পুস্তকাদি ভিন্ন অন্য পুস্তক পড়িতে কখনও তাঁহাকে দেখা যাইতনা। অসার প্রসঙ্গ হইতে তিনি সর্ব্বদা দূরে থাকিতেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্য নিয়মবদ্ধ ছিল, কখনও নিয়মের ব্যতিক্রম হইত না। দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করা সত্ত্বেও কখনও নিয়মভঙ্গ করেন নাই।

মা আমাদের অত্যন্ত ধৈর্য্যশীলা ছিলেন। চিরজীবন তিনি কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়া অতিবাহিত করেন। সংগ্রামের ভিতর দিয়া কিরূপ ঈশ্বরে নির্ভরশীলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। নিদারুণ রোগ-শয্যায় কখনও তাঁহাকে অস্থির বা বিরক্ত হইতে দেখি নাই। তিরোধানের আট দশ দিন পূর্ব্বে যখন কষ্ট অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, তখন হইতে শেষ পর্য্যন্ত শুধু 'মা' ও 'দয়াময় হরি' ভিন্ন আর কোন নাম তাঁহার মুখে শুনি নাই। যখন অসহ্য কষ্ট হইত, তখন বলিতেন, "একটু শান্তি, একটু আরাম চাই"। যাইবার পূর্ব্বে এমনই নির্লিপ্ত ভাবে আপনাকে প্রস্তুত করেন যে, আপনার স্নেহের সন্তানগণের জন্য কোন ভাবনা চিন্তা দেখা যায় নাই ও তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই বলিয়া যান নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি স্নেহ-মমতা-হীন ছিলেন না, তাঁহার হৃদয় স্বর্গীয় মহা প্রেমে পূর্ণ ছিল।

মাতৃদেবী চিরজীবন বীর নারীর মত সংগ্রাম করিয়া, ক্ষত বিক্ষত হইয়া, হাসি মুখে আপনার সকল কর্ত্তব্য পালন করিয়া, চির শান্তিদায়িনী জননীর ক্রোড়ে চির আশ্রয় লাভ করিয়াছেন।

কবি গাহিয়াছেন :—

"প্রথম যে দিন তুমি এসেছিলে ভবে,
তুমি মাত্র কেঁদেছিলে, হেসেছিল সবে;
এমন জীবন হবে করিতে গঠন,
মরণে হাসিবে তুমি, কাঁদিবে ভুবন।"

আমাদের পরমপূজনীয়া মাতৃদেবীর জীবনে কবির এই উক্তির সার্থকতা দেখিয়া ধন্য হইয়াছি।

মাগো, স্নেহময়ী মা আমার, জন্ম দিয়ে, অসহায় অবস্থায় প্রতি-পালন করে, রোগ, শোক, দুঃখ, কষ্ট, বিপদের হাত হতে বাঁচিয়ে রেখে, আজ আমাদের অনাথ করে কোথায় চলে গিয়েছ, মা? কতদূরে সে দেশ, কোথায় গেলে তোমায় পাব, মা? কারণে অকারণে শতবার যে মধুর "মা" নামে তোমায় ডেকে তৃপ্তি লাভ

করতে পারতাম না, আজ সেই নামে কাকে ডাকব, মা? "মা" বলে ডাক কি চিরজীবনের মত ফুরিয়ে গেল; মাগো, তুমি যে আমাদের সুখে সুখী, আমাদের দুঃখে দুঃখী হতে; তবে কেন আজ আসছ না, মা? একদণ্ড যে আমাদের দূরে রাখতে চাইতে না, মা; আর আজ এত যে 'মা মা' বলে ডাকছি, তা কি তুমি শুনতে পাচ্ছ না, মা? আমাদের জন্য তুমি কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছ, আমাদের সুখী করবার জন্য, আমাদের সুখে রাখবার জন্য, চিরদিন কত পরিশ্রম করেছ; আমাদের জন্যই তুমি আত্ম জীবন দান করলে, কিন্তু আমরা ত তোমার জন্য কিছুই করতে পারলাম না, মা। মাগো, আমরা যে তোমার সেবা করতে পারিনি, তোমার নিদারুণ রোগ-যন্ত্রণায় তুমি যে "একটু শান্তি, একটু আরাম" চেয়েছিলে, তাই দিতে পারিনি বলে কি, মা, চলে গেলে? মাগো, আজ চারিদিক অন্ধকার মনে হচ্ছে। তোমার স্নেহের সন্তানদের ফেলে কি করে দূরে রয়েছ, মা? আমাদের কি ভুলে গেলে, মা? আর কি ফিরে আসবে না? "What is home without a mother?" আজ যে শুধু তাই মনে হচ্ছে, মা? আর কি তোমার সেই প্রেমময়ী মূর্ত্তি দেখতে পাব না? তোমায় ছেড়ে কি করে থাকব, মা? মাগো, সংসারের কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী রোগ-শয্যায় পড়েও, দিনের পর দিন কি অটল বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের সঙ্গে ভগবানে বিশ্বাস রেখে, নীরবে রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করে চলে গেলে; শেষের দিনেও তার বিন্দুমাত্র ত্রুটী হল না। মা, আমরা তোমার নিতান্ত অযোগ্য সন্তান সন্ততি, তোমার অশেষ স্নেহ ভালবাসা পেয়েও কত অপরাধ করেছি, সে সকল ক্ষমা কর। মাগো, তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠা, ধৈর্য্য, আত্মত্যাগ, ভগবানে নির্ভর, যা জীবনে দেখিয়ে গিয়েছ, তাই যেন জীবনে আদর্শ বলে নিতে পারি।

নববিধান-জননী, যিনি এই পৃথিবী দেখাইলেন, অসহায় অবস্থায় কালের কবল হইতে রক্ষা করিলেন, আত্ম সুখাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া পরম স্নেহে ও যত্নে লালন পালন করিলেন, যাঁহার শিক্ষায় চলিতে বলিতে শিখিলাম, যাঁহার দ্বারা জ্ঞানালোকের প্রথম আভাস পাইলাম, শত অপরাধেও যাঁহার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হই নাই, সন্তানের দেহ মন ও আত্মার পরিপুষ্টি সাধনের জন্য যিনি কোন কষ্ট, কোন ত্যাগ-স্বীকারেই পরাঙ্মুখ হন নাই, যিনি সকল গুণের আধার, আমাদিগকে সেই "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননীর উপযুক্ত সন্তান কর। সেই পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কর ও তাঁহাকে তোমার "অমর ভবনে দেবদেবী সনে" সুখে ও শান্তিতে রাখ।

"এস তবে দেবী, স্বস্তি তব এ মহা প্রস্থান,
মুছি আঁখিজল পাছে হয় তব অকল্যাণ।
আজি সমবেত আত্মীয় সকলে মিলিয়া,
দিতেছি ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি লহগো তুলিয়া।
কাতর প্রার্থনা শুধু মোদের সম্বল,
অম্লান কুসুম সম তব আত্মা অমরায়,
থাকুক অনন্তকাল পরিপূর্ণ পরিমল,
বিশ্ব-জননীর পদে চির ফুল্ল শতদল।"

শ্রীসুহাসি ঘোষ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

[স্বর্গীয় দেবেন্দ্র মোহন সেনের শ্রাদ্ধবাসরে, জ্যেষ্ঠা কন্যা কর্ত্তৃক পঠিত।]

বিধাতার বিধানে আজ আমরা পিতৃমাতৃহীন। হে জগদীশ্বর, শৈশবে আমাদের মাতাকে তোমার ক্রোড়স্থ করিয়াছিলে। পিতা আমাদের একাধারে পিতামাতা দুইই ছিলেন, আজ তাঁহাকে হারাইয়া আমরা অকূল পাথারে ভাসিতেছি। হে অন্তর্য্যামী দেবতা, আজ আমাদের প্রাণে যে আকুল আর্ত্তনাদ উঠিতেছে, তাহা তুমি সবই দেখিতেছ। আমরা তো ইহার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিলাম না, তুমি আজ অকস্মাৎ একি করিলে? আমাদের অভিযোগ করিবার কিছু নেই, তুমিই আমাদের এমন স্নেহময় পিতা দিয়াছিলে, আবার তুমিই আজ তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছ।

পিতৃদেবের শৈশব জীবনের কথা আমরা কিছুই জানিনা। আজ এই পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার চরিত্রের গুণাবলী আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইতেছি। আমরা তাঁহার অযোগ্য সন্তান, তাঁহার দেবতুল্য চরিত্র ফুটাইতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাঁহার চরিত্রে যে কোন্ সদ্‌গুণের অভাব ছিল, তাহাতো ভাবিয়া পাইতেছিনা। একাধারে সকল গুণ বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার শৈশবের পিতৃদত্ত নামটী পর্য্যন্ত চরিত্রে আশ্চর্য্যরূপে মিশিয়া গিয়াছিল। নম্রতা তাঁহার চরিত্রের অলঙ্কার ছিল। তিনি ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও, চিরদিন সুখে লালিত পালিত হইয়াও, সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। বিলাসিতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার বেশ ভুষার কোন পারিপাট্য ছিল না, কিন্তু সদা শুভ্র মোটা সাজ ছিল। পিতা ছোট, বড়, ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের সঙ্গে সমভাবে মিশিতেন। তাই আজ আমরা শুধু পিতৃহীন হই নাই, আমাদের সঙ্গে বহু লোক পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, সখা, সহায়, আশ্রয় হারাইয়াছেন বলিয়া হাহাকার করিতেছেন। তিনি প্রত্যেকের খোঁজ খবর করিতেন। বাবা সম্পদে বিপদে প্রাণপণে সকলের সাহায্য করিতেন; তাই কেহ কোন বিপদে পড়িলে, কিম্বা কাহারও কোন উৎসবের আয়োজন করিতে হইলে, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে বাবাকে ডাকিতেন। তিনি অমনি হাসিমুখে সকলের দ্বারে উপস্থিত হইতেন, যতক্ষণ না কার্য্য সুসম্পন্ন হইত, ততক্ষণ তিনি নিবৃত্ত হইতেন না। কাহারও অসুখের খবর পাইলে তো কথাই ছিল না, প্রতিদিন দুই বেলা তাঁহার খোঁজ করা চাই। তিনি আশ্চর্য্যরূপে পরকে আপন করিতে পারিতেন। যে কেহ তাঁহার সহবাসে

আসিয়াছে, সেই তাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল। এতটুকু অপরিষ্কার সহ্য করিতে পারিতেন না, গৃহের কোথাও একটু অপরিষ্কার কিম্বা ঝুল দেখিলে, নিজের হাতে তাহা ঝাট দিয়া, দাস দাসী ও পুত্র কন্যাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিতেন। দেশ দেশান্তরের লোক তাঁহার গৃহের পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া প্রশংসা করিতেন। তাঁহার পছন্দ ও রুচি এত ছিল যে, কেহ কোন কাজের ভার তাঁহার উপর দিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতেন, যে উহা সুরুচি-সম্পন্ন হইবে। ফুল বাগান তাঁহার বড় প্রিয়বস্তু ছিল, প্রতিদিন নিজে তাহার পরিচর্য্যা করিতেন। সাংসারিক ও পারিবারিক হিসাবেও তিনি আদর্শ গৃহী ছিলেন, পুত্র কন্যা হইতে দাস দাসী অবধি কায় কিসে সুবিধা হইবে, নিজে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। আমাদের মাতৃদেবীদের হারাইয়া তিনি জীবনে খুবই আঘাত পাইয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁহার সহ্য করিবার ক্ষমতা ছিল, নীরবে সব বহন করিয়া হাসিমুখে আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধান করিতেন। কখনও তাঁহাকে অধীর হইতে দেখি নাই।

তাঁহার জীবন শুদ্ধ ও পবিত্র ছিল, তাই তাঁর মৃত্যুও অপূর্ব্ব। তিনি অন্যের নিকট হইতে সেবা লইতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইতেন, তাই তাঁর শেষ সময়ে কোন রোগ-ভোগ হইল না। কাহারও নিকট হইতে এতটুকু সেবারও প্রয়োজন হইল না। সুস্থ মানুষ স্নানাহার করিয়া ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া পরম জননীর কোলে আশ্রয় লইলেন। পুণ্যাত্মা ভিন্ন কি এরূপ সম্ভবে?

তাই বলি, ঠাকুর, এমন সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পিতার ঘরে আমাদের জন্ম দিয়াছিলে, কিন্তু দুঃখ এই, তুমি এমন অকালে তুলে নিলে। আজ তাঁর তিরোধানে আমরা যে চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছি। দয়াময়ি মা! তুমি আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দাও, তোমার ভিতর পিতৃদেবকে দেখিয়া আমরা ধন্য হই। আঘাতের তীব্র কষাঘাত ভিন্ন আমাদের চক্ষু মোহে আচ্ছন্ন থাকে; তাই বুঝি, তুমি একে একে সকল প্রিয়জন আত্মীয় স্বজনকে তোমার ঘর তুলে নিয়ে, আঘাতের পর আঘাত দিয়ে, আমাদের নিকট পরলোক উজ্জ্বল করে তুলিতেছ ও তোমার দিকে আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছ। তোমার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে পূর্ণ হইতে দাও, এই প্রার্থনা ভিক্ষা করিয়া তোমার চরণে প্রণত হই।

নব প্রেমিক।

("আমায় দেখা পাগল ক'রে"—সুর)

তোরা দেখ্‌রে নয়ন খুলে,
এক নূতন প্রেমিক ধরাতলে!
ধনমান পরিহরি, ভিখারীর বেশ ধরি,
প্রেমের ভরে থাকেন প'ড়ে সবার চরণ-তলে।
ভু'লে গেছেন আপনায়, মগ্ন প্রেম-সাধনায়,
জীবের দশা হেরি চিত্ত গলে;
তিনি সবার সবাই তাঁর, এক মায়ের এক পরিবার,
হৃদয় মাঝে বিশ্ব-মিলন প্রেমের ইন্দ্রজালে।
নাহি দুঃখ নাহি ভয়, প্রাণ প্রেমে মধুময়,
পুণ্য-ভাতি বদন-মণ্ডলে;
মেষ শাবকের মত, থাকেন সদা অবনত,
কিন্তু করেন সিংহনাদ "জয় জননী" ব'লে।
কাঙ্গালদাস ভিখারী বলে, ভাসি প্রেম অশ্রু জলে,
ইনতো সামান্য কেহ নন;
ইনি যে শ্রীকেশবচন্দ্র, আনন্দময়ীর আনন্দ,
(ভবে) গভীর আঁধারে চাঁদের উদয় মায়ের কৃপা ফলে!

মঙ্গল কুটির, ঢাকা। শ্রীমতিলাল দাস।

প্রেরিত ভাই কেদার নাথ দে।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

প্রেরিত কেদার।

জীবনের গভীর কন্দরে শৈশবকাল হইতে যাহা নিহিত ছিল, তাহা প্রকাশিত হইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। ভগবান আপন প্রিয় পুত্রকে যে কার্য্য হেতু প্রেরণ করিয়াছিলেন, সতত্তই সেই ভাব কেদার নাথের অন্তরে জাগিত। সেই জন্যই যৌবনকালে যখন তিনি পৃথিবীতে সংসারের জন্য চাকুরী লইয়া ছিলেন, সেই প্রথম হইতেই প্রাণে ধর্ম্ম-কার্য্যে প্রাণ দিবার নিমিত্ত অন্তরের ইচ্ছা জাগিত। চাকুরী করিতে আরম্ভ করা অবধি অনেক বার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ও প্রকৃতির রাজ্যে সাধন ভজন, সাধু-সঙ্গ এই সকল করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এইবার মানুষের কাছে অর্থের নিমিত্ত কার্য্য কর্ম্ম করিবার দিন অবসান হইল। তিনিই জানিতেন, কোনটী উপযুক্ত সময়, যিনি তাঁহাকে ভবে আনিয়াছিলেন। যখন সময় আসিল, তখন শ্রীহরি আপন তাঁহার প্রেরিত পুত্রকে সংসার-কার্য্যালয় হইতে আপন প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিলেন। কেদার নাথ এক্ষণে দিল্লীতে অফিস করিতে ছিলেন। পরিবার সঙ্গেই ছিলেন। সেই সময়ে দিল্লী মহা নগরীতে এক প্রকার নূতন জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। ধনী দরিদ্র সকলেই আক্রান্ত হইতে লাগিল। বাড়ীর ছেলেরা হইতে পিতা মাতা সকলেই একটী একটী করিয়া এই জ্বরে ভুগিতে লাগিলেন। দাস দাসী প্রভৃতি পরিচারকবৃন্দ কেহ আর বাদ রহিল না। অত্যন্ত অসুবিধা ও কষ্ট হইতে লাগিল। প্রতিদিন দুটীবেলা চিকিৎসক আসিত, ঔষধ পথ্য ব্যবস্থাদি করিত, জ্বর ছাড়িয়া যাইত, আবার হইত। অনেক প্রকার টোট্‌কাও লোকে করিত। মাকেও কত লোক আসিয়া কত পরামর্শ দিত। একদিন লোক জনেরা সব ছুটিয়া আসিয়া মাকে বলিল, এক জায়গায় বহুদূরে যমুনা নদীর

কিনারে একটী সাধু আসিয়াছে, জলপড়া দিতেছে, আর সেই জল পান করিয়াই জ্বর একেবারে আরাম হইয়া যাইতেছে। তাহারাই আগ্রহাতিশয় সহকারে নূতন কলসী করিয়া জল পড়িয়া লইয়া আসিল এবং ঘটি ঘটি জল সব পান করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতেই যে একেবারে জ্বর আরাম হইয়া গেল, তাহা দেখা গেল না। যাহা হউক, সে সময় দিল্লীতে নানা হুজুগ উঠিয়াছিল এবং মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। এই বিষম জ্বরে ভুগিতে ভুগিতে যখন দেখিলেন, কিছুতেই পারিতেছেন না, তখন ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে জল বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত তিন মাসের ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। সেই সময় শ্রীআচার্য্যদেব মনোনীত ধরের বাগানস্থিত বড় ভারতাশ্রম উঠিয়া যাওয়ার পর, ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীতে অল্প-সংখক ভাই ভগ্নী ও পরিবার মিলিত হইয়া আশ্রমের আদর্শ চলিতেছিল। সেখানে এক বিভাগে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সপরিবারে বাস করিতেন এবং অন্যাংশে বালিকা-বিদ্যালয় হইত এবং কয়েকটী পরিবারও থাকিতেন। পিতৃদেব আমাদের সকলকে লইয়া প্রথমে সেই আশ্রম বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছিলেন। অল্প কয়েকদিন পরে আমাদের বড় দাদা শ্রীমনোমত ধন অন্যমনস্ক হইয়া কালীঘাটে আমাদের বড় পিসীমার বাড়ী চলিয়া যান। সে সময় তিনি অতি বিনীত কিশোর বালক; তাহাতে কলিকাতার পথ কিছু জানেন না, পশ্চিমে থাকা অভ্যাস, নূতন আসিয়াছেন। বাড়ী আসিতে বিলম্ব হওয়াতে মাতৃদেবী পিতৃদেব চিন্তিত হইয়া বিস্তর খোঁজ করিলেন। রাত্রি ভোর হইল, তথাপি কোনও উপায় না হওয়াতে, পিতৃদেব ভগিনীপাত দুর্গাপদ বসু কলিকাতায় যে আফিসে কার্য্য করিতেন, সেখানে গেলেন এবং সকল তথ্য অবগত হইয়া ভাবনা হইতে মুক্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, আমি এই মাত্র আফিসে আসিয়াছি, তোমাকে একটু লিখিয়া চাপরাশীকে পাঠাইতে ছিলাম। মনোমত ধন তাহার কিছু পূর্ব্বেই দিল্লীতে ছাদ হইতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া তিন দিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। সেবার বালক মনোমত ধন ভগবানের ইচ্ছাতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। অনেকবার তাঁহার জীবনে বিপদ দেখা গিয়াছিল। সে আশ্রমে আর অধিক দিন থাকা হইল না, সে জন্য কিছুদিন থাকিয়া সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ একটী তৃতল বড় বাড়ীতে পিতৃদেব উঠিয়া আসিলেন। সেই তৃতল বাড়ীতে সেই সময় ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু, রামচন্দ্র সিংহ ও ব্রাহ্ম ভ্রাতা হোমিওপ্যাথী ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। দিন কতক যাইতে না যাইতে প্রেরিত ভাই দ্বয় তাঁহাদের মঙ্গলবাড়ীস্থ নূতন গৃহে প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মানন্দের আদরের সেই মঙ্গলবাড়ীতে বড়ই আনন্দে সকলে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমরা তখন ছোট ছিলাম, তবু আমাদেরও মনে হয়, "হায়, কোথা গেল সুখের নব বৃন্দাবন, প্রেমিক ভক্তের মেলা হরি সংকীর্ত্তন।"

যখন এই মঙ্গলবাড়ী প্রস্তুত হইতেছিল, সকলে মিলিয়া জায়গা ঠিক করিতেছিলেন, পিতৃদেব তখন পশ্চিমে কর্ম্মস্থলে। ভাই অঘোর নাথ গুপ্ত পিতাকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং প্রথম হইতেই উভয়ের মধ্যে একান্ত সৌহৃদ্য ছিল। ভাই অঘোর নাথ বাবাকে লিখেছিলেন, তুমি যদি এখানে বাড়ী করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে লিখিও, আমি সব বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব। মার কাছে শুনিয়াছি, পিতৃদেব লইতে পারিলেন না। মা বলিতেন, ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল না, তাই মঙ্গল পাড়ায় আমাদের বাড়ী হয়নি। অথচ সেই সময়ের অব্যবহিত পরেই পিতৃদেব প্রেরিত ভাইয়ের স্থান গ্রহণ করিলেন।

এই তৃতল বাড়ীতে থাকা কালীন সময়ে অর্থাৎ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে পিতৃদেব প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে কমল-কুটীরে চলিয়া যাইতেন। সারাটা দিনই সেখানে থাকিতেন, পরে অধিক রাত্রে ঘরে ফিরিতেন। সেই ভাবেই ছুটীটা কাটাইতে লাগিলেন। ওখানে মিশনের অনেক কাজ করিতেন। আবার অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অন্য সকল প্রেরিত ভাইদের সঙ্গে কেদার নাথও নববৃন্দাবনের নূতন নূতন ধর্ম্মালোচনা ও আনন্দ-সম্ভোগে যোগ দিতেন। পরিবার সন্তান সন্ততির কোন সংবাদই সে সময় তিনি লইতেন না। সর্ব্বদা যেন নববিধানের লীলাধারী শ্রীহরির আদেশের প্রতীক্ষায় উদাসীন ভাবে চিন্তাশীল অন্তরে অবস্থান করিতেন। শ্রীআচার্য্যদেবকে ছাড়িয়া যেন থাকিতে পারেন না, এইরূপ ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইত। যখন অন্তরে আদেশ-বাণী শুনিয়া প্রেরিত দাসের কার্য্যে জীবন যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, সেই সময়ে একদিন সকলে যখন রাত্রি ১২টার পর পর্য্যন্ত শ্রীআচার্য্যদেবের সহবাসানন্তর উঠিয়া গিয়াছিলেন, কেদার নাথকে সেই সময় ডাকিয়া শ্রীআচার্য্যদেব বলিলেন, আবার কার্য্যস্থলে না যাইলে কি চলে না? কি আশ্চর্য্য, কেদারনাথের প্রাণতন্ত্রী যেন এক তারে ভাবে মিলে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। শ্রীআচার্য্যদেবের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেলেন। শ্রীদরবার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনের ভাব, ভাষা ও মিলন এই প্রেরিত ভাইদের সঙ্গে, যাহা শ্রীআচার্য্যদেব অনেকবার বলেছেন, এ স্থলে দেখা গেল, ঠিক তেমনি আপনার করে শ্রীআচার্য্য দেব কেদার নাথকে গ্রহণ করিলেন। সে রাতে আনন্দের ভরা যোগে দুজনে এক আদেশে শ্রীভগবানের কাছে ভাই হয়ে সুখী হলেন। দলে স্থান পেয়েছেন, প্রাণে এ বারতা কেদারনাথ বার বার অনুভব করিতে লাগিলেন। তেমন শুভক্ষণ জগতের লোকের আসে না। শ্রীঈশ্বর যাঁহাদিগের ললাটে এই প্রেরিত চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া ভবে প্রেরণ করিলেন, তাঁহারাই এই নববিধানে ভাই হয়ে দলে দলে, দলে বলে মিশে গেলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে, তবু নববিধান-ভারত-গাথা শেষ হইবে না। নব-ভানুদয়ে নববিধানের নিশান হাতে দলে দলে শ্রীদরবারে ভাই সব আসিবে। শ্রীদরবার কি? সে যে নিত্য সত্য ভগবানের বাণী আসবার ঘর।

যখন অর্থ উপার্জ্জনের কার্য্য ছাড়িয়া দিলেন, তখন উপরওয়ালা সাহেব দুঃখিত হইয়া কর্ম্ম পুনঃ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনেক পত্র

লিখিয়াছিলেন। কেদার নাথ সত্য-পরায়ণ কর্ম্ম নিপুণ ব্যক্তি ছিলেন এবং অত্যন্ত হিসাবী ছিলেন। ছুটীর মাহিনা লইয়া যাইবার নিমিত্ত আফিস হইতে অনুরোধ পত্র আসতে লাগিল, কিন্তু যাঁহাকে পরম দেবতা পরমেশ্বর নিজে ডাকিয়া স্বকার্য্য-ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন, তিনি কি আর পৃথিবীর এই প্রলোভনে ভুলিতে পারেন? কেদার নাথ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ শুনিয়া হৃদয়কে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং পিতার নিকট পুত্র হইয়া কাছে কাছে রহিলেন, তাই পৃথিবীর মোহিনী মায়া বা সয়তানের প্রলোভন তাঁহার পবিত্র আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত কিম্বা বিচলিত করিতে পারিলনা। স্বর্গীয় ভাই কেদার নাথ যে প্রকার বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতার সহিত নিজ জীবন-ব্রত সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া জগতে ঘোষিত ও মহিমান্বিত থাকিবে। সুখে ঐশ্বর্য্যে চিরদিন প্রতিপালিত তাঁহার বড় আদরের পরিবার, পুত্র কন্যাগুলিকে কিরূপ কষ্টে উপবাসী থাকিতে স্বচক্ষে দেখিয়াও, কেদার নাথ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ভগবানের স্নেহময় মুখপানে চাহিয়া নীরবে থাকিতেন। নিজেরত কথাই নাই; যতদূর কঠোরতা ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার ব্রত পালন করা যায়, সেই সকল বৈরাগ্য নিজ সম্বন্ধে পালন করিতে লাগিলেন। অতি শিশু বয়স হইতেই কেদার নাথের জীবনে নিঃস্বার্থ বৈরাগ্য ভাবের অঙ্কুর দেখা যাইত। আহারে বিহারে, বস্ত্র অলঙ্কারে শৈশব হইতেই কেদার নাথ নিস্পৃহ অনাসক্ত বৈরাগী ছিলেন। পুত্র কন্যাকে উপবাসী রাখিয়া মাতার প্রাণই সর্ব্বদা কাতর হইত, কিন্তু কেদার নাথ এই সান্ত্বনা দিতেন, সর্ব্বদা ভগবানের প্রতি স্থির হইয়া নির্ভর কর। ভগবানের কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত হন, স্বয়ং ভগবানই তাঁহাদিগের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী দান করেন। সেই জন্য কেদার নাথের মুখের পানে চাহিয়া ও তাঁহার বিশ্বাস এবং নির্ভরশীলতা দর্শন করিয়া, মা অবাক হইয়া যাইতেন এবং ধৈর্য্য-সহকারে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকিতেন। সেই সময় একদিন রন্ধনের উপযোগী কথঞ্চিৎ সামগ্রী ছিল, কিন্তু মা কখনও পাথর কয়লার ব্যবস্থা অবগত ছিলেন না। তিনি অধিক-সংখ্যক পরিচারক ও পরিচারিকা লইয়া সংসার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাহাদিগের প্রতি একবার আদেশ করিলেই চলিত। তিনি সেই কয়লা জ্বালাইয়া অগ্নি করিতে সেদিন আর কিছুতেই সক্ষম হইলেন না। অবশেষে যখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিলেন, মা তখন রন্ধন ঘর হইতে উপরে উঠিয়া আসিলেন এবং শিশুগুলিকে ডাকিয়া চলিয়া আসিতে বলিলেন। সকলে হতাশ ভাবে মাতার আহ্বানে উঠিয়া আসিল, কিন্তু আড়াই বছরের ছোট মেয়েটী উঠিল না। পা ছড়াইয়া বসিয়া এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, আজ আর আমাদের রান্না হবেনা গো, কি খাব গো। দুই চক্ষু জলে ভাসিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া একটি দয়ালু প্রতিবেশী এক থাল ভাত ব্যঞ্জন দিয়া সেই ক্ষুধা-কাতরা মেয়েটীর মুখে হাসি ফুটাইয়া দিলেন। বাহিরের এই সকল দুঃখ সে সময় অনেক পাইতে হইয়াছিল। ভাই অনেককাল পরে প্রবাসের কর্ম্মস্থল হ'তে দেশে আসিয়াছেন শুনিয়া, কেদার নাথের ছোটদি ভাইয়ের কাছে কিছুদিন প্রাণ জুড়াইতে আসিলেন। কয়েক দিন মধ্যে এই দারিদ্র্য দেখিয়া পিসীমা বলিলেন, "দুখী যায় সুখীর কাছে, দুখ যায় তার পাছে পাছে"।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমলতা চন্দ।

গিরিডি নববিধান ব্রহ্মমন্দির

চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

মঙ্গলময়ী মার কৃপায় নিম্নলিখিত প্রকারে গিরিডির উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। গত ২৫শে অক্টোবর, ৮ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার উৎসব আরম্ভ হয়। ঐদিন ও পূর্ব্বদিন উৎসবের যাত্রিগণ গিরিডিতে আগমন করিয়া তৃপ্তি-কুটীরে আশ্রয় লাভ করেন। ২৫শে প্রাতে তৃপ্তি-কুটীরের দেবালয়ে বিশেষ উপাসনার কার্য্য ভ্রাতা দেবেন্দ্র নাথ বসু সম্পন্ন করেন, সেবক অখিলচন্দ্র রায় এখানকার নববিধান-সাধক স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের সহিত একাত্মতা লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারদেশে সমাগত ব্যক্তিগণ দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তি ও অনুরাগের ভরে "মা আনন্দময়ীর শ্রীমন্দিরে, চল ভাই যাই সকলে" সঙ্গীতটী গান করিতে করিতে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলে, সম্পাদক ডাক্তার যোগানন্দ রায়ের উদ্যোগে, তাঁর পুত্রকন্যাগণ ও তাহাদের সঙ্গীরা আরতির সঙ্কীর্ত্তনটী করেন এবং প্রফেসার রাজেন্দ্র নাথ সেন দণ্ডায়মান হইয়া সংক্ষেপে উদ্বোধন ও আরাধনা করিয়া সাধারণ প্রার্থনান্তে মাঘোৎসবের আরতির প্রার্থনাটী ভক্তিভরে পাঠ করেন ও শেষে একটী সঙ্গীত হয়।

২৬শে অক্টোবর, শুক্রবার, প্রাতে ভ্রাতা দেবেন্দ্র নাথ বসু ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য করেন, ব্রহ্মপ্রেম বিষয়ে আচার্য্যের উপদেশ পাঠ করিয়া ঐভাবে আত্মনিবেদন করেন। উপাসনাটী বেশ সুমিষ্ট হয়। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের উৎসব উপলক্ষে গিরিডির নববিধান সমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন ও ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি আচার্য্যের উপদেশ হইতে একটী উপদেশ পাঠ ও ঐভাবে মহিলাদিগের জন্য প্রার্থনা হয়; মহিলাগণ সঙ্গীত করেন।

২৭শে অক্টোবর, প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের করিবার কথা ছিল; তাঁর আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, সেবক অখিল চন্দ্র রায় সংক্ষেপে উদ্বোধন ও আরাধনা এবং সাধারণ প্রার্থনার পর মানব-সমাজের জন্য কল্যাণ ভিক্ষা করিলে, ডাক্তার পরেশ বাবু বেদীতে আসীন হইয়া, "উৎসবের বিশেষত্ব বিষয়ে" আত্ম-নিবেদনে, কলিকাতার উৎসবে যোগদান করিয়া, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মাঘোৎসবের মধ্যে এক দিবস, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের বেদীতে শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে দিব্য

জ্যোতির্ম্ময় পুরুষরূপে দর্শন ও তাঁর ব্রহ্মপূজা, সুমিষ্ট উপদেশ ও প্রার্থনা শ্রবণে তাঁহার কিরূপে জীবনে মহাপরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা বিশদ ভাবে বলিয়া উপস্থিত উপাসক উপাসিকাদিগকে মোহিত করেন; অদ্য সায়ংকালে পাটনা বি, এন, কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ সেন ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। "পরপারে" বিষয়ে সুন্দর উপদেশ দেন। তিনি সরল ও সুমিষ্টভাবে উদ্বোধন ও আরাধনা করিয়া, পরকাল ও আত্মার অমরত্ব এবং দেহী অদেহী আত্মাদিগের যোগাযোগ সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা করিয়াছিলেন।

২৮শে অক্টোবর, রবিবার, সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৮টার সময় সঙ্কীর্ত্তন ও সঙ্গীত হইলে সেবক অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন। যাঁর পরিশ্রমলব্ধ অর্থে ও ত্যাগে এবং একনিষ্ঠ সাধনার ফল-স্বরূপ এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে আজ ১৪ বৎসর উৎসব হইতেছে, সেই স্বর্গীয় আত্মার ও তাঁর সহকর্ম্মী পরলোকস্থ আত্মাগুলির সহিত যোগযুক্ত হইয়া এবং সমস্ত ভাই ভগিনীদের সঙ্গে একাত্মতা-সাধনে মহোৎসব করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিয়া উদ্বোধন করেন। আরাধনাতে প্রত্যেক স্বরূপের বন্দনা বিশদরূপে করিয়া তিনি ধন্য হন। সেবক অখিলচন্দ্র রায়ের আত্মনিবেদনটী দীর্ঘ হয়। তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই, "আমরা সকলেই এ জগতের সেবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত, তাঁরই ইচ্ছা-পালন ও তাঁকে সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন করিয়া তাঁর পবিত্র প্রেমে চিরদিন সম্বদ্ধ থাকিব, সেই জীবন্ত বিধাতাকে সত্যরূপে বিশ্বাস করিয়া, সত্য, পবিত্রতা এবং নিত্য প্রেমে আমরা অনন্ত জীবন যাপন করিব। একটী মানব আত্মাকেও আমরা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও পরমেশ্বরের অসীম কৃপার অধিকারী, নবভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র স্বয়ং এই আশার কথা আমাদের শুনাইয়াছেন।" এই মর্ম্মে আত্ম-নিবেদন করিয়া নবভক্তের দৈনিক প্রার্থনা হইতে "আত্মার জন্য" প্রর্থনাটী পাঠ করেন ও ঐ ভাবেই প্রার্থনা করেন। পরিশেষে সঙ্গীত হইয়া প্রায় ১০॥০টায় উপাসনা শেষ হয়। স্থানীয় সমাজের সম্পাদক প্রেমাস্পদ ডাক্তার যোগানন্দ রায়ের ও ভ্রাতা অমৃত লাল ঘোষের তত্ত্বাবধান ও যত্নে মধ্যাহ্ন ভোজনের সুব্যবস্থা ব্রহ্মমন্দিরের প্রাঙ্গণে হইয়াছিল। প্রায় শতাধিক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ঐস্থানে প্রীতি-ভোজন করিয়া আহ্লাদিত হন। পুনরায় অপরাহ্নে ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু, সেবক অখিলচন্দ্র রায় প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও কি উপায়ে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিতভাবে কার্য্য করা যায়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই সংকীর্ত্তন ও সঙ্গীত হইতে থাকে। সন্ধ্যার পর ডাক্তার কামাখ্যা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদীর কার্য্য করেন, সংক্ষেপে আরাধনা করিয়া, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের আত্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তাঁর দিব্য গতির জন্য প্রার্থনা করত, ধর্ম্মজীবনে মহাত্যাগের বিষয়ে উপদেশে সম্রাট্ অশোকের জীবনের পরিবর্ত্তন ও বৌদ্ধধর্ম্ম-বিস্তারের জন্য সর্ব্বস্ব-সমর্পণের বিবরণ এবং ঐ দৃষ্টান্তে প্রত্যেককে ধর্ম্মজীবন লাভের কথা বলিয়া দীর্ঘ উপদেশ শেষ করেন।

২৯শে অক্টোবর, সোমবার, প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বসু উপাসনার কার্য্য করেন। সায়ংকালে প্রফেসার রাজেন্দ্র নাথ সেন এম, এ, "নবযুগের সাধনা" বিষয়ে অতি গম্ভীর গবেষণাপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্লাদিত করেন। তৎপরে ব্রহ্মমন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হয়। গিরিডির কাছারী ও বারগণ্ডার কয়েকটী ছোট বড় রাস্তা দিয়া কীর্ত্তনের দল তৃপ্তি কুটীরে যাইয়া কীর্ত্তন শেষ করেন। স্থানীয় প্রায় ২৫টী যুবক ও বালক উৎসাহের সহিত এই নগর-কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। ভ্রাতা অবিনাশ চন্দ্র দাস স্বরচিত নগর-কীর্ত্তনটীর নেতৃত্ব স্বয়ং করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় অমৃত লাল ঘোষের সহধর্ম্মিণী, পুত্র কন্যা ও পুত্রবধূ প্রভৃতি অতি ভক্তিভাবে সংকীর্ত্তনকারীদের অভ্যর্থনা করিয়া সেবা করিয়াছিলেন। অনেকদিন পরে এবার গিরিডি নগরে নববিধান-জননীর জয়-ঘোষণা হইল। সংকীর্ত্তনের অগ্রে অগ্রে "জয় শ্রীনববিধানের জয়", "জয় মা আনন্দময়ীর জয়" ইত্যাদি জয়-পতাকা উড়িতে থাকায়, কীর্ত্তনের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য আরো বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এখানকার উভয় সমাজের ব্রাহ্মবন্ধুগণ কেহ কেহ এই নগর-সংকীর্ত্তনে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমাদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

৩০শে অক্টোবর, মঙ্গলবার, প্রাতে ৯॥০টায় "তৃপ্তি কুটীরে"র দেবালয়ে উপাসনার কার্য্য সেবক অখিল চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। তিনি কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে মৈত্রীভাব রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যকার্য্য ও ভক্ত বিদুরের গৃহে ক্ষুদ-কণিকা-ভোজনের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া, ভক্তবৎসল ভগবান্ যে সর্ব্বদাই মানব-মণ্ডলীর মধ্যে ভ্রাতৃভাব-রক্ষার জন্য অহঙ্কারী অপেক্ষা কাঙ্গাল ভক্তের প্রেমে অধিকতর বশীভূত হন, তাহাই নিবেদন করেন। শ্রদ্ধেয় কামাখ্যা বাবু স্বর্গীয় অমৃত লালের পরিবারে ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে সেবক অখিলচন্দ্র রায় শান্তিবাচনের প্রার্থনাটী করেন।

এখানকার নববিধানের একনিষ্ঠ সাধক স্বর্গীয় অমৃত লালের সহধর্ম্মিণী, পুত্র কন্যা, পুত্রবধূ এবং আত্মীয়গণ প্রাণপণে যাত্রীদিগের ও বন্ধুদিগের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। দয়াময়ী বিধান-জননী সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। দেশে দেশে, নগরে নগরে তাঁরই স্বর্গীয় প্রেমের বিধান জয়যুক্ত হউক।

গিরিডি।
৩১শে অক্টোবর, ১৯২৮। } জনৈক উৎসবযাত্রী।

সংবাদ।

শুভ বিবাহ—গত ১৮ই অক্টোবর, ১৯৯নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় বেচারাম মল্লিকের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী শেফালিকার সহিত, স্বর্গীয় রায় সাহেব বিপিন মোহন সেহানবিশের কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ বিবেক মোহন সেহানবিশের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে স্বর্গের আশীর্ব্বাদ দান করুন।

শারদীয় উৎসব—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, ৮৯নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটে, শারদীয় উৎসব উপলক্ষে, ২০শে অক্টোবর, সন্ধ্যায় ডাঃ বিমল চন্দ্র ঘোষ, ২১শে, সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২২শে, সন্ধ্যায় ভাই প্রমথ লাল সেন, ২৩শে, সন্ধ্যায় অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। ২৪শে, সন্ধ্যায় শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের নেতৃত্বে কীর্ত্তন হয়। প্রতিদিন প্রাতে কমল কুটীরের নবদেবালয়ে উপাসনা হয়, ভাই প্রমথ লাল সেন উপাসনা করেন। এবার সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই চিন্ময়ী মাতৃপূজায় যোগদান করিয়া সুখী হইয়াছেন।

রোগমুক্তি—শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র চন্দের রোগমুক্তি উপলক্ষে ময়মনসিংহের ব্রাহ্মপল্লীস্থ "কৃপাকুটীরের" দেবালয়ে, বিগত ৭ই অক্টোবর, বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত নিম্নলিখিত পরলোকগমন সংবাদ পত্রিকাস্থ করিতেছি :—

গত ২০শে অক্টোবর, ৩রা কার্ত্তিক, আমাদের শ্রদ্ধেয় নালুদার সেজদা, কুচবিহারের অবসর-প্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন ডঃ মোতিলাল সেন ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করিয়াছেন। বৎসরাধিক-কাল হল, তিনি সহধর্ম্মিণীকে হারাইয়াছিলেন। এখন অমরলোকে অমরদলে সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে পরমানন্দে মিলিত হইয়াছেন।

গত ২৫শে অক্টোবর, ৮ই কার্ত্তিক, আমাদের প্রিয় বন্ধু ঢাকার ডাক্তার উমাপ্রসন্ন ঘোষের সহধর্ম্মিণী দেবী নীহারিকা ঘোষ শিলংএ নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন।

গত ২৬শে অক্টোবর, ৯ই কার্ত্তিক, বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য, বাঙ্গালার সুসন্তান, ব্রাহ্মসমাজের পরমহিতকারী বন্ধু, দানে মুক্তহস্ত, রাজনীতিবিদ্, ব্যবহারজ্ঞ মাননীয় এস্ আর্ দাস ৫৬ বৎসর বয়সে কলিকাতায়, ৮নং শর্ট ষ্ট্রীটে, ডাঃ ডি, এন্, রায়ের বাসভবনে, হৃদ্‌রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন।

গত অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে, হাজারিবাগে, আমাদের প্রিয় বন্ধু, পাটনা জিলা স্কুলের হেড মাষ্টার বেচুনারায়ণ ও কলিকাতার ডাঃ ধ্যানন্দের পিতৃদেব পরলোক গমন করিয়াছেন।

আমরা শোকার্ত্ত পরিবারের সঙ্গে হৃদয়ের সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে অমরধামে নিত্য শান্তিতে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বর্ষণ করুন।

পারলৌকিক—গত ৭ই অক্টোবর, নওগাঁতে, স্বর্গীয়া সুপ্রভা ঘোষের শ্রাদ্ধদিনে, কলিকাতার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া, তাঁহার সহোদরা শ্রীমতী সুমনা দত্তের গৃহেও বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় উপাসনা করেন। প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ দান করা হইয়াছে।

গত ১০ই অক্টোবর, ঢাকায়, স্বর্গীয় দেবেন্দ্র মোহন সেনের আদ্যশ্রাদ্ধে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গিত হইয়াছে :—

ঢাকা—নববিধান ব্রহ্মমন্দির ১২৫৲, অনাথ আশ্রম ২৫৲, বিধবা আশ্রম ২০৲, মূক ও বধির স্কুল ২৫৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২০৲, অনাথ ব্রাহ্ম পরিবার সংস্থান ধনভাণ্ডার ২০৲, রামকৃষ্ণ মিশন ১০৲, উয়ারী লাইব্রেরী ২০৲, উয়ারী গরিব বিধবাদের কাপড় ৫৲; কলিকাতা—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ২০৲, নববিধান ট্রাষ্ট ফাণ্ডের কান্তিচন্দ্র-মেমোরিয়েলে ২০৲, ধর্ম্মতত্ত্ব কাগজের সাহায্যের জন্য ২০৲, নববিধান কাগজের সাহায্যের জন্য ২০৲, প্রচারক প্যারী বাবুর সেবার জন্য ১০৲, নববিধান প্রচারাশ্রম ২০৲, ভগ্নী-সমিতি ১০৲; ময়মনসিংহের নববিধান ব্রহ্মমন্দির ১০৲, মত্ত গ্রামের বালিকা-বিদ্যালয় ২৫৲, ভৃত্য-সেবা ২০৲, কাঙ্গালী বিদায় ১০০৲; মোট ৫৫০৲ টাকা। বিধাতা এই দানকে সার্থক করুন।

গত ১১ই অক্টোবর, কমল কুটীরের নবদেবালয়ে, ডাক্তার অনুকূল চন্দ্র মিত্রের পিতৃদেব স্বর্গস্থ ডাক্তার নৃত্যগোপাল মিত্রের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথ লাল সেন উপাসনা করিয়াছেন।

গত ১৬ই অক্টোবর, ডাক্তার অনুকূল চন্দ্র মিত্রের ২৮নং যুগীপাড়া লেনস্থ বাসভবনে, তাঁহার মাতৃদেবী স্বর্গগতা অন্নদামণি দেবীর সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ উপাসনা করিয়াছেন। এই দুই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র ৪৲ টাকা নববিধান প্রচারাশ্রমে দান করিয়াছেন।

গত ২৫শে অক্টোবর, বালীগঞ্জে, শ্রীযুক্ত নীতিলাল ঘোষের গৃহে তাঁহার শ্বশুর স্বর্গীয় বিহারী কান্ত চন্দের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ২৭শে অক্টোবর, কার্সিয়াং পর্ব্বতে স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ সাহেবের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক পবিত্র দিন স্মরণার্থ বিশেষ ভাবে উপাসনা হয়। কতকগুলি গরিবকে চাউল পয়সা ও চিঁড়া গুড় বিতরণ করা হয়। ঐদিন কলিকাতায় ২৮।১ চক্রবেড়ে লেনে ভক্ত-কন্যা শ্রীমতী মণিকা দেবী সুমিষ্ট উপাসনা করিয়া পরিবারবর্গের মনে শান্তি দিয়াছেন। সেখানে গরিবদের চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হয়। কুচবিহার রাজ্যেও ঐ পবিত্র দিন স্মরণার্থ ১৭০ জন গরিবকে চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হয়।

গত ২৯শে অক্টোবর, কলুটোলায় স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ৩১শে অক্টোবর, ৭৬নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় রামেশ্বর দাসের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই প্রমথ লাল সেন উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত স্বপ্রকাশ চন্দ্র দাস প্রার্থনা করেন।

ভগবান্ পরলোকস্থ ব্যক্তিগণের পুত্র কন্যা ও আত্মীয় স্বজনদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ৩০শে কার্ত্তিক, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৩ ভাগ। ২১শ সংখ্যা। | ১লা অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক, ৯৯ ব্রাহ্মাব্দ। 17th November, 1928. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে জগৎ-প্রসবিতা, তুমি আমাদিগের প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের দ্বারা এবং ব্রহ্মনন্দন শ্রীঈশা দ্বারা পিতা বলিয়া সম্বোধিত ও পূজিত হইয়াছিলে। বর্ত্তমান যুগে যিনি তোমাকে সর্ব্বপ্রথমে চিন্ময়ী মাতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন, পূজা আরাধনা করিলেন, তাঁহার জন্মোৎসব আসিতেছে। এবার আমরা কেমন করিয়া এই জন্মোৎসব করিব, তাহা বলিয়া দাও। তিনি যে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা, বল সত্য করে" তিনি যে দৈহিক জীবন-ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বেই আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোরা আমার মাকে চিনলি না, আমার মা বড্ড ভালরে বড্ড ভাল।" যাহাতে এবার এই জন্মোৎসবে তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারি এবং সত্য করিয়া বলিতে পারি, আমরাও তোমার মাকে চিনিয়াছি, তোমার মা আমাদেরও বড্ড ভাল মা, এমন আশীর্ব্বাদ কর। তোমার নববিধানের নবশিশু করিয়া তুমি তাঁহাকে ত আমাদের অগ্রজ করিয়াছ। তবে তাঁহার শুভ জন্মদিনে আমাদিগকেও নববিধানের নব জন্ম দান কর, যেন তিনি যে মাকে মা বলিলেন, সেই একই মা যে আমাদিগেরও মা, তাঁহার সহিত সমস্বরে সমসুরে সেই তোমাকে মা বলিয়া ডাকি এবং আমাদেরও বড্ড ভাল মা বলিয়া তোমাকে চিনি। আরও, মা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তাঁহার সহিত সমবিশ্বাসী হইয়া, একই নববিধানের নবশিশুর জীবন লাভে সকলে ধন্য হইয়া ও তাঁহার সহিত একাত্মা হইয়া, পরস্পরের সঙ্গে ঐক্য-বন্ধনে নবশিশুদল হইয়া, তোমাকে এবং তোমার নববিধানকে গৌরবান্বিত করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

শ্রীকেশবের জন্মোৎসব।

নববিধানাচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শুভ জন্মোৎসব আবার আসিল। মানব মাত্রেরই জন্মদাতা পিতা মাতা একই জগৎপাতা পরমাত্মা। বিশেষভাবে ভক্তগণই ইহা উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাকে পিতামাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার পবিত্রাত্মা হইতেই আপনাদিগের জন্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদিগের আর্য্যঋষিগণ এই জন্যই "পিতা নোঽসি" বলিয়া তাঁহার মহিমা গান করিয়াছেন। মেরী-তনয় শ্রীঈশা আপনাকে সেই এক ঈশ্বরেরই পুত্র বলিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন।

পিতা অপেক্ষা মাতৃস্নেহ অধিকতর কোমল, মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধ অধিকতর নিকট, এই জন্য বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধানে বিধাতা স্বয়ং আপনার মাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রকে মাতৃসন্তান নবশিশুরূপে জন্ম-

দান করিলেন। সুতরাং মনুষ্যসন্তান যে অনন্ত মার কোলের শিশুসন্তান, ইহাই মানব-জীবনে সপ্রমাণ করিতে শ্রীকেশব-চন্দ্রের জন্ম এবং ইহাই নববিধানের প্রধান শিক্ষা।

মহাসাগরের গর্ভ হইতে যখন পূর্ণচন্দ্রোদয় হয়, তখন তাহা কি বৃহৎ, কি সুন্দর, কি স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় প্রতীয়মান হয়। অনন্ত মার গর্ভ হইতে নবশিশু মানবাত্মার জন্মও তেমনি মহত্বে ও শুদ্ধ জ্যোতিতে পূর্ণ। মানব-শিশুত্বের উচ্চভাব ও সৌন্দর্য্য নিত্যপ্রদর্শন ও প্রতিষ্ঠা করিতেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্ম। সেই বৃহচ্চন্দ্রেরই প্রতিভা যে কেশবচন্দ্রে প্রতিবিম্বিত ও প্রতিফলিত, ইহা তিনিও নিজমুখে প্রচার করিয়াছেন।

সূর্য্যের জ্যোতিঃ যেমন চন্দ্রে প্রতিবিম্বিত, তেমনি ব্রহ্ম মার জ্যোতিঃ এবং স্বরূপ মানবশিশু-চন্দ্রে প্রভাবান্বিত, ইহা উপলব্ধি করাই নবশিশুর জন্মের উদ্দেশ্য। তিনিই এ জীবনের জীবন, তিনিই জ্ঞানের জ্ঞান, তিনিই অনন্ত প্রেম, অদ্বৈত শুদ্ধতা ও আনন্দময় হইয়া জীবন বাঁচাইতে-ছেন, তাঁহাতেই আমি জীবিত। মুহূর্ত্তও আমি তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকি না। মার গর্ভস্থ শিশু যেমন, তেমনি আমি তাঁহারই সত্তায় ও শক্তিতে বাঁচি, ইহাই উপলব্ধি করা নবজন্ম।

তাই কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব সর্ব্ব মানবের এই নবশিশু-জন্ম-লাভের উৎসব। কেননা নববিধানে তিনি এই উপলব্ধি করিলেন যে, "আমি একা আমি নই, আমরা," "এই দৃশ্যমান আমির পশ্চাতে অদৃশ্য আমরা"।

অতএব সেই "আমরা" যদি আমরা হই, তবে আমরাও তাঁহার জন্মোৎসবে নবশিশু-জন্ম লাভ[illegible] মাতৃ-সন্তানত্ব জীবনে কেবল উপলব্ধি করিব না, মানব-শিশুত্বের মহিমা ও সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিব এবং তাহারই প্রভাব পরস্পরকে আদান প্রদান করিব।

যাহা একজন মানবে সম্ভাবিত হয়, তাহা সর্ব্ব মানবের জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ইহাই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া, সকল মানুষকে আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

সুতরাং আমরা তাঁহার সহিত একই মানবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইহা উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার জন্মোৎসবে আমরাও যাহাতে নবশিশু-জন্ম লাভ করিতে পারি, তাহারই জন্য আকাঙ্ক্ষিত ও প্রার্থী হই।

[illegible]র্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে, সূর্য্যের জ্যোতিই চন্দ্রে প্রতিবিম্বিত, সত্য সত্য মানবও তেমনি ঈশ্বরের প্রতি-কৃতিতে গঠিত। কিন্তু কই তাহা আমরা সর্ব্বদা স্মরণে রাখি, কই তাহা আমরা জীবনে প্রদর্শন করিতে পারি?

ঈশা এই জন্যই বলিলেন, "স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ, তেমনি পূর্ণ হও।" ইহাই মানবের নিয়তি, কিন্তু কই মানব নিজ সাধনায় বা পুরুষকারে তেমনি পূর্ণ হইতে পারিল? ব্রহ্মনন্দন ঈশা, নিজকে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া ঘোষণা করিলেন, "যে আমাকে দেখিয়াছে, সেই আমার পিতাকেও দেখিয়াছে।" অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপে তিনি গঠিত। হায়, যাঁহারা তাঁহার অনুগমন করিলেন, তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন, তাঁহারা তাঁহার আদর্শ বা দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা দূরে থাকুক, তাঁহাকেই ঈশ্বর-স্থানীয় বলিয়া বরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং তাহাই তাঁহাদের ধর্ম্মের উদ্দেশ্য করিয়া লইলেন।

এই নিমিত্তই বিশেষভাবে শ্রীঈশার বিধান পূর্ণ করিবার জন্য পবিত্রাত্মার নববিধান অবতীর্ণ এবং পবিত্রাত্মা স্বয়ং মা হইয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে তাঁর নবশিশুরূপে জন্মদান করিলেন। তিনি সাধন ও আচরণ দ্বারা জীবনে নব-বিধানকে প্রদর্শন করিয়া, জীবনে নববিধানকে মূর্ত্তিমান করিয়া, নববিধানের আচার্য্য ও প্রবর্ত্তকরূপে সকলের গুরুস্থানীয় হইলেন এবং সকল মানবকে আপনার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে গ্রহণ করিয়া একই মার সন্তান সকল-কার অগ্রজ সমবিশ্বাসী সমযোগী ভাই হইলেন।

অতএব আমরাও তাঁহার সহিত একাত্মতা অবলম্বনে নব জন্মোৎসব-সাধনে মাতৃসন্তান হইয়া, মা যেমন, তাঁর ছেলে মেয়ে আমরাও তেমনি হইব এবং মার স্বরূপ ও চরিত্র আমাদের হইবে।

শিশু নিজ চেষ্টায় বা নিজ পুরুষকারবলে শিশু হয় না। মাই তাঁহাকে জন্মদান করেন, এবং মায়ের মুখ, মায়ের রং, মায়ের স্বভাব মার কৃপা-গুণেই সন্তানে প্রতিফলিত হয়।

শ্রীকেশব যে নববিধানের নবশিশু হইয়াছেন, তাহা মার কৃপাতেই হইয়াছেন। তেমনি আমরাও তাঁহার সহিত সম ভক্ত হইলে তাহাই হইব। এই নবশিশুর জন্মোৎসবে যেন এবার সত্যই তাহা হয়। কেবল বাহ্য আড়ম্বরের জন্মোৎসবে যেন আর আমরা না ভুলি। বৈষ্ণব-সেনার ছবিতে যেমন বিষ্ণুর মুখ সর্ব্বমুখে অঙ্কিত হয় দেখি, তেমনি যেন সকলে আমরা এক নববিধান-মূর্ত্তি-কেশব হইয়া নবশিশুদল হইয়া যাই।

শ্রীকেশবচন্দ্র তাঁর শেষ জন্মদিনের প্রার্থনায় বলিলেন, "আজ ইঁহাদের জীবনের পরিবর্ত্তনের দিন।" যেন বাস্তবিকই তাঁহার জন্মদিন আমাদের জীবনের পরিবর্ত্তনের দিন হয়। তিনি যে আপনাকে নববিধানের আচার্য্য বা গুরু বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন, তাহা এই জন্য যে, তাঁহার সহিত আমরা একাত্মা হইয়া পরস্পরকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিয়া, একই নববিধান-জীবন লাভ করিব এবং পূর্ণ বিশ্বাস মাকে, মার বিধানকে, মার প্রত্যাদেশকে ও মার ভক্তকে দিয়া স্বর্গের উপযুক্ত হইব। তাহাই যেন এবার তাঁহার জন্মোৎসব-সাধনের সুফল হয়।

শ্রীকেশবচন্দ্র-গ্রহণ

এক ব্রহ্মকে লাভ করিতে বা সাধনা করিতে গিয়া জগতে শত শত সম্প্রদায় হইয়াছে, ভক্তদিগকে গ্রহণ করিতে বা এক এক ভক্তের অনুসরণ করিতে গিয়াও বহু সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম-বিধান সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা বিনাশ করিতেই আসিয়াছেন। কিন্তু এ বিধানের আশ্রয়ে আসিয়া আমাদেরও মধ্যে যদি ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ভক্তগ্রহণ সম্বন্ধে মতভেদ বা বিশ্বাসভেদ উপস্থিত হয়, নিতান্তই সাংঘাতিক অপরাধ হইবে। অতএব এ বিষয়ে প্রার্থনা ও ভগবৎ-প্রেরণা-যোগে, যাহাতে আচার্য্যের উক্তি ও উপদেশাদি অধ্যয়ন পূর্ব্বক আমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করা উচিত।

ভক্ত রামকৃষ্ণ সরলভাবে বলিলেন, "কেশব, যাই আমি তোমার কাছে আসি, অমনি আমার চৌদ্দ পো মা গলে যায়," অর্থাৎ দেবীমূর্ত্তি আর মৃন্ময়ী থাকে না, চিন্ময়ী হইয়া যায়। তেমনি কি নববিধান সম্বন্ধে, কি কেশবগ্রহণ সম্বন্ধে, কি নববিধানের মা সম্বন্ধে, যদি সত্যই ঐকান্তিক সরল প্রাণে আমরাও শ্রীকেশবসঙ্গ করি, আমাদের সকল কল্পিত মতই চলিয়া যায় এবং তাঁহার মাকে, তাঁকে এবং নববিধানকে যে ভাবে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, বিশ্বাস করিয়াছেন, উপলব্ধি করিয়াছেন, আমরাও সেইভাবে তাঁহার মনোগত দৃষ্টিতে দেখিব, আর আমাদের ভুলভ্রান্তি হইবার আশঙ্কা বা সম্ভাবনা থাকিবে না।

তাই আচার্য্যগ্রহণ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের কিছু কিছু উক্তি আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। এই উক্তিগুলি ভক্তিযোগে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহাকে যেভাবে গ্রহণ করা সমুচিত, তাহাই যেন আমরা করিতে পারি, তাহাতে যেন আমরা ভয় না পাই, কিম্বা লোকের তুষ্টি সম্পাদন করিতে এদিক ওদিক না করি। পবিত্রাত্মা আমাদের সহায় ও পরিচালক হউন:—

"আমি ঠিক বলি, আমার মা সত্য।"

"পুরাতন মাকে যাঁরা এনেচেন, ফেলে দিয়ে আমার লাবণ্যময়ী মাকে নিয়ে যান। এই যে আসল মা, যাঁকে আমি মা বলেছি; ভারত, তুমি তাঁকে লও।"—"জীবন্ত প্রমাণ,"

"ভাইরে, আমার মা বড্ড ভাল রে,বড্ড ভাল, মাকে তোরা চিনলি-নে। এই মা আমার সর্ব্বস্ব। মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রী সৌন্দর্য্য, মা আমার ইহলোক পরলোক, মা আমার সম্পদ সুস্থতা। বিষম রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দ-সুধা। এই আনন্দ-ময়ী মাকে নিয়ে, ভাইগণ, তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিও না।"—"নবদেবালয়-প্রতিষ্ঠা।"

"আমার কাছে বসিয়া বন্ধুরা এক মাকে ডাকিলে, এক মার মত দেখিলে সব মধুময় হইবে।" "আমি আমার ঈশ্বরকে দেখিয়াছি ও তাঁহার বাণী শুনিয়াছি এবং তাঁহাতেই আমি পরম আনন্দিত।"—"আদর্শ চরিত্র।"

"আমি বাণী শুনিয়া বলি, বানিয়া বলি না।"

"বড় সচ্চিদানন্দ, আর ছোট সচ্চিদানন্দ, আর কিছু আমি নই। চিন্ময় বস্তু আমি। এই যে নর-প্রকৃতি-বিশিষ্ট নবকুমার, যাহার নাম শ্রীঅদ্ভুত, যিনি ইহার পিতামাতা কর্ত্তৃক প্রশংসিত, স্বর্গ-কর্ত্তৃক আদৃত, এই আত্মাই আমি।"

"এই লোকটার প্রত্যেক ইঞ্চ সত্য, ভয়ঙ্কর সত্য।"

"আমার 'আমি পাখী' এই মন্দির হইতে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, আর সে ফিরিবে না।"

"আমি একজন অসাধারণ মানুষ, আমি অন্য লোকের মত নই।"

"সমস্ত মানব আমাতে, আমি তোমাতে।"

"আমি ও আমার ভাই এক। আমরা একজন।"

"একজন লোকে কয়জন লোক মিলিত হইয়া যাইবে এবং তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিবে এবং সমুদায় মিলিয়া তোমাতে বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই নববিধানের তাৎপর্য্য। যেখানে দশজন শতজন তোমাতে এক হইবে,সেখানে একটা অবলম্বন চাই। আমরা তাহা মানিলাম না বলিয়া মিলন হইল না। ভিন্নতা, স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা, 'আমি' 'আমি' যেখানে, সেখানে আমার বাপ নাই, আমি সে 'আমি' ভূতের রাজ্যে থাকিতে চাই না।"—"একাত্মতা।"

"জল মাছের আধার। সেই জলে আদত মাছ রেখে সবশুদ্ধ মাছটা নিয়ে যাও। জল থেকে মাছ আলাদা করিও না। বুদ্ধি খাঁড়া দিয়ে মাছ কেটো না। মিছামিছি একটা কেশব খাড়া করিও না। একটা দৃষ্টান্ত বুকের ভিতর নিয়ে যাও। জীবনশুদ্ধ যেন ভাইদের ভিতর মিশি। সব ভাই এক হয়ে, শেষে এক মাছ হয়ে, ভক্তির সাগরে, আনন্দের সাগরে, ব্রহ্মের সাগরে ভাসিয়া বেড়াইব, আমরা সকলে এক হয়ে, এক মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়ে, বিধান-সাগরে ভাসিতে থাকি।"—"আচার্য্য-গ্রহণ।"

"আমরা কি প্রমাণ দেখিয়াছি যে, একজন কেউ আমাদের মধ্যে ঈশা গৌরাঙ্গের মত হয়েছে? দোহাই হরি, মানুষ দেখাও। গরিব

বলিতে চায় যে, ঈশা মুশার বিধানের সঙ্গে এ বিধান মিলেছে, যদিও স্বতন্ত্রতা আছে। আমিত সিদ্ধ হইয়া জন্মি নাই। আমি অবিশ্বাসী পাপী অপ্রেমিক ছিলাম। পরিবর্ত্তিত পাপী এই বিধানে কেবল দেখা যায়. অন্য বিধানেতো তা হয় নাই। প্রেমভক্তি ছিল না, ভক্তদের জানিত না, ক্রমে সে নববিধানের প্রসাদে পরিবর্ত্তিত জীবন পাইল। আমার জীবনে যেমন নববিধানের বিরোধ ছিল, এমন আর কার জীবনে আছে? আমার জীবনের পরিবর্ত্তন সকলের পক্ষে আশাপ্রদ। আমি নিশ্চয় বল'ছ, আমার জীবন দেখ, বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে। নারকী উদ্ধার হতে পারে, এ যদি দেখিতে চাও, তবে, ভাই, এই বন্ধুকে লও, সঙ্গে রাখ। একটা কাল ছেলে সুন্দর হয়েছে, একটা ছেলে তোমার কাছে দৌড়ে যাচ্ছে, এই আশার কথা।"—"আত্মপরিচয়-দান।"

"যেন বন্ধুদের মনে থাকে, একটা আসল কথা একজনের কাছে শিখেছিল, যা মান সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা ধর্ম্ম শান্তি সংসারের সব সুখের মূল। সে এক সময় ছেলে হয়ে কাছে এয়েছে, মা হয়ে কাছে এয়েছে, বিপদের সময় বন্ধু হয়েছে। সে যে প্রাণ দিয়েছে সকলের জন্য, সেই লোকটা আমি।"—"বিধানের মানুষে বিশ্বাস।"

"কি কি দোষ করিলে ধর্ম্মের মূলে কুঠার মারা হয়? নরক কোন পাপে? আমরা যদি গোড়া না মানি, যেখান থেকে ধর্ম্মের কথা আসছে, তাতে যদি বিশ্বাস না রাখি। এইখানকার মত যদি পূর্ণতার সহিত না লইয়া তাহাতে নিজের বুদ্ধির মত মিশাইলাম, তাহলে ভয়ানক নরকের পথ পরিষ্কার করা হইল। পরিত্রাণের বীজমন্ত্র কেহ বাদ দিয়া লইবে না, মিশাইয়া লইবে না, ছোট করে লইবে না, ষোল আনা গ্রহণ করিতেই হইবে। এতো বড় অহঙ্কারের কথা যে, আমার কথা গ্রহণ না করিলে তাহার পরিত্রাণ হইবে না? কিন্তু এরূপ অহঙ্কারের কথা সোনার অক্ষরে লেখা থাকে।"—"বিধান-প্রবর্ত্তকে বিশ্বাস।"

"গোড়ার নক্সা যে আমার। গোড়াটা ঠিক থাকা চাই যে। কাপড়ে রিপু করিতে, তালি দিতে আমি আসি নাই। আমি যে একখানা নূতন কাপড়ের আগা গোড়া করিতে আসিয়াছি।"—"অমিশ্র-বিধান-গ্রহণ।"

"আমার মত মানুষ আমার কাছে আসিল না বলিয়া আমি পারিলাম না এবার। আমি যতদিন আমার মত পাপী না পাই, আমার কাজ করা হইবে না।"—"উপযুক্ত দল।"

"নববিধানের গঠনের সময় এঁরা অপারক হইলেন, ব্রাহ্মসমাজ গঠনের সময় ইঁহারা খুব পারিতেন। তবে আর আমি কি করিব? আমি একলা মিস্ত্রী হইব, কামার হইব, ছুতার হইব, একলা সুরকি মাথায় করিয়া আনিব, তোমার মন্দির নিশ্চয় প্রস্তুত করিব। ৪০ হাজার বৎসর পরে হউক, কিন্তু হইবেই। এ গরিব লোক-গুলির কি হইবে বল? ইহাদের ভিতর ঈশা মুষার রক্ত আছেই। মনে করিলে এখনই অলৌকিক কার্য্য করিতে পারে। তবে পারিনা বলিলে আর কি হইবে?"—"আমার দলের লোক।"

"দশজন প্রচারকের হাতে দশ নববিধান হইল। খাঁটী পরিত্রাণের ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচার করিতে হইবে। এ যা ছিল, অনন্ত কাল তাই থাকিবে। কেহ বদলাইতে পারিবে না। তোমার বিধানের বিধি ষোল আনা খাঁটী থাকিবে। যা তোমার বিধি, তা আমার বিধি। আমার কোন ভাই কি ভগিনী তোমার এক-টুকরা সত্য যেন বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা না করেন, কমিয়ে দেবার চেষ্টা না করেন।"—"অখণ্ড নববিধান।"

"ভগবান্, তুমি আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ? আমার এতদিনকার কৌশল মিথ্যা হলো, আমি এতদিনে এই ঘরের দুটা লোককেও এক করিতে পারিলাম না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এঁরা যদি তোমায় ডেকে ভাল হতেন, পৃথিবীতে প্রমাণ হয়ে যেতো, আর গুরুর দরকার নাই। আবার গুরু হতে চল্লাম। কি ভাবে গুরু হব? আমার কথা এখন যার খুসি যেটা ইচ্ছা নিচ্ছেন, যেটা ইচ্ছা ফেলে দিচ্ছেন। আমি যেন গারব, বাণের জলে ভেসে এসেছি। কেবল যেন দুটো কথা এঁদের শেখাতে এসেছি। তা করিলে ত হইবে না। যদি মানতে হয়, ষোল আনা মানিতে হইবে। নব-বিধান সম্পূর্ণ লইতে হইবে। তা এতে একজন থাকুন, দেড়জন থাকুন। জগদীশ! এ কয়টী লোককে স্বেচ্ছাচার হইতে বাঁচাও। আজ এঁদের জীবনের পরিবর্ত্তনের দিন। আজ সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, নববিধানের ধর্ম্ম। অন্য গুরুলাভ। অন্য ধর্ম্মের গুরুর মত নহে, নববিধানের গুরু। এক শরীরের সকলে অঙ্গ এই বিশ্বাস। আমাকে সেবা করিতে হবে না এঁদের। মা আজ বলছেন, 'যে আমার ভক্তকে ষোল আনা বিশ্বাস দেবে, সেই আসুক, আর কেহ নয়।' এ আগেকার গুরু আচার্য্য নয়। এ ভাই বলে পরস্পরকে খুব ভালবাসা দেওয়া, কোলাকুলি করা, বিশ্বাস দেওয়া। প্রাণেশ্বর, এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকলে এই ষোল আনা বিধি পালন করিয়া, ষোল আনা বিশ্বাস তোমাকে, তোমার বিধানকে, তোমার প্রত্যাদেশকে, তোমার ভক্তকে দিয়া স্বর্গের উপযুক্ত হইতে পারি।"—"জন্মদিন উপলক্ষে।"

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নবশিশু।

এই মানবজীবনের পাঁচটী অবস্থা (১) শিশু, (২) বালক, (৩) যুবা, (৪) প্রৌঢ়, (৫) বৃদ্ধ। এই সকল অবস্থাতেই যিনি শিশুর ন্যায় নিতান্ত সরল, শুদ্ধ, মাতৃক্রোড়াশ্রিত, মাতৃনির্ভর, মার স্তন্যপায়ী এবং মা-সর্ব্বস্ব, তিনিই নবশিশু।

——

নববিধানের উদারতা।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলেন, যখনই যে জল পান কর, ঝরণা, নদী, পুষ্করিণী বা কূপের জল, সকল জলই অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া পান করিবে; তাহা হইলে জলের যাহা কিছু দোষ, সকলই দূর হইবে।

নববিধান-বিজ্ঞান বলে, আকাশের বারির ন্যায় সকল ধর্ম্ম-বিধানই স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ; কিন্তু আধারের ভিন্নতা অনুসারে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। ব্রহ্মাগ্নি-সংযোগে উত্তপ্ত করিয়া শোধিত করিয়া লইলে, সকল ধর্ম্মের সকল সাধন ও অনুষ্ঠানই এই নববিধানে আদৃত ও জীবনপ্রদ।

জন্মদিনের প্রার্থনা।

আচার্য্য প্রার্থনা করিলেন :—"জীবনের নৌকায় চড়িয়া আনন্দ-সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতেছি। যাইতেছি সেই স্থানে, যেখানে অশরীরী আত্মা তোমার সঙ্গে মিশিবে। বয়সের ঘড়ি বেজে গেল, জন্মোৎসব স্মরণ করিয়া দিতেছে যে, 'তোমার শরীর আছে, থাকিবে না, তুমি যোগী ঋষি। ঋষি আশ্রম যেখানে, সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। আয়ুর্বৃদ্ধিকে স্বর্গীয় পরমান্ন-ভোজনের জন্য প্রস্তুত হবার দিন মনে কর।' বর্ষ হইতে বর্ষান্তরে, লোক হইতে লোকান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে চলিলাম। এক জন্ম শেষ হইল, আর এক জন্মে চলিলাম। এসকল কথা শরীর সম্বন্ধে নয়, আমরা নববিধানের রথে চড়িয়া সুখের রাজ্যের দিকে, অনন্ত পুণ্যধামের দিকে, স্বর্গের দিকে চলিয়া যাইতেছি। এই বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে শরীরবিহীন হইয়া যাই। আমরা এই জীবন থাকিতে থাকিতে এমন জীবন সঞ্চয় করি, যে জীবনের ক্ষয় নাই। যারা অমর, তারা আর মৃত্যুর দিন গণনা করে না। স্বর্গ তাদের চক্ষে, স্বর্গ তাদের বক্ষে, স্বর্গ তাদের হৃদয়ে। হরি, তুমি আমার বয়স, তুমি আমার বাল্য, তুমি আমার যৌবন, তুমি আমার বার্দ্ধক্য। তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল। তুমি আমার বয়সের সাগর, আমার মৃত্যু নাই।" এইরূপ যেন আমরাও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অশরীরী আত্মা হইয়া মাতৃবক্ষে বাস করিতে পারি।

—•—

কীর্ত্তন।

["চল চল ভাই মার কাছে যাই"—সুর]

(এস) মা মা বলি ভাই, মার গুণ গাই,
পূজি মার চরণ নব জীবন পাই।
নব শিশু সনে, মিলে প্রাণে প্রাণে,
মার স্তন্যপানে জীবন জুড়াই।
"আমি আছি" "আমি আছি" বলেন জননী,
জ্ঞান আঁখি মিলে মাকে এস দেখি শুনি;
(আর ভুলবো না রে—মোহ ঘুম ঘোরে মজে)
এই যে অনন্তরূপিণী, স্নেহ-স্বরূপিণী,
মা বই মোদের আর কেহ নাই। (এক মা বই)
কিবা মায়ের পুণ্য রূপ—
দরশে যায় পাপ তাপ,
(আর ভাবনা কি রে)
(হেরি) ভকত-জননী, আনন্দ-রূপিণী,
ব্রহ্মানন্দে চির মগ্ন হয়ে যাই।

—•—

বিশ্বপরিবারের কেশব।

জন্মোৎসব পারিবারিক ব্যাপার। প্রিয়জন প্রিয়জনের জন্মোৎসব করেন। কেশবচন্দ্র কোন পরিবারের লোক? তিনি রক্তমাংসের পরিবারে আবদ্ধ ছিলেন না। এক ঈশ্বর ইহকালস্থ পরকালস্থ সকলের পিতামাতা, ইহকালস্থ পরকালস্থ সকলে এক পিতামাতার সন্তান বলিয়া পরস্পর পরস্পরের ভাই ভগ্নী। ইহকালস্থ পরকালস্থ সকলে মিলিয়া এক অখণ্ড পরিবার। এই অখণ্ড পরিবার-সাধন কেশবের জীবনের সাধনা ও উচ্চ সিদ্ধির বিষয় ছিল। পূর্ব্ব দেশ ও পশ্চিম দেশ, এসিয়া ও ইয়ুরোপ পরম পিতার অখণ্ড গৃহের দুইটী খণ্ড ও অংশ বলিয়াই তিনি বিশ্বাস এবং ধারণা করিতেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশকে এক পবিত্র ভ্রাতৃ-বন্ধনে সম্বদ্ধ করা তাঁহার জীবনব্যাপী লক্ষ্য ছিল। তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধন লক্ষ্য করিয়া এ সম্বন্ধ স্থাপনে অগ্রসর হন নাই; স্বর্গীয় পিতার বৃহৎ পরিবারের পরিচয় দান, সেই বৃহৎ প্রেম-পরিবারের পবিত্র সম্পর্ক পরস্পর মধ্যে স্থাপন, তাঁহার সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল। এইরূপ আমেরিকা, আফ্রিকার সঙ্গেও সম্পর্ক-স্থাপনে তিনি কৃত-সঙ্কল্প ছিলেন। শু'নয়াছি, আপনার বুকের উপর গোলাকার ভূখণ্ডের চিত্র, এবং সময় সময় উপাসনা-কালে সম্মুখে পৃথিবীর চিত্র স্থাপন করিয়া সাধন করিতেন। তাঁহার গূঢ় সাধনের মর্ম্ম নিম্নলিখিত সঙ্গীতের অংশ গুলি প্রকাশ করে। "কর দেব যোগে লয়, তন্ময় আমারে হে এবার,—সুরনর সনে প্রেমে একাকার। * * * তুমি আমি নরজাতি, সবে এক প্রেমে মাতি, ধরিব অখণ্ড চিদাকার; দাও সবে এক প্রাণ, এক ধর্ম্ম এক জ্ঞান, গাই তব এক নাম, হয়ে এক পরিবার।" "আমরা তাঁহারি, সব নরনারী, কেহ নহে কারো পর; এক ব্রহ্মরূপ, হৃদয়ে হৃদয়ে, জ্বলিতেছে নিরন্তর।" "এ বিশাল সংসার, তব প্রিয় পরিবার, নরনারী যত প্রকাশে মহিমা তোমার" ইত্যাদি। তাঁহার প্রার্থনায় এই কথা গুলি আছে—"এদের বুঝিতে দেও যে, এখানে কেহ আমি আমার হইতে পারে না, সব এক। এক ঈশ্বর উপরে, এক সন্তান নীচে। কৃপা করিয়া এই দৃশ্যটী কিছুদিন দেখাও। পাঁচটা মানুষ যেন না দেখি। এক উপরে, এক নীচে। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া ছিলেন উপরে, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' নববিধান বলিতেছেন পৃথিবীতে। সমুদয় মনুষ্য-সমাজ এক।"

ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের জীবন-ব্যাপী সাধনার প্রধানতঃ তিনটী স্তর। প্রথম, ঈশ্বরের সঙ্গে স্বরূপতঃ একতা-সাধন দ্বারা পূর্ণতম পুত্রত্ব-লাভ। দ্বিতীয়, ঈশা, চৈতন্য প্রভৃতি সাধু মহাজনদিগের দেব চরিত্র গ্রহণ দ্বারা তাঁহাদের সঙ্গে একতা-লাভ এবং

এই বিভিন্ন-প্রকৃতির সাধু মহাজনদিগের দেব দিক্ গ্রহণ করিয়া, যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্মের একত্র সমাধানে, মহাসমন্বয় ধর্ম্ম জীবনে ও মণ্ডলীতে সাধন ও প্রতিষ্ঠা। তৃতীয়, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণ লোক-মণ্ডলীর দেবাংশ দিব্য চক্ষে দর্শন করিয়া, তাঁহাদের জন্মগত দেবত্ব ও ভাবী জীবনের শ্রেষ্ঠতম দেবত্ব স্বীকার করিয়া, সকলের সঙ্গে অভেদ মাত্মিক মিলন-সাধন ও সেই মিলন-প্রতিষ্ঠা।

তিনি স্বদেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, বাহিরে একজন হয়ত কাল, একজন হয়ত সাদা, একজন হয়ত ভারতের, আর একজন হয়ত বিলাতের কি এমেরিকার, একজন হয়ত বাহিরে আচার ব্যবহারে হিন্দু, একজন হয়ত মুসলমান কি ইংরেজ, একজন হয়ত ধনী, একজন হয়ত গরিব। এসব ভিন্নতা সম্পূর্ণ বাহিরের জিনিষ। আত্মিক ভাবে সকলে এক-জাতীয়। আত্মিক সাধনা দ্বারা সকলের মধ্যে যত একত্ব, যত মিলন প্রতিষ্ঠিত হইবে, বাহিরের এ সকল দেশগত অবস্থাগত ভিন্নতা থাকিলেও, বাহিরের এ সকল ভিন্নতার গুরুত্ব আর থাকিবে না। আত্মিক মিলনের মহিমা ও গৌরবে আকৃষ্ট হইয়া সকলে আত্মিক মিলনই পূর্ণভাবে সাধন করিবে, আত্মিক মিলনের নিত্যতা, মধুরতা, গুরুত্ব ও গৌরব প্রত্যক্ষ করিয়া, স্বাদ গ্রহণ করিয়া, এই মিলনকেই পৃথিবীতে সুখ, শান্তি, আনন্দের একমাত্র উপায় বলিয়া জানিবে। এই মিলন-প্রতিষ্ঠাই পৃথিবীতে স্বর্গ-রাজ্য-প্রতিষ্ঠা জানিয়া, এই মিলনই ইহলোকের ও পরলোকের উচ্চ পরিণতি জানিয়া, এই মিলনেই সকলে পরম পিতা মাতা পরমেশ্বরের গৃহে এক প্রেম-পরিবার হইয়া বাস করিবে। কেশবচন্দ্রের জীবনের উচ্চ সাধনার এই উচ্চ পরিণতি। এ পরিবার সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক।

তাই নববিধানের দীক্ষার্থীর নিকট প্রশ্ন করা হয়—তোমার মণ্ডলী কি? দীক্ষার্থী উত্তর দেন—সেই অদৃশ্য মণ্ডলী, যে মণ্ডলীতে পূর্ণ সত্য, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ পুণ্য, পূর্ণানন্দ, পূর্ণশক্তি ইত্যাদি। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, নববিধানের দীক্ষার্থী দৃশ্য লোকের একজন হইয়া, দৃশ্য মণ্ডলীতে দৃশ্যতঃ প্রবেশ করিতে যাইয়া, নববিধানের শিক্ষাধীনে অদৃশ্য মণ্ডলীকেই স্বীকার করিলেন, ভাবতঃ অদৃশ্য মণ্ডলীতেই, অদৃশ্য পরিবারেই প্রবেশ করিলেন।

তাই বলিতেছি, কেশবচন্দ্রের সাধন-লব্ধ, কেশবচন্দ্রের স্বীকৃত সত্য পরিবার এক অখণ্ড পরিবার। দৃশ্য, অদৃশ্য সকল লইয়া এক পরিবার। এই অখণ্ড পরিবারের লোক কেশবচন্দ্র। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব তবে কোথায় হইবে? এই অখণ্ড পরিবারে। আমরা এখন নববিধান-বিশ্বাসী মুষ্টিমেয় লোক মিলিয়া তাঁহার জন্মোৎসবে প্রবৃত্ত। আমরা যদি তাঁহার স্বীকৃত পরিবারের সকলের সঙ্গে ভাব-যোগে অন্ততঃ মিলিত হইয়া তাঁহার জন্মোৎসব না করি, তবে কি আমাদের প্রাণে তাঁহার জন্মোৎসবের একটা পূর্ণতর আদর্শ উদ্ভাসিত হইতে পারে? আমরা কি তাহা হইলে দূর, নিকট, জানিত, অজানিত, সকলের সঙ্গে ভাব-যোগে মিলিত হইয়া আমাদের পূর্ণ প্রাণে, পূর্ণ হৃদয়ে, হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে তাঁহার জন্মোৎসব করিতে পারি? অথবা কেশবই তাঁহার পূর্ণ প্রাণ লইয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া এই উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিতে পারেন? যেখানে সকল পরিবার এক মহাপরিবারে মিলিত, সেখানেই যখন তাঁহার প্রাণের পূর্ণ সাড়া, সেখানেই যখন তাঁহার হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাস, সেখানেই যখন তাঁহার উচ্চ তৃপ্তি, তখন কি তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম মহা-পরিবারের সঙ্গে আমাদিগকে মিলিত হইয়া উৎসব করিতে না দেখিলে, তাঁহার প্রাণে তাঁহার জন্মোৎসবের বিমলানন্দ সম্ভোগ সম্ভবে? তাই বাহ্যতঃ আমরা সকলের সঙ্গে মিলিত হইতে না পারিলেও, ভাব-যোগে সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহার জন্মোৎসব করিব। সময় আসিবে, যখন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টীয়ান, স্বদেশস্থ বিদেশস্থ সকলে, তাঁহাকে তাঁহাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতম একজন জানিয়া, তাঁহাদের পরিবারের ঈশ্বর-প্রেরিত বিশেষ মহাপুরুষ জানিয়া, প্রিয়তম ভাই জানিয়া, কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব কোন না কোন আকারে করিবে, অথবা যাঁহারা করিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে পূর্ণ সহানুভূতির সহিত যোগদান করিবে। সত্যই কেশবচন্দ্র বিশ্বের অখণ্ড পরিবারের প্রিয় সন্তান, তাঁহার যথার্থ জন্মোৎসব সেই অখণ্ড পরিবার মধ্যে এবং সেই অখণ্ড পরিবার লইয়া।

কেশবচন্দ্র অপরিহার্য্য সত্য।

আজ দেখিতে দেখিতে কেশবচন্দ্রের জন্মদিনের উন-নব্বই বৎসর অতীত হইতে চলিল। এই দীর্ঘকালের ঘটনাপুঞ্জ কেমন সংবদ্ধ; একটী আর একটীকে অবলম্বন করিয়া পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। কোন ঘটনাই আকস্মিক নহে। অনন্তকাল-সাগরে একটীর পর আর একটী তরঙ্গের মত ঘটনাগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে। নব-বিধানের নূতন সাধনা যুগযুগান্তরের ক্রমবিকাশের ফল। প্রথম শতাব্দী নিজ সাধনা, সত্য, ধর্ম্ম ও নীতি দ্বিতীয় শতাব্দীকে দিয়া চলিয়া গেল; দ্বিতীয় শতাব্দীর শোণিত লইয়া তৃতীয় শতাব্দী আপনাকে পুষ্ট করিল; তৃতীয় শতাব্দীর গর্ভ হইতে চতুর্থ শতাব্দী জন্ম গ্রহণ করিল। এইরূপে এক শতাব্দীর সত্য, জ্ঞান, ধর্ম্ম, সাধনা, সাহিত্য ও শিক্ষা লইয়া পরবর্ত্তী শতাব্দী আত্মপ্রকাশ করিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ছুটিয়াছে, অনন্তের দিকে অবি-রাম গতিতে অগ্রসর হইতেছে। হে মানব! তুমি কি এই কালকে বিচ্ছিন্ন করিতে পার? তুমি কি এক শতাব্দীকে অন্য শতাব্দী হইতে পৃথক করিয়া ভাবিতে পার? তুমি কি ইহার ঘটনাপুঞ্জকে অসংবদ্ধভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পার? না, তাহা পার না। এই কাল বা ঘটনা অনন্তের প্রবাহ লইয়া ছুটিয়াছে,

ইহাকে পৃথক করা যায় না। তবে তুমি তোমার সুবিধার জন্য কালের নামকরণ করিতে পার। বার, মাস, তিথি, ঋতু, বৎসর, যুগ, কল্প বা মহাকল্প নামে অভিহিত করিতে পার। কিন্তু ইহারা সেই অনন্ত কালেরই অখণ্ড অঙ্গ, ইহাকে খণ্ড করিতে পার না। সমুদ্রের জলরাশিকে যেমন ভাগ করা যায় না, তবে তোমার সুবিধার জন্য ইহার নামকরণ করিয়াছ, যেমন ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর, প্রশান্ত মহাসাগর নাম দিয়াছ; কালও সেইরূপ অখণ্ড। অনন্তকালের বক্ষে ঘটনাপুঞ্জ উত্থিত হইতেছে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের ক্রমবিকাশ এবং এক অখণ্ডসূত্রে গ্রথিত। প্রত্যেক সত্য, প্রত্যেক ধর্ম্ম, প্রত্যেক বিজ্ঞান এই অখণ্ডের সূত্র ধরিয়া বিধাতার অনন্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছে, অনন্তের মহিমা গান করিতেছে। প্রত্যেক সত্যই মানবকে আশ্রয় করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছে, মানব-অন্তরে প্রতিভাত হইয়াছে। যেমন কালকে, ঘটনাপুঞ্জকে ও সত্যকে—একটী হইতে অন্যকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না, সেইরূপ যে মানব অন্তরকে আশ্রয় করিয়া সত্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেই অন্তরকে, সেই আধারকেও আমরা বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। মানবাত্মাও এক অখণ্ড সূত্র ধরিয়া অনন্তের সংবাদ বহন করিতেছে। যেমন একই অখণ্ড জলরাশিকে আমরা তাহার পৃথক পৃথক ভাব, বা তাহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দেখিয়া কাহাকে লোহিত সাগর, কাহাকে প্রশান্ত মহাসাগর নাম দিয়াছি, সেইরূপ এক একটী মহাপুরুষকে এক একটী সত্যের প্রকাশক বা প্রবর্ত্তক বলিয়া এক একটী আখ্যা প্রদান করিয়াছি। বস্তুতঃ তাঁহারা একই অখণ্ড সত্যের খণ্ড প্রকাশ মাত্র। আমরা এখানে যদি ব্যক্তি ছাড়িয়া বস্তুর কথা ভাবি, যদি একই অখণ্ড সত্যের খণ্ডভাব রূপে প্রত্যেক মহাপুরুষকে চিন্তা করি, তাহা হইলে দেখিব যে, তাঁহারা পরস্পর সংবদ্ধ, একের ভাব লইয়া অন্যে পুষ্ট হইয়াছেন, একের ভিতরে অন্য জন্মলাভ করিয়াছেন, এক অন্যের ক্রমবিকাশ রূপে পরিস্ফুট হইয়াছেন, এক অন্যের পূর্ণতারূপে আত্মবিকাশ লাভ করিয়াছেন।

কেশবচন্দ্র কে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, প্রথম ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা আমাদের বিষয়টী বুঝিবার পক্ষে সুগম হইবে না। কেশবচন্দ্র একটী সত্য, অথবা একটী ভাব; এই সত্য বা ভাব কোথা হইতে আসিল? সমস্ত প্রাচীন সত্য শতাব্দীর পর শতাব্দীর মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশের ধারা বহিয়া যেমন নূতন আকার গ্রহণ করে এবং তাহাদিগের মধ্যে যেমন পূর্ব্বাপর যোগ দেখা যায়, সেইরূপ কেশবচন্দ্রও পূর্ব্বাপর যোগের মধ্য দিয়া সকল প্রাচীন জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সত্যকে বক্ষে লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দী যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী সকল প্রাচীন শতাব্দীর পূর্ণতারূপে আমাদের নিকট আসিয়াছে, সেইরূপ কেশবচন্দ্রও প্রাচীন মহাপুরুষদিগের সাধনা, সত্য ও ধর্ম্মের পূর্ণতারূপে আত্মবিকাশ লাভ করিয়াছেন। ভৌতিক জগতের বা সৌরমণ্ডলের একটী বিধিকে উল্লঙ্ঘন করিলে যেমন প্রলয়ের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ ধর্ম্মজগতেরও কোন সত্যকে অস্বীকার করিলে নূতন সৃষ্টি অসম্ভব হয়। কেশবচন্দ্রকে বিশ্লেষণ কর, দেখিতে পাইবে, সক্রেটিসের আত্মজ্ঞান বিরাজ করিতেছে, ঋষিদিগের যোগ, ঈশার পুত্রত্ব ও শ্রীচৈতন্যের ভক্তি তাঁহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে; অথচ তিনি ঈশাও নন, সক্রেটিসও নন, অথবা চৈতন্যও নন, তিনি এই সকল সত্যের সমন্বয়ে একটী নূতন সত্যের বিকাশ মাত্র। তিনি বিধাতার হস্তের নূতন সৃষ্টি বা নূতন বিধান।

তিনি একটী জ্বলন্ত সত্য। সত্যের দিক দিয়া, বা ভাবের দিক দিয়া, বা বস্তুর দিক দিয়া তিনি চিরদিন অপরিহার্য্য, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। দুই এক কথায় আমরা তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তিনি যে ব্যক্তি ছিলেন, সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। যেখানে বিশিষ্টতা আছে, সেইখানেই ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে। বিশিষ্টতা ব্যক্তিত্বের প্রাণ। কেশবচন্দ্রের ভিতর কি বিশিষ্টতা ছিল, যাহা অন্য হইতে স্বতন্ত্র? যে বিশিষ্টতা হইতে পৃথিবীতে তাঁহার ব্যক্তিত্বের স্থান হইতে পারে? তিনি জীবনের উষাকালে এক অলক্ষিত হস্তের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইলেন। ব্রহ্মবাণী তাঁহার জীবনের পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সকল দিক অধিকার করিয়া বসিল। বাণীই তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে শিখাইল। প্রার্থনাকে সম্বল করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রত্যাদেশের আলোকে এক অভিনব যোগরাজ্য দর্শন করিলেন। তিনি স্বর্গের আলোকে বিবদমান সকল ধর্ম্মবিধানকে এক অখণ্ড ধর্ম্মবিধানের পূর্ব্বোত্তর বিকাশরূপে প্রতিপন্ন করিলেন এবং প্রাচীন ও নবীন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে এক পূর্ব্বাপর যোগের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং একই জীবনে সকল সাধু ও মহাপুরুষদিগের সমন্বয় যে সম্ভব, তাহা নিজ জীবনে প্রতিপন্ন করিলেন। যে আলোক তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে শিখাইল, সেই আলোকই তাঁহাকে সাধুদিগের মধ্যে পূর্ব্বাপর যোগের সূত্র দেখাইয়া দিল। ইহাই তাঁহার বিশিষ্টতা। ইহাই তাঁহার ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বকে পৃথিবী পরিহার করিতে পারিল না। তিনি নিজে বলিয়া গেলেন যে, 'I am a singular man, I am commissioned by God to preach certain truths." "আমি বিশিষ্ট ব্যক্তি, আমি বিধাতা কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছি, কতকগুলি সত্য প্রচার করিবার জন্য।" সুতরাং ব্যক্তিত্বের দিক দিয়াও তিনি চিরদিন ধর্ম্মজগতে অপরিহার্য্য সত্যরূপে স্থান লাভ করিবেন।

নববিধানের আলোকে আমরা আর কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তককে বা কোন ধর্ম্মবিধানকে অসংবদ্ধভাবে চিন্তা করিতে পারি না। সকল ধর্ম্মবিধান ও সকল মহাপুরুষ একই অখণ্ড বিধানের পূর্ব্বোত্তর বিকাশ। অসংবদ্ধভাবে বা আকস্মিকভাবে কোন বস্তু বা ব্যক্তি জগতে উৎপন্ন হইতে পারে না। যোগের সূত্র ধরিয়াই জগৎ চলিয়াছে; কি ভৌতিক জগৎ, কি জীব-জগৎ, সকলই ক্রম-বিকাশের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। ধর্ম্ম-জগতে এই নিয়মের

ব্যতিক্রম হইবে কেন? দুয়ে দুয়ে যোগ করিলে চার হয়; যখন চার হইল, তখন তাহার আকার পরিবর্ত্তন হইল, তখন তাহার নূতন শক্তি হইল, তখন সে একটী নূতন সৃষ্টির আধার হইয়া দাঁড়াইল। যখন একটী সত্য পাঁচটী সত্যের সহিত মিলিত হয়, তখন সে শক্তিমান হয়, নূতন সৃষ্টির বীজরূপে অবতীর্ণ হয়। যে আধারে সকল সত্যের সমন্বয় হইল, তাহা একটী নূতন আকার ধারণ করিল, নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা লইয়া পৃথিবীতে আগমন করিল। এই সমন্বিত জীবনই কেশব-জীবন।

সমন্বয় সৃষ্টির সনাতন বিধি। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই মানব-সমাজ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি নীতি, কি সভ্যতা, সকলই যুগযুগান্তরের সমন্বয়ের ফল; যুগযুগান্তরের কর্ম্ম-ফলের ভিতর দিয়াই মানব নূতন সভ্যতা লাভ করিয়াছে। আজ যে জগতে নূতন জড়-বিজ্ঞান প্রতিদিন আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা কি এক বংশের বা এক জাতির চেষ্টার ফল? কোন প্রাচীন সত্যকে পরিহার করিয়া কি কেহ বিজ্ঞান-জগতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে পারে? তাহা অসম্ভব। যে যুগযুগান্তরের প্রাচীন সত্য ও সাধনা লইয়া কেশবচন্দ্র অবতীর্ণ হইলেন, পৃথিবী তাঁহাকে পরিহার করিবে কিরূপে? পৃথিবী হয়ত ব্যক্তিকে ভুলিয়া যাইতে পারে, অথবা অস্বীকারও করিতে পারে, কিন্তু যাহা বস্তু, সত্য, তাহাকে অস্বীকার করিবে কিরূপে? সত্যের সহিত ব্যক্তির অবিচ্ছিন্ন যোগ, সত্যকে স্বীকার করিলেই ব্যক্তিকে স্বীকার করিতে হইবে। এজন্য কেশবচন্দ্র ধর্ম্মজগতে চিরদিন অপরিহার্য্য।

নববিধানের নূতন দৃষ্টি চারিদিকে এক নূতন যোগরাজ্য আবিষ্কার করিয়াছে। কি ভৌতিক জগৎ, কি জীব-জগৎ, কি বিজ্ঞান-জগৎ, কি ধর্ম্ম-জগৎ, সকলই পরস্পর যোগের ভিতর দিয়া বিধাতার নূতন রাজ্য সৃষ্টি করিতেছে। মহাপুরুষ-তত্ত্ব পাঠ কর, সাধন কর, সেখানেও যোগরাজ্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে, দেখিতে পাইবে। যে জীবন এই নূতন যোগরাজ্য দর্শন করিলেন, পৃথিবীকে নূতন দৃষ্টি দান করিলেন, তিনি কেমন করিয়া পৃথিবী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন? সত্যকে পরিহার করিয়া কোন দিন নূতন জগৎ গড়িবে না। সত্যে সত্যে বিরোধ থাকিবে না, একথা যদি সনাতন ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে কেশবচন্দ্রকে পরিহার করিয়া পৃথিবী কোন দিন জয়যুক্ত হইবে না। কেশবচন্দ্র ধর্ম্মজগতে অপরিহার্য্য সত্য।

শ্রীকামাখ্যা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•—

শ্রীকেশবের আচার্য্যপদে নিয়োগ। *

শ্রীকেশবচন্দ্রের আচার্য্যপদে নিয়োগ ব্রাহ্মসমাজের একটী মহা ব্যাপার। ইহা যে পরমেশ্বরের বিশেষ আদেশেই হইয়াছিল, তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ নিজে অতি পরিষ্কারভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

১৮৬২ সনের মার্চ্চ মাসে মহর্ষি বিশেষ কোন কারণে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত গুস্করা নামক গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। প্রকৃতিদেবীর সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া সাধন ভজন করিবার উদ্দেশে তিনি একটী সুরম্য আম্রকুঞ্জে তাঁবু ফেলিয়া স্থিতি করেন। একদিন যোগিবর একাকী ব্রহ্মচিন্তনে নিরত আছেন। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, শুধু বিহঙ্গকুলের সুমধুর কাকলী মধ্যে মাঝে কোন্ অদৃশ্য রাজ্য হইতে স্বপ্ন-সঙ্গীতের ন্যায় ভাসিয়া আসিয়া কাননবাসীর প্রাণকে সুধাসিক্ত করিতেছে। ঊর্দ্ধে লতা পাতার ফাঁকে ফাঁকে আকাশের নীলঘন হাসি, নিম্নে সমস্ত বনময় স্নিগ্ধ ছায়ার মৃদুল নৃত্য। মহর্ষির প্রাণ এই অতুল স্বভাব-সৌন্দর্য্যের ভিতরে মহা সমাধিতে মগ্ন। এমন সময়ে অকস্মাৎ মঙ্গলময় পরমেশ্বরের জীবন্ত আদেশবাণী চিদাকাশ হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া তাঁহার হৃদয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইল :—

"কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে বরণ কর; সমাজ সর্ব্বপ্রকারে সমুন্নত ও শ্রীসম্পন্ন হইবে।"

মহর্ষি ঈশ্বরের এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, এবং বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মগণের নিষেধ সত্ত্বেও নব বর্ষের প্রথম দিনে (১লা বৈশাখ) কেশবচন্দ্রকে "ব্রহ্মানন্দ" উপাধিতে ভূষিত করিয়া, মহাসমারোহে আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিলেন। সত্যের জয় হইল, এবং বিধাতার মঙ্গলবিধি পূর্ণ হইতে চলিল।

উপরোক্ত ১লা বৈশাখ প্রভাতে শ্রীকেশবচন্দ্র আপনার সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে গমন করেন। এই জন্য সেন পরিবারে যে কি মহা হুলুস্থুল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অনেকে জীবন্ত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অল্প-বয়স্কা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া প্রকাশ্যভাবে "পিরালী" পরিবারে গমন, এবং "খ্রীষ্টানী" ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান, তৎকালীন হিন্দুসমাজের চক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল। ইহার দণ্ড হইল, সেন পরিবার হইতে কেশবচন্দ্রের নির্ব্বাসন। কিন্তু তাহাতে তিনি একটুও দমিলেন না, তাঁহার হৃদিস্থিত বিশ্বাস মহাতেজের সহিত উত্থান করিয়া সিংহ-বিক্রমে দেশের অনাচার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল।

পরিবার হইতে নির্ব্বাসিত হওয়ার পরে (২১শে বৈশাখ, ১৭৮৫ শক) শ্রীকেশবচন্দ্র বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে এক পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

"নববর্ষের প্রথম দিনের ব্রহ্মোপাসনা উপলক্ষে আমার পরিবারকে আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে আনিয়াছিলাম, ইহাতে বাটীর লোকেরা আমাকে যৎপরোনাস্তি ভয় দেখাইয়াছিলেন, এবং নানা প্রকার উপায়ে আমাকে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন;

* মৎপ্রণীত "শ্রীকেশ-সমাগম" নামক অমুদ্রিত গ্রন্থ হইতে এই কাহিনীটী "ধর্ম্মতত্ত্বের" জন্য পাঠান গেল। উক্ত পুস্তক দুই ভাগে (মোট বারটী অধ্যায়ে) বিভক্ত; প্রথম ভাগে কেশব-জীবনের তত্ত্ব এবং দ্বিতীয় ভাগে কাহিনী। আগামী শত বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ইহা সর্ব্ব-সমক্ষে বাহির করিবার ইচ্ছা আছে।

কিন্তু 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্', ইহা স্মরণ করিয়া, সকল বিঘ্ন অতিক্রম করতঃ মনস্কাম সিদ্ধ করিয়াছিলাম। সে দিবসের উৎসব শেষ হইলে, রাত্রি দুই প্রহরের সময় বাটী হইতে একখানা পত্র পাইলাম। তাহাতে এই লেখা ছিল, 'তুমি এবং তোমার স্ত্রী গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া অন্যত্র বাসা করিবে।' সেই দিন হইতে আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে অবস্থিতি করিতেছি। যতদিন না স্বাধীনভাবে থাকিতে পারি, ততদিন হয়তো এ স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবে। দেখি কি হয়। সত্যের জয়, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। চতুর্দ্দিকে গোলমাল হইতেছে। শুভচিহ্ন, সন্দেহ নাই। অনুষ্ঠানের কাল উপস্থিত; ত্যাগ-স্বীকারের কাল উপস্থিত; বিষয়-ত্যাগ, গৃহত্যাগ, কত ত্যাগ ব্রাহ্মদিগের করিতে হইবে, তাহার কিছু স্থির নাই। সুখস্বচ্ছন্দে থাকিবার দিন অবসান হইয়াছে। এখন সকল ব্রাহ্ম দলবদ্ধ হইয়া অকুতোভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার, ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকুন; সত্যের রাজ্য, মঙ্গলের রাজ্য ক্রমে বিস্তৃত হইবে।"

যৌবনের আরম্ভে যদি তিনি এইরূপ বিশ্বাসের বল দেখাইতে না পারিতেন, তবে কি আর পরবর্ত্তী সময়ে নববিধানের শুভাগমন সম্ভব হইত?

উপরি উক্ত পত্রে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে "আচার্য্য" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। মহর্ষি প্রথমতঃ তাই ছিলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্রকে আচার্য্যপদে বরণ করার পরে তিনি আপনাকে "প্রধান আচার্য্য" বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

মঙ্গল কুটীর,
ঢাকা। শ্রীমতিলাল দাস।

কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ।

কুচবিহার-নিবাসী কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ সাহেবের পরলোক-গমনের অব্যবহিত পরে আমাদের ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহার জীবন-কাহিনীর কথঞ্চিৎ আভাস বিবৃত করিয়াছি। তাঁহার পরলোক-গমনের দিন স্মরণ করিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের কথা লিখিতে আসিলাম। স্বর্গীয় কুমার সাহেব তাঁহার জীবনের যে বিশেষ অধীতব্য দিক্ বিশ্বাসী জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সেই দিক্ মহারহস্যময় ও আন্দোলনপূর্ণ কুচবিহার-বিবাহের আধ্যাত্মিকতার বিশদ ব্যাখ্যানরূপে বিধাতার বিধান-বিশ্বাসীর গ্রহণীয়। নারিকেলের কঠিন আবরণ ভেদ না করিলে অভ্যন্তরস্থ শস্য কে সংগ্রহ করিতে পারে? আজ আমি কুমার সাহেব গজেন্দ্র নারায়ণের অভ্যন্তরস্থ জীবনকথাই কুচবিহার-বিবাহ-তত্ত্বের interpretation অর্থাৎ ব্যাখ্যান রূপে উপস্থিত করিতেছি। যখন কোন শাস্ত্র আসে, তখন তাহার ব্যাখ্যানও প্রয়োজন হয়। ভারতীয় অথবা পাশ্চাত্য কাব্যকার ও শাস্ত্রকারদিগের যখন যে গ্রন্থ আসিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে টীকাকারও আসিয়াছেন। ভূরি আন্দোলন-পূর্ণ কুচবিহার বিবাহে অধ্যেতার কোন্ বস্তু অধীতব্য? ভীষণ আন্দোলনের ভিতর সেই পাহাড়ের মত যে মহাপুরুষ দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে যে দুই আত্মা তদ্রূপ দৃঢ়তার সহিত সেই ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রথম অধীতব্য। হিমালয়ের উপর ঝড় বহে, হিমালয় কম্পান্বিত হয় না। ছোট ছোট গাছ পালা কাঁপিয়া উঠে। কুচবিহার-বিবাহ সত্য সত্য তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। পাহাড়ে ঝড় বহে, কিন্তু নিভৃত গুহাবাসী ঋষি স্থির ও সমাহিত। কুচবিহার-বিবাহ-বিধানে বিধাতা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। "Enter into the closet and there you shall find Him." নিভৃতে প্রবেশ কর এবং সেই স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। সত্য সত্য যাঁহারা নিভৃতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সেই ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতের ভিতর বিধাতার হস্ত দেখিতেছিলেন। তাঁহারাই ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দাঁড়াইয়াছিলেন। কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ সেই দণ্ডায়মান বিশ্বাসীদিগের মধ্যে একজন। রাজগণ-পরিবার-ভুক্ত কুচবিহারনিবাসী গজেন্দ্র নারায়ণ কুচবিহার-আকাশে এই ধ্রুবতারা দেখিয়াছিলেন। আণুবীক্ষণিক ও দৌরবীক্ষণিক দৃষ্টি ব্যতীত কে সূক্ষ্ম ও দূরের বস্তু দেখিতে পায়? রাজগণ-পরিবারে বসিয়া রাজগণ-নৃপতি মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে কুমার গজেন্দ্র নারায়ণও কুচবিহার আকাশে নবতারার অভ্যুদয় দেখিয়াছিলেন। ঈশা আসিতেছেন, সে তারা কয়জন দেখিয়াছিলেন? ঝড়ে ধ্রুবতারার বিনাশ নাই। সত্য সত্যই ব্রহ্মানন্দের যে বৈদ্যুতিক স্পর্শ কুচবিহারের দ্বারদেশে পড়িয়াছিল, সেই স্পর্শ কুচবিহারবাসী বিশ্বাসী আত্মার উপরও আসিয়া পড়িয়াছিল। কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ যাহা দেখিয়াছিলেন, যে স্পর্শ অনুভব করিয়াছিলেন এবং যে বৈদ্যুতিক আলোক তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই মহাশক্তিতে তিনি চারিদিকের তরঙ্গ তুফান ও গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া, প্রবহমান ঝঞ্ঝাবাতকে উপেক্ষাপূর্ব্বক, অনতিবিলম্বে বিধাতার আদেশে ব্রহ্মানন্দের দ্বিতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ আদেশ শাস্ত্রের টীকাকাররূপে আসন গ্রহণ করিলেন। কুমার সাহেব তাঁহার জীবনে সেই নবীন প্রভাতালোক-দর্শনের সাক্ষ্যদান করিলেন, যে আলোক-দর্শনে ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মানন্দ-কন্যা এবং কুচবিহার রাজকুমার প্রথম আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। "They that were ready, entered in." যাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহারাই প্রবেশ করিলেন। ভক্ত ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ-দলের যাঁহারা প্রবেশ করিলেন, তাঁহারাও এই নবালোক "New Revelation" দেখিতে পাইলেন। ১৮৭৮ সালের ৭ই মার্চ্চ তারিখে নববিধান-মন্দিরে যে দীপালোক জ্বলিয়াছিল, সেই দীপালোক চিরদিনই কুচবিহার-বিবাহের মহা সত্য সপ্রমাণ করিবে। "It is easy to criticise but difficult to

become." সমালোচনা করা সহজ, কিন্তু কয়জন ব্রহ্মানন্দের মত দাঁড়াইতে পারিলেন? সেই যে একজন বলিয়াছিলেন, "It requires a second keshub to understand what Keshub was." কেশবকে বুঝিতে হইলে, দ্বিতীয় কেশবের প্রয়োজন। একথা খুবই সত্য। বিধাতার আলোক কিরূপে ধরিতে হয়, কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ তাঁহার জীবনে তাহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সব-সাধিকা ও সহধর্ম্মিণী দেবী সাবিত্রী কুমার সাহেবের যে জীবনকাহিনী পুস্তকাকারে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, এই পুস্তক সত্যই তাঁহার উচ্চ জীবনের আভাস সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবে। কুমার সাহেব সম্বন্ধে এ দাসের আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

আর্য্যনারী-সমাজের কার্য্য-বিবরণ।

(আর্য্যনারী-সমাজের অধিবেশনে পঠিত)

মঙ্গলময়ী বিশ্বজননীর অপার করুণায় আমাদের আদরের আর্য্যনারী-সমাজ প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে সকল ভগিনী একত্র মিলিয়া, প্রাণের সহিত যোগদান করিয়া, করুণাময়ী মার চরণ-পূজা, আরাধনা, বন্দনা ও গুণগান করিয়া সকলে সুখী ও ধন্য হইবেন, এই মহৎ উদ্দেশ্যেই ইহা স্থাপিত হয়। দয়াময়ী জগজ্জননী এই প্রিয় আর্য্যনারী-সমাজকে আশীর্ব্বাদ করুন, ইহার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সফল করুন, ইহার শুভাকাঙ্ক্ষী স্নেহময় প্রতিষ্ঠাতার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন। হৃদয়ের সহিত মা জননীর চরণতলে এই প্রার্থনা করিতেছি।

ইতিমধ্যে আর্য্যনারী-সমাজের এই কয়েকটি অধিবেশন হইয়াছে। একদিন শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্রের ভবনে অধিবেশন হয়; প্রিয়ভগিনী শ্রীমতী কুমুদিনী দাস উপাসনা করেন। আর একদিন শ্রীমতী প্রীতিলতা গুপ্তের গৃহে অধিবেশন হয়; প্রিয় ভগিনী মহারাণী সুচারু দেবী উপাসনা করেন। আর একদিনের অধিবেশনে কমলকুটীরে মহারাণী সুনীতি দেবী উপাসনা করেন। অপর অধিবেশনে শ্রীমতী সরলা সেনের ভবনে মহারাণী সুচারু দেবী উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন। আর একদিন শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জ্জির ভবনে অধিবেশন হয়; মহারাণী সুচারু দেবী উপাসনা করেন। তারপর ১১ই এপ্রেল শ্রীমতী সুধা বানার্জ্জির সাদর আহ্বানে তাঁহার নূতন গৃহে আর্য্যনারী-সমাজের অধিবেশন হয়। অনেকগুলি ভগিনী আনন্দের সহিত যোগদান করেন। মহারাণী সুনীতি দেবী উপাসনা করেন। ইহার পরের অধিবেশনে, ১৮ই এপ্রেল, শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর স্নেহের আহ্বানে, তাঁহার বাড়ীতে উপাসনা হয়; মহারাণী সুনীতি দেবী উপাসনা করেন। তৎপরের অধিবেশনে, মহারাণী সুনীতি দেবীর ভবনে, ২৫শে এপ্রেল উপাসনা হয়। তারপরের অধিবেশনে, ৪ঠা জুলাই, ৩নং প্রচারাশ্রম গৃহে মহারাণী সুনীতি দেবী উপাসনা করেন। তৎপরের অধিবেশনে, ১১ই জুলাই, শ্রীমতী সুজাতা সেনের ভবনে উপাসনা হয়; মহারাণী সুনীতি দেবী উপাসনা করেন। তারপর ২১শে নবেম্বর আচার্য্যদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীমতী সরলা সেনের গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়; প্রিয়ভগিনী শ্রীমতী চপলা মজুমদার উপাসনা করেন। তৎপরে ২৬শে ডিসেম্বর ৭নং রামমোহন রায় রোডে অধিবেশন হয়; প্রিয় ভগিনী শ্রীমতী কমলেকামিনী বসু উপাসনা করেন। তারপরের অধিবেশনে কমলকুটীরে মহারাণী সুনীতি দেবী উপাসনা করেন। তারপর ২৭শে ফেব্রুয়ারী শ্রীমতী বিরাজ মোহিনী দত্তের বাড়ীতে অধিবেশন হয়। মহারাণী অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। প্রিয় ভগিনী শ্রীমতী সরলা সেন উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। তারপর মহারাণী সুনীতি দেবী কমলকুটীরে আর্য্যনারী-সমাজের অধিবেশনে উপাসনা করেন। তারপর মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীর ভবনে অধিবেশন হয়; মহারাণী সুনীতি দেবী উপাসনা করেন। গত ১৬ই জুলাই, ৭নং রামমোহন রায় রোডে অধিবেশন হয়; শ্রীমতী শকুন্তলা সেন উপাসনা করেন। সকল অধিবেশনেই অনেকগুলি ভগিনী আসিয়া যোগদান করিয়া সুখী ও আনন্দিত হইয়াছেন। সকল ভগিনী পরম সমাদরে সকলকে বিশেষ আহ্বানে নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছেন এবং সাদরে সকলকে মিষ্টান্ন প্রীতিভোজন করাইয়া সুখী হইয়াছেন। আমাদের আর্য্যনারীসমাজের চাঁদা হইতে গাড়ীভাড়া, দরোয়ানের বেতন প্রভৃতি খরচ হইয়া, প্রতিমাসে কিছু কিছু টাকা গরিব দরিদ্র অনাথাদের সাহায্য দেওয়া হয়। অবশিষ্ট টাকা ফণ্ডে জমা থাকে। এখন সকল ভগিনীদের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা সকলে যেন উপাসনায় যোগদান করিয়া আমাদের আশা ও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, এবং আমাদের প্রিয় আর্য্যনারী-সমাজের উন্নতি ও মঙ্গল প্রার্থনা করেন। এবং আমরা সকলে যেন নিজ নিজ জীবনকে দিন দিন প্রেম, পুণ্য, ধর্ম্ম ও পবিত্রতার পথে অগ্রসর করিতে প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ন করিতে পারি, করুণাময়ী জননী এই আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীসরলা দাস।

—•—

পুস্তক-পরিচয়।

"পরলোকের সন্ধান" শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের উপদেশাবলী হইতে সংগৃহীত। নববিধানাচার্য্যদেবের অমূল্য উপদেশ সকল মহারত্নখনি বিশেষ। তাহার ভিতর ধর্ম্মসাধনের তত্ত্ব কতই যে নিহিত, তাহা বলা যায় না। তিনি বলিলেন, "বাণী শুনিয়া বলি, বানিয়া বলি নাই।" সুতরাং তাঁহার উক্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মবাণীই নিহিত রহিয়াছে। ভক্তিপূর্ব্বক যিনি যে অবস্থায় পড়িয়া যে তত্ত্ব গ্রহণ করিতে চান, তিনিই এই সকল উপদেশ মধ্যে সেই ভাবের উপযোগী আত্মার কল্যাণ ও শান্তি-সান্ত্বনাপ্রদ উপদেশ পাইতে পারেন। আচার্য্য-

দেব এইজন্ত আমাদিগকেও এক সময়, তাঁহার উপদেশ ও প্রার্থনাদি হইতে বিভিন্ন ভাবের ও অবস্থার উপযোগী তত্ত্ব-কথা সকল সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ প্রিয়তমা কন্তা শ্রীমতী সুব্রাতা দেবী নিজ কন্তা 'প্রকৃতির' মৃত্যুতে শোকে আহত হইয়া, ভক্ত পিতৃদেবের উপদেশাবলী অধ্যয়ন করিতে করিতে, যে সকল মধুর পরলোক-সন্ধানের তত্ত্বকথাগুলি চয়ন করিয়াছেন, তাহাই এই পুস্তক থানিতে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উৎসর্গ-পত্রে সরল-প্রাণে লিখিয়াছেন, "প্রকৃতিকে হারিয়ে প্রাণের জ্বালার পিতৃদেবের বইগুলির আশ্রয় নিয়ে এই মুক্তগুলি জড় করেছি। * * এই বই খানি পড়ে, পরলোকের সন্ধান পেয়ে, আমার মত কত প্রাণ শান্তি পাবে।" বাস্তবিক আমরাও আশা করি, এই পুস্তকখানি পড়িয়া অনেক সন্তপ্ত প্রাণই সান্ত্বনা লাভ করিবে। আচার্য্য-দেবের পুত্রকন্তাগণ পিতৃদেবের অমূল্য উপদেশ ও প্রার্থনাদি সংগ্রহ, প্রচার ও রক্ষার জন্ত যে সমগ্র ধর্ম্মমণ্ডলীর চির-কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন, তাহা আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিব।

—০—

সংবাদ।

তীর্থবাস—ভাই প্রিয় নাথ মল্লিক তীর্থযাত্রী হইয়া গত ১১ই অক্টোবর হইতে ২১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ভুবনেশ্বরে বাস করেন। এই সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণী কঠিন দোকালীন জরবিকারে আক্রান্ত হইয়া সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হন। রোগীর সেবা-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ভাই প্রিয়নাথ পারিবারিক উপাসনা ও নামগান ব্যতীত একদিন সামাজিকভাবে উপাসনা করেন, তীর্থাগত প্রতি-বেশীদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন ও স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক উপলক্ষে বালিকাদিগকে আদর্শ মাতৃপ্রতিমা হইতে উপদেশ দান করেন। তথা হইতে পুরীতে গিয়া শ্রদ্ধাস্পদ রায় জানকীনাথ বসু বাহাদুরের বিশেষ অনুগ্রহে তাঁহার পুরীস্থ "জগন্নাথধাম" আবাসের দ্বিতল প্রকোষ্ঠে বাস করেন। সপরিবারে এই থানেই কয়দিন আধ্যাত্মিক নব দুর্গোৎসব সাধন করেন। বিষ দ্বারা যেমন বিষ নষ্ট হয়, তেমন ভগবতী দুর্গা দুঃখ দুর্গতি দিয়া চিরদুর্গতি দূর করেন, ইহাই বিশেষ ভাবে এই উৎসবের প্রসাদ লাভ করিয়াছেন।

তৎপর পুরীর ভক্তিমান উকীল বাবু হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে, রামকৃষ্ণ-লাইব্রেরীর হলে, শারদীয় পূর্ণিমা উপলক্ষে বিশেষ উৎসব হয়। রামকৃষ্ণ-সমিতির সম্পাদক বাবু বীরেন্দ্রনাথ রায় রামকৃষ্ণ-কথামৃত হইতে কিছু পাঠ করিলে, ভাই প্রিয় নাথ বিশেষ উপাসনা করেন। শ্রীকেশব চন্দ্রের কাছে আসিলে রামকৃষ্ণ-দেব বলিতেন, তাঁহার চৌদ্দ পোয়া মা গলে যান। এইরূপ কেশব রামকৃষ্ণের আত্মিক যোগ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা হয়। হুগলীর বাবু বলাইচাঁদ দত্ত, তাঁহার স্ত্রী ও শিশু নাতি এবং ভাই প্রিয় নাথের কন্তা সঙ্গীত করিয়া সকলকে প্রীত করেন। ব্যারিষ্টার মিঃ জে, এন, দত্ত সস্ত্রীক ও অপর কতিপয় ভদ্র ব্যক্তি এবং মহিলা যোগদান করেন। উৎসবান্তে ভ্রাতা হরেন্দ্র-নাথ সকলকে চিড়া নারিকেল মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ করেন। ভাই প্রিয়নাথের সহধর্ম্মিণী পুরীতে ক্রমে সুস্থ হইলে, তাঁহাকে লইয়া ভাই প্রিয়নাথ ব্রহ্মানন্দাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া-ছেন। গম্ভীর রোগের অবস্থায় যে সকল আত্মীয় বন্ধু অর্থাদি ও সহানুভূতিযোগে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলের নিকট ভাই প্রিয়নাথ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ৪ঠা নভেম্বর, ১৮ই কার্ত্তিক, ঢাকায়, ১৬নং নবরায়ের গলীতে, ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষের সহধর্ম্মিণী দেবী নীহারিকা ঘোষের পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসনা ও ভাই দুর্গানাথ রায় শ্লোকাদি পাঠ করেন। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাকে অনন্ত শান্তিধামে রক্ষা করুন, প্রিয়তম স্বামী ও মাতৃহীন এক মাত্র শিশু পুত্রের কল্যাণ করুন এবং সকল শোকার্ত্ত প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গ করা হইয়াছে:—

কলিকাতা—নববিধান প্রচার আশ্রম ১০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দির ৫৲, শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেনের সেবার জন্ত ১০৲, শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর সেবার জন্য ৫৲, অনাথ আশ্রম ৩৲, নববিধান ট্রষ্ট ৫৲, ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট ৩৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৫৲; শ্রদ্ধেয় ভাই বিহারী লাল সেনের সেবার জন্য ৫৲, এলাহাবাদ নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, বালেশ্বর ও বারিপদা নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজ ৩৲, ভাগলপুর নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, চন্দননগর নব-বিধান ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, চট্টগ্রাম নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, গাজীপুর নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, গিরিধি নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, হাজারিবাগ নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, সিন্ধু হায়দ্রাবাদ নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, করাচি নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, লক্ষ্ণৌ নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, ময়মনসিংহ নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, মুঙ্গের নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, পাটনা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, রঙ্গপুর নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, শান্তিপুর নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজ ৩৲, সিমলা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, সিরাজগঞ্জ নব-বিধান ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, টাঙ্গাইল নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, ত্রিবেণী বাবা ১০৲, সোঽহং স্বামীর আশ্রম ১০৲, বগুড়া ব্রাহ্মসমাজ ৩৲, শিলং ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, শিলং "কনভেণ্ট" ৫৲, বরিশাল ব্রাহ্ম-সমাজ ৫৲, বরিশালের শ্রদ্ধেয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর সেবার জন্য ৫৲, বরিশালের শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখার্জির আশ্রম ৫৲; ঢাকা—নববিধান ব্রহ্মমন্দির ১০৲, শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায়ের সেবার জন্য ৫৲, শ্রদ্ধেয় ভাই মহিমচন্দ্র সেনের সেবার জন্ত ৫৲, বিধবা আশ্রম ৩৲, কনভেণ্ট ১০৲, অনাথ আশ্রম ৩৲, রামকৃষ্ণ মিশন ৩৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, কালাবোবা স্কুল ৩৲।

এতদ্ব্যতীত তিনজন প্রচারককে বস্ত্র ও গৈরিক দান করা হইয়াছে। ভগবান্ এই দানকে সার্থক করুন।

গত ৮ই নভেম্বর, ২২শে কার্ত্তিক, ৮৪।৫ রিপন ষ্ট্রীটে, ডাঃ ধর্ম্মানন্দ পিতৃদেবের পবিত্র আত্মশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ডাঃ ধর্ম্মানন্দ নবসংহিতার প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন, এবং এই উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲, নববিধান প্রচার আশ্রমে ৫৲, Brahmo Relief fund ৫৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, অনাথ আশ্রমে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাকে স্বর্গধামে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্তজনের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ৪ঠা নভেম্বর, ১৮নং পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীটে, শ্রীমান্ ব্রহ্মানন্দ গুপ্তের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় রাজেশ্বর গুপ্তের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ৫ই নভেম্বর, স্বর্গীয় অমৃত লাল ঘোষের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে,বালীগঞ্জে, জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত নীতিলাল ঘোষের গৃহে শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন এবং কলিকাতায় জ্যেষ্ঠা কন্যার গৃহে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে ৪ঠা নবেম্বর, গিরিধির বাসভবনে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

গত ৮ই নবেম্বর, শিঁথিতে, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দাসের পিতামাতার সাম্বৎসিরক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। প্রচার ভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

১৭ই নভেম্বর, ৮৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দের গৃহে, তাঁহার শ্বশ্রূমাতার সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। ভগ্নী শ্রীমতী কুমুদিনী দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন।

জাতকর্ম্ম—গত ৪ঠা নভেম্বর, বালীগঞ্জে, শ্রীযুক্ত নীতি লাল ঘোষের নবজাত শিশুপুত্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। গত ৬ই অক্টোবর শিশুটী জন্মগ্রহণ করে। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ—গত ৫ই নভেম্বর, বারিপদায় শ্রীমান্ সুরেন্দ্র নাথ বানার্জ্জির দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠানে শিশুর পিতামহ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি উপাসনা করেন। শিশুকে "সোমেন্দ্র নাথ" নাম প্রদান করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—গত ১৪ই নভেম্বর, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে, হ্যারিসন রোডস্থিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথদত্তের গৃহে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন।

ধৰ্ম্মতত্ত্বের মূল্যপ্রাপ্তি।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের সহিত অক্টোবর মাসে ধর্ম্মতত্ত্বের নিম্নলিখিত মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি:—

কলিকাতার—শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত ৩৲, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র লাল খাস্তগীর ১॥০, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেন ২॥০, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন ১৲, মিসেস্ কুনাল চন্দ্র সেন ৩৲, শ্রীযুক্ত নির্ম্মল কুমার সেন ৩৲, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ ৩৲, শ্রীযুক্ত পুণ্যদায়িনী চক্রবর্ত্তী ১৲, মিসেস্ এন্, এন্, সেন ৩৲, মিঃ এস্, কে, সেন ব্যারিষ্টার ৬৲, Lt. Col. K. K. Chatterjee ৩৲; ঢাকার—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র নন্দী ৩৲, শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা ৩৲, শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস ৩৲; নওগাঁর—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্ত ৬৲; দেরাদুনের শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র দেব ৩৲; গিডনীর—শ্রীমতী সুচারু বসু ১॥০; মত্ত (মাণিকগঞ্জ)—শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকান্ত চন্দ ৩৲; ময়মনসিংহের—শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চন্দ ৬৲; মরিশদা (কাঁথি)—শ্রীযুক্ত নন্দলাল মাইতী ৫৲; পটুলাপুর (দানাপুর)—ডাঃ কেশবলাল হাজরা ২৲; জলপাইগুড়ির—শ্রীমতী কমলেকামিনী বসু ৩৲; জামালপুর (ময়মনসিংহ)—ডাঃ নগেন্দ্রনাথ রায় ৬৲; কটকের—রায় বাহাদুর ডাঃ জয়ন্ত রাও ৯৲।

বিশেষ দান।

ঢাকার স্বর্গীয় দেবেন্দ্র মোহন সেনের আদ্য শ্রাদ্ধে ধর্ম্মতত্ত্বের সাহায্যার্থ ২০৲ টাকা দানপ্রাপ্তিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের সহিত স্বীকার করিতেছি।

ধর্ম্মতত্ত্বের বৎসর শেষ হইতে চলিল। গ্রাহকদিগের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, তাঁহারা আপন আপন দেয় মূল্য অনুগ্রহপূর্ব্বক সত্বর পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করিবেন। ধর্ম্মতত্ত্বের জন্য আমরা ঋণগ্রস্ত। এই ঋণ-মুক্তির জন্য গ্রাহক, অনুগ্রাহক সকলের নিকটই আমরা কৃপা ও সাহায্য ভিক্ষা করি।

শ্রীঅক্ষয় কুমার লধ
কার্য্যাধ্যক্ষ।

—•—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

পুরাতন বইয়ের তাড়া খুঁজিতে গিয়া স্বর্গীয় উপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত, কয়েকখানা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বাঙ্গালা সংস্করণ) পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা লইতে ইচ্ছা করেন, সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিলেই পাইবেন। মূল্য ৫৲ টাকা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। পূর্ব্বে অনেকেই বইখানা লইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আমরা তখন দিতে পারি নাই। এখন তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিবেন।

নববিধান-প্রচার-কার্য্যালয়,
৩ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট;
কলিকাতা।

শ্রীঅক্ষয় কুমার লধ।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" বি, এন্ মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক, ২১শে অগ্রহায়ণ, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৩ ভাগ। ২২শ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক, ৯৯ ব্রাহ্মাব্দ।
2nd December, 1928.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

অনন্ত-স্নেহ-স্বরূপা লীলাময়ী জননি! তুমি যে জাগ্রত জীবন্ত দেবতা, তোমার নব ধর্ম্ম, নববিধান যে জীবন্ত জাগ্রত বিধান, তোমার প্রিয়পুত্র ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র যে তোমার নববিধানের বাহকরূপে বিশেষ প্রেরিত, তিনি এবং তাঁহার দল যে নববিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠা জন্য তোমার বিশেষ মনোনীত এবং প্রেরিত, তাহা তুমি দিন দিন আমাদের মধ্যে তোমার উপাসনা, পাঠ, প্রসঙ্গ, ধ্যান, ধারণার মধ্যে তুমি অতি পরিষ্কার রূপে বুঝিতে দিতেছ। যখনই কোন প্রকার মোহ-মেঘ আসিয়া আমাদের চিত্তাকাশকে আবৃত করিয়া ফেলে, তোমার নববিধান, তোমার বিধান-বাহক কেশব চন্দ্র এবং তাঁহার দলের সম্পর্কে সত্যালোক আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হইতে কোনরূপ বাধা উপস্থিত করে, সেই অবস্থায় যখনই আমরা সরল জিজ্ঞাসু হইয়া ব্যাকুল-প্রাণে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, তখনই তুমি আমাদের অন্তরে সাক্ষাৎ ভাবে জীবন্ত জাগ্রত দেবতা রূপে সত্যালোক প্রকাশ করিয়া এবং আমাদের লব্ধ আলোক, লব্ধ সত্যকে দিনের পর দিন আরও বর্দ্ধনশীল আলোকে, বর্দ্ধনশীল সত্যে পরিণত করিয়া, আমাদিগকে ধন্য করিতেছ। তোমার এ দয়ার, এ করুণার তুলনা কোথায়? কিন্তু এক দিকে এত দয়া তোমার, এত কৃপা তোমার, অপর দিকে আমরা তোমার এত কৃপালোকে কৃতার্থ হইয়াও তোমার নিকট বড় অপরাধী! তোমার প্রেরিত সাধু মহাজন ভক্তবৃন্দের নিকট এবং আমাদের পরস্পরের নিকটও বড় অপরাধী! তোমার প্রেরিত নবধর্ম্ম, নববিধান যে ঘোষিত হইয়াছে, তাহার পঞ্চাশ বৎসর এখনও তো পূর্ণ হয় নাই; ইহারই মধ্যে তোমার বিধান-গ্রহণ, তোমার বিধানের কার্য্য পরিচালন সম্পর্কে, আমাদের মধ্যে কত দলাদলী, কত মতান্তর, ভাবান্তর উপস্থিত। বঙ্গে, ভারতে, সমগ্র পৃথিবীতে তোমার এই নবধর্ম্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা জন্য, নববিধানের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে যথাযথ পরিচালনা জন্য, তুমি যে সকল প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান ও ব্রত নিয়ম প্রভৃতি তোমার বিধান বাহক কেশবচন্দ্র যোগে এই বিধান-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও প্রবর্ত্তিত করিয়াছ, তাহা স্বীকার ও গ্রহণ না করিয়া, তাহা যথাযথ অনুসরণ ও পালন না করিয়া, সে সম্পর্কে শিথিলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিয়া, আমরা আমাদের কত অকল্যাণ করিতেছি, তোমার নিকট ও তোমার ভক্তদলের নিকট কত অপরাধী হইয়াছি, তুমি সকলই দেখিতেছ, জানিতেছ। আমরা দুর্ব্বল, অসহায়, আমরা একান্ত নিরুপায়। তাই আমাদের উপস্থিত অবস্থায় ব্যথিত ও শঙ্কিত হইয়া, হে নিরুপায়ের একমাত্র উপায়, অসহায়ের একমাত্র সহায়, তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি, তোমারই শ্রীমুখের পানে আশা ও বিশ্বাসের

সহিত চাহিতেছি। তুমি আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া, আমাদের মধ্যে অবস্থার উপযোগী শুভ ব্যবস্থা দান কর। আমাদের প্রাণে শুভমতি, শুভবুদ্ধি জাগ্রত কর। আমরা তোমাদ্বারা জাগ্রত ও অনুপ্রাণিত হইয়া, নবোদ্যমে, নবোৎসাহে তোমার নববিধান-সাধনে প্রাণে প্রাণে মিলিয়া অগ্রসর হই। আমাদের এই কাতর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

উদারতা ও রক্ষণশীলতা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিক দল আছেন এবং রক্ষণশীল দলও আছেন। সামাজিক ক্ষেত্রেও উদার নৈতিক শ্রেণী আছেন, রক্ষণশীল শ্রেণীও আছেন। ধর্ম্ম-ক্ষেত্রেও উদারনৈতিক শ্রেণী আছেন, রক্ষণশীল শ্রেণী আছেন। গূঢ় ভাবে আমরা আত্মানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, আমাদের প্রতিজনের ভিতরেই অল্লাধিক পরিমাণে উদারতার কার্য্য হইতেছে, আবার রক্ষণশীলতার কার্য্য হইতেছে। মানব-প্রকৃতির অন্তস্তরে ভাল করিয়া প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, মঙ্গলময় ঈশ্বর মানব-স্বভাবের মধ্যে উদারতার ভাব ও রক্ষণশীলতার ভাব, এ দুইটি ভাবের অঙ্কুরই রোপণ করিয়া দিয়াছেন। মানব-প্রকৃতির ক্রমোন্মেষ ও ক্রমবিকাশের জন্য এবং মানুষের পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের বিকাশ ও পূর্ণতা সাধন জন্য, প্রত্যেক মানুষের উদারতা ও রক্ষণশীলতা, দুই বৃত্তিরই পরিচালনা প্রয়োজন। এই দুই বৃত্তির যথাযথ উন্মেষ, প্রয়োগ ও সামঞ্জস্য-বিধান বিশেষ শিক্ষা, সাধনা ও মহদ্দৃষ্টান্ত-সাপেক্ষ।

মানুষ মহতের স্পর্শ পাইলে ক্রমে মহৎ হয়, হীন ও নীচ জীবনের স্পর্শ পাইলে হীন ও নীচ হইয়া যায়। ঈশ্বরের কৃপার দান স্বদেশের, বিদেশের, অতীতের, বর্ত্তমানের কত সাধু, ভক্ত, মহাজনের মহজ্জীবন আমাদের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ। ঈশ্বরের মহত্ত্ব অনন্ত ও অপার, তাঁহাতে হীনতার লেশ মাত্র নাই। সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম যিনি, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভাবে আরাধনা করিয়া, সেই আরাধনার ভিতর দিয়া তাঁহার প্রত্যেক স্বরূপকে স্পর্শ করিয়া, প্রত্যেক স্বরূপের স্বাদ গ্রহণ করিয়া, প্রত্যেক স্বরূপকে আত্মস্থ করিয়া, আমরা আমাদের জীবনের ক্রমোন্মেষ ও ক্রমোন্নতি সাধনের অধিকার লাভ করিয়াছি। তাঁহারই ইঙ্গিতে, তাঁহারই সাক্ষাৎ প্রেরণায় আমরা সাধু ভক্তদিগের জীবনের দেব দিক্ গ্রহণেরও অধিকার পাইয়াছি। আমাদের মত সৌভাগ্যশালী আর কে? আমাদের জীবনে উদারতা ও রক্ষণশীলতারূপ দুইটী মৌলিক বৃত্তির ক্রমবিকাশ, ক্রমপ্রকাশ এবং এ উভয়ের সামঞ্জস্য সেই ঈশ্বরেরই সাক্ষাৎ স্পর্শ ও প্রেরণা-সাপেক্ষ।

আমরা যখন চতুর্দ্দিক্ হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে বন্ধু বান্ধব ও আপনার প্রিয়জন হইতে আঘাত প্রাপ্ত হই, যখন নিতান্ত আপনার জন হইতেও দূরে থাকিয়া নিজের বিশিষ্টতা, বিশেষত্ব এবং জীবনের ভাল সামগ্রী যাহা, তাহা রক্ষা করিতে বাধ্য হই, তখন হয়ত আমাদের জীবনের স্বাভাবিক উদারতার লাঘব হয়, একটু অস্বাভাবিক ভাবে হয়ত সময় সময় রক্ষণশীল হইতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু সৌভাগ্য আমাদের এই, যখনই আমরা পূজা বন্দনার সময় ঈশ্বরের অনন্ত স্বরূপের আরাধনা করি, প্রাণ ভরিয়া অনন্ত স্বরূপের স্পর্শ পাই, যখন মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষ করি, আমার উপাস্য দেবতার অনন্ত বক্ষে দূর, নিকট, আমার ত্যজ্য, গ্রাহ্য সকলেই ফুল সজ্জার মত সজ্জিত রহিয়াছে, যখন দেখি, তিনি তাঁহার প্রশস্ত উদার প্রেম-বক্ষে ছোট বড়, পাপী তাপী নির্ব্বিশেষে সকলকে ধারণ করিয়া সকলের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন, তখন বুঝিতে পারি, আমি কোন ছার, যে আমি তাঁহারই প্রিয়জন বলিয়া, প্রিয়পুত্র কন্যা বলিয়া, অবিচারে সকলকে প্রাণে গ্রহণ করিব না? ঈশ্বরের অনন্ত স্বরূপের স্পর্শ পাইয়া আমাদের জীবনে যে স্বর্গীয় উদারতার উন্মেষ হয়, তাহারই ধারণা, তাহারই ক্রমবিকাশ-সাধনই তো আমাদের মধ্যে উদারতার শ্রেষ্ঠ সাধন। জীবনের এই সাধন-পথে সাধু মহাজনদিগের মহজ্জীবনের দৃষ্টান্তও বিশেষ সহায়, অসামান্য সহায়।

আবার যখন আমরা ঈশ্বরের সত্য-স্বরূপের আরাধনার ভিতর দিয়া জীবনে সমধিক সত্যনিষ্ঠ হই, জ্ঞান-স্বরূপের আরাধনার ভিতর দিয়া স্বর্গীয় সামগ্রীগুলি দেখিবার, গ্রহণ করিবার ও রক্ষা করিবার দৃষ্টি খুলিয়া যায়, যখন প্রেম-স্বরূপের আরাধনায় আমাদের

হৃদয় সরস হয়, এবং সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরকে আপনার বলিয়া, প্রিয়তম বলিয়া মনে হয়, যখন "একমেবাদ্বিতীয়ম্" স্বরূপের আরাধনার ভিতর দিয়া আমাদের জীবনে বিশেষ একনিষ্ঠ ভাব খুলিয়া যায়, পুণ্য-স্বরূপের ভিতর দিয়া যখন জীবনে শুদ্ধতা ও সাত্ত্বিক ভাবের উন্মেষ সমধিক সম্ভব হয়, তখন আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ব্রহ্ম কৃপায় যাহা কিছু আত্মিক সম্পদ লাভ হয়, জীবনের যে সকল দেব দিক্ সহজে খুলিয়া যায়, সে সকল আত্মিক সম্পদ ও দেব দিক্ সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য একটা রক্ষণশীলতার বিশেষ ভাবের উন্মেষ হয়। এইরূপে উপাসনাদির ভিতর দিয়া যেমন নব নব উদার ভাবের উন্মেষ হয়, তেমনই নব নব ভাবে রক্ষণশীলতার ভাবও উপস্থিত হয়। এ উদারতা রক্ষণশীলতার প্রতিরোধক নহে, পরিপোষক, এবং এরূপ রক্ষণশীলতাও উদারতার প্রতিরোধক নহে, পরিপোষক। কেন না, যতই আমরা অনন্ত স্বরূপের স্পর্শের ভিতর দিয়া উদার হই, ততই আমাদের জীবনের আধ্যাত্মিকতা গভীর হয়, জীবন অধিক গ্রহণে সক্ষম হয়। এই উদারতার ভিতর দিয়া সমধিক আত্মিক সম্পদ সঞ্চয় হয় বলিয়া, আত্মিক সম্পদ সম্পর্কে রক্ষণশীলতা বাড়িয়া যায়, উদারতা রক্ষণশীলতার বৃদ্ধির কারণ হয়। আবার দেব স্পর্শে রক্ষণশীলতার ভিতর দিয়া যতই আমরা জীবনে আত্মিক সম্পদে অধিক সম্পন্ন হই, ততই আমরা অধিক বলীয়ান্ হই, আমাদের আত্মিক লব্ধ বল আমাদিগকে ঈশ্বরের অনন্ত স্বরূপের সঙ্গে সমধিক যোগযুক্ত করে। আমরা তাহারই ফলে সমধিক উদার হই। উদার ভাবে সকলকে গ্রহণ করিয়া ধন্য হই। এইরূপে আমাদের জীবনে উদারতা ও রক্ষণশীলতার মধ্যে বিরোধ থাকেনা, বন্ধুতা উপস্থিত হয়, মিলন সংস্থাপিত হয়, সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে উদারতা ও রক্ষণশীলতার ক্রিয়া যথাযথ রূপে সামঞ্জস্যের ভাবে চলিলে, আমরা দেখিতে পাইব, অন্য জীবনের উদারতার স্পর্শ পাইয়া আরও আমরা সমধিক উদার হইতেছি, অন্য জীবনের অনুকরণীয় রক্ষণশীলতার স্পর্শ পাইয়া আরও আমরা রক্ষণশীল হইতেছি। আপনার মধ্যেও বিরোধ নাই, অপরের সঙ্গেও বিরোধ নাই। তাই নববিধানের সাধন-ক্ষেত্রে উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল বলিয়া দুইটা স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভিন্ন দল দাঁড়াইতে পারে না। অন্য ক্ষেত্রেই তাহা সম্ভব।

উদারতা ও রক্ষণশীলতার ক্রমবিকাশ, উচ্চ উন্মেষ, উচ্চ পরিণতি ও উচ্চ সামঞ্জস্য সম্পর্কে, ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের জীবন বর্ত্তমান যুগে শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তিনি উদার হইয়া ছোট বড় সকলকে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আপনার জীবনের বিশেষত্ব ও বিশিষ্টতা সম্পর্কে, আপনার জীবন-লব্ধ সঞ্চিত ধর্ম্মধন সম্পর্কে সর্ব্বদাই রক্ষণশীল ছিলেন। তাই ব্রহ্মানন্দ জীবন-বেদের স্বাধীনতা-শীর্ষক অভিভাষণে বলিলেন, "মহামান্য ঈশা মহীয়ান্ হউন, শ্রীগৌরাঙ্গকেও যথেষ্ট ভক্তি করি। কিন্তু তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ করি না। * * পূর্ণ আদর্শ মানুষ হইতে পারে না। যেখানে ঈশার আলোক পৌঁছিতে পারে না, ঈশ্বর আদর্শ হইয়া নিজ আলোকে সে স্থান প্রকাশ করেন।" ব্রহ্মানন্দ উদার-ভাবে স্বদেশের বিদেশের সকল স্থান হইতেই যাহা কিছু ভাল সকলই গ্রহণ করিলেন, কিন্তু বলিলেন, "নববিধান জাতীয় বিধান। নববিধান-বিশ্বাসী প্রকৃত হিন্দু"।

প্রশ্নতত্ত্ব।

ঈশ্বর-দর্শনের অন্তরায়।

ঈশ্বর সর্ব্বত্র নিত্য-বিদ্যমান, তবে তাঁহাকে দর্শন করা এত কঠিন কেন? কোন ব্যক্তিকে বা বস্তুকে যখন আমরা দেখি, তখন তাহার প্রতি দৃষ্টি ফিরাই বলিয়াই দেখিতে পাই; তাহার দিকে পশ্চাৎ ফিরালে কই দেখিতে পাই? তেমনি ঈশ্বরের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার প্রতি সত্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বা প্রকৃত প্রস্তাবে মন ফিরাইলেই আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের মন তাঁহার দিকে না ফিরিয়া, তাঁহাকে দূরে বা পশ্চাতে রাখিয়া, বিভিন্ন বিষয়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়; তাই তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়ে না, আর তাঁহাকে দেখিতেও পাই না।

শ্রীকেশবচন্দ্র-গ্রহণের অর্থ কি?

শ্রীকেশবচন্দ্রকে প্রকৃতভাবে গ্রহণ করার অর্থ, তাঁহার আত্মায় আত্মস্থ হওয়, তাঁহার সহিত একাত্মা হইয়া, তাঁহার ভাব, তাঁহার স্বভাব, তাঁহার প্রকৃতি, তাঁহার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, শুদ্ধতা আপনার করা। যদি তাঁহাকে গ্রহণ করি, তাঁহার ন্যায় আমার 'আমি' লোপ হইয়া যায়, তাঁহার ন্যায়, আমি যে মহাপাপী, এই পাপ-বোধ উদ্দীপন হয় ও নিত্য প্রবল হয়,

তাঁহার মাই আমার মা বলিয়া বিশ্বাস উজ্জ্বল হয়, দর্শন শ্রবণ সহজ হয়, তাঁহার ন্যায় সঙ্গতের তীব্র নীতি, মুঙ্গেরের প্রগল্ভা ভক্তি, নববিধানের মহাযোগ ধর্ম্ম আমার হয়। আমি আর "আমি" থাকি না, "আমরা" হইয়া গিয়া সবার পরিত্রাণে আমার পরিত্রাণ, বিশ্বাস করি। আমি আর কেবল আমার আপনার পরিত্রাণ লইয়া তুষ্ট থাকিতে পারি না, স্বার্থপর হইয়া আপনার উন্নতিই উন্নতি ভাবিতে পারি না; তাই সকল ভাই ভগ্নীকে লইয়া অনন্ত মার কোলের দিকে অর্থাৎ নিত্য নবজীবনের পথে দৌড়িয়া যাইতেই মন ব্যাকুল হয়। তাঁহার ন্যায় প্রেমে পাগল, ভক্তিতে মাতাল, মার কোলের শিশু হইয়া যাওয়াই বা কেশবের অনুজ হওয়াই যথার্থ কেশব-গ্রহণ।

রোগের ঔষধ।

দৈহিক রোগে উদরে ময়লা থাকিলে ঔষধ কার্য্যকরী হয় না, ময়লা পরিষ্কার হইলে তবে ঔষধে উপকার হয়। তেমনি যতক্ষণ না মনের ময়লা দুর্নীতি, পাপ দূর হয়, ততক্ষণ দেবারাধনাও জীবনে কার্য্যকরী হয় না। সেই জন্য পাপমনের সংশোধনের নিমিত্ত ন্যায়দণ্ড প্রয়োজন। ন্যায়দণ্ডে মনের অহং তিরোহিত হইলে মার কৃপা উপভোগের উপযুক্ত অবস্থা হয়। এমনই অপরাধী ব্যক্তির মন সুশাসনে শাসিত হইলে, তবে তাহার প্রেম উপলব্ধির অবস্থা আসে; মন যতক্ষণ গরম থাকে, ততক্ষণ প্রেম ভালবাসার মর্ম্মই সে উপলব্ধি করিতে পারে না। শারীরিক রোগে যেমন, মানসিক রোগেও অবস্থানুমত ব্যবস্থা প্রয়োজন।

হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মকথা।

নিরাকার নির্ব্বিকার পরমাত্মাকে ব্যক্তভাবে পিতামাতা বন্ধু সখারূপে উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ দর্শন গোচর করিতে চেষ্টাই পৌরাণিক মূর্ত্তি-কল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। যখন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" শাস্ত্রের নির্দ্দেশ, তখন মূর্ত্তিতেও তিনি বর্ত্তমান, এইরূপ বিচারই মূর্ত্তি-কল্পনার কারণ। আয়নার মধ্যে জীবন্ত ব্যক্তির মূর্ত্তি যথাযথ প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, কিন্তু সে প্রতিবিম্ব যথার্থ ব্যক্তি নয়। তেমনি মূর্ত্তি ব্যক্তি নয় বলিয়াই তাহার দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তিদের সাধন-ভাব উদ্দীপন করিয়াই তাহাকে বিসর্জ্জনের বিধি। ইহাতেই প্রমাণ হয়, মূর্ত্তিপূজা নিত্য নয়। ইষ্ট-মন্ত্র-জপই হিন্দুর নিত্য সাধন।

ব্রাহ্মণের পক্ষে গায়ত্রী কেবল জপ নয়, "তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি" অর্থাৎ সেই জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি। সুতরাং চিন্ময় পরমাত্মার ধ্যানই ব্রাহ্মণের বা ব্রহ্ম-সন্তানের সাধন। দুর্গোৎসব তিনরাত্রি তিন দিন ধরিয়া হয়, কিন্তু কালীপূজা এক রাত্রিতেই শেষ হয়। অর্থাৎ দুঃখ বিপদের পূজা ক্ষণিক, কিন্তু আনন্দ উৎসব ত্রিকালব্যাপী। ছেঁড়া চুল, পচা গোবর, আবর্জ্জনা অলক্ষ্মী, তাহা দূর করিয়া লক্ষ্মীর গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। লক্ষ্মীপূজা একদিন, সৌভাগ্য-লক্ষ্মী মানুষের এ সংসারে বহুদিন থাকে না। জগদ্ধাত্রীর পূজা একই দিনে তিন পূজা; জগজ্জননীর এমনই সর্ব্বাঙ্গীন পূজা একই দিনে করিতে হইবে। বীরবাহু দেবসেনাপতি বৈরাগী কার্ত্তিকের পূজা আদর্শ সন্তান লাভের জন্যই হিন্দু করেন।

নববিধানের অসাম্প্রদায়িকতা।

নববিধান কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মমণ্ডলী সকলের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িকতা, তাহা বিনাশ করিতেই এই বিধান বিশেষ ভাবে সমাগত। তাই সাম্প্রদায়িকতাকে ইনি পাপ ও অপরাধ জানিয়া সর্ব্বতোভাবে পরিহার করেন। সুতরাং যাঁহারা ইহাকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম মনে করেন, কিম্বা ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা আনিতে চান, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত।

নববিধান সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক ভাব অপনোদনপূর্ব্বক, সর্ব্বধর্ম্মের সম্মিলন সম্পাদন করিতেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত। সুতরাং কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই নববিধান আপনাকে নিবদ্ধ করিতে পারেন না, কিন্তু উদার ভাবে সকল ধর্ম্মকেই আপনার বক্ষে স্থান দান করেন, সকলকে উদার প্রেমে আলিঙ্গন করেন, এবং সহানুভূতি যোগে সকলের সহিত সখ্যভাব সম্পাদন করেন।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, জৈন, কবীরপন্থী ইত্যাদি সকল ধর্ম্মের সকল শাখা ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ঐক্য এবং মিলন সম্পাদন করিতে ও তাহাদের মধ্যে বিভিন্নতা-প্রতিপাদক বিষয় পরিহার পূর্ব্বক শান্তি সংস্থাপন করিতেই ইনি আসিয়াছেন। পরন্তু সকল ধর্ম্মের মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করাই নববিধানের বিশেষ উদ্দেশ্য।

এই সকল ধর্ম্মের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু ধর্ম্ম, যাহা কিছু নীতি, সকলই নববিধান গ্রহণ করেন। হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব, মুসলমানের মুসলমানত্ব, খৃষ্টানের খৃষ্টত্ব, বৌদ্ধের বৌদ্ধত্ব, বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্ব, সকলই নববিধান-বিশ্বাসীর গ্রহণীয়; সুতরাং হিন্দুর কাছে তিনি হিন্দু, মুসলমানের কাছে তিনি মুসলমান, খৃষ্টানের কাছে তিনি খৃষ্টান, বৌদ্ধের কাছে তিনি বৌদ্ধ, বৈষ্ণবের কাছে তিনি বৈষ্ণব, শাক্তের কাছে তিনি শাক্ত। এইরূপ সকলকারই সহিত সহানুভূতি ও প্রেম-যোগে একতাসাধন করাই নববিধানের সাধন।

তাই সকল ধর্ম্মের সকল সাধন, সকল অনুষ্ঠান, সকল পূজা অর্চ্চনা, সকল শাস্ত্র মন্ত্র, যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, সাধু ভক্ত, মহাপুরুষ, মহাত্মা নববিধানবাদীর বরণীয়, স্তবনীয়, এবং গ্রহণীয়। কাহাকেই তিনি পরিত্যাগ করেন না, এবং সকলকেই আত্মস্থ করিতে ও অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন।

নববিধানবাদী দুর্গোৎসবও করেন, লক্ষ্মীপূজাও করেন, কালীপূজাও করেন, চৈতন্যোৎসব, খৃষ্টোৎসব, মহরম, বুদ্ধোৎসব ইত্যাদি কিছুই পরিহার করেন না; বরং তাহা না করিলে প্রকৃত ধর্ম্মসাধন অপূর্ণ রহিল, ইহাই বিশ্বাস করেন।

সমগ্র মানব-সমাজকে এক অখণ্ড সূত্রে সংগ্রথিত করিতে নববিধান সমাগত। তাই যেখানে যে মানুষ যে ধর্ম্ম অবলম্বনে যে কিছু অনুষ্ঠান করেন, তাহার সহিত সহানুভূতি ও যোগ রক্ষা করা নববিধানের বিশেষ সাধন।

নববিধানের মানুষ,—উদার মানুষ; তিনি কোন জাতি, সম্প্রদায়, দল, বা দেশে আবদ্ধ নন। তিনি যেখানে থাকেন, যেখানে যান, যাহার সহিত মেলেন, সেখানের লোক হইয়া নববিধান সাধনে নিরত হন। মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা নববিধানের প্রধান সঙ্কল্প; তাই ভাইএর সহিত ভ্রাতৃভাব সাধন করিয়া তাঁহার সহিত সমজীবন হইতে হইবে, ইহাই আমাদের সাধন।

নববিধানের মূল ভিত্তি ও মধ্য বিন্দু এক জীবন্ত ঈশ্বর। তাঁহারই উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এবং তাঁহারই পবিত্রাত্মার প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম এবং সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সকল সত্য ও সাধন আমরা গ্রহণ ও অবলম্বন করিব এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের সহিত সখ্যভাব সম্পাদন করিব।

নববিধান সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক হইলেও ইহার বিশেষত্বও আছে; তাই বলিয়া ইহাতে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা স্থান পাইবে না। একেশ্বরে বিশ্বাস ইহার ভিত্তি হইলেও, একেশ্বরবাদী যে কয়টী সম্প্রদায় এ পৃথিবীতে রহিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও সহিত নববিধান পূর্ণভাবে এক নহেন। আর্য্যসমাজ, ইউনিটেরিয়ন, বা বাহাই নাম দিয়া বিভিন্ন একেশ্বরবাদিগণ যে এক একটি দল বা সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত অনেক মতের একতা থাকিলেও কাহারও সহিত নববিধান সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে এক নহেন। ব্রাহ্ম নাম লইয়াও এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা নববিধান বিশ্বাস করেন না। সুতরাং তাঁহাদেরও সাম্প্রদায়িক ভাব আমরা কেমনে স্বীকার করিতে পারি?

নববিধান কোন সমাজ বা দলে নিবদ্ধ নহেন। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে নববিধান উদ্ভূত হইলেও, ব্রাহ্মসমাজ নামে যে বিভিন্ন শাখা বা দল হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহার সহিত নববিধান এক নয়। সর্ব্ব প্রথমে যাঁহার জীবনে বিধাতা নববিধান সঞ্চার করিলেন, তিনি যেরূপ উদার অসাম্প্রদায়িক ভাবে সর্ব্বধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য দর্শন করিলেন, সকল শাস্ত্র এবং সাধুভক্তকে এক অখণ্ড সূত্রে গাঁথিলেন এবং সকল মানবকে আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে গ্রহণ করিলেন, সেইভাবে তাঁহার সহিত সমযোগী সমবিশ্বাসী, সমভক্ত হইয়া আমাদিগকে নববিধান সাধন করিতে হইবে। তিনি নববিধানের মূর্ত্তিমান জীবন [illegible] করিয়া, নববিধানের আচার্য্য ও নেতা হইলেও, তিনি আমাদিগকে তাঁহার সহিত একাঙ্গ ভাই বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, যেন আমরাও তাঁহার সহিত একাত্মা হইয়া পরস্পরের সহিত এবং সকল মানবের সহিত ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে নিবদ্ধ হইতে পারি।

মালা গাঁথিতে হইলে সূত্র যেমন অভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকে, তেমনি নববিধান সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্ব সম্প্রদায়, সর্ব্ব শাস্ত্র, সকল সাধু, ভক্ত এবং মানবের মিলন-সূত্র-স্বরূপ। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত সর্ব্বধর্ম্মের মিলন-সূত্র নববিধান। ইহাকে কোন এক ধর্ম্মমতে বা দলে নিবদ্ধ করিয়া যেন নববিধানের সার্ব্বজনীন উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতা আমরা নষ্ট না করি।

জীবন ও মৃত্যু

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আত্মতত্ত্ববিদ্ কোন শক্তির ঐকান্তিক অভাব স্বীকার করেন না। ভারতবর্ষে আস্তিক ও নাস্তিক যত প্রকার দর্শন-শাস্ত্র আছে, তত্ত্বাবতের মত এক না হইলেও, প্রকৃতির তিনটি মূলশক্তি বা গুণ—সত্ত্ব রজঃ তমঃ সম্বন্ধে কাহারও বিবাদ দেখা যায় না। সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক, রজোগুণ ক্রিয়াত্মক এবং তমোগুণ আবরণাত্মক। এই তিন গুণ পরস্পর বিরোধী হইলেও এক সঙ্গে থাকে, সুতরাং প্রাকৃতিক সমস্ত বস্তুই ত্রিগুণাত্মক। যখন যে গুণ প্রধান হয়, তখন সেই গুণের অধীনে অপর দুই অপ্রধান গুণ কার্য্য করে। এই তিন গুণের বৈষম্য এবং সমবায়ে জড় এবং জীব জগতের সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইতেছে। লয় অর্থে একেবারে ধ্বংস নয়, কিন্তু কোন প্রকার অবস্থায় লীন হয়ে থাকা। অন্ধকার যেমন সমস্ত বস্তুকে ঢেকে রাখে, সেইরূপ আবরণাত্মক তমোগুণও জগৎকে ঢাকিলে লয় বলে। জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির সহিত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের তুলনা করা যাইতে পারে। জীবের এই তিন অবস্থা যেমন ক্রমান্বয়ে চাকার মত ঘুরিতেছে, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ও সেইরূপ ক্রমাগত ঘুরিতেছে। ভারতের দার্শনিকেরা এই সকল শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কোন শক্তির অভাব স্বীকার করেন না, কিন্তু এক শক্তিদ্বারা অপর শক্তি অভিভূত হইয়া থাকে, ইহা স্বীকার করেন। সূর্য্য যেমন আপন কিরণ দ্বারা নক্ষত্রকে অভিভূত করে, সেইরূপ আত্মপ্রকাশে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি অভিভূত হয়। এই আত্মপ্রকাশ বা আত্মজ্ঞানকেই অনেকে মুক্তি [illegible] থাকেন, কিন্তু ভক্ত কেবল আত্মজ্ঞানেই পরিতৃপ্ত নন। [illegible] কেবল ত্রিগুণকে অভিভূত করিয়া তুষ্ট নহেন। তিনি [illegible] পরমাত্মা পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত হইয়া ঐ [illegible]নের সেবায় নিযুক্ত রাখিতে চাহেন, অন্য কোন [illegible] মুক্তি তিনি ইচ্ছা করেন না। আত্মজ্ঞান হইলে মৃত্যুকে [illegible] সত্য, কিন্তু ভক্ত শুধু মৃত্যুঞ্জয় হইয়া থাকিতে চান

না, ভগবানের হাতের যন্ত্র হইয়া ভগবানেরই কাজে নিরত থাকিতে চান।

প্রাচ্য দার্শনিক বলেন, মৃত্যু জীবনী-শক্তির অভাব ; প্রতীচ্য দার্শনিক বলেন, না, ইহা কোন শক্তির অভাব নয়, ইহা ত্রিগুণময়ী প্রাকৃতিক শক্তির কার্য্য। ঐ গুণত্রয়ের বৈষম্য হেতু জগতে জন্ম, মৃত্যু, আবির্ভাব ও তিরোভাব নিত্যই হইতেছে। জীবাত্মা যিনি, তিনি ত্রিগুণাতীত, প্রকৃতির ঊর্দ্ধ স্তরের বস্তু, প্রাকৃতিক শক্তির কার্য্য জন্ম মৃত্যু তাঁহার কাছে পৌঁছিতে পারে না। কিরূপে পঞ্চভূতময় দেহ পঞ্চভূতের দ্বারা রক্ষিত, আবার সেই পঞ্চভূতের দ্বারা বিনষ্ট হয়? যে জল, বায়ু, তেজ না হলে জীবনের রক্ষা হয় না, আবার উহারাই সেই দেহনাশের কারণ হয় কিরূপে? প্রাচ্য পণ্ডিতেরা বলেন, জীবনী-শক্তি এই মারাত্মক শক্তি সকলকে দেহ-রক্ষার্থ উপযোগী করিয়া লয় এবং সেই জীবনী শক্তির অভাবে ঐ মারাত্মক শক্তি সকল জীবনকে নাশ করে। প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা বলেন, যখন দেহের জীবন প্রাকৃতিক শক্তির উপরেই নির্ভর করে, জীবদেহ যখন অন্য জীবদেহ গ্রাস না করিলে রক্ষা হয় না, তখন জীবনী শক্তির অপর প্রাকৃতিক শক্তির উপরে কি অধিকার থাকিতে পারে? আরও এক কথা এই, জীবনী-শক্তি কাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া দেহে থাকে এবং দেহত্যাগ করে? অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই প্রাকৃতিক জীবনী-শক্তির অপেক্ষা অধিকতর বলবতী শক্তি আছে, যে শক্তি এই সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে পরাজিত এবং পরিচালিত করিতে পারে—সেই শক্তি জড়শক্তি নয়, চৈতন্যময়ী আত্মশক্তি। জীব যখন অহঙ্কারের বশে প্রকৃতির খেলাকে আপনার খেলা মনে করে, তখন সে প্রাকৃতিক বদ্ধ জীব ; সংসারের সুখ দুঃখ, জীবন মরণ দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া শান্তির অন্বেষণে অশান্তি ভোগ করে। দেহকেই আত্মা মনে করিয়া সদাই ভয় ও ভাবনায় কাল কাটায়। আর যখন সে আপনাকে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র জানে, তখন সে সকল প্রকার দ্বন্দ্বের, জীবন মরণের অতীত অজর, অমর, অক্ষর আত্মার দর্শনে প্রশান্ত হয়। তখন সে প্রকৃতির খেলাকে আর আপনার খেলা মনে করে না, সে ঐ খেলা দেখে, খেলার সঙ্গী হয় না। ইহাতেও মানুষের অহঙ্কার যায়না, পরে যখন সে এই আত্মার নিয়ন্তা পরমাত্মার বা পুরুষোত্তমের সন্ধান পায়, তখন সে আপনাকে নিয়ন্তার হাতের পুঁতুল অনুভব করে। নিরহঙ্কারী হইয়া, তিনি যেমন সাজান তেমনি সাজে, যেমন করান তেমনি করে, "আমি আমার" বলিবার স্বাতন্ত্র্য কিছুই থাকে না।

জগতের বাহিরের দিকটা ভীষণ বিরোধ-পূর্ণ বোধ হইলেও ভিতরের দিকটা অতিশয় মধুর, প্রেম-পূর্ণ। সমুদ্রের উপরে মারাত্মক ঢেউ থাকিলেও ভিতর স্থির এবং রত্নপূর্ণ। জগতের বাহিরে নানা প্রকার ধ্বংস-লীলা দেখিয়া যাহারা ইহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে অক্ষম, তাহারা এই বিরোধের সহজ সমাধান করিয়াছে। তাহাদের বিবেচনায় যাহা ভাল, তাহা ঈশ্বরের কার্য্য, আর যাহা মন্দ, তাহা সয়তানের কার্য্য, এইরূপ দেব ও দানব দুইজনকে স্বীকার করায়, এই বিরোধের সমাধান না হইয়া আরও বাড়িয়াছে। অধিকাংশ ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বর ও সয়তান দুইজনকে মানিয়া, ঈশ্বরের দয়াস্বরূপ বজায় রাখিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে দেব দানবের যুদ্ধ বিগ্রহ কিছুই কমে নাই। একমাত্র ঔপনিষদধর্ম্ম ইহার তত্ত্ব বুঝিয়া, দৃঢ় বিশ্বাস ও সাহসের সহিত প্রচার করিয়াছে যে, একই ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা। যিনি জগতের ঈশ্বর, সর্ব্বজীবের লালন-পালন-কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, সকলের হিতকারী, প্রেম-স্বরূপ, তিনিই আবার সকলের ধ্বংসকারী ভীষণ কাল। যিনই শিব, তিনিই রুদ্র ; যিনিই শ্মশান-কালী, তিনিই স্নেহময়ী জগদম্বা। যে সূর্য্য তাপ দেয়, সেই সূর্য্যই জল দেয়। যে কাল নিধন করে, সেই কালই বর্দ্ধন করে। এই দ্বন্দ্বের যথা মাত্রায় অস্বচ্ছ স্বচ্ছ হয়, অপ্রকাশ প্রকাশ হয়, মরণ জীবন হয়। এই দ্বন্দ্বের মিলনে বিপদে সম্পদে, সুখে দুঃখে, জীবনে মরণে, প্রত্যেক ঘটনাতে দয়াময়ের দয়া উজ্জল হইতে উজ্জলতর ভাবে প্রকাশ পায়। জীবন মরণ উভয়ই দয়াময়ের দয়া কীর্ত্তন করে। শ্রীহরির এই বিশ্বরূপ দেখিয়া ব্রহ্মদর্শী বলেন, "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" "হে দেব যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে এই ভীষণ মৃত্যুর মুখোষটা খুলে তোমার সেই ভুবন ভুলান মুখ খানি দেখাও। আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, আবার বলি, সহস্রবার বলি, নিত্যই বলি, দয়াময়, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

যাঁহারা নিজ বুদ্ধিদ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, তাঁহারা বৌদ্ধ নামে খ্যাত এবং যাঁহারা ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়া শ্রীবিষ্ণুপদাশ্রিত, তাঁহারা বৈষ্ণব নামে বিখ্যাত। এখন এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি, জানা আবশ্যক ; কেন না, আমরা বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া প্রায়ই ভুলিয়া যাই। জড়ে ও জীবে যেরূপ প্রভেদ, বৌদ্ধে ও বৈষ্ণবে সেইরূপ। একের উন্নতি বাহির হইতে, অপরের উন্নতি ভিতর হইতে। ভূপতির শিরোভূষণ এক টুকরো হীরা হইতে সকলের পদদলিত একটা ঘাসের প্রভেদ কি? উভয়েই পঞ্চভূতময়, উভয়েই পদার্থ-বিধির অধীন। উভয়েই দেখিতে সুন্দর, বরং হীরার চমকে চিত্ত চমৎকৃত হয়। তথাপি ঐ তৃণ-খণ্ডের মধ্যে একটী এরূপ নিগূঢ় বস্তু আছে, যাহা ঐ হীরক-খণ্ডে নাই। সেই নিগূঢ় বস্তুটী জীবন, যাহা তৃণের আছে, হীরকের নাই। ইহা ঘাসের আছে, কিন্তু হীরার নাই। এই জীবনের জন্যই ঐ ঘাস উজ্জল হীরা হইতে এক স্বতন্ত্র পদার্থ এবং মানুষ ছাড়া সকল জীবেরই অতিশয় আদরণীয়। হীরাকে পায়ে ঠেলে সকল

জীবই ঘাসের উপরে শুয়ে ব'সে কতই আরাম পায়, আবার কোন কোন জীব উহা খেয়ে প্রাণ বাঁচায়। বৈষ্ণব আপনার জীবন অন্তরতম পুরুষোত্তমে নির্ভর-পূর্ব্বক অনন্তকাল অমৃত-রস-পানে সঞ্জীবিত, বৌদ্ধ বাহ্য জন-সমাজ হইতে মনুষ্যোপার্জ্জিত বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, ধন সম্পত্তি সংগ্রহ করিয়া বিভূষিত হয়। মণি-মাণিক্য-খচিত, বিবিধবর্ণে রঞ্জিত, বিবিধ ভূষণ দ্বারা বিভূষিত দেহ, দেহের জীবন রক্ষা করিতে পারে না। শব দেহকে বিভূষিত করিলে তাহার সৌন্দর্য্য কতক্ষণ থাকে? বৈষ্ণব কোন এক বাহ্য শক্তির উৎকর্ষ-সাধনের বা পরিমাণের ফল নয়, কিন্তু কোন এক স্বতন্ত্র আত্মার শক্তির গুণের, পুরুষোত্তমের সহিত সম্মিলনের ফল। ইহাই মৃত্যুর অতীত অনন্ত আনন্দ-পূর্ণ জীবন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহলধর সেন।

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের সঙ্গে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সকল সময়েই আমার খোঁজ খবর লইতেন। আমি কখন কি করি, কোথায় যাই, তাহারও অনুসন্ধান রাখিতেন এবং আমার সকল সৎ উদ্যমে উৎসাহ দান করিতেন।

আমি কিছুদিনের জন্য ব্রতের ভাবে মেডিক্যাল কলেজের হাঁসপাতালে রোগীদের দেখা শুনা করিতে ও তাহাদের অভাবাদির অনুসন্ধান করিয়া যদি কিছু সেবা করিতে পারি, তাহার জন্য প্রায় প্রতিদিন যাইতাম। কে কেমন আছে, আলাপ পরিচয় করিতাম, কাহারও কাছে একটু কিছু পড়িয়া শুনাইতাম, কাহারও বাড়ীতে চিঠি লিখিয়া দিবার আবশ্যক হইলে তাহা লিখিয়া দিতাম। কাহারও কিছু খাবার বা ফল কিনিয়া আনিয়া দিতাম। কাহারও বেশী কষ্ট হইতেছে দেখিলে, ডাক্তারকে বা সেবকাকে ডাকিয়া আনিয়া দিতাম। শ্রীকেশবচন্দ্র কাহার নিকট এই সংবাদ পাইয়া, একদিন কতকগুলি হাত পাখা কিনিয়া আনিয়া হাঁসপাতালের রোগীদের বিতরণ করিবার জন্য দিলেন। ইহাতে আমি কতই যে উৎসাহিত হইলাম ও আপনাকে ধন্য মনে করিলাম, বলিতে পারি না।

যে দিন "হোম" অনুষ্ঠান প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, সে দিন আমি আমার পল্লীভবনে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিলে, শ্রীকেশবচন্দ্র আমাকে সে উপলক্ষে না দেখিতে পাইয়া, আমি যে একটা বিশেষ অনুষ্ঠান সাধনের সুযোগ হারাইয়াছি, তা বলিয়া দুঃখ করিলেন।

পর সপ্তাহে "জল-সংস্কারের" অনুষ্ঠান উপলক্ষে, স্বয়ং আমার মাথায় অতি পবিত্র ভাবে এবং আদর পূর্ব্বক সুবাসিত তৈল মর্দ্দন করিয়া দেন। সে সময়ে যে ভাবে আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ ধরিয়া তৈল মর্দ্দন করেন, তাহা এখন স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তৈল মাখাইয়া কমলসরোবরের ঘাটে বসাইয়া কুণ্ড হইতে জল ঢালিয়া যে অভিষেক দান করেন, তাহাতে সত্যই তখন সকল পাপ ধৌত হইল মনে হইয়াছিল। এইরূপে প্রচারক মহাশয়দিগের ও আমাদের দলের যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সকলের অভিষেকান্তে মহিলাদিগেরও জল-সংস্কার হয়। সে সময় আমরা চলিয়া আসিয়াছিলাম।

যখন আচার্য্যদেবের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর বিবাহের সম্বন্ধ হয়, প্রথম আমাদের পরিচিত একজনের সঙ্গে সম্বন্ধের কথা হয়। তাঁহাকে আমি চিনিতাম, তাঁর যৌবন-সুলভ-স্বভাব সম্বন্ধে আমার কিছু জানা ছিল। সম্বন্ধের প্রস্তাব শুনিয়া আমি শ্রীকেশবচন্দ্রকে তাঁহার কথা কিছু বলি, তাহাতে সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। সেই সময়ে কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া বিলাত হইতে আগমন করেন, পরমহংস দেবের নিকট যাইবার সময় ষ্টীমারে তাঁহার সঙ্গে আমাদের আলাপ পরিচয় হয়। তাঁহাকে অতি শিষ্ট ও শান্ত-প্রকৃতির যুবা দেখিয়া তাঁর প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ হয়। তাই আচার্য্যদেবকে তাঁর কথা বলিয়া বিবাহের সম্বন্ধ করিতে অনুরোধ করি। কথাবার্ত্তা ঠিক হইলে যে দিন পাকা দেখা হয়, যুবাদের মধ্যে স্বর্গীয় নলীনবিহারী সরকারকে ও আমাকে অনুষ্ঠানে যোগদান ও প্রীতি-ভোজন করিতে আচার্য্যদেব নিমন্ত্রণ করেন। যুবকদলের অন্য কাহারও সে নিমন্ত্রণের সৌভাগ্য হয় নাই।

একদিন আচার্য্য কেশবচন্দ্র কি কথায় কথায় আমাকে বলেন, "দেখ তোমারই মত এক সময় আমি রোগা ছিলাম।" আমি তখনই তদুত্তরে বলিলাম, "তবে ত আমার আশা আছে"। তিনি বলিলেন, "আশা আছে বই কি।" দেহ সম্বন্ধে সে আশা পূর্ণ হইবে কিনা জানি না, আত্মা ও মন সম্বন্ধে সে আশা পূর্ণ হইলেই কৃতার্থ হইব।

একবার আমেরিকার "Presidents Words" নামে একখানি পুস্তক দেখাইয়া আচার্য্যদেব বলিলেন, 'আমার উপদেশ থেকে এমনই করে সার-সংগ্রহ যদি কর্ত্তে পার, ভাল হয়।" তখন জীবনবেদ ফর্ম্মায় ফর্ম্মায় ছাপা হইতেছিল, কয়েক ফর্ম্মা আমাকে তখনই দিলেন। আচার্য্যের এই ইচ্ছা পালন করা আমার জীবনের একটি বিশেষ ব্রত মনে করি। দেখি, মা যদি তাহাতে কৃতকার্য্য করেন, ধন্য হইব।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব নববৃন্দাবন নাটক অভিনয় সময়ে বোধ হয় দুইবার ও যখন মতিরায়ের যাত্রা হয় তখন আচার্য্য-ভবনে আসিয়াছিলেন। আর একবার ষ্টীমারে করিয়া আচার্য্যদেব সঙ্গে আমরা দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে পৌঁছিবামাত্র, পরমহংস শ্রীকেশবচন্দ্রকে একেবারে আলিঙ্গন করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি শ্যাম আমি রাধা, আমি রাধা তুমি শ্যাম, তুমি শ্যাম আমি রাধা, আমি রাধা তুমি শ্যাম" বার বার এই কথা বলিতে বলিতে একেবারে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র যখন কোন ইংরাজের সঙ্গে দেখা শুনা করিতে বা ইংরাজী বক্তৃতা দিতে বা কোন প্রকাশ্য সভা সমিতিতে যাইতেন, চোগা চাপকান পরিয়া যাইতেন। আবার হরিনাম করিতে বা উপাসনাদি করিতে যখন যাইতেন, কাপড় পরিয়া গৈরিক গায়ে দিয়া যাইতেন। গৈরিক কিন্তু কখনও পরিধেয় রূপে ব্যবহার করিতেন না। হরিনাম করিতে যাইতে হইলে প্রায় খালি পায়েই যাইতেন।

একবার অকস্‌ফোর্ড মিশনের প্রচারকগণ আমাদিগকে "At Home" এ নিমন্ত্রণ করেন। শ্রীকেশবচন্দ্র যথারীতি চোগা চাপকান পরিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করেন, ও মিশনারী বন্ধুদের সঙ্গে কতই ধর্ম্মালাপ করেন। আবার সেখান হইতে ফিরিয়া কমল কুটীরে আসিয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, গৈরিক গায়ে নগ্নপদে সঙ্গীতাচার্য্য-প্রমুখ সদলে আমাদিগকে লইয়া পথে হরিনাম করিতে করিতে অকস্‌ফোর্ড মিশন হাউসে উপনীত হইয়া সংকীর্ত্তন করেন। সাহেবেরা দ্বারে আসিয়া অভ্যর্থনা করেন। তখন বৌবাজার ষ্ট্রীটে অকস্‌ফোর্ড মিশন হাউস ছিল।

গাজীপুর-প্রবাসী স্বর্গগত নিত্যগোপাল রায় বলিয়াছিলেন, তিনি আচার্য্য কেশবচন্দ্রের শ্রীমুখাৎ নিম্নলিখিত উক্তিগুলি শ্রবণ করিয়াছিলেন :—

(১) "খৃষ্টের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আমি খৃষ্টের Footnote।"

(২) "বিরোধিগণ যদি আমার সঙ্গে মিলে ১২ দিন উপাসনা করেন, নিশ্চয় মিলন হয়।"

(৩) "যেখানে আমার পিতার মন্দির, আমি সেইখানেই প্রণাম করি"। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের সম্মুখে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গিয়া যে সময় প্রণাম করেন, তাহার পর তপোবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই দিন কমলকুটীরে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, "উহারা মন্দিরের দ্বার বন্ধ না করিলে মিলন অনেক এগিয়ে যেতো।"

(৪) ডায়েবিটিস রোগাক্রান্ত হইলে দিল্লীর হাকিম জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি কোন বিশেষ শোক পাইয়াছিলেন? তাহার উত্তরে আচার্য্য বলিয়াছিলেন, "অঘোরের শোকের কথা তখন মনে পড়িয়াছিল, তাই বলেছিলাম।"

(৫) "আমার আমার চেয়ে Characterএ জীবনে বড়, যদিও আমি Positionএ বড়।"

(৬) "সব ভক্তেরা, সব ধর্ম্ম ক্রমে এগুচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে।"

(৭) "এখন এমন হবে যে, এক একজন ঘরের ভিতর বসে থাকবেন, আর যারা বাহিরে থেকে তাঁদের দেখবে, তারাও তাঁদের নিশ্বাসে শুদ্ধ হয়ে যাবে।"

অনুগৃহীত।

শ্রীমদ্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব।

কলিকাতা।

গত ১৯শে নভেম্বর, শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জন্মোৎসব উপলক্ষে, প্রত্যুষে ভাই প্রিয়নাথ বন্ধু সহ আচার্য্যদেবের কলুটোলার ভবনে উষাকীর্ত্তন করিয়া জন্মগৃহদ্বারে প্রার্থনা করেন। পরিবারস্থ অনেকে আসিয়া তাহাতে যোগদান করেন। পরে ৭।৹ টায় কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনার কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়া বালিকাবিদ্যালয়ে মেয়েদের উদ্‌যোগে কল্পতরুর অনুষ্ঠান হয়।

সন্ধ্যার পর ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আলোচনাদি হয়। প্রথমে সঙ্গীত হয়, সঙ্গীতান্তে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন। তৎপর হরিসেনার শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য আপনার চক্ষে যেরূপ দেখিয়াছেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনের বিশেষ বিশেষ কথা অতি শ্রদ্ধার সহিত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন কমলকুটীরের বাড়ীর নিম্নের বাহিরের বারান্দায় অথবা কড়ি বারান্দায় তাঁহারা কয়টী বন্ধু মিলিয়া "বন্ধুতা" বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় কেশবচন্দ্র উপর হইতে নামিয়া আসিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ বিষয়ে আলোচনা হইতেছে? উত্তর হইল, "বন্ধুতা" বিষয়ে। তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে একজন অপর একজনকে এমন বন্ধুরূপে পাইয়াছ কি, যাঁহার উপর আপনার স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলের ভার অর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, তোমার প্রয়োজন হইলে, কোন দূর দেশে চলিয়া যাইতে পার? দেখ, এই সহরে অনেকে বাস করেন, প্রয়োজন হইলে একজন অপর বন্ধুর উপর আপনার স্ত্রী পরিবারের ভার রাখিয়া দূর স্থানে চলিয়া যান; তোমাদের মধ্যে কি এমন বন্ধুতা জন্মিয়াছে? কেশব চন্দ্র আরও বলিলেন, যখন প্রিয়জনের জুতাটীও মিষ্ট বোধ হয়, তখন বলি, যথার্থ বন্ধুতা। বক্তা বলিলেন, ব্রহ্মানন্দের এই শেষ কথার জীবন্ত সাক্ষ্য তিনি পরবর্ত্তী সময়ে পাইয়াছেন। মহাজনগণের বাক্য যে বৃথা হয় না, তাহার জীবন্ত প্রমাণ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বক্তা বলিলেন, ব্রহ্মানন্দের এ কথার অনেক দিন পরে তাঁহার পরিচিত কোন পরিবারের একটী বিধবা কন্যার সঙ্গে তাঁহার কথাবার্ত্তা হয়। কন্যাটী ১৪বৎসরের সময় বিধবা হয়। কন্যার আত্মীয় স্বজন তাহার পরলোকগত স্বামীর জিনিষপত্র স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ যাহা কিছু তাহারা পাইল, কন্যার নিকট হইতে সরাইয়া তাহার চক্ষু মনের অগোচর করিল, পাছে সে সকল দেখিয়া ও স্মরণ করিয়া কন্যার মনে শোক দুঃখ উপস্থিত

হয়। কন্তার নিকট তাহার স্বামীর এক জোড়া জুতা ছিল, কন্যা গোপনে সেই জুতা যত্ন করিয়া আপনার বাক্সে রাখিয়া দিয়াছিল। কন্যাটীর বিধবা হওয়ার অনেক দিন পরেই সম্ভবতঃ এই বক্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে এই সব কথাবার্ত্তা হইতেছিল। কন্যাটী মনের গভীর কথা বলিতে গিয়া বলিল, সংসারে একটী সামগ্রী মাত্র আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, সেটী আমার স্বর্গগত স্বামীর জুতা, স্বামীর ঐ নিদর্শন টুকু আমার আছে, উহাই আমার অতি প্রিয়। বক্তা বলিলেন, মহাজনগণ যাহা বলেন, তাহা কেমন সত্য, এই ঘটনায় তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। তৎপর বক্তা কেশবচন্দ্রের ভক্তি প্রেমোন্মত্ততার কথা উল্লেখ করিয়া, স্বচক্ষে যেরূপ দেখিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করিয়া বলিলেন, ছেলে, যুবক, বৃদ্ধগণ বিভিন্ন চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রমত্তভাবে নৃত্য করিতেছে, শরীরের অসুস্থতা সত্ত্বেও ভক্ত কেশবচন্দ্র বীরবেশে কি যে উন্মত্ততার সহিত নৃত্য করিতেন, তাঁহার সেই উন্মত্ততার দিব্য স্পর্শে সকলের জীবনে ভক্তির নৃত্য, উন্মত্ততা স্ফুরিত হইত। বীডেন পার্কে তাঁহার শেষ বক্তৃতা কালে তাঁহার শরীর নিতান্ত ভগ্ন ছিল, কিন্তু তাঁহাকে থামায় কে? এক একবার গাড়ী লইয়া বসান হয়, কীর্ত্তনের ভাবে আত্মহারা হইয়া সেই শরীরে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়েন, ধরিয়া রাখা যায় না। এ ভক্তবীর শ্রীগৌরাঙ্গের মহাভাবের মত্ততা।

তৎপর শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ রায় কেশবচন্দ্রের দয়া ও সেবার বিষয় স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, অনেক ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন। কেশবচন্দ্রেরই নিদেশে স্বর্গগত ভাই উমানাথ গুপ্ত অনেক দুস্থ বা বিপদ্‌গ্রস্ত লোকের সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সেবা শিক্ষা করেন; স্বর্গগত ভাই অমৃতলাল বসু কেশবচন্দ্রের নিদেশে নিঃস্বার্থ ভাবে পরের বালক বালিকার শিক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত হন ইত্যাদি। আর একটী বন্ধুও, কেশবচন্দ্রের বৈরাগ্য বিষয়ে, স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা বলেন।

তৎপর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বসু বলেন। কেশবচন্দ্র যে আপনাকে "আশার চন্দ্র" "মিশ্রির দানা" বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন, দেবেন্ বাবু সেই সব কথা উল্লেখ করিয়া, কেশবচন্দ্রকে কি ভাবে সকলের গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা ব্যাখ্যা করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যানন্দ রায় কেশব চন্দ্রের বিষয় বলিতে গিয়া বলেন, অনেকে বলিয়া থাকেন, "তোমরা বড় কেশব কেশব কর", কিন্তু আমি বলি, কেশবচন্দ্রের কথা এখনও কিছু বলা হয় নাই। এদেশ তাঁহাকে লইতেছেনা, তাঁহাকে বুঝিতেছে না, তাঁহার কথা শুনিতে চাহিতেছে না, কিন্তু বিদেশে, এমেরিকা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার প্রভাব, তাঁহার Spirit কিরূপ কার্য্য করিতেছে, তাহা উল্লেখ করিয়া নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

তৎপর শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন ঘোষ উৎসাহের সহিত কেশবচন্দ্রের কথা বলিতে যাইয়া বলেন, তাঁহার পিতা কেশবচন্দ্রের প্রভাবাধীনে বিশেষ শিক্ষা ও উপকার লাভ করিয়াছিলেন, তিনি নিজেও কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা উপদেশাদি পাঠ করিয়া বিশেষ শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করিয়াছেন। তিনি যে কোন Public স্থানে বক্তৃতা কালে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা হইতে অনেক উক্তি আবৃত্তি করিয়া বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন। কেশবচন্দ্রের উক্তি, কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা তাঁহার এতই ভাল লাগে যে, কেশব চন্দ্রের অনেক বক্তৃতার বিশেষ বিশেষ অংশ তিনি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। এই কথা বলিয়া কেশব চন্দ্রের ইংরেজি কোন কোন বক্তৃতার অনেক অংশ অনর্গল অতি আবেগের সহিত বলিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের বিশেষ চিত্ত আকর্ষণ করেন।

ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ সর্ব্বশেষে বলেন। তিনি বলেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে স্বচক্ষে দেখিয়া, তাঁহার জীবনের সাক্ষাৎ দেখা বিষয় গুলি যাঁহারা বলিলেন, তাঁহাদের সে সকল মূল্যবান কথায় আমাদের চিত্তকে বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছে। কেশব চন্দ্রের সাক্ষাৎ দর্শন আমার ভাগ্যে হয় নাই। চর্ম্মচক্ষে দেখা হয় নাই, মনের চক্ষে প্রথমে তাঁহার দেখা আমার জীবনে কিরূপে হইয়াছিল, তাহা একটু উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হয়। আমি আমার প্রথম জীবনে কিছুদিন সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তর্গত ছিলাম। আরাধনার শ্লোকটীতে যেরূপ স্বরূপের পর্য্যায় আছে, সেই পর্য্যায় অনুসারে আরাধনা করিতাম। এ আরাধনায় আমার প্রাণে তেমন তৃপ্ত হইতনা, একটা অভাব বোধ হইত। মনে হইত, আমার তো ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ মাত্র, হয়তো আমার জীবনের অপরিপক্কতা জন্যই এ অভাব ও অতৃপ্তি বোধ হইতেছে; নয়তো অল্পদিনের ব্রাহ্ম-সমাজ, ব্রাহ্ম-সমাজের এ সাধন-প্রণালীতেই বিশেষ কোন অপূর্ণতা রহিয়াছে, সময়ে তাহার পূর্ণতা সাধিত হইবে। আমার মনের মধ্যে যখন ক্রমাগত এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময় জানিতে পারিলাম, ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র তাঁহার পরিণত জীবনে স্বরূপারাধনার নূতন Order অর্থাৎ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। আমি বাহিরে কোন আন্দোলন বা আলোচনা দ্বারা, ব্রহ্মানন্দ-প্রবর্ত্তিত আরাধনাপর্য্যায়ের সার্থকতা অথবা উপযোগিতা কি, বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, আমার নির্জ্জন উপাসনায় ঐ কেশব-প্রবর্ত্তিত প্রণালী অবলম্বনে উপাসনা করিয়া, উহার উপযোগিতা বা সার্থকতা বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্রমাগত কিছু সময় এইরূপে নির্জ্জনে এই স্বরূপ-পর্য্যায় ধরিয়া উপাসনা করিতেছি, একদিন উপাসনা-কালে এই নব পর্য্যায় অনুসারে স্বরূপারাধনার উপযোগিতা বিশেষ মৌলিক ভাবে আমার নিকট প্রকাশিত হইল। দেখিলাম, পুণ্য-স্বরূপের পর যে আনন্দ-স্বরূপের ধারণা, ইহা আত্মার গ্রহণের পক্ষে

অতি স্বাভাবিক, অত্যন্ত উপযোগী। মনে হইল, প্রথমে নানা সময়ে ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদের মধ্য হইতে আরাধনার স্বরূপগুলি সংগ্রহ করিয়া শ্লোকে ছন্দোবন্দে যোজনা করা হইয়াছিল, তখন তো বিভিন্ন স্বরূপের প্রকৃত্তর স্বাদ গ্রহণ করিয়া একটী স্বরূপের পর অন্য একটী স্বরূপ শ্লোকে যোজনা করা হয় নাই। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র দীর্ঘ জীবনের সাধন দ্বারা প্রত্যেক স্বরূপের স্বাদ গ্রহণ করিয়া, প্রত্যেক স্বরূপের বিশেষত্ব প্রণিধান করিয়া, কোন স্বরূপের পর কোন স্বরূপ আরাধনার গ্রহণের বিষয় হইলে আত্মার পক্ষে গ্রহণ স্বাভাবিক হয়, এক স্বরূপের আরাধনা আত্মাকে প্রস্তুত করিয়া তাহার পরবর্ত্তী স্বরূপের আরাধনা করিতে, পরবর্ত্তী স্বরূপে সহজে প্রবেশ ও তাহার আস্বাদন করিতে কেমন সহায়তা করিতে পারে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই স্বরূপারাধনায় নূতন পর্য্যায়ের প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন, এইটী আমার অন্তরে সহজে সিদ্ধান্তের বিষয় হইল এবং ইহা দ্বারা আমার প্রাণ স্বীকার করিল, ব্রহ্মানন্দ এ যুগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক। এইরূপে বাহিরের চক্ষে নয়, অন্তশ্চক্ষে তাঁহাকে আমার প্রথমে দেখা হইল অথবা জানা হইল। দেখিলাম, এই সাধন-প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার। হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের সাধন-প্রণালীর বিষয়ে আমার যাহা জানা ছিল, তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলাম, এ এক স্বতন্ত্র প্রণালী, এ এই নবযুগের সাধন-ক্ষেত্রের নূতন প্রণালী, ইহা স্বর্গের নূতন বিধি। যেখানে নূতন ধর্ম্ম-বিধি সমাগত হয়, সেখানে সে ধর্ম্মের উপাসনা-প্রণালী নূতন হইবেই। এই নূতন উপাসনা-প্রণালীই নবধর্ম্মের গোড়ার আয়োজন। এই উপাসনা-প্রণালীর নূতনত্ব দেখিয়া আমি নবযুগের ধর্ম্মকে নববিধান বলিয়া স্বীকার করিলাম, এবং তাহার অল্প দিন পরে সাধারণ সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নববিধান সমাজে আসিলাম। কেশবচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত উপাসনা-প্রণালী আমার জীবনের উপাসনা-প্রণালী হইয়াছে, তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম আমার জীবনের ধর্ম্ম হইয়াছে। বৈষ্ণব সাধুগণের মধ্যে কথা আছে—"যদি গৌর না হত, কি জানি কি হত, কেমনে ধরিতাম জী"; তেমনই আমাকে বা আমাদিগকে বলিতে হয়, "যদি কেশব না হত, কি জানি কি হত, কেমনে ধরিতাম জী"। বৈষ্ণব সাধুগণ কি ভাবে বলিতেন, "যদি গৌর না হত, কি জানি কি হত, কেমনে ধরিতাম জী", তাহা একটু আলোচনা করিয়া বুঝা প্রয়োজন। বৈষ্ণব সাধুগণ শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া, তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাধন ভজন অনুসরণ করতঃ যখন জীবনে শুদ্ধা ভক্তির স্বাদ পাইলেন, ক্রমে তাঁহাদের জীবনে সেই ভক্তি গঙ্গা প্রবাহিত হইল, তাঁহাদের জীবনকে সরস, সুন্দর ও স্বর্গীয় করিয়া তুলিল, তখন পূর্ব্ব নিকৃষ্ট হীন মলিন জীবনের সহিত তাঁহাদের ভক্তিপথে অর্জ্জিত নব জীবনের তুলনা করিয়া সত্যই তাঁহারা বলিতে বাধ্য হইলেন, "যদি গৌর না হত, কি জানি কি হত, কেমন ধরিতাম জী"। আমি এবং আমার মত নববিধান-ক্ষেত্রে যাঁহারা, আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব, কেশবচন্দ্রের জীবনে লব্ধ ধর্ম্ম কত উচ্চ এবং আমাদের জীবনের ধর্ম্ম সে তুলনায় কতদূর নীচে; কিন্তু আমরা যাহা ছিলাম এবং বর্ত্তমানে আমাদের জীবন কেশবচন্দ্রের পথ ধরিয়া যাহা হইয়াছে এবং সেই পথের উচ্চ নিয়তি ও কেশবচন্দ্রের জীবনের উচ্চ ধর্ম্ম যাহা আমাদের মানস চক্ষে ঈশ্বরালোকে প্রকাশিত হইতেছে, এই তিনটী অবস্থার সঙ্গে একটু তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদিগকে কি বলিতে হয় না, "যদি কেশব না হত, কি জানি কি হত, কেমনে ধরিতাম জী"?

কেশবচন্দ্রের জীবন-সম্বন্ধে আর একটী কথার উল্লেখ করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। সর্ব্বশক্তিমান পরম দয়ালু ঈশ্বর আমাদের উপাস্য দেবতা, কোন মধ্যবর্ত্তী কাহাকেও অবলম্বন না করিয়া আমরা প্রত্যেকে সাক্ষাৎ ভাবে সেই ঈশ্বরোপসনার অধিকার পাইয়াছি। ইহা আমাদের কত শ্রেষ্ঠ অধিকার। সর্ব্বশক্তিমান পরম দয়ালু ঈশ্বর কি আমাদের জীবনের উন্নতি কি পরিত্রাণের পক্ষে যথেষ্ট আয়োজন ও উপায় নন? কেশবচন্দ্র ইহার মধ্যে সাধুভক্তের জীবন-গ্রহণের ব্যবস্থা আনিয়া এক দিকে ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরবকে খর্ব্ব করিয়াছেন, অপর দিকে আমাদের ব্যক্তিত্বকে, ব্যক্তিগত জীবনের বিশিষ্ট অধিকারকে খর্ব্ব করিয়াছেন, এই একটী কথা উঠিয়াছে। এ অভিযোগ কতদূর সত্য, একটু আলোচনা করিয়া দেখি।

আমরা যখন একটু ধর্ম্ম-লাভের জন্য পিপাসু হই, ধীরে ধীরে ধর্ম্ম-পথে চলিতে আরম্ভ করি, কাহার না ইচ্ছা হয়, একটু সৎসঙ্গ, একটু সাধু-সঙ্গ করি। আমা অপেক্ষা একটু অধিক জ্ঞানী, অধিক ভক্ত, অধিক ধার্ম্মিক লোক পাইলেই তাঁহার নিকট একটু বসিতে, তাঁহার সঙ্গ একটু করিতে ইচ্ছা হয়। এ প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, ভেবে গুণে ইহা করিতে হয়না। সহজে, স্বভাবের নিয়মে আমরা একটু সাধু-সঙ্গ করি, তাহাতে লাভবান্ হই। লোকে বলে, ঈশ্বর-কৃপাতে সাধু-সঙ্গ-লাভ হয়। সাধু-সঙ্গের প্রয়োজনীয়তা ও মহিমা চিরদিন কীর্ত্তিত হইতেছে। লোকে বলে, "যদি তীর্থে যাও, তবে অন্ততঃ তিনদিন তীর্থে বাস করিও"। ইহা আমাদের প্রাচীন সমাজের কথা। তিন দিন তীর্থ-বাস না করিলে তীর্থে যাওয়া বিফল। ইহার অর্থ এই যে, তীর্থে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য, শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, সাধু-সঙ্গ করা। শুধু তীর্থস্থানে গিয়া গঙ্গা কি যমুনার জলে অবগাহন করিলে, কি দান ধ্যানাদি করিলে, যথার্থ তীর্থ-গমনের ফল হয় না। সাধু সঙ্গ করিলে তীর্থ-গমনের উদ্দেশ্য সফল হয়। এক মুহূর্ত্ত সাধুর নিকট বসিলে সাধু-সঙ্গ হয় না; অন্ততঃ তিন দিন সাধু-সঙ্গে বাস করিলে তবে কথঞ্চিৎ সাধুসঙ্গ করা হয় এবং

তাহাতেই তীর্থ-গমনের যথার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এ বিষয়ে একটী বিশেষ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। আপনারা জানেন, শ্রীগৌরাঙ্গের তিরোধানের অল্পদিন পর বঙ্গে বৈষ্ণব সমাজে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর নামে দুইজন ব্রতধারী বৈষ্ণব প্রচারক ও সহসাধক এবং পরস্পর বিশেষ অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম-বন্ধু ছিলেন। শ্রীনিবাস জ্যেষ্ঠ, নরোত্তম কনিষ্ঠ, ধর্ম্ম-ক্ষেত্রের গণনাই বলিতেছি। এক সময় শ্রীনিবাসের ইচ্ছা হইল, তিনি বৃন্দাবন যান। কার না ইচ্ছা হয়, তীর্থ-পথে প্রাণের প্রিয়জন ও অন্তরঙ্গ সহসাধক সঙ্গী পাইতে? কত সম্ভোগ ও কৃতার্থতার সম্ভাবনা, এরূপ সঙ্গ পাইলে। তাই শ্রীনিবাস শ্রীনরোত্তমকে জানাইলেন, তিনি যদি বৃন্দাবন-গমনে শ্রীনিবাসের সঙ্গী হন। এ সময় বৃন্দাবনের রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী প্রভৃতি বড় বড় সাধুগণের তিরোধান হইয়াছিল। নরোত্তম প্রত্যুত্তরে বলিলেন, বৃন্দাবনে এখন আর তেমন সাধু-সঙ্গ নাই, শুধু তীর্থ বলিয়া তীর্থে গমন আমার মত নয়, এই বলিয়া তিনি শ্রীনিবাসের সঙ্গী হইলেন না। এই সকল আলোচনা করিয়া আপনারা দেখুন, প্রাচীন সাধকমণ্ডলী সাধু-সঙ্গের কত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন। সাধু সঙ্গ ধর্ম্ম-জীবন-পথে কত প্রয়োজন, তাহা বুঝিয়া বিশিষ্ট ভাবে সাধুসঙ্গ করিতেন। এইরূপ সাধুসঙ্গ করা আমাদের প্রত্যেকের আত্মিক প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ ভাব। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যে ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি সাধু মহাজনদিগকে জীবনে গ্রহণ করিলেন এবং নববিধানের সাধন-ক্ষেত্রে শরীরী, অশরীরী সকল সাধু মহাজনদিগকে গ্রহণের ব্যবস্থা, অতি বিজ্ঞান-পূর্ণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনা করিলেন, তাহা কি সেই স্বভাবসিদ্ধ সাধুসঙ্গ দ্বারা সাধুদিগের দেবগুণ-গ্রহণেরই একটা অপরিহার্য্য ব্যবস্থা নয়?

আমরা এখন আলোচনা করিয়া দেখি, এরূপ সাধু মহাজনদিগকে জীবনে গ্রহণ দ্বারা আমরা ঈশ্বরের গৌরবকে খর্ব্ব করি, না, ইহা দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব আমাদের নিকট সমধিক পরিস্ফুট হয়? এবং আমাদের সাধন-পথে এরূপ সাধু মহাজনদিগকে গ্রহণ করিতে যাইয়া, ঈশ্বর যে আমাদিগকে তাঁহাকে স্বাধীনভাবে লাভ করিবার, সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইবার ব্যক্তিগত অধিকার দিয়াছেন, সে অধিকারের কোন প্রকার হ্রাস হয়, না, সে অধিকার সমধিক বর্দ্ধিত হয়?

ঈশা, চৈতন্য প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে যাইয়া আমরা প্রথমেই তাঁহাদের নিতান্ত বাহিরের আচার ব্যবহার দেখিয়াও বুঝিতে পারি, তাঁহারা ঈশ্বরকে কত আদর করেন, সম্মান করেন, কত শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁহারা দান করেন, ঈশ্বরের কত মহিমা গৌরব তাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন এবং জীবন দ্বারা প্রচার করেন। তাঁহাদের সাধন ভজন, তাঁহাদের বিশ্বাস, ভক্তি, ব্যাকুলতা দর্শনে আমাদের অন্তরের নিদ্রিত ধর্ম্মভাব সকল জাগিয়া উঠে, ঈশ্বরের মহিমা গৌরবে আমাদের প্রাণ পূর্ণ হয়, তাঁহাদের বিশ্বাস, ভক্তি, ব্যাকুলতা আমাদের জীবনের ক্ষীণ বিশ্বাস, অস্ফুট ভক্তি ও ব্যাকুলতার ভাবগুলিকে জাগাইয়া তোলে। ইহা দ্বারা ক্রমে আমাদের আত্মিক জীবনের পোষণ হয়, জীবনের সার ও সত্য ব্যক্তিত্বের নব নব উদ্গম হয়। কথা আছে, "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে"। আমাদের অন্তরে, আমাদের জীবনে অস্ফুট ভাবে যে সকল সামগ্রী রহিয়াছে, সাধন ভজন দ্বারা এবং সাধু-জীবনের স্পর্শ দ্বারা তাহাই গজায়, যাহা নাই তাহা কখনও গজায়না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অতীতের, বর্ত্তমানের, স্বদেশের, বিদেশের সাধুভক্তদিগের বিভিন্ন প্রকারের জীবন-গ্রহণের পথ খুলিয়া দিয়া, আমাদের প্রতি জীবনের বিভিন্ন প্রকার অস্ফুট দেবভাব, দেবগুণগুলির পূর্ণ বিকাশের পথ খুলিয়া দিলেন। ইহা দ্বারাই প্রতি জীবনে যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞানের সমন্বয়-সাধন সম্ভব হইল, ইহা দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিগত জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব হইল, ইহা দ্বারা আমাদের ব্যক্তিত্বের হানি হয় নাই বরং পূর্ণ ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ, পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হইল, ব্যক্তিত্বের মহিমা ও গৌরব-বৃদ্ধিরই কারণ হইল।

তাই বলিতেছি, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সাধু মহাজনদিগকে গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তনা করিয়া এক দিকে প্রত্যেক জীবনে ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরবের পূর্ণ বিকাশের আয়োজন করিলেন, সাধন ভজনের পূর্ণ আয়োজন উপস্থিত করিলেন, অন্যদিকে ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণ-ব্যক্তিত্বমূলক সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব হইল। এত দিন কেহ ছিলেন ভক্ত, কেহ ছিলেন যোগী, কেহ ছিলেন জ্ঞানী, কেহ ছিলেন কর্ম্মী, এখন প্রত্যেক জীবনে সকল গুণের বিকাশ সম্ভব হইল। এই উপায়ে স্বর্গলোকের, ইহলোকের সকল সাধু, ভক্ত, মহাজনগণ আমাদের সাধন-পথে সঙ্গী হইলেন, সকলকে সঙ্গে লইয়া আমাদের উপাসনা ও উৎসব সম্ভব হইল। তাই "অনন্তের মহাপূজায় অনন্ত আয়োজন"। কেশবচন্দ্র সাধু ভক্ত মহাজনদিগকে গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তনা করিয়া আমাদের মধ্যে পূজা বন্দনার কি বিরাট আয়োজন আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। স্বর্গলোকের, ইহলোকের সকল সাধু ভক্ত মহাজনদিগকে লইয়া আমাদের বিরাট পূজা বন্দনা, সকলকে লইয়া আমাদের মহা মহোৎসব।

গিরিধি নববিধান ব্রহ্মমন্দির।

চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক উৎসবে নগর-কীর্ত্তন।

এস জগতবাসী, প্রেমানন্দে ভাসি,
চলরে আনন্দধাম।
মুখে মা মা বলে, এস বাহু তুলে,
করি মার নাম গান॥

এ ভব-জলধিপারে, মায়ের মন্দিরে,
মার কোলে ব্রহ্মানন্দ আছে আলো-করে;
(দেখে নয়ন জুড়াব রে—ভক্তকোলে ভগবতী)
সাধুভক্তগণে, মিলে প্রাণে প্রাণে,
গাহিছে মায়ের নাম।
কেন পাপী তাপী জন, বিষণ্ণ-বদন,
এ নববিধানে আছে সকলেরি স্থান;
(নিরাশ হয়োনা, আশাচন্দ্রোদয় হয়েছে)
সেথা হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টীয়ান,
নাহি ভেদাভেদ-জ্ঞান।
জাতি কুল ভয়, সেথা নাহি রয়,
হয় দুঃখ অবসান॥
জননীর কৃপাস্রোতে, ভাসিতে ভাসিতে,
যাব চলে মাতৃধামে, হাসিতে হাসিতে;
(আর রবোনা ;—মায়ার বন্ধনে বাঁধা)
নিত্য শান্তি পাব, আনন্দে মাতিব,
পুলকিত হবে প্রাণ।
প্রেমানন্দে গলে, শুয়ে মার কোলে,
করিব অমৃত পান॥
(মরণ-ভয় ঘুচে যাবে)

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১লা ডিসেম্বর, বাগনান-নিবাসী স্বর্গীয় শশিভূষণ চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্রের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার বাটীতে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন। শিশুর মাতা সঙ্গীত করেন।

৫ই অগ্রহায়ণ, ২১শে নবেম্বর, ভাই প্রিয়নাথের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনীতি মল্লিকের জন্মদিন উপলক্ষে, ঐ দিন আচার্য্য-দেবের জন্মোৎসবের শেষে ঐ কন্যার জন্য এবং বিশেষ ভাবে তাহার আসন্ন মৃত্যু হইতে জীবন-লাভের জন্য কৃতজ্ঞতা-অর্পণ-সূচক প্রার্থনাদি হয়।

গত ২৩শে নভেম্বর, ভাই প্রিয়নাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুপ্রীতি সিংহের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে হইয়াছিল।

বিগত ১১ই নভেম্বর, প্রাতে মিঃ পি, কে, সেনের জন্মদিন উপলক্ষে, তাঁর পাটনাস্থ বাটীতে বিশেষ উপাসনা ও প্রীতি-ভোজন হয়। ভাই প্রমথ লাল সেন উপাসনা ও মিঃ পি, কে, সেন প্রার্থনা করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১লা ডিসেম্বর, নববিধানের প্রেরিত ভাই উমানাথের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়।

বিগত ৯ই নভেম্বর, সায়ংকালে, পাটনা বেলিরোডস্থ মিঃ পি, কে, সেনের ভবনে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় ভাই প্রসন্নকুমার সেনের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা ও সেবক অখিলচন্দ্র ও মিঃ পি, কে, সেন প্রার্থনা করেন। স্থানীয় ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকাগণ যোগদান করেন।

গত ২০শে নবেম্বর, অনাথ আশ্রমে, স্বর্গগত ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন।

সেবা—বিগত ৮ঠা নভেম্বর, রবিবার, মুঙ্গের নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে সায়ংকালে সেবক অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন। ৬/৭টী বন্ধু ও মিস শান্তিপ্রভা মল্লিক যোগদান করেন। ঐ দিন প্রাতে সমাধি-চত্বরে স্বর্গীয় অমৃত লাল ঘোষের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উপাসনা ও পরলোকগত আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করা হয়।

বিগত ১১ই নভেম্বর, রবিবার সায়ংকালে, বাঁকিপুর নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে সেবক অখিল চন্দ্র রায় উপাসনা ও "বিশ্বাসের ধর্ম্ম" বিষয়ে আত্ম-নিবেদন করেন। মহিলাগণ সঙ্গীত করিয়াছিলেন।

গত ২৯শে নবেম্বর, সীতারামপুরের নিকটবর্ত্তী ইথোরায়, কাশিমবাজারের মহারাজার কাছারীতে, তথাকার উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসুর মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ও তৎপর দিন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ সুকুমার বসুর শিশু কন্যার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। কলিকাতা হইতে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ তথায় গিয়া দুই অনুষ্ঠানে উপাসনা করেন। এই উপ-লক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ৪৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

জাতকর্ম্ম—গত ২১শে নভেম্বর, ৯৯।১ A কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে, অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগীর নবজাত শিশুপুত্রের জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। শিশুটী গত ২১শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করে। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভ বিবাহ—গত ১৯শে নভেম্বর, ৭।এ শরৎ ঘোষের ষ্ট্রীটে, তমলুক-প্রবাসী স্বর্গীয় ডাঃ শরচ্চন্দ্র দত্তের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দত্তের কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী মনোরমার সহিত, লক্ষ্ণৌ-নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্র কুমার সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ অক্ষয় কুমার সেনের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে স্বর্গের আশীর্ব্বাদ দান করুন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক, ১৬ই পৌষ, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৩ ভাগ। ২৩।২৪ সংখ্যা। | ১লা ও ১৬ই পৌষ, ১৩৩৫ সাল, ১৮৫০ শক; ৯৯ ব্রাহ্মাব্দ। 16th & 31st December, 1928. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে মাতঃ জননি, তুমিই বেদে ব্রহ্ম, বেদান্তে সগুণস্বরূপ পরমাত্মা, আবার পুরাণে তুমি তেত্রিশ কোটী দেবতারূপে প্রকাশিত; কিন্তু বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধানে নিত্য নবনবরূপে, বিচিত্রভাবে ভক্তের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ কর। কখন কিরূপে কাহার নিকট প্রকাশিত হও, কে বলিতে পারে। তুমি সেই এক পরব্রহ্ম, কিন্তু ভক্তের কাছে বহুরূপধারিণী মা। তুমি যে সুন্দরী কারুণ্যময়ী মা লক্ষ্মী, দুর্গতি-নাশিনী মা দুর্গা, ইহাই ত সকলে জানিতাম; আবার দেখি, সেই তুমিই যে দুঃখ-দুর্গতি-দায়িনী হয়ে, শ্যামাঙ্গিনী কালীমূর্ত্তিও ধারণ কর। তোমার সুখদায়িনী মূর্ত্তি সকলেই দেখিতে চাই, কিন্তু তুমি যে দুঃখদায়ক রূপও ধর, আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি না। ধন্য আমাদের পৌরাণিক পূর্ব্ব-পুরুষগণ, তাঁহারা কল্পনাযোগে যে তোমার কালী-মূর্ত্তি উপলব্ধি করিয়া তোমাকে শ্যামা মা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ও পূজা করিয়াছেন, ইহার গভীর অর্থ আমাদিগকেও হৃদয়ঙ্গম করিতে দাও। বাস্তবিক দুঃখ, বিপদ, পরীক্ষা, রোগ, শোকের কাল মূর্ত্তি ধরিয়াও যে তুমি ভক্ত-চিত্ত হরণ কর, আমরা যেন ইহা বিশ্বাস করিয়া তোমার শরণাপন্ন হই। দুঃখ বিপদও তোমারই স্বরূপ, কেন না তাহাতে প্রাণ যেমন তোমাকে মা মা বলিয়া ডাকিতে ব্যাকুল হয়, এমন ত সুখ সৌভাগ্যের অবস্থায় হয় না। মা, আশীর্ব্বাদ কর, তুমি যখন যেরূপই ধরণা কেন, বাহিরে তোমার আরক্ত চক্ষু হইলেও অন্তরটা যে মাতৃ-স্নেহে ভরা, ইহা বিশ্বাস করিয়া, যেন তোমার চরণ জড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারি এবং নবভক্ত [illegible] নিত্য তোমার নব নব রূপ দর্শনে যেন নব[illegible] হই।

[illegible]ন্তিঃ শান্তিঃ।

"নববিধানের গুরু।"

শ্রীকেশবচন্দ্র কে এবং কি ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, এই বিষয় লইয়া কতই মতভেদ, নববিধান-বাদীদিগের মধ্যেও দেখা যাইতেছে। তিনি নিজেও আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আত্ম-পরিচয় দিলাম অনেকদিন, কিন্তু এ আত্মা পরিচিত হইল না।" "একজনের কাছে এক রকম আমি, আর একজনের কাছে আর এক রকম।" এই সমুদয়-কথা যে কেবল তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী যাঁরা, তাঁহাদের সম্পর্কেই বলিলেন, তাহা নহে; তাঁহাদের পরবর্ত্তী যাঁহারা, তাঁহাদের সম্বন্ধেও এই কথা। বাস্তবিক তিনি যে আমাদের

কে এবং কি ভাবে আমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিব, এ তত্ত্বের সম্যক্ মীমাংসা এখনও কই আমাদের মধ্যে হইয়াছে ?

তাঁহার আত্ম-কথা এতই আপাতত পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবাত্মক যে, তাহার গভীর গূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হওয়াও সহজ নয়। কেবল জ্ঞান বুদ্ধি বিচারেও তাহা হইবার নয়।

বাস্তবিক আমরা যখন নিজ বুদ্ধি বিচারে সাধারণ মানুষকেও সম্যক্‌রূপে চিনিতে ও বুঝিতে পারি না, তখন অসাধারণ মানুষ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিলেন যিনি, তাঁহাকে কেমন করিয়া চিনিব, জানিব, বুঝিব ও গ্রহণ করিতে পারিব ?

এক ঈশ্বরালোক বিনা আমরা কাহাকেও প্রকৃত-রূপে চিনিতে পারি না। সুতরাং সেই ঈশ্বরালোক বিনা আমরা কেশবচন্দ্রকে কেমনে সম্যক্‌ভাবে চিনিব ?

তিনি একদিকে বলিলেন, "আমি মহাপাপী, পাপীর সর্দ্দার। ইহা অতিরঞ্জিত নয়, আপনার পাপের সাক্ষী আপনি। পাপের জ্বালায় লালদিঘী হইতে গোলদিঘী, গোলদিঘী হইতে লালদিঘী ছটপট করিয়া ছুটিতেছি।"

আবার আর একদিকে শেষ জন্মদিনের প্রার্থনায় বলিলেন, "আবার গুরু হতে চলিলাম। আমার কথা যার খুসী যেটা ইচ্ছা নিচ্ছেন, যেটা ইচ্ছা ফেলে দিচ্ছেন। আমি যেন গরিব, বানের জলে ভেসে এয়েছি। তা কল্লে তো হবে না। যদি মানিতে হয়, ষোল আনা মানিতে হইবে। তা এতে একজন থাকুন, দেড়জন থাকুন।"

এই দুই উক্তির সামঞ্জস্য [illegible] "গুরু" শব্দের মৌলিক অর্থ, যিনি পাপ হইতে [illegible] অজ্ঞানতা নাশ করেন। তবে কেশবচন্দ্রের একি অদ্ভুত কথা ? কেশবচন্দ্র পাছে গুরু হন, যুগে যুগে বিধানপ্রবর্ত্তক ভক্তগণ যেরূপ মধ্যবর্ত্তী, পাপীর পরিত্রাণ-কর্ত্তা ইত্যাদি নামাভিধানে অভিহিত হইয়াছেন, পাছে তেমনই ইনিও হন, এই আতঙ্কে আমরা কতই জড়সড় হই ; এমন কি, তাঁহার নাম করিতেও আমরা কতই ভয় পাই। তবে আমরা কেমন করিয়া তাঁহার এই উক্তি গ্রহণ করিব ?

যিনি একবার বলিলেন, "আমি মহাপাপী, পাপীর সর্দ্দার", আবার তিনিই বলিলেন, "আমি গুরু হতে চলিলাম" ইহা কি তাঁহার অহঙ্কারের কথা, না, সাধারণতঃ যেমন লোকে গুরুগিরি করিতে চায়, সেই ভাবে তিনিও হইতে চান বলিয়া একথা বলিলেন ?

তিনি যে আরো একটা বড় গুরুতর কথা এই সঙ্গে বলিলেন, "সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এরা যদি তোমায় ডেকে ভাল হতো, পৃথিবীতে প্রমাণ হয়ে যেতো, আর গুরুর দরকার নাই। হে চন্দ্র সূর্য্য, সাক্ষী হও, আমি নিজে কচ্চি না, আমার বাবা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার এত দিনকার কৌশল মিথ্যা হলো। আমি এতদিনে এই ঘরের দুটা লোককেও এক করিতে পারিলাম না।"

বাস্তবিক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানকে ডাকিয়া আমরা ভাল হইব এবং হইতে পারি, ব্রাহ্মধর্ম্মে ইহাই ত আমরা শিক্ষা করিয়াছি। কিন্তু নববিধান কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মমতে ভগবান্‌কে ডাকা নয়। এক ভগবান্‌কে ডাকিয়া এক অখণ্ড মণ্ডলী, পাঁচজনে একজন হইতে হইবে, ইহাই নববিধানের উদ্দেশ্য। অনন্ত ভগবান্‌কে কেবল ডাকিলে ত আমরা অনন্ত প্রকার ধর্ম্মমত ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে পারি ; কিন্তু তাহা দ্বারা মানবের একত্ব বা দুটা লোকও এক হইতে পারে না। সেই জন্য ঐক্য-বন্ধনের কেন্দ্র করিয়া বিধাতা এক এক জন মানুষকে দাঁড় করাইয়া, তাঁহার জীবনে বিধানের জীবনাদর্শ মূর্ত্তিমান করিয়া থাকেন। যুগে যুগে প্রতিবিধানেই ইহা হইয়াছে। কিন্তু সেই বিধান-প্রবর্ত্তককে গুরু বলিয়া, কতজন আপনাদিগকে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে তাঁহাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছেন।

এই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মধ্যবর্ত্তিত্ব চিরদিনের জন্য উচ্ছেদ করিবার জন্যই নববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রেরিত। তাই তিনি বলিলেন, "আমি গুরু হইতে চলিলাম। কিন্তু অন্য ধর্ম্মের গুরুর মত নহে, 'নববিধানের গুরু', এক শরীরের সকলে অঙ্গ এই বিশ্বাস, এ ভাই বলে পরস্পরকে খুব ভালবাসা দেওয়া, কোলাকুলি করা, বিশ্বাস দেওয়া।... মা আজ বলছেন, আমার ভক্তকে যে ষোল আনা বিশ্বাস দেবে, সেই আসুক, আর কেহ নয়।"

তিনিই গুরু, যিনি শিক্ষা দেন, পথ প্রদর্শন করেন। কেশবচন্দ্র এই ভাবে গুরু হইতে চাহিলেন যে, তিনি যেমন পাপী মানবের সঙ্গে একাঙ্গ হইয়া মানবজীবনের সকল প্রকার পাপ আপনার পাপ বোধ করিলেন ও আপ-

নাকে পাপীর সর্দ্দার বলিয়া আত্মবোধ করিলেন এবং সেই পাপ-প্রবণ জীবন কেমন করিয়া মার কৃপায় পরিবর্ত্তিত হইয়া নববিধানের নবজীবন প্রাপ্ত হয়, তাহাও জীবন দ্বারা প্রদর্শন করিলেন। নববিধান-বিশ্বাসী মাত্রকেও তাহাই করিতে হইবে। এই ভাবে তিনি যে নববিধান-সাধনের গুরু বা শিক্ষাদাতা, ইহা কি আমরা অস্বীকার করিতে পারি?

আবার "গুরু" বলিয়া যেমন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণকে কেবল ঈশ্বরাবতার মনে করিয়া অনুবর্ত্তিগণ তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্য হইয়াছেন ও পূজা করিয়াছেন, এবারকার নূতন বিধানে তাহা যাহাতে না হয়, সেই নিমিত্ত কেশবচন্দ্র বলিলেন, "আমি যে কাহাকেও শিষ্য বলিতে পারি না।" আমরা এক শরীরের অঙ্গ, এই বিশ্বাস করিয়া, পরস্পরকে যোল আনা বিশ্বাস করিব, ভালবাসিব, কোলাকুলি করিব, ইহাও তিনি জীবন দ্বারা দেখাইলেন ও শিখাইলেন। সুতরাং তাঁহাকে গ্রহণ করার অর্থ তাঁহার সহিত সকলে একাঙ্গ জানিয়া পরস্পরকে যোল আনা বিশ্বাস করা, ভালবাসা দেওয়া, কোলাকুলি করা। এই শিক্ষা দিবার জন্য কেশবচন্দ্র আমাদের নূতন গুরু, অন্য ধর্ম্মের গুরুর মত নন, নববিধানের গুরু। এ গুরু-লাভ বা গুরু-গ্রহণ বিনা নববিধানের জীবন লাভ হইবে না।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

প্রতিমা-পূজা।

নববিধান মানব-মনঃ-কল্পিত বা হস্ত-নির্ম্মিত প্রতিমা-পূজার প্রশ্রয় দেন না। কিন্তু ঈশ্বরের স্বহস্তরচিত প্রতিমার পূজা করিতে কেবল যে প্রশ্রয় দেন তাহা নহে, তাহা না করিলে প্রকৃত ঈশ্বরের পূজার অধিকারই হয় না বলেন। মাতা, পিতা, মহাত্মা, দেবাত্মা, সাধু ভক্তাত্মা সকলেই যে সেই পরমাত্মার স্বহস্ত-রচিত প্রতিমা। এমন কি, সকল মানবাত্মাও যে ঈশ্বরের প্রতিমা-রূপে গঠিত, ইহাও ত শাস্ত্রে উক্ত রহিয়াছে। এই সকল প্রতিমার পূজা না করিলে বা ইহাদের প্রতি যথাযথ ভক্তি কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা পূজা দান না করিলে, ঈশ্বরেরও পূজার অধিকার লাভ হয় না, ও ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদন হয় না। কারণ ঈশ্বর যে সর্ব্বময়, এই নিমিত্তই বাইবেলে উক্ত হইয়াছে, যে আপনার ভ্রাতাকে অর্থাৎ মানবাত্মাকে না ভালবাসে, সে কেমনে পিতা পরমাত্মাকে যে ভালবাসে, তাহার প্রমাণ হইবে। মানবকে ঈশ্বর-বোধে পূজা করিবে না; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিমা তাহার অন্তরে নিহিত, দর্শন করিয়া পূজা করিবে, তাহাতে প্রতিমা পূজার অপরাধ হইবে না।

——

একমেবাদ্বিতীয়ম্।

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" এক ব্রহ্মই আছেন, আর কিছু নাই, ইহাই প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তাহা হইতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সর্ব্বময় ব্রহ্ম, ইহা উপলব্ধি করিতে গিয়া, অদ্বৈত-বাদ সকল বস্তুই ব্রহ্ম, ইহা নিরূপণ করিলেন। কিন্তু হজরৎ মহম্মদ যে বলিলেন, "ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই", ইহাতে অদ্বৈত-বাদের ভ্রান্তি অপনোদিত হইল। বাস্তবিক ব্রহ্ম যিনি, তিনিই ব্রহ্ম, আর কেহ বা কিছুই ব্রহ্ম নয়, যথার্থ "একমেবাদ্বিতীয়মের" ইহাই অর্থ। তিনিই এক মূলাধাররূপে আছেন, আর যাহা কিছু আছে, তাহা তাঁহার অস্তিত্ব বা শক্তি-প্রভাবেই আছে। প্রকৃতভাবে আমরা তাঁহাকে যদি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলি, ইহার অর্থ, তিনি ছাড়া আমাদের আর কেহই নাই, এক আপনার বলিবার আর কিছুই নাই, আমাদের এক সর্ব্বস্ব তিনি। আমি আমার যাহা বলি, তাহা কিছুই থাকে না। যখন বলি, "একমেবা-দ্বিতীয়ম্", তাতে এক তিনিই আমার, আর আমি তাঁর হইয়া, তাঁহাতেই আমার সব পাই, তাঁহার দ্বারা অধিকৃত হইয়া যাই, আমার আমিত্ব আর তখন থাকে না।

——

নিরাকার-সাধনের উপকারিতা।

অভ্যাস দ্বারাই জীবনে ভাল মন্দ দুই হইয়া থাকে। ভাল অভ্যাস করিলে ভাল শিক্ষা হয়, জীবন ভাল হয়। আবার মন্দ অভ্যাসের ফলে জীবন কলঙ্কিত হয়, কুশিক্ষা লাভ হয়। সাধনও আর কিছু নয়, ভাল অভ্যাস। নিরাকার ঈশ্বরকে সাধন করিতে শিখিলে আমরা কেবল যে তাঁহার চিন্ময় সত্তা ক্রমে উপলব্ধি করিতে পারি তাহা নয়, আমরা পরলোক-গত অমরাত্মাদিগেরও সহবাস উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। পরমাত্মার দর্শন লাভ হইলে অমরাত্মাগণের দর্শনলাভও সহজ হয়, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনার আত্মাকেও আত্মজ্ঞানে দর্শন করিতে পারি। জড়-পূজা বা জড়-বিষয়ের অভ্যাস বশতঃই আমাদের দৃষ্টিও জড় ভিন্ন কিছু দেখিতে, চিনিতে পারে না। তাহাতে আমাদিগের আত্মদৃষ্টিও খোলে না, তাই কোন মানবের ভাল দিকও দেখিতে পাই না, পরমাত্মা ও পরলোকগত অমরাত্মাদিগেরও স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। এই জন্য নিরাকার-সাধনই শ্রেষ্ঠ সাধন। আলোক জ্বালিলে যেমন অন্ধকারও আলোকিত হয়, তেমনি নিরাকার চিন্ময়ের সাধনে সকলই উজ্জ্বল-দর্শন হয়।

—:—

নূতন গান।

"কার মা এমন দয়াময়ী—সুর।

কেশব আমার কেশব নয় ভাই
(সে যে) ব্রহ্মসাগর ছেঁচা ধন,
সে ধন যার ঘরে নাই তার
বৃথাই যে এ জীবন।
সাত রাজার ধন মাণিক আমার,
তুলনা দেখিনে যে তার,
এ পাপ জীবন আঁধারে,
আশার কেশব চন্দ্র কেমন।
আয় চাঁদ আয় বলে,
সে চাঁদের টিপ্ নিয়ে ভালে,
মিলে নব শিশু দলে,
মা ব'লে পাই নবজীবন।

—•—

গিরিধি নববিধান ব্রহ্মমন্দির।

(গিরিধি নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে প্রিন্সিপাল দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বিবৃত আরাধনা ও উপদেশ)

উদ্বোধন।

তোমরা সবাই স্রোতাপন্ন। যারা স্রোতাপন্ন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ, "সকৃৎ আগামী", এসে ফিরে যায়, আবার হয়ত আসে। কেউ "অনাগামী"; এসে আর ফিরে না। তাদের পথ প্রশস্ত, তাদের অবাধ গতি। এই উর্ম্মি নদী কোথাও ক্রন্দসি, কোথাও মন্থর, কোথাও-খরস্রোত; কোথাও গম্ভীর; কোথাও প্রশান্ত, অখণ্ড, কোথাও খণ্ড বিখণ্ডিত হয়ে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে পাহাড় হতে পাহাড়ে ভেঙ্গে পড়ছে। আমাদের জীবনও এমনি, সংসারের জীবন এই রকমই হয়। কিন্তু জীবনেরও সমতল ভূমি আছে, যেখানে গিয়ে টুকরোগুলি এক হয়ে যায়। নদীগুলি যতই সাগরের দিকে যায়, ততই প্রশস্ত ও গভীর হইয়া উঠে। সাগর-সঙ্গমে প্রথমে জলে-জলে ভাল মেশে না। কিন্তু সমুদ্রের গভীরে সব এক হয়ে যায়; সব নীল হয়ে যায়। হে সাগরের যাত্রী, চল সাগর-সঙ্গমে। নদীগুলি সাগরের দিকে ধায় নৈসর্গিক নিয়মের বশে। তারা কি জানে কোথায় যাচ্চে, কি উদ্দেশে? আমরাও ছুটেছি অনন্তের পানে। কিন্তু আমাদের আশা জেগে উঠেছে, আমাদের গম্যস্থান অজ্ঞানিত অথবা অদৃশ্য নয়, আমাদের উদ্যম কেবল প্রকৃতির অন্ধ-প্রয়াস নয়। চন্দ্রভবে অনন্তের যাত্রী, সবে চল সেই মহা-সঙ্গমে। একসঙ্গে মিলে চল, জলগুলি যেমন একসঙ্গে মিলে, এক স্রোত হয়ে চলে, তেমনি চল; সাগর দূরে নয়, নিকটে।

আরাধনা।

কথার বাঁধনে আমাদের এমনি করে বেঁধে ফেলেছি যে তাতে সত্যকেও হারিয়ে ফেলি। তুমি সত্য জানি। কিন্তু তোমাকে ভাব্তেও শিখেনি, ডাকৃতেও শিখেনি। জগৎকে অসত্য করে দিয়ে, শূন্য করে দিয়ে, তোমাকে দেখ্তে চাই। কর্তে গিয়ে, হে পূর্ণ, তোমাকেও হারিয়ে ফেলি। সত্য অসত্যের কি পার্থক্য, আমি জানিনা, বুঝিনা। কিন্তু জানি, হে সত্য, এই নানা রূপ, গন্ধ, গান, স্পর্শের মধ্যেও তুমিই সত্য। সত্য এরা ক্ষণিকের অতিথি। কিন্তু এসবও সত্য, কারণ এসবও তোমারই ক্ষণিকের স্পর্শ। তুমি সব ক্ষণিকের ভিতর অকাল, সব অসত্যের ভিতর এক অনির্ব্বচনীয় সত্যের ধারা। সাগরের তরঙ্গে যেমন সূর্য্য সহস্র খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়ে, তেমনি তুমি আমার অন্তরে ও বাহিরে সহস্র স্পন্দনে স্পন্দিত হচ্চ। আমার প্রতি জীবন-বিন্দু তোমার দ্বারা অনুপ্রাণিত, জড়, জীব, চেতন, সমস্তে তুমি ওতপ্রোত।

আমি আমাকেই চিন্তে পারিনি, তোমাকে চিনব কি করে? শরীরের সঙ্গে আপনাকে এমন করে মিশিয়ে দিয়েছি, আর বার করে নিতে পারিনে। "মুঞ্জ" হতে "ঈশিকা" পৃথক্ করা, সে আর বুঝি আমার হল না। তবে আমার আত্মার ভিতর তোমাকে কি করে ধরব? সূর্য্য অস্তমিত হয়, চোখের আলো নিভে যায়। তবুও তুমি আলোক জ্বেলে রাখ মনের ভিতর। হে চিন্ময়, হে স্বয়ম্ভু জ্যোতি, সেই আলোকে তোমাকে দেখব, আমাকে দেখব, সব আত্মাকে দেখব, জগৎকে দেখব। আবার সব শক্তির মধ্যে যেমন তোমার অনুপ্রাণন, তেমনি আমার প্রত্যেক চিন্তা ও ভাবের মধ্যে তোমারই বিদ্যুৎ-প্রবাহ। তুমি জ্যোতির্ম্ময়, তুমি আলোক-স্বরূপ, তিমিরাতীত পুরুষ।

আমার বুদ্ধি বলে, তুমি অসীম, এ সব সীমাবদ্ধ। তোমাকে তোমার প্রকৃতি হতে একেবারে পৃথক করে নিয়ে দেখ্তে চায়। সব সীমাবদ্ধ বস্তু হতে একেবারে সরিয়ে নিয়ে, কোথায় কোন মহাশূন্যে গিয়ে পড়ে। সত্য, তোমাকে যত পাই, আরও কত বেশী পাওয়ার থাকে। কিন্তু হে অসীম, তুমি সীমার মধ্যে অসীম হয়েও নিত্য লীলা করিতেছ; অজ্ঞাত হয়েও আমাদের ধরা দিচ্চ প্রতিদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদান প্রদানের ভিতরে। আমরা সব তোমার টানে পড়েছি; তাই ক্রমাগত আপনাকে ছেড়ে এগিয়ে চলে যাচ্ছি। এ যে সাগরের টান্, পাহাড় ভেঙ্গে রাস্তা করে, কত উপত্যকা, অধিত্যকা পার হয়ে; অই আমরা তোমার পথে প্রতিনিয়ত চলেছি।

এ দীর্ঘ পথ আমার জীবন-তরণী তুমি বয়ে নিয়ে এলে কত সন্তর্পণে। দিনে দিনে, পলে পলে তোমার কত পরিচয় দিলে। কত বাঁধনে দৃঢ় করে বাঁধলে। মনটা যখন আহ্লাদে ভরে যেত তোমার স্নেহ-স্পর্শে, সকল বর্ণ, গন্ধ ও গানের আহ্বানে, তাতে

যে তোমার আহ্বান ছিল, তা কি জানিতাম? হৃদয় ছুটেছিল তোমার দিকে, যখন মন তোমাকে চেনেনি। কি আজন্ম পিপাসা নিহিত করেছ জীবনের মধ্যে, মন চিরকাল তোমাকেই চাহিল। এ পিপাসা কি কখনও মিটবে? তোমাকে পেয়েও মিট্‌বে না। কারণ তুমি কখনও ফুরিয়ে যাবে না। পৃথিবীতে এনে অনেক শেখালে, কত রকমে শেখালে, কত সম্বন্ধ দিয়ে, অনুরাগ দিয়ে হৃদয়টাকে প্রস্ফুটিত করে তুল্লে তুমি। তোমার অমৃত ঢাল্‌লে আমার ক্ষুদ্র জীবনের পান-পাত্রে; সে তোমারই সম্ভোগের জন্য। এখন মন চায়, এমন করে ভরে দেও হৃদয়কে তোমার প্রেমে ও সৌন্দর্য্যে, যা দিয়ে তোমার পূজা করে জীবন সার্থক হতে পারে। তুমি সমস্ত জগতের মধু, তুমি আমার আত্মার মধু। তোমার আবির্ভাবে সকল মানুষ ও প্রকৃতি মধুময় হল। হে প্রেমময়, তুমি আমারি, তুমি আমারি।

সমস্ত দিন রাত ঐকতান-সঙ্গীত উঠ্‌ছে বিশ্ব হতে। হে সুনিপুণ শিল্পী; তুমি আমাদের সকলের হৃদয়ের তারগুলি বেঁধে দিয়েছ, তাই তোমার অঙ্গুলি-স্পর্শে এমন মধুর সঙ্গীত উঠ্‌ছে সব হৃদয় হতে। এখানে ত কোন ভেদ বিসম্বাদ নাই; কোন দেশ, কাল, জাতি ও ধর্ম্মের ভেদ নাই। ভুবন-জোড়া করুণ-স্বরে এক সঙ্গীত উঠ্‌ছে, যার প্রতি-স্পন্দন সকল হৃদয়ে। লক্ষ জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী হতে, নীরব প্রকৃতি হতে, একই সঙ্গীত উঠে এক মহা ঐকতান-বাদ্যের সৃষ্টি করেছে। এই মহা-বিশ্ব-সঙ্গীতের স্রোতে আমরা আমাদের ভাসিয়ে দি।

আলোকে আঁধারে কি কখনও মিলে? পাপে পুণ্যে কি এক হতে পারে? হে পবিত্র, তা হলে তোমার কাছে যাব কি করে? তোমা হতে দূরেও থাকতে পাচ্ছিনে। স্বর্গে ও নরকে কত ব্যবধান, দেখে ভয় হয়। নিজের দিকে যখন তাকাই, দেখি, পদে পদে পদস্খলন হচ্চে। উঠ্‌ছি, আবার পড়্‌ছি, আবার উঠ্‌ছি। পাপগুলি কত সূক্ষ্ম হয়ে, কত ভদ্রতায় আকার ধরে, আমাকে এসে জড়িয়ে ধচ্চে। এ সব সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত পাপ হতে, তুমি ছাড়া কে আমাকে রক্ষা কর্‌বে? আমি জানি, আমি আমাকে ছাড়্‌লেও, তুমি আমাকে ছাড়্‌বেনা। নির্ম্মল, নিষ্পাপ করে দেবেই, সুন্দর সুশ্রী করে দেবেই। আমি যতদিন পাপের মলিনতা নিয়ে থাক্‌ব, তোমার সৃষ্টিতে কলঙ্ক থাক্‌বে। মনের ভিতর যে সব ছায়া পাপ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে, তুমি সব দেখে ফেলেছ, তুমি তাড়িয়ে দেবেই।

ঝড়ের পর শান্তি। দীর্ঘ জীবনের শ্রান্তির পর তোমারই আনন্দ ও শান্তি। হে অভয় আয়তন, তোমাতেই নির্ভয়। আমি যত সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করেছি শরীর ও মন দিয়ে, হে আনন্দময়, সে তোমারই আনন্দ-স্পর্শ। শৈশবের সে সব ব্যাকুল আনন্দ, জীবনের পরিণতির সঙ্গে; তোমার পরিচয়ের সঙ্গে কত গভীর হয়েছে, কত অর্থময় হয়েছে। হে সুন্দর, হে মধুর, হে প্রিয়, তোমাতে মগ্ন হতে ইচ্ছা যায়।

ধ্যান।

এ কোথায় আন্‌লে, তোমার সভায়? তোমার খাস দরবারে? এ ইহকাল ও পরকালের মিলন। এক অখণ্ড আনন্দ হয়ে সব ভরে দিলে, সকলকে এনে দিলে, যারা দর্শনের অতীত হয়েছিল। হৃদয়ভরা বুকজোড়া আনন্দ নিয়ে তোমার এই সভায় প্রবেশ করি ও অমরধামের আনন্দোৎসবে মগ্ন হই।

উপদেশ।

"পরপারে"

এক সময় ছিল, যখন লোকে পৃথিবীর ভোগ ঐশ্বর্য্য নিয়েই তৃপ্ত হত। ইহলোকে সন্তানলাভ, ধন সম্পদ ও জীবনান্তে স্বর্গ-সম্ভোগ, জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য ও উদ্যম ইহাতেই সমাপ্তিপ্রাপ্ত হইত। জীবনের সেই প্রথম প্রভাতের তরুণ সূর্য্যালোকে সবই সুন্দর, মধুর চিরদিনের মনে হইত। কিন্তু দিনের পর রাত্রি আসে, জন্মের পর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, পৃথিবীর ধন দৌলত সব ফুরিয়ে যায় দুদিনে। যারা নদী-সৈকতে বালুকা-গৃহ নির্ম্মাণ করে, প্লাবন আসিলে সব ভাসিয়া যায়। মানুষের জীবন-উদ্যম যদি সম্ভোগের পথে থাকে, তাহা হইলে নৈরাশ্যের অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। এমন কি উপায় আছে, যাহা হইলে, শোকের হাত হতে, মৃত্যুর হাত হতে, নৈরাশ্যের হাত হতে উদ্ধার পাওয়া যায়। এই প্রশ্ন উপনিষদের ঋষিরা বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার উত্তর অধ্যবসায়ের সহিত সমালোচনা করিয়াছেন। ইন্দ্র ও বিরোচন বৃহস্পতির নিকট গমন করিলেন, এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য। তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন বৈদিক বিধি অনুসারে। বিরোচন সহজেই সন্তুষ্ট হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। সেই জন্য অসুরেরা এ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইল। ইন্দ্র বারংবার প্রশ্ন করিয়া এবং শত বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের পর গুরুর নিকট হইতে অভিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া দেবলোকে চলিয়া গেলেন। উপনিষদের শিক্ষা এই যে, আপনাকে জানিলে ও ভগবানকে জানিলে, শোক ও মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। শরীর মৃত্যুর দ্বারা গৃহীত, আত্মা অবিনশ্বর, মৃত্যু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ আত্মা পরমাত্মাতে জীবিত। অনেক বিচারে, অনেক তপস্যায়, অনেক ব্রহ্মচর্য্যে আত্মজ্ঞান লাভ হয় এবং অন্তরাত্মাকে জানা যায়। পঞ্চভূতে নির্ম্মিত এই শরীর পঞ্চত্ব লাভ করে, শুদ্ধ আত্মা অমৃত-স্বভাব, পরমাত্মায় চিরস্থিতি পায়। এই বিশ্বাস দৃঢ়-নিবদ্ধ হইলে শোক ও ভয় দূর হয়।

বুদ্ধের একজন গৃহস্থ শিষ্য মৃত্যু নিকটে বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। বলিয়া দিলেন, আমার হইয়া তাঁহার চরণে মস্তক রাখিয়া কহিও, আমার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, যদি তথাগত অনুগ্রহ করিয়া একবার আমার গৃহে পদধূলি দেন, আমি কৃতার্থ হইব। শিষ্য-বৎসল বুদ্ধ আসিয়া শেষ সময়ের উপযোগী উপদেশ দিলেন, যাহাতে তাঁহার শেষ গতি, সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল। বুদ্ধ বলিলেন, মনে কর একজন

লোক একটী মাটীর ভাঁড় ঘৃতে অথবা তৈলে পরিপূর্ণ করিয়া জলে ডুব দিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ভগ্ন ভাণ্ডখণ্ড নীচে পড়িয়া যাইবে, কিন্তু ঘৃত অথবা তৈল উর্দ্ধে ভাসিয়া উঠিবে। আমাদের গতিও এই প্রকারের। এই শরীর যাহা আমরা পিতামাতা হইতে লাভ করিয়াছি এবং যাহা অন্ন দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যদি সযত্নে চরিত্রকে রক্ষা করিয়া থাক এবং সুপথে থাকিয়া আপনার উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাক, শরীর ভস্মীভূত হইলেও চিত্ত বিশেষ গতি লাভ করিবে। বিশুদ্ধ-চিত্ত মুক্ত হইয়া উর্দ্ধে গমন করে। মৃত্যু তাহাকে স্পর্শ করে না। নির্ব্বাণের পরম শান্তি ও অমৃতত্ব মুক্ত আত্মার স্বকীয় ঐশ্বর্য্য। সাগর যেমন অগাধ এবং বহু মণি মুক্তার আধার, তেমনি সেই অনন্ত নির্ব্বাণ-সিন্ধুতে মুক্ত আত্মাগণ বাস করেন।

সম্ভোগ হইল জীবনের উদ্দেশ্য। মুক্তি হইল জীবনের শেষ সম্বল। কিন্তু আমাদের দেশে এমন একদল লোকের সৃষ্টি হইয়াছিল, যাঁহারা মুক্তিকেও তুচ্ছ মনে করিয়াছিলেন জীবোদ্ধারের জন্য আত্ম-নিবেদনে। তাঁহাদের সংকল্প ছিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটী মাত্র জীবও অমুক্ত রহিবে, বারংবার জীবন গ্রহণ করিতে হইলেও তাহা করিতে হইবে।

কর্ম্মে, ভাবে ও চিন্তায় ভগবানের সঙ্গে যে মিলন, তাহাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর যাহা কিছু, তাহা অনিত্য হইলেও অসত্য নয়। তাহারও মূল্য আছে। পরমার্থ সত্য না হইলেও জীবন-গঠনে তাহা আমাদের বিশেষ সহায়, পরমার্থলাভেরও উপায়স্বরূপ।

জীবনে যেখানে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন, নূতন বিধান আমাদিগকে সেই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। যদি প্রেমে, সেবায়, জ্ঞানে সে জীবনে আমরা প্রবেশ করিয়া থাকি, আমরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিয়াছি। শরীরে জন্ম, জরা, মৃত্যু আছে ও তাহা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই শরীরে থাকিতেই সেই অমৃতময় জীবন আমাদের মধ্যে আসিয়াছে এবং ঈশ্বর-কৃপায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।

আমি মৃত্যুর স্পর্শ অনুভব করিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মৃত্যুর নৈকট্যেও মাতৃক্রোড়ের আনন্দ ও শান্তি অনুভব করিয়াছি। শরীরে যন্ত্রণা আমাকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করে নাই। যাঁহাদের সঙ্গে কখনও অধ্যাত্মযোগে যুক্ত হইয়াছি, তাঁহাদিগকে হারাই নাই। কখনও হারাইবনা। মুহূর্ত্তের মধ্যে মন তাঁহাদের কাছে চলিয়া যায় এবং মধুর যোগে যুক্ত হয়। তাঁহাদের ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হই নাই, কখনও হইব না।

প্রজাপতি আপনার জন্য রেশমের গৃহ নির্ম্মাণ করে। তাহার মধ্যে অনশনে থাকিয়া আপনার নূতন রূপ নির্ম্মাণ করে। পরিপূর্ণ-অবয়ব হইলে, ঘর ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিয়া, আনন্দে আকাশে বিচরণ করে।

ফুলের কলি অন্ধকার কোষের ভিতর বর্দ্ধিত হয়। শেষে কোষ ভগ্ন করিয়া, সূর্য্যালোকে বিচিত্র বর্ণে শোভিত, মনোহর গন্ধে পূর্ণ আপনার রচিত রূপ প্রকাশ করে।

পাখীর সুমধুর সঙ্গীত ডিম্বের ভিতর লুক্কায়িত থাকে। তাহার সুন্দর সুবর্ণ দেহখানি সেই অন্ধকার গৃহে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পূর্ণাবয়ব হইলে, কোষকে বিদীর্ণ করিয়া, আলোকে ও আনন্দে জন্মলাভ করে এবং তাহার সুকণ্ঠের সঙ্গীতে আকাশকে পরিপূর্ণ করে।

এই জীবন আমাদের জীবনের একটী ক্ষণিক প্রসঙ্গ মাত্র। অনেক অজানার মধ্যে, অনেক অন্ধকারের মধ্যে, এই দেহ-প্রবাসে আমরা বর্দ্ধিত হচ্ছি। যখন এ জীবনের ঘুম ভাঙ্গবে, সে নূতন জীবনে কত আনন্দ, কে তা জানে? মাঝে মাঝে জীবন থাকিতেই এই সুন্দর প্রকৃতিতে কত আবেশ ও আবির্ভাব সম্ভোগ করিয়াছি, সম্মুখে আরও কত আছে, কে জানে? হে অনন্তের যাত্রী, হে অমৃতত্বের অধিকারী, এ জীবন-যাত্রা নিষ্ফল নয়। আমরা দিব্যধামের লোক, আমরা অমৃতের সন্তান, নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে, আশা ও আনন্দের সঙ্গে আপন পথে অগ্রসর হও। সে দিনের সুন্দর উষার মৃদু স্নিগ্ধ আলোক এখনই তোমার আত্মাকে সিক্ত করিতেছে এবং তোমার দীপ্ত নয়নে প্রতিফলিত হচ্ছে।

১৯শে নবেম্বর।

আজ ১৯শে নবেম্বর, নবধর্ম্মজগতে অক্ষয় পূর্ণিমা। নবতি বৎসর পূর্ব্বে এই পবিত্র দিবসে শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র পূর্ণ আশা-চন্দ্ররূপে ভারতের প্রাণাকাশে প্রথম উদিত হইয়াছিলেন। তাই আজ সকলের পক্ষেই ব্রহ্মানন্দে অবগাহন করিবার প্রশস্ত দিন।

প্রেমময়ী উষার কনক-কান্তি পূর্ব্বাকাশে একটু একটু করিয়া ফুটিতে না ফুটিতেই নবজীবনের কি স্বর্গ সঙ্গীত বিহঙ্গ-কুলের কল-কণ্ঠ-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে—

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ!"

আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। আধজাগন্ত আধঘুমন্ত ভাবে প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে আসিয়া কি দেখিলাম!

সহসা একিরে গভীর আঁধারে
আলোক উঠিল হাসি!
ভিতরে বাহিরে অমৃতের সুরে
বাজিল মঙ্গল-বাঁশী!
নবীন আকাশ, নবীন বাতাস,
নবীন আলোর সঞ্চরণ;
নবীন আশার মন্ত্র নিয়ে
ফুল্ল ধরার তরুণ মন।

এই তো ১৯শে নভেম্বর! মানবজাতির নবজাগরণের মহা দিন! "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত!"

আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। আত্মারাম প্রিয়তম জীবনদেবতাকে ভক্তিভরে অভিবাদন করিয়া প্রেমসিক্ত-স্বরে গান ধরিল,—

মুখরিত মধুকণ্ঠ বিহঙ্গের কলতানে,
বিভাসিত স্বর্ণালোকে ব্রহ্মানন্দ-প্রকাশের,
এ প্রভাতী প্রাণে আজ ফুটিছ বিরলে;
তুমি বিশ্বাধার;
সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!
হে প্রিয় আমার।
রসময়ী প্রকৃতির প্রেম-কান্তি অভিরাম
নিভৃতে কুসুম-গন্ধে ঢালিছে নীরবে, আহা,
নন্দনের অফুরন্ত মাধুরী নবীন,
স্বরূপে তোমার,
হে প্রিয় আমার।
হে চিরবাঞ্ছিত পূর্ণ! এক লক্ষ্য জীবনের!
আজি এ বিন্দুর বিন্দু তৃষিত হৃদয় মোর
কি অমৃতে ডুবাইলে,—অকূল অতল
সিন্ধুর আকার!
হে প্রিয় আমার।
চিদানন্দরসময় কেশব-জীবনে, ওগো,
তোমার বিভূতি বিনে কি দেখিব আর?
সবি যে তোমার!
সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!
হে প্রিয় আমার।

আজ ব্রহ্মানন্দ-রত্নাকরে ডুব দিয়া একটী দুর্লভ রত্ন লাভ করিলাম, ইহার নাম বিশ্বাস।

মঙ্গল কুটীর, ঢাকা।
১৯শে নভেম্বর, ১৯২৮। } শ্রীমতিলাল দাস।

—•—

জন্মোৎসবে ভক্তি-অর্ঘ্য।

(আচার্য্যদেব ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জন্মোৎসব উপলক্ষে আর্য্যনারী-সমাজে পঠিত)

আজ আমরা যাঁর শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে এখানে সকল ভগিনী মিলিয়া জগজ্জননীর চরণতলে একত্রিত হইয়াছি, সেই পবিত্র-চরিত্র, পরম পুণ্যবান্, একান্ত ধর্ম্মপ্রাণ, সাধুভক্ত সন্তানের স্নেহময়ী জননীর মঙ্গলময় চরণে সর্ব্বাগ্রে প্রাণের সহিত ভক্তিকৃতজ্ঞতা ভরে প্রণাম করি। যাঁর অনুপম স্নেহ, অপূর্ব্ব ভালবাসা, অতুলনীয় প্রেম, অনন্ত করুণাভরা আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া, নবভক্তরত্ন এই দুঃখ-ক্লেশ-ভারাক্রান্ত পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, এই পাপতাপময় সংসারে সেই অমূল্য ধর্ম্মধন বিতরণ করিবার জন্য এই শুভদিনে শুভমুহূর্ত্তে মাহেন্দ্রক্ষণে স্বর্গধাম হইতে এই ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আজ সেই করুণাময়ী মার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া আনন্দপূর্ণ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি।

বহু যুগযুগান্তর পূর্ব্বে যে জগৎপিতার অসীম কৃপা প্রাণে লইয়া, জগতের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত দয়ার অবতার বুদ্ধদেব এ ধরাধামে আগমন করিয়া ছিলেন, দুঃখী তাপী জীবের দুঃখে যে সুকুমার রাজকুমারের কুসুমসম কোমল প্রাণ কাঁদিয়াছিল, জগতের দুঃখ-বিমোচনে ব্যাকুল হইয়া নিত্য-শান্তির অন্বেষণে ছুটিয়াছিলেন, অতুল ঐশ্বর্য্য, অপূর্ব্ব রাজ্য-সুখ অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া, পরম বৈরাগী, পথের ভিখারীর বেশে ঘরের বাহির হইয়াছিলেন, যে স্বর্গের প্রেম বক্ষে ধারণ করিয়া পরম প্রেমিক পবিত্র ঈশ্বর-সন্তান, পুণ্যের অবতার যীশুখৃষ্ট এই পাপভারাক্রান্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা সুখে দুঃখে জীবনে মরণে পূর্ণ করিবার মহামন্ত্র মহাশিক্ষা দান করে গেছেন, জীবের দুঃখে কাতর হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া মহোচ্চ ধর্ম্মধন বিলাইয়া প্রাণপাত করেছেন, ঘোর দুঃখের কশাঘাতে, তীব্র ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া বক্ষের শোণিত-দানে ধরাতল পবিত্র করে গেছেন, আর যে প্রেমময় ভগবানের অনন্ত প্রেমে প্রাণ পূর্ণ করিয়া সেই নবদ্বীপের প্রেমের অবতার সোণার গৌরাঙ্গ নিমাই চাঁদ কয়দিন আগে আমাদের দেশে জন্মে জগৎকে ধন্য করে গেছেন, সুধামাখা শান্তিভরা অমৃতময় মধুর হরিনাম ঘরে ঘরে বিলাইবার জন্য, মা স্ত্রী আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া পথের ভিখারী, পরম বৈরাগী, সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন, ভাই বন্ধুরা সবাই সৃষ্টিকর্ত্তা দয়াময় ভগবানকে ভুলিয়া গিয়াছে, কেহ আর আমার প্রাণের প্রিয় হরিনাম দিনান্তে একবারও গ্রহণ করে না, এই বলিয়া যাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া চক্ষে ধারা বহিত, মুখে অন্ন উঠিত না, চক্ষে নিদ্রা আসিত না, প্রাণে শান্তি পাইতেন না, অবশেষে প্রেমে পাগল হইয়া, সেই প্রেমের গোরাচাঁদ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, পথের কাঙ্গাল হয়ে ছুটিলেন, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশে দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিলাইয়া পাপে হত জগজ্জনের প্রাণ বাঁচাইলেন, সেই পরম করুণাময়ের যুগ-যুগবাহী অনন্ত করুণাধারা, অসীম স্নেহ ও ভালবাসা প্রাণে পুরিয়া হৃদয়ে ভরিয়া লইয়া, দুঃখী পাপী জগজ্জনকে বিলাইবার জন্য, এই প্রেমের চন্দ্র নববিধানের ভক্ত-রত্ন সে দিন ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর প্রাণের ভাইদের, হৃদয়ের বন্ধুদের প্রাণ ভরিয়া স্নেহ ভালবাসা দানে মন বুঝিল না, প্রাণে সন্তোষ হইল না, হৃদয় তৃপ্তি মানিল না; তাঁর দুঃখিনী

ভগিনীদের জন্য, অজ্ঞানান্ধ কন্যাদের জন্য প্রাণ কাঁদিল। বলিলেন, স্বর্গের পিতা আমাদের ফিরাইয়া দিলেন, স্বর্গের দ্বার খুলিলেন না, আমাদের বলিলেন, "তোমাদের চিরদুঃখিনী অজ্ঞানান্ধ ভগিনী ও কন্যারা যে অন্ধকারে পড়িয়া কাঁদিতেছে, তাদের আগে অশ্রুজল মুছাইয়া দাও, আমার কাছে ডাকিয়া আন"। এমন উদার হৃদয়, মহৎপ্রাণ আর কয়জনের আছে? এত স্নেহ ভালবাসার কথা মনে হলে পাষাণ প্রাণ বিগলিত হয়। আমাদের স্ত্রীজাতির শিক্ষা দীক্ষা, জীবনের উন্নতি, মঙ্গল যাহা কিছু, সবই তাঁর হৃদয়ের শুভ ইচ্ছা, মঙ্গল প্রার্থনা, কল্যাণ কামনার ফল। আমরা যেন সেই স্নেহময় ধর্ম্মাচার্য্য শিক্ষাগুরুর ইচ্ছামত পবিত্র সুন্দর সুমিষ্ট স্নেহময় জীবন লাভ করে সুখী ও কৃতার্থ হই। তাঁর ইচ্ছা, আদেশ উপদেশ খুব নিষ্ঠাভক্তির সহিত জীবনে পালন করিয়া, যেন তাঁর স্বর্গস্থ আত্মাকে তৃপ্তিদান করিতে পারি। আমাদের আচারে ব্যবহারে, কথায়, জীবনের প্রতিকার্য্যে যেন তাঁহার স্বর্গবাসী, আমাদের চিরশুভাকাঙ্ক্ষী দেবাত্মাকে এবং তাঁহার প্রাণের পূজনীয় জগজ্জননীকে সন্তুষ্ট করিতে পারি। ইহাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হউক। আজ হইতে যেন আমরা সকলে এই মহাব্রত গ্রহণ করি এবং সকলে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া, অবশিষ্ট সারা জীবন ব্যাপী সাধনায়, প্রাণপণ যত্নে যেন তাহা পালন করিতে চেষ্টা করি। সকলকে প্রাণভরে ভালবেসে সুখী করে, নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করে, সুখী ও ধন্য হতে পারি, দয়াময় দয়া করে আজ আমাদের এই আশীর্ব্বাদ করুন।

—•—

জীবন ও মৃত্যু।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমরা দুই প্রকারের চরিত্রবান্ লোক দেখিতে পাই। একপ্রকার লোক সমাজের অগ্রণীদিগকে আদর্শ করিয়া তাঁহাদের বিধি নিষেধ মানিয়া চলেন। আর এক প্রকার লোক সমাজের প্রচলিত মতামতের উৰ্দ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, কি এক নিগূঢ় শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া, অপূর্ব্ব উদ্যম ও উৎসাহের সহিত মানবজাতিকে অমৃতধামের পথ দেখাইয়া চলেন। একপ্রকার লোক অতিশয় সরল, সচ্চরিত্র এবং ধার্ম্মিক বলিয়া সুবিখ্যাত, সম্মানিত ও সমাদৃত। আর একপ্রকার লোক উঁহাদিগের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঐ সকল গুণে বিভূষিত নন, কিন্তু অন্য প্রকারের অমায়িক, চরিত্রবান্ এবং ধার্ম্মিক বলিয়া সম্মানিত ও সমাদৃত। এক ব্যক্তির চরিত্র-গঠনে মানবীয় যত্নের চিহ্ন দেখা যায়, অপর ব্যক্তির চরিত্র-গঠনে কেবল ভগবানেরই অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ প্রকাশ পায়। একজন নির্ম্মিত সুন্দর মোমের পুতুল, আর একজন স্বভাবজাত সুন্দর সরল শিশু। একজন উপার্জ্জনে উৎকণ্ঠিত, অপর জন বিসর্জ্জনে বিকসিত। একজন আত্ম গৌরবে গৌরবান্বিত, আর একজন ভগবদ্-গৌরবে গৌরবান্বিত। একজন অহঙ্কারে স্ফীত, অপর একজন নিরহঙ্কারে প্রস্ফুটিত। একজন আপন ইচ্ছার জয়াভিলাষী; অপর একজন ঈশ্বরেচ্ছার জয়াভিলাষী। একজন বলে, আমি করি, আর একজন বলে, আমি করি না, আমার ভিতরে যিনি আছেন, তিনিই আমার জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা হইয়া, আমাকে যন্ত্র করিয়া, তাঁর ইচ্ছামত এই যন্ত্রকে চালান।

আমরা অহঙ্কারী জীব, 'আমি আমার' লইয়াই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। ইহা কোন মতে সজ্ঞানে ছাড়িতে পারি না। নিদ্রিত অবস্থায় 'আমি আমার' থাকে না, সে সময় শোক তাপ মরণের ভয় কিম্বা সুখ সম্পদ জীবনের ভরসা অথবা স্ত্রী-পুত্র পরিবারের ভাবনা কিছুই থাকে না। এই ভয়, ভরসা ও ভাবনাশূন্য অবস্থায় এক প্রকার শান্তি অনুভব করি; তাই বলি, বেশ সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। নিদ্রাবস্থায় বা যোগাবস্থায় যখনই মানুষের অহঙ্কার যায়, তখনই শান্তি হয়। যোগিগণ তাই সজ্ঞানে অহঙ্কারশূন্য হইয়া, বিধাতার বিধানে সম্পূর্ণ নির্ভরপূর্ব্বক, সদানন্দে ধীরে ধীরে ফুলটীর মত প্রস্ফুটিত হন; আর আমরা অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া, সদাই ভয় ভাবনায় আঁকু বাঁকু করিয়া, শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়া ফেলি। তাই ধর্ম্মরাজ যমকে, প্রত্যক্ষ বন্ধু মৃত্যুকে, ভয়ঙ্কর শত্রুরূপে চিত্রিত করি। এই ভয়ও জগতের ইতিহাস-পাঠে, জীবনের অভিজ্ঞতা-স্মরণে এবং মৃত্যুকে স্থির দৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত করিতে পারিলে, ভূতের ছায়া-কায়ার মত অন্তর্দ্ধান হইয়া যায়। নচিকেতা তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় যম-সদনে (মর্ত্ত্য ভবনে) মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। পরে মৃত্যু আসিয়া, তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তিনটী বর দিয়াছিলেন। অবশেষে মৃত্যু নচিকেতাকে আপনার হইয়া, স্বরূপ প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে আত্মতত্ব ও ব্রহ্মতত্ব-জ্ঞানে বিভূষিত করিয়া, মৃত্যুর অধিকার হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া, পুনর্ব্বার তাঁহাকে তাঁহার পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই উপাখ্যানের মর্ম্ম এই যে, মৃত্যু-চিন্তাই মৃত্যুভয় দূর করিয়া, মৃত্যুকে বন্ধুরূপে প্রকাশ করে। এখন একটী একটী করে দেখা যাক, আমরা মৃত্যুকে এত ভয় করি কেন এবং সেই ভয় অহঙ্কারী মানব-বুদ্ধি দ্বারা তিরোহিত হয় কি না?

১ম। মরণের পরে কোন্ এক অপরিচিত স্থানে গিয়া, কিভাবে আবার জীবন আরম্ভ করিতে হইবে কি না, এই সংশয়ে আমরা অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া মৃত্যু-চিন্তা করিতে বিরত হই। কিন্তু ইহ জীবনে মৃত্যু-চিন্তা করিলে, মৃত্যু হইলে যে সকল বস্তু পরিত্যাগ করিতে হইবে, সেই সকল বস্তুর অনিত্যতা-বোধের সঙ্গে সঙ্গেই এক নিত্য বস্তুর আভাস উপলব্ধ হয়। ইহাই আত্মার আভাস। যতক্ষণ এই সমস্ত অনিত্য বস্তুকে নিত্য বলিয়া বোধ থাকে, ততক্ষণ আমরা দেহ, গেহ, বিষয়াদি লইয়া ভুলে থাকি। অপরের মৃত্যু দেখিয়া যখন এই ভুল ভেঙ্গে যায়, তখনি চিদাত্মার আলোকে, মৃত্যু-ভয়-আঁধার অপসারিত হইয়া, মরণের উপরে

অমর লোকের প্রকাশ হয়। প্রকৃতি কোন স্থান শূন্য রাখে না। পার্থিব সমস্ত বিষয় হইতে মন আসক্তিশূন্য হইলে, সেই শূন্য মন অপর কোন অপার্থিব বিষয় দ্বারা পূর্ণ হইবেই হইবে। মনের এই নবভাব ক্ষণিকের জন্য হইলেও, সেই ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলোকে শোক তাপ আর তিষ্ঠিতে পারে না। এই প্রশান্ত অবস্থা শোকার্ত্ত সকল ব্যক্তিই অনুভব করিয়াছেন। ইহা কিরূপে কোথা হইতে আসে, আবার কোথায় চলিয়া যায়, তাহা মানব-বুদ্ধির অতীত হইলেও সম্ভোগের বিষয়। বাতাসের ন্যায় ইহা তপন-তাপে তাপিত তনুকে স্পর্শপূর্ব্বক শীতল করিয়া চলিয়া যায়। ইহাই আত্ম-প্রসাদ, পার্থিক সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ। এই মুহূর্ত্তে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ বন্ধু বলিয়া মনে হয়, আবার পর মুহূর্ত্তে ভুলে যাই। আবার বিষয়-বাসনা শোক-তাপ আসিয়া মনকে পানা-পুকুরের মত আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, আর সেই মনে আত্মা-সূর্য্য প্রকাশ পায় না।

এই জগতে আসিবার পূর্ব্বে ইহা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতে এতাবৎকাল আমরা কিরূপে মাতৃগর্ভে এবং এই ধরিত্রীবক্ষে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছি, তাহা মনে করিলে আর মরণের পরে অজানিত স্থানে কিরূপে জীবন আরম্ভ করিতে হইবে, এ ভাবনা থাকে না। দেহে কি বিদেহে, যে অবস্থায় যাইনা কেন, তাহার সমস্ত বিধি ব্যবস্থা বিধাতা পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের শারীরিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আমাদের অজ্ঞাতসারে যেরূপে আমরা জড়-সম ভ্রূণাবস্থা হইতে পশুসম শৈশবাবস্থা, এবং শৈশবাবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে মানবাবস্থা পাইয়াছি, সেইরূপ মরণাবস্থা হইতে কোন এক অবস্থায় প্রবেশ করিব, তা আর অসম্ভব কি? এই প্রবেশ-দ্বার এক নিগূঢ় নিয়ম দ্বারা সংরক্ষিত। ঠিক কোন্ সময়ে আমরা জাগ্রত বা নিদ্রিত হই, তাহা যেমন বুঝিতে পারি না, আমাদের জীবন মরণও সেইরূপ রহস্যপূর্ণ। উভয় অবস্থার সাক্ষী 'আমি', কিন্তু কোন অবস্থাই 'আমি' নয়। অবিলুপ্ত-চৈতন্যস্বরূপ, অজর, অমর, চিদাকার 'আত্মা'ই 'আমি'।

২য়। মরণের যাতনা কি করিয়া সহ্য করিব, ইহা একটা বিষম ভাবনা। সেই আসন্নকালে নিতান্ত পরবশ হইয়া মল-মূত্রের উপরে পড়িয়া থাকিতে হইবে, কি দুর্গন্ধময় গলিত কুষ্ঠের যাতনায় অস্থির হইতে হইবে, কি ভয়ানক গাত্রদাহে ছট্‌ফট্ করিতে হইবে, কি অন্য কোন বিশেষ যাতনাদায়ক পীড়া বা আঘাতে এই দেহ ত্যাগ করিতে হইবে, তা কে বলিতে পারে। বিশ্বাস বা অভিজ্ঞতার চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে এ ভয়ও যাইতে পারে। জীবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যেরূপ বিচিত্র কৌশলে গঠিত, উহাদের কার্য্য-প্রণালীও ততোধিক বিচিত্র। শরীর সুস্থ থাকিলে উহার আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি যেরূপ বাহ্যবস্তুর সহিত উপ-যোগিতা রক্ষা করিতে পারে, শরীর অসুস্থ হইলে সেরূপ পারে না। শারীরিক যন্ত্রণা স্নায়ু দ্বারা সঞ্চালিত না হইলে, যাতনা-বোধ হয় না। অসুস্থ শরীরে এই স্নায়বীয় সঞ্চালন-শক্তির হ্রাস হয়। রোগ-বৃদ্ধির সহিত এই শক্তিরও ক্ষয় হইতে থাকে; ক্রমে ক্রমে এত ক্ষীণ হইয়া যায় যে, উহা দ্বারা আর কোন যন্ত্রণাই সঞ্চালিত হইতে পারে না, এবং মস্তিষ্কেরও বিকার বশতঃ কোন প্রকার বাহ্যজ্ঞান থাকে না। সুস্থাবস্থায় যে যাতনা অসহ্য বলিয়া বোধ হয়, রুগ্নাবস্থায় তাহা হয় না, ইহা আমরা সকলেই জানি। ফোঁড়ার প্রথমাবস্থায় যেরূপ কষ্ট হয়, পরে সেরূপ হয় না। আসন্নকালে শারীরিক কোন যাতনাই বোধ হয় না, তবে অঙ্গাদির বিকৃতি হয় সত্য, কিন্তু তাহা যন্ত্রণার লক্ষণ নয়, মাংসপেশীর সঙ্কোচ হেতু এরূপ হইয়া থাকে, যেমন বলিদানের পর জীবদেহ মস্তক হইতে পৃথক হইয়াও ছটফট করে।

এই জ্ঞান-কৌশলের মধ্যে ভগবানের প্রেম-নিদর্শন আরও উজ্জ্বলতর হয়। যখন দেখি যে, যন্ত্রণা সহ্য করাইবার জন্য যেমন তিনি বাহ্যজ্ঞান হরণ করেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গেই আত্মজ্ঞান-দানে রোগীকে সান্ত্বনা দান করেন। বসন্ত হইলে লোকে মার অনুগ্রহ বলে। বসন্তরোগী যখন সুস্থ হয়, তখন তার বাহ্যজ্ঞান-শূন্য অবস্থা-কালের কত আনন্দের কথা বলে। গলিত কুষ্ঠরোগীকে বলিতে শুনিয়াছি যে, সে সময়ে সময়ে এত আনন্দ অনুভব করে যে, কথায় তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। কখন কখন রুগ্ন অবস্থায় আমরাও এক প্রকার শান্তি পাই, তখন আর রোগের যাতনা বোধ হয় না। রোগে শোকে তাপে পার্থিব সমস্ত প্রিয় বস্তুর অনিত্যতা-বোধ হইবা মাত্র সেই বোধেই নিত্যবোধ হয়। তাই মুমূর্ষু ব্যক্তি ধন, জন, মান, সম্ভ্রম, বন্ধুবান্ধব, দেহ, প্রাণ পরিত্যাগের সময় বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া আন্তরজ্ঞানে পূর্ণ হন এবং পারমার্থিক কথা বলেন। ইহাকে প্রলাপ বলিয়া অবহেলা না করিয়া, বিশ্বাস ও মনো-যোগের সহিত শুনিলে, প্রেমময়ের প্রেম-নিদর্শন প্রকাশ পায়।

এই সকল ঘটনা দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে যে অব-স্থাকে আমরা অজ্ঞান অবস্থা বলি (unconsciousness), তাহা যথার্থ পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থা, কি বাহ্যজ্ঞানের ঊর্দ্ধে সমাধির অবস্থা (superconsciousness)? সাধু অসাধু সকলেরই এই বিভোর অবস্থা হয় বলিয়া ইহাকে স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত নয়; কারণ স্বভাবের ঈশ্বর স্বভাবের ভিতর দিয়াই সাধু-অসাধু-নির্ব্বিশেষে, সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার কৃপা-বিতরণে কখনই কুণ্ঠিত নন। তা না হ'লে আমার ন্যায় মহাপাপী কৃতঘ্ন ব্যক্তিকে কি তিনি এতকাল জীবিত রাখিয়া, তাঁহার দয়ার কথা বলিতে সুযোগ দিতেন, না লোকে তাঁহাকে পতিতপাবন অধমতারণ বলিয়া জানিত? তাই বলি, দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলি, সাধু অসাধু কেহই করুণাময়ের কৃপাকণা হইতে কখনই বঞ্চিত নয়। প্রত্যে-কেই আপন আপন জ্ঞান অনুযায়ী, মৃত্যুর পূর্ব্বে, আপন আপন গম্যস্থানের আভাস পাইয়া সানন্দে দেহত্যাগ করে। "আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

দুর্গন্ধময় শয্যায়, অথবা গলিত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বীভৎস দেহে, অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে হইবে ভাবিলে, শরীর মন শিহরিয়া উঠে। কিন্তু অভ্যাস ও অবস্থাভেদে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-গ্রহণের শক্তিও পরিবর্ত্তিত হয়। দুর্গন্ধময় স্থানে বহুক্ষণ থাকিলে, আর সে দুর্গন্ধবোধ থাকে না। ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করিয়া শুইলে, কোন দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না, কিন্তু একবার ঘরের বাহিরে গিয়া আবার সেই ঘরে আসিলে একটা দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। অভ্যাস বশতঃ রোগী নিজ পূতিদেহের দুর্গন্ধ কিছুই অনুভব করিতে পারে না। ইহা ছাড়া রুগ্নাবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি শিথিল হওয়ায় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর অনুভূতি হয় না। অপরের আসন্ন অবস্থা দেখিয়া সুস্থ ব্যক্তির হৃদয় কাঁপিতে পারে, কিন্তু সেই কাল উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তিই আর সে কষ্ট অনুভবই করিতে পারে না। করুণাময়ের করুণায় সে ইহা অনায়াসে ভোগ করে।

৩য়। মৃত্যুর আর একটী বিষম ভাবনা, প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদ। আমাকে এই সমস্ত প্রিয়জনকে ছাড়িতে হইবে এবং আমার অবর্ত্তমানে ইহাদের কি দশা হইবে? মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে, ইহা জানিয়া যদি আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করি, অবকাশ মত প্রতিদিন মৃত্যু চিন্তা করি, তাহা হইলে মৃত্যুর আনুষঙ্গিক ভয় ভাবনা হইতে মুক্ত হইতে পারি। মৃত্যু-চিন্তাই মৃত্যুভয়-নিবারক মহৌষধ। সদৃশ-চিকিৎসা (Homeopathy) বিষে বিষক্ষয়, অথবা টিকা চিকিৎসা (Isopathy) এই রোগের ব্যবস্থা। কোন ব্যাধির আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইবার জন্য সুস্থ শরীরে ঐ ব্যাধির বীজ লইয়া টিকা লওয়া বিধি। যখন জীবনের সম্ভোগ পূর্ণ মাত্রায় উঠে, ধন-জন, মান-সম্ভ্রম, রূপ-যৌবন, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি কোন বিষয়েরই অভাব থাকে না, সেই সুখের সময়ই মৃত্যু-টিকা লইবার উপযুক্ত সময়। পার্থিব সমস্ত অনুকূল কামনা ও চিন্তার মধ্যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির চিন্তা-বীজ লইয়া ফুঁড়িয়া দিতে হইবে—মৃত্যু-টিকা লইতে হইবে। পৃথিবীর সুখ-স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া মৃত্যুচিন্তা করিতে হইবে। সৌভাগ্যের সাদর সম্ভাষণ ও প্রিয়জনের প্রেমালিঙ্গন হইতে বিষয়াসক্ত মনকে মুক্ত করিতে হইবে। বিষয়-সুখ-কল্পতরু-জড়িত আশালতার বাঁধন খুলিয়া, একাকী গভীর নিশিতে, ভূতপ্রেতের ভয়ে ভীত ছমছমে শরীরে, চিন্তা করিতে হইবে, "এই অর্দ্ধ পৃথিবীর মৃতবৎ নিদ্রিত অবস্থায় কে জাগ্রত থাকিয়া সকলকে দেখিতেছে? কে সমস্ত জীবের, আমার এবং আমার প্রিয়জনের জীবনে মরণে নিত্য সঙ্গী হইয়া রহিয়াছে?" যখন ইহার উত্তর পাইবে, তখন জীবন মরণের বিরোধ মিটিবে, ইহকাল পরকালের ব্যবধান ঘুচিবে। কোন বিচ্ছেদের আশঙ্কা থাকিবে না। তোমার এই নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত অবস্থার আলোকে, নিরবচ্ছিন্ন মিলনের আভাসে, প্রিয়জনেরও মৃত্যুভয় এবং বিচ্ছেদ-দুঃখ দূর হইবে তখন যম আসিয়া সাবিত্রীর হৃদয়-কন্দরের দেবতার বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিবে না। ইহ-পরকালের ব্যবধান-বোধ যাঁহাদের আছে, কিম্বা যাঁহারা বিষয়-সুখকে চরম সুখ জানিয়াছেন, অথবা এই সুখের অধিক কোন এক অপার্থিব সুখের আভাস পাইয়াও ইহাকে কল্পনা মনে করেন, তাঁহারা মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক সহানুভূতির কার্য্য দেখিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। সংসার আশ্রম, অনাথ আশ্রম, আতুর আশ্রম, ধর্ম্মশালা, অতিথিশালা, চিকিৎসালয়, সেবালয় ইত্যাদি সমস্তই সহানুভূতির নিদর্শন সর্ব্বদেশেই প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সহানুভূতি দ্বারা পরিচালিত মানব আপনার অবস্থা ভুলিয়া, অপরের অবস্থার সহিত মিলে মিশে এক হইয়া যায়। মাঝে মাঝে দেখা যায় যে, পিতামাতার বর্ত্তমানে সন্তানের যেরূপ অবস্থা হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাঁহাদের অবর্ত্তমানে উহা অপেক্ষা শতগুণে ভাল হইয়াছে। জগদ্বিখ্যাত অনেক মহাপুরুষ নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, অমুক সময় অমুক বিপদ না হইলে তাঁহারা ওরূপ উন্নত হইতে পারিতেন না। আমার বর্ত্তমানে কি অবর্ত্তমানে আমার প্রিয়জনের ভবিষ্যৎ উন্নতি হইতেও পারে, না হইতেও পারে। আত্মীয়-বিয়োগে যেরূপ, আত্মীয়-অবিয়োগেও সেইরূপ প্রিয়জনের উন্নতি হইতে পারে, অবনতিও হইতে পারে। ইহার মধ্যে মানববুদ্ধির অতীত এমন এক রহস্য আছে, যাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহাকে কর্ম্মফলই বল, দৈব-বিপাকই বল, স্বভাবই বল, আর ঈশ্বরেচ্ছাই বল, যে যাহা বিশ্বাস করে, তারই উপর নির্ভর করিলে আর কোন ভাবনা থাকে না।

যিনি যে মতাবলম্বী হউন না কেন, সকলেই স্বীকার করেন যে, এক বিশ্বজনীন নিয়মের দ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, সকল কার্য্যই চলিতেছে। নাস্তিক ইহাকে স্বভাবের নিয়ম বলেন, আস্তিক ইহাকে নিয়ন্তার ইচ্ছা বলেন। একই ভাবে দুইটী কথায় প্রকাশ করা মাত্র। একটী অপরটীর পূরক। বিশ্বজনীন নিয়ম বলিলে ইহাই বুঝায় যে, জগতে যাহা কিছু হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, সে সমস্তই এই নিয়মের অধীন। হৃদয়-বিদারক সমস্ত দুঃখ কষ্ট, প্রাণনাশক সমস্ত রোগ-যন্ত্রণা, ভৌতিক সমস্ত দুর্ঘটনা এই নিয়মাধীন। যে সকল ঘটনা অপ্রাসঙ্গিক, অনিয়মিত, আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়, সে সমস্তও এই বিশ্বজনীন নিয়মের অন্তর্ভূত, একই অনতিক্রমণীয়, অখণ্ডনীয় নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। ইহার মধ্যে একটীও উদ্দেশ্য-শূন্য আকস্মিক ঘটনা-চক্রের নৈমিত্তিক কোন ব্যাপার নহে। ইহাদের প্রত্যেকটীর কোন না কোন অভিপ্রায় নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই অভিপ্রায়কে "ক্রমোন্নতি" আখ্যা দিয়া স্বভাবেরই নিয়ম বলা হয়। ইতিহাস বলে যে, আপাততঃ সর্ব্বপ্রকার প্রতীয়মান অমঙ্গল হইতে মঙ্গলই হইতেছে। আস্তিকও তাই বলেন যে, ভগবানের বিশ্বজনীন প্রেম-বিধানেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় নিত্যই হইতেছে।

এখন বিচার যুক্তির কথা, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের

গবেষণা ছাড়িয়া দিয়া, মানুষের স্বাভাবিক প্রাণের টানটা কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। হৃদয়ের প্রধানস্থানের ঝোঁকটা কোন দিকে? বুদ্ধ, সক্রেটীস্, ঈশা, মুশা, মহম্মদ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদি মহা মহা পুরুষেরা কেন স্ত্রী, পুত্র, জীবন, যৌবন সর্ব্বস্বধন পরিত্যাগ করিয়া, পথের ভিখারী হইয়া, অপমানে, নির্য্যাতনে, বিষপানে, ক্রুশোপরি, যুদ্ধক্ষেত্রে, অগ্নিশিখায় প্রেমাবিষ্ট হৃদয়ে, রক্তাক্ত কলেবরে শত্রুদিগকে আশীর্ব্বাদ-পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়াছিলেন? কেন তাঁহাদের শত্রুরা পরে অনুতপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকেই প্রাণের পুতলি করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন? তাঁহাদের চরিত্র-পাঠে আমাদের মত ঘোর স্বার্থপর লোকেরও কেন কণ্ঠরোধ হয়ে আসে, চোখ ফেটে জল প'ড়ে বুক ভেসে যায়, দেহ মন প্রাণ ঠাণ্ডা হয়? আবার আততায়ী, অত্যাচারী, নিষ্ঠুর লোকের চরিত্র-পাঠে কেন দেহ মন প্রাণ জ্বলে উঠে? ঐতিহাসিক ঘটনা ছাড়িয়া ঔপন্যাসিক কল্পিত বৃত্তান্ত পাঠেও কেন ঐ রূপ হয়? আমরা যে যে-ভাবের লোক হই না কেন, প্রত্যেকেরই মন কেন এরূপ বিচলিত হয়? ইহাতে মনে হয় নাকি, মানুষের স্বাভাবিক প্রাণের টানটা একই দিকে কে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে? একই পুরুষ সকলের প্রাণের প্রাণ হইয়া কোন্ এক জীবন মরণের অতীত অনন্ত শান্তিরাজ্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন, বোধ হয় নাকি? এই টান না থাকিলে মহাত্মারা কি এরূপ বিস্ময়জনক জীবন এবং আরও আশ্চর্য্যমরণ এই পৃথিবীতে অভিনয় করিতে পারিতেন? কিম্বা এই টান না থাকিলে, তাঁহাদের ঐ অভিনয় দেখিয়া শুনিয়া পড়িয়া কেহ কি তাদৃশ অভিনয় করিতে পারিত, কিম্বা চেষ্টা করিত, কিম্বা আমাদের মত ক্ষণিকের জন্যও এক আধ ফোঁটা চোখের জল ফেলিতে পারিত? একই টানে নিরহঙ্কারী সাধু আপনার দেহ মন প্রাণ সমস্ত সমর্পণ করেন; অহঙ্কারী সাধু পুরুষোত্তমের এই টানকে না বুঝিয়া, আপনারই বিদ্যা বুদ্ধি ও বীর্য্যের ফল জানিয়া গৌরব করেন, বিষয়াসক্ত স্বার্থপর দুরাচারী ব্যক্তি অনুতাপে দগ্ধ হয়। এই নিগূঢ় জন্মগত টান না থাকিলে সাধু ভক্তেরা কি সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিতেন, না অসাধু স্বার্থপরেরা অনুতপ্ত হইতে পারিত? সল্ পল্, ওমর, ওসমান, জগাই মাধাই, কত ভাই কোথায় থাকিতেন, আর আমাদেরই বা কি দশা হইত? মহাপুরুষেরা যে টানে প্রেমে প্রমত্ত হইয়া পড়েন, অধম পুরুষেরা সেই টানের মহিমা একটু আধটু অনুভব করিতে পারে বলিয়াই না আপনাকে ধিক্কার দেয়? তাঁহারা বলেন, "ভাই, কেহই নিরাশ হইও না, যিনি আমাদের টানিতেছেন, তিনি তোমাদেরও টানিতেছেন। চুম্বক পাথর সকল লোহাকেই টানে, ময়লা মাটি মাখান লোহা এ টান বুঝিয়াও বোঝেনা; বিষয়-বাসনা ময়লা মাটি গেলেই এ টান স্পষ্ট বুঝিবে, তখন আর আমরা তোমাদের বাহিরের বস্তু থাকিবনা। তোমরা সেই অন্তরের টানে আমাদিগকে অন্তরস্থ করিয়া, পুরুষোত্তমের সহিত একত্রে থাকিয়া, কি করে বাঁচিতে ও মরিতে হয়, আমাদেরই মত বুঝিতে পারিবে। অমরধামে বসিয়া অমরাত্মাদের সহিত শারীরিক জীবন মরণের খেলা দেখিয়া আনন্দে হাত তালি দিবে। এই নিত্যধামে দেশ কাল পাত্রের কোনই ব্যবধান থাকে না, সেখানে সবাই এক-প্রাণে এক-সুরে 'জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে' বলিয়া নাচে গায়, হুকুমে হাজির থাকে।"

মানুষের সত্যের দিকে এতই ঝোঁক যে, সে আপনার বিচার আপনি করে। আমিই আমার বিচারক হইয়া আমারই বিচার করি। বিষয়েন্দ্রিয়ের নানা প্রকার সুখের লোভে কত কি ভাবি ও কত কি করি। সেই সেই কাজ করিয়া আমার নিজের ও প্রিয়জনবর্গের কত সুখ সম্পদ হয়। এই শ্রীবৃদ্ধি সত্ত্বেও কেন মনে হয়, আমার অমুক কাজটা করা বড়ই অন্যায় হইয়াছে, সে কাজটা না করিলেই ভাল হইত। আবার কোন একটা খুব সুখ-প্রদ কাজ করিতে যাইতেছি, এমন সময় কে যেন একজন এক হ্যাঁচকা টান দিয়া বাধা দেয়। কত বিচার বিবেচনা বুদ্ধি খরচ করিয়া যে ফলদায়ক কাজটা ঠিক করিলাম, মুহূর্ত্তের মধ্যে সেটা উল্টে পাল্টে গেল। এই টানের কাছে লাভ লোকসান, সুখ দুঃখ, জীবন মরণ, মান অপমান, কিছুই তিষ্টিতে পারে না। এই টানে সকল বিপরীত গতি ফিরিয়া একই দিকে ধায়। সকল দ্বন্দ্বের সমাধান হয়। সকল দ্বন্দ্বের মধ্যে একই উদ্দেশ্য, ক্রমবিকাশ বা প্রেমবিকাশ যাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাঁহার কাছে বিরোধের স্থান কোথায়? তাঁহার নিত্যজ্ঞান হইয়াছে, কারণ কোন এক নিত্যবস্তু না থাকিলে কাহার চিরোন্নতি হইবে? তিনি জানেন, এই অজর অমর আত্মার অনন্ত উন্নতির জন্যই জীবন ও মরণ উভয়ই ব্যবস্থিত। তাঁহার কাছে জীবন মরণ উভয়ই আদরের সামগ্রী। তিনি বিধাতার বিধির উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর-পূর্ব্বক উভয়ের সদ্ব্যবহার করেন। কি করে জীবনধারণ করিতে হয় এবং কি করে মরণ আলিঙ্গন করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত তিনি জগতে রাখিয়া যান। হৃদয়ের অন্তরতম স্থানে থাকিয়া যিনি সাধু অসাধু সকলকে টানিতেছেন, মরলোক হইতে অমরলোকে লইয়া যাইতেছেন, সেই হৃদয়েশের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে, জীবন মরণের রহস্য উন্মোচন হয় না, নিত্যবস্তুর জ্ঞান হয় না। যতক্ষণ মৃত্যু-ভয়, ততক্ষণ নিত্য-জ্ঞানের অভাব। মৃত্যুই এই নিত্যজ্ঞানের কষ্টিপাথর। এই পাথরে ঘষিয়া আপন আপন জ্ঞান পরীক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য, নতুবা মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া অমৃতের স্বাদ পাওয়া যাবে না।

শ্রীহলধর সেন।

প্রেরিত কেদার নাথ দে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এ বৎসর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রচারে জীবন ঢালিয়া দিলেন। অনন্ত-চিন্ত হইয়া সর্ব্বদা প্রেরিত জীবনে কেমন করিয়া ভগবানের কার্য্য করিতে পারিবেন, তাই সর্ব্বান্তঃকরণে চিন্তা করিতেন। প্রচার-কার্য্য তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী হইয়া উঠিল। প্রেরিত কেদার নাথের পরীক্ষার প্রথম বৎসর দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বিধান-প্রবর্ত্তক ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন 25th January নববিধান ঘোষণা করিলেন। শ্রীনববিধানের বিজয় নিশান ভারতাকাশে উড্ডীয়মান হইয়া সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় প্রচার করিল। সমগ্র জগতে কি আনন্দ-প্রবাহ যে সেই সময় উঠিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। প্রাচীন কাল হইতে যত যত ধর্ম্ম জগতে আসিয়াছে, সকলে আসিয়া নববিধানে মিশিল। আমরাও বাল্য জীবনের ভিতর দিয়া, সেই আনন্দালোকের ভিতর দিয়া, নববিধান নিশান ধরিলাম। ভারত ও হিন্দুস্থানের চারিধার হইতে লোক সকল আসিয়া নববিধানে যোগ দিল। শ্রীআচার্য্য-দেব প্রেরিতদিগকে লইয়া ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ করিলেন। কেদার নাথ এই বিশেষ সময়ে প্রেরিত ভাই নাম প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

এই বৎসর মাঘোৎসবের কয় মাস পরে শ্রী আচার্য্যদেব কয়েকটী প্রেরিত ভাইকে নানা দেশে প্রচারে প্রেরণ করিলেন। নববিধানের ধর্ম্ম-বীরগণ এক এক জন এক এক দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। ভাই কেদার নাথকে শ্রীআচার্য্যদেব সে বৎসরে পঞ্জাবে প্রেরণ করিলেন। সেখানেই তাঁহার প্রচার-ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। প্রচারে যাইতে কেদার নাথের বড়ই উৎসাহ ছিল। তিনি পরিবার, পুত্র কন্যা ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিয়া, আনন্দে উৎসাহিত হইয়া পিতার কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন। ভগবান্ যে তাঁহার ভক্তের সকল ভার আপনি গ্রহণ করেন, এ কথা যে কত সত্য, তাহা এই পরিবারে প্রতিফলিত হইয়াছিল। সেই সময় মঙ্গলবাড়ী হইতে ভাই অমৃত লাল বসু, গৌরগোবিন্দ রায় সপরিবারে প্রচারে যান। শ্রীআচার্য্যদেব কেদারনাথের ভাড়া বাড়ী উঠাইয়া দিয়া, ভাই গৌর গোবিন্দের বাড়ীতে আসিয়া বাস করিবার জন্য অনুমতি করিয়াছিলেন। এই অনুগ্রহ পাইয়া ভাই কেদারনাথের পত্নী বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। প্রতি প্রাতঃকালে শ্রীআচার্য্যদেবের উপাসনাতে যাইতে পারাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা সুখের কারণ হইয়াছিল। মাতৃদেবী ছেলেদের খাওয়াইয়া শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হইতেন। আমাদের বলিয়াছিলেন, কখনও তাঁর বিলম্ব হইত না।

সেই সময় নববিধানে শ্রীআচার্য্যদেবের নব নব ভাবের আরাধনা, প্রার্থনা এবং সঙ্গীত-প্রচারকের সেই ভাবের সঙ্গীত সকল যাঁহারা যথার্থ-প্রাণে সম্ভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সে সময় কমলকুটীর আর ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। মা তাঁহাদেরই একজন ছিলেন। কমলকুটীর সে সময় ধর্ম্মের আনন্দে পূর্ণ থাকিত। ক্রমে ক্রমে নানাদেশে ও নগরে নগরে ঋষি কেদার নবোদ্যমে নববিধানের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। পরে মাঘোৎসবের প্রাক্কালে একে একে বিজয়ী সৈন্যের মত বিধান-প্রেরিত দল, ঈশ্বরের যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের মিলন প্রচার করিয়া, চতুর্দ্দিক হইতে এক একজন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু শ্রীআচার্য্যদেবের বড় স্নেহের ভাই অঘোর আর ফিরিয়া আসিলেন না।

শ্রীআচার্য্যদেবের ভ্রাতৃশোক দেখিয়া কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। স্বর্গীয় আত্মা যদি অমর, তবে কেন আপনি রোদন করিতেছেন, অনেকের এইরূপ প্রশ্ন ছিল; কিন্তু শ্রীআচার্য্যদেব উত্তরে বলিলেন, অমরাত্মার সহিত আমরা চিরদিন সম্মিলিত থাকিব ইহা নিশ্চয় সত্য, কিন্তু যাঁহারা ইহলোকে রহিলেন, তাঁহা-দের দৈহিক বিচ্ছেদ-যাতনা অপরিহার্য্য। সেবার ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে শ্রীআচার্য্যদেব বিরূপভাবের উপদেশ প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন, তাহা বিধানের ইতিহাসে চিরদিন জীবন্ত থাকিবে। সাধু অঘোরনাথের স্বর্গারোহণে ভাই কেদারনাথ বড় ব্যথিত হইয়াছিলেন। এই সাধু অঘোরের সঙ্গে তিনি সকল সময় সংযুক্ত ছিলেন। ইদানীং একবার সাধু অঘোর পশ্চিমে আমাদের বাড়ী গিয়াছিলেন। আমরা খুব ছোট ছিলাম, তবু একটু মনে পড়ে, বেশ প্রফুল্ল সদানন্দ মুখকমল। মার মুখেও শুনিয়াছি, অঘোরনাথ যেখানে আতিথ্য লইতেন, তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। নিজের একটী ছোট ব্যাগ সঙ্গে থাকিত, তাহাতেই সব নিজের পাকোপযোগী ছোট ছোট বাটলো হাতা বেড়ী প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুলিতে পূর্ণ থাকত। সেবার অনন্তধামের সঙ্গে মিলিত হইয়া কি অপূর্ব্ব সংযোগে মাঘোৎসবে শ্রীআচার্য্যদেব সকলকে আহ্বান করিলেন। দলে দলে যাত্রীরা আসিতে লাগিলেন। ব্রহ্মমন্দিরে স্থানের অভাব দেখা গেল। সকলে কত নূতন জ্ঞান, ভাব, যোগ, ভক্তি ও ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হইয়া মাঘোৎসব সম্ভোগ করিলেন। সেই মাঘোৎসব যাঁহারা সম্ভোগ করিয়াছেন, এ ভবে তাঁহারা আর কখনও অনন্তের সঙ্গে যোগ না রাখিয়া উৎসবে উপনীত হন নাই।

ভারতাশ্রমের পর হইতে পটলডাঙ্গায় কিছুদিন মেয়েদের School চলিয়াছিল। ইহার পর অনেক দিন বন্ধ ছিল। অনুমান ১৮৮২ অব্দে কমলকুটীরের সন্নিহিত বৃহৎ অট্টালিকাতে Victoria College ও Collegiate School পুনঃ সংস্থাপিত হইল। ভাই প্রসন্ন কুমার সেন অধ্যক্ষরূপে সপরিবারে বাস করিতেন। ভাই কেদারনাথ এক অংশে সপরিবারে রহিলেন এবং Schoolএ শিক্ষকতার কার্য্য করিতে লাগিলেন। সেখানে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার

জন্ম হয়। এই কন্যাকে নিরামিষ খাওয়াইতেন। প্রতিদিন নাম দিতেন। কমলকুটীরের পূজা ও গাছতলার ভোজন সমাপন করিয়া কিছু পুষ্প পত্র পল্লব লইয়া Schoolএ আসিতেন ও সর্ব্বপ্রথমে শিশু কন্যাকে টেবিলে বসাইয়া, পুষ্পে সাজাইয়া নামটী উচ্চারণ করিতেন, পরে আমাদিগকে পড়াইতেন। একটী মোটা কাগজে প্রতিদিন সংখ্যা দিয়া নামগুলি লিখিতেন। তাঁহার হাতের লেখা অতিশয় সুন্দর ছিল, সেইজন্য মুক্তার মত দেখাইত। এইরূপে ৭০টী নাম হইবার পরে শ্রীআচার্য্যদেব ১৮৮৪তে স্বর্গারোহণ করেন। সেই হইতে আর নাম রাখিতেন না। অনেক দিন পরে সেই নাম আর পাওয়া যায় নাই। কয়েকটী আমাদের মনে আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—ক্ষমাসিন্ধু, অমৃতবিন্দু প্রীতিপ্রমোদিনী, শান্তসুহাসিনী, সুধীরসুন্দরী, বনকুসুমেশ্বরী, যোগনিদ্রাপরায়ণা, দেবজ্বদিপদ্মাসনা, পুণ্যমনিমানস্বনী, নববিধানরঙ্গিনী, হাস্যসিন্ধুতরঙ্গিনী, নিত্যসুখবৰ্দ্ধিনী, সুধানিসান্দনী, প্রাণতোষিণী।

শ্রীআচার্য্যদেবের মহাপ্রস্থানে কমলকুটীর, কলুটোলা ও বিধান-প্রেরিত দল কেবল দুঃখ পাইলেন, তাহা নহে; সমস্ত ভারত কেন, চারি মহাদেশ ব্যাপিয়া এই শোকের বার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রিয়রূপে কে না ভাল বাসিয়াছিল। শ্রীআচার্য্যদেবের মুখনিঃসৃত বাণীতে England পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিল। ইহার পরে একটী মাসও যাইতে না যাইতে, শ্রীদরবার, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ইত্যাদি লইয়া যে সকল গোলযোগ হইয়াছিল, তাহা অবশ্য ইতিহাসে চিরদিন থাকিবে। কিন্তু অল্প কিছু যাহা আমরা জানি এবং ভাই কেদার নাথের সঙ্গে যাহা সংসৃষ্ট, তাহাই এখানে উল্লেখ করিতেছি। শ্রীআচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পরেই সকল প্রেরিত ভাইগণ শ্রীদরবার করিতে বসিলেন এবং অন্যান্য বিষয় গুলির সহিত ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, শ্রীআচার্য্যদেবের জন্য শোক-প্রকাশার্থ এবং তাঁহার মহিমা ও সম্মান প্রদর্শনার্থ এক মাস বেদীতে বসিয়া কেহ ব্রহ্মমন্দিরের রবিবাসরীয় উপাসনা করিবেন না। সেই মতেই এক-মাস কার্য্য চলিয়াছিল। বেদীর সম্মুখস্থিত অন্য আসনে উপাসনা-কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল।

এক মাসের পরে, সাপ্তাহিক উপাসনার দিনে, যখন ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বেদীতে বসিলেন, সেদিন অনেক উপাসক ব্রহ্মমন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং প্রেরিত-দলের সেবক ভাই কান্তি চন্দ্র মিত্র প্রার্থনাযোগে বলিলেন, ব্রহ্মমন্দিরের আজিকার উপাসনায় যাঁহারা যোগ দিয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহাদিগের সেবার ভার আমি ছাড়িয়া দিলাম। অন্য কয়েক জন ব্রাহ্ম এবং প্রচারকের সহিত ভাই কেদার নাথও সেইদিনে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের উপাসনাতে যোগ দিয়াছিলেন। সে দিন ব্রহ্মমন্দিরে এতদূর গোলযোগ চলিল যে, শ্রীআচার্য্যদেবের তিরোধানের পর শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রথমে সেদিন বেদী হইতে কিরূপ ভাবে উপাসনা করিলেন, শ্রীআচার্য্যদেব সম্বন্ধে কি বলিলেন বা কি উপদেশ দিলেন, উপাসকগণের তাহা কিছুই শুনা গেল না।

ভাই প্রতাপচন্দ্র শ্রীআচার্য্যদেবের চিরদিনের বন্ধু ছিলেন। শৈশব কাল হইতে ইহাঁরা এক সঙ্গে খেলাধূলা করিয়া একসঙ্গে বাড়িয়াছেন, শেষে একই সঙ্গে ধর্ম্ম-জীবনে প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়া একসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ভাই প্রতাপচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র অন্তরে অন্তরে কি গভীর প্রেম যুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা বাহিরের দৃষ্টিতে অনেকে অনুভব করিতে সক্ষম হন নাই। ভাই কেদার নাথ সেই দিন মন্দিরে থাকা হেতু তাঁহার সংসার খরচের পয়সা প্রতিদিন যাহা ভাই কান্তি চন্দ্র মিত্র পাঠাইয়া দিতেন, সে পয়সা আসিল না। মা ভাবিত হইলেন। শিশু সন্তানের মুখে আহার না দিতে পারিলে মাতার প্রাণে যে কষ্ট হয়, তাহা অন্য কাহারও হইতে পারে না। ভাই কেদার নাথ প্রতিদিনের মত নবদেবালয়ে উপাসনার পর গাছতলায় গেলেন, কিন্তু আর সব ভাই গুলি কেদার নাথের সঙ্গে বাক্যালাপ করিলেন না এবং সকলে গম্ভীর হইয়া রহিলেন। তাঁহার আহারাদিও তথায় বন্ধ হইয়া গেল। সকলে উপবাস করিয়া থাকিবার পর, জনৈক অনানুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ভ্রাতা কেদার নাথের পরিবারের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তখন এমনি মনে হইল, যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ তাঁহার ভক্তের কষ্ট দেখিতে না পারিয়া স্বহস্তে খাওয়াইতে আসিলেন।

মা বলিয়াছেন, একদিন সেই সময় কিছু খানেন না, শুনেন না, অথচ একটী লোক খুব প্রকাণ্ড এক কলসী আখের গুড় লইয়া দালানে বসাইয়া দিল। জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, হরিবাবুকা দোকানসে আয়া। মা মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন, ঠিকইত, হরিই পাঠাইয়াছেন। এইরূপে সে সময়ে কেবল শ্রীহরির দয়ার উপর নির্ভর করিয়া দিন চলিতে লাগিল। ভাই কেদার নাথ তখন Mission officeএও প্রচারের প্রভৃত কার্য্য করিতেন। ইংরাজি বাংলা কাগজে লিখিতেন, আবার বাড়ীতে আসিয়াও কত রাত জাগিয়া প্রেসের লেখা সংশোধন করিতেন। কত রাত সেখানেই থাকিয়া যাইতেন।

ভাই কেদার নাথ চিন্তাশীল, জ্ঞানী ও বিদ্বান্ লোক ছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিন রাত্রিতে তিনি ভগবচ্চিন্তনে কাটাইয়া দিতেন। সর্ব্বদা সকলের সঙ্গে প্রফুল্ল বদনে কথা বার্ত্তা বলিতেন। দাসদাসী, পুত্র কন্যা বা মুটে মজুর, দোকানদার, ব্যবসাদার প্রভৃতি কাহারও সহিত কঠোর ব্যবহার অথবা রুক্ষ বাক্য বলিতেন না। ভাই কেদার নাথকে কেহ কঠোর কথা বলিলেও তিনি হাসিতেই থাকিতেন। তাঁহাকে কেহ বিরক্ত করিলেও তিনি বিরক্ত হইতেন না। দাসগণকে

উপাসনা করিবার জন্য কিছুক্ষণ অবসর লইতে বলিতেন ও সুলভ সংবাদ পত্র ইত্যাদি পাঠ করিতে শিখাইতেন। ভাল উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য ঘরে আসিলে তাহাদিগকে দিতে বলিতেন, কিম্বা নিজেই ছেলেদের মত হাতে করিয়া খাইতে দিতেন। সেই জন্য সকলেই তাঁকে ভালবাসিত। দেশ দেশান্তরে যখন তিনি বদলী হইয়া যাইতেন, তখন সেই সকল স্থানের পরিচারকগণ রোদন করিত এবং বলিত, য্যাসা বাবু নেহি মিলেগা। সকলকেই দয়ার চক্ষে দেখিতেন।

ব্রহ্মমন্দির লইয়া গোলমালের জন্য ভাই কেদার নাথকে সপরিবারে School বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়া অন্যত্র বাড়ী লইতে হইয়াছিল। এখানে প্রশস্ত স্থানে থাকা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। যখন গিরীশ বিদ্যারত্নের লেনে কলুদের একটী ছোট একতালা বাড়ীতে থাকিয়া মা হাঁপানী কাশিতে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, তখন ঐ গলিতেই অপেক্ষাকৃত একটু ভাল আর একটী বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন। তথায় গিয়া ভাই কেদার নাথের পত্নী বিষম জ্বর-বিকারে আক্রান্ত হইলেন। আট দিন অজ্ঞান অবস্থায় রহিলেন। অন্যান্য সকলে নিতান্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিশ্বাসী ভাই কেদার নাথ ভগবানের চরণে সকল ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন; তিনিই কেবল স্থির হইয়া ভগবানে নির্ভর করিয়া রহিলেন। সেই সময় ডাক্তার অন্নদা চরণ খাস্তগীর মাতার চিকিৎসা করিতেছিলেন। প্রতিদিনই ডাক্তার আসিতেন। যে দিন হঠাৎ রোগ বৃদ্ধি পাইল, সেই অষ্টম দিনে রাত্রিকালে মাতার মাতা যেন নিজে আসিয়া মস্তকের শিয়রে বসিয়া রহিলেন। কেহ কিছু জানে না, সেই মুহূর্ত্তে আমাদের গয়ার বন্ধু পরলোক-গত চন্দ্র কুমার চাটার্জ্জি আসিলেন এবং এক ডোজ এমন ঔষধ পান করাইলেন যে, আসন্ন মৃত্যুর অবস্থায় একটু সুপরিবর্ত্তন দেখা গেল। ডাক্তার সারা রাত বসিয়া মাকে আরাম করিয়াছিলেন। মায়ের ক্রোড়ে শিশু কন্যাটী তখন মাত্র দেড়বৎসরের ও ছোট ছোট ৭টী পুত্র কন্যা। বিশ্বাসী ভক্তের সকল ভার যে আমাদের প্রিয় ঈশ্বর বহন করেন, এ স্থলে তাহা কেবল কথায় রহিল না; কিন্তু উজ্জ্বল প্রমাণ পাইয়া গৃহ ধন্য হইল। বন্ধুগণ আসিয়া কত সেবাই করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিবার নহে। চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালক, বাপ মায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মনোমতধন দে সেই সময় মাতৃ-সেবা, পিতৃ-সেবা ও ভ্রাতা ভগিনীর সেবার অলৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই প্রকারে মাতৃদেবী ভগবৎকৃপায় যখন পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন, তখন এই অস্বাস্থ্যকর স্থান ও বাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া, ভাই কেদার নাথ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে একটী বাড়ী লইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমলতা চন্দ।

নববিধানে পরলোক-তত্ত্ব।

অনন্ত আকাশ মাঝে, যেমন বিশ্ব বিরাজে,
চন্দ্র সূর্য্য ধরা আদি যত;
সেইরূপ আত্মা যত, ব্রহ্ম-বক্ষে অবিরত,
অবিচ্ছেদে রহে অবস্থিত।

মানবের আত্মা যত, সকলি ব্রহ্ম-সৃজিত,
কিন্তু তারা চিরোন্নতিশীল;
নাহিক মরণ তার, অমর সে অনিবার,
নহে পাপ-শূন্য অনাবিল।

পক্ষীর আছে যেমন, অবস্থা তিন রকম,
ডিম্ব ছানা আর পক্ষী ভাব;
তেমনি আত্মার হয়, ত্রিবিধ অবস্থাচয়,
এই জেনো আত্মার স্বভাব।

যখন দেহেতে রহে, ইহলোক তারে কহে,
দেহ-মুক্ত হইবে যখন;
রবে জীব পরলোকে, দৈহিক ইন্দ্রিয় তাকে,
নারিবেক করিতে পীড়ন।

ইহ কিম্বা পরলোকে, জীবাত্মা যে ভাবে থাকে,
যদি তার প্রিয় আত্মাধন—
পাপ হতে হয় মুক্ত, হয় ব্রহ্মে যোগযুক্ত,
লভে ব্রহ্ম-গত সে জীবন।

তবে সে স্বরগধামে, বাস করে মহারামে,
বিশ্বাসী ভকত-বৃন্দ সহ;
হরি দরশন করি, হরি-রস পান করি,
রহে মত্ত সুখে অহরহ।

অনন্ত ব্রহ্ম-সাগরে, খেলে তারা প্রেমভরে,
অনন্তেরে করে অন্নপান;
অনন্ত উন্নতি পানে, ধায় তারা নিশিদিনে,
স্বর্গ হতে উচ্চ স্বর্গে যান।

মৃত্যু বলি জীব সবে, যার ভয়ে সদা কাঁপে,
নহে তাহা ভয়ের নিদান;
জীর্ণ-বস্ত্র-ত্যাগ প্রায়, বটে উহা এ ধরায়,
মৃত্যু সদা অমৃত-সোপান।

অমর আত্মা সকল, ভোগি পাপ পুণ্য ফল,
অগ্রসর হয়েন জীবনে;
আত্মকৃত পাপ তরে, লভি দণ্ড ব্রহ্ম-করে,
দগ্ধ হয় অনুতাপাগুনে।

হরি দরশন পায়, ক্রমে স্বর্গে চলি যায়,
লভে ব্রহ্মগত যে জীবন;
এই রূপে জীবগণ, লভিয়া ব্রহ্ম-চরণ,
ব্রহ্মানন্দ লভে অনুক্ষণ।

এই ইহ পরলোক, এই পুণ্য স্বর্গলোক,
ব্রহ্ম-বক্ষে রহে অবস্থিত ;
এ তিনের মূলাধার, হন ব্রহ্ম সারাৎসার,
ব্রহ্ম-হস্তে সকলি বিধৃত।
বিশ্বাসীর কাছে তিন, ভিন্ন নহে কোন দিন,
সব তিনি হেরি একাকার ;
ব্রহ্ম-পদে এ জীবন, করি প্রেমে সমর্পণ,
অনন্তেতে করেন বিহার।
ব্রহ্ম বিশ্বাসীর স্বর্গ, ব্রহ্মে মিলে চতুর্ব্বর্গ,
ব্রহ্ম তাঁর লক্ষ্য সুমহান্ ;
ইহলোকে থাকি তিনি, প্রস্তুত দিবা যামিনী—
হন লক্ষ্য তরে অবিরাম।
অনিত্য সংসার-মোহে, বিশ্বাসী না কভু রহে,
সাধিয়া কর্ত্তব্য প্রাণপণে ;
শিশু সন্তানের মত, মায়ের কোলে সতত,
ব্যস্ত রন যেতে নিশি দিনে।
মায়ের আহ্বান-ধ্বনি, বিশ্বাসী অন্তরে শুনি,
দেহ-ভার করি পরিহার ;
হাসিতে হাসিতে তিনি, যান পরলোক-ভূমি,
মার হাতে দিয়া সব ভার।

স্বর্গীয় শশিভূষণ তালুকদার।

—•—

ভারতীয় মহিলা-সম্মেলন

গত ১৩ই পৌষ, কলিকাতায় গৌরাচাঁদ রোডে, কংগ্রেস ক্যাম্পের বিশেষ মণ্ডপে, নিখিল-ভারত-মহিলা-সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাণী মাননীয়া সেতুপার্ব্বতী বাঈ সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি-ভাজনীয়া ভগিনী মহারাণী সুচারু দেবী অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী-রূপে নিম্নলিখিত সারগর্ভ অভিভাষণ করেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রীর অভিভাষণ।

ভগিনীগণ, আজ আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন জাতির মহিলাবৃন্দ একই মিলনক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। এই জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিই, এবং ঋষিগণের সেই অতি পুরাতন বাণী স্মরণ করি,—

"অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে আলোকে, মৃত্যু হইতে অমরতায় লইয়া যাও"।

অতীতের দিকে ফিরিয়া দেখিলে আমাদের বর্ত্তমানের সুখ সুবিধা ভোগের জন্য কৃতজ্ঞ না হইয়া পারি না।

প্রিয় ভগিনীগণ, আজি আমরা আপনাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে অভ্যর্থনা করিতেছি। যখন হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন হয়, তখন আর কোন ব্যবধান থাকে না। যেখানে ভালবাসা আছে, যেখানে সমবেদনা আছে, সেখানে জাত্যভিমান থাকে না, সংস্কার-বুদ্ধি থাকে না, সামাজিক বৃত্তি থাকে না।

ভারত মহিলার আদর্শ

আশা করি, আমাদের এই মিলন সমস্ত বৈষম্য দূর করিয়া প্রীতি ও সহানুভূতির বন্ধনকে দৃঢ় করিবে। যত সামান্যই হউক না কেন, জীবন-যাত্রায় প্রত্যেকেরই যে স্ব স্ব স্থান আছে— স্ব স্ব উদ্দেশ্য আছে, তাহা অস্বীকারও করা যায় না। জীবনে যে ক্ষেত্রে যে অবস্থায় থাকি না কেন, যে ব্রতই অবলম্বন করি না কেন, আমরা আমাদিগকে তুচ্ছ, নগণ্য মনে করি। ইহার ফলে আমরা আমাদের নিজের উপরই বিশ্বাসহীন হইয়া পড়ি এবং অবশেষে একেবারে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ হইয়া যাই। ভারত মহিলাগণের আদর্শ অন্যান্য দেশের আদর্শ হইতে কিছু বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার প্রথম যুগ হইতেই ভারতনারীগণ তাঁহাদের গৃহস্থালীর কাজের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় নানা কার্য্যেও যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্ম্মের ধারা সত্যকার পথে প্রবাহিত রাখিয়া, আসুন, আমরা সকলে ভারত মহিলাদের সম্মান অব্যাহত রাখি।

আমাদের ব্রত

আমাদের ব্রত প্রতিপালন করিতে হইলে শুধু কথা লইয়া থাকিলে চলিবে না,—উৎসাহ এবং সঞ্জীবনী বাণী উচ্চারণ করিলেই চলিবে না, যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, সেই উচ্চ আদর্শের অনুযায়ী আমাদের নিজেদের জীবনকে গঠন করিতে হইবে। আমাদের আদর্শ অতি মহৎ। অতীতের মহীয়সী ভারত মহিলাগণের গৌরব-গর্ব্বে উহা সমুজ্জ্বল, তাঁহাদের গৌরব-দ্যুতি কাল বিমলিন করিতে পারে নাই। একথা সত্য যে, জগতের উন্নতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে, কিন্তু ভারতের ইতিহাস এবং সভ্যতার বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়াই আমাদিগকে চলিতে হইবে। দিগন্ত-প্রসারী হিমগিরিকে বাদ দিয়া—সিন্ধু গঙ্গা গোদাবরীকে পরিহার করিয়া, এই ভারত যেমন ভারত ভূমি হইতে পারে না— সেইরূপ ভারত মহিলাদের বিশিষ্টতা পরিহার করিয়া আমরা উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইব না।

ভগবানের নূতন মন্দির

কেশবচন্দ্র সেন "একই কালে স্বাভাবিক এবং জাতীয় ভাবাপন্ন" বলিয়া যাহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং আধ্যাত্ম সর্ব্বপ্রকার আন্দোলনের লক্ষ্য তাহাকেই করিতে হইবে।

ভগিনীগণ, আমাদের এই আন্দোলনকে যুগপৎ স্বাভাবিক ও জাতীয়ভাবে গঠন করিয়া, আত্মনিষ্ঠাবতী দেশনিষ্ঠাবতী হইয়া, আপনার জাতি-মূলক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া, ভিন্ন জাতির গুণাবলী আত্মস্থ করিয়া লইয়া, আপনাদিগকে একটী সমাজে সংহত করিয়া,

জগতে ভগবানের নূতন মন্দির গঠন করিবার জন্য স্বেচ্ছাব্রতিনী হইতে হইবে।

অদ্য আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আমার মনে হইতেছে, আমি যেন একযুগের নব-উষালোকে প্রতিভাত হইয়া, জাতি বৈষম্য, শ্রেণী-সংস্কার-পার্থক্য, সামাজিক আচার-বন্ধন বিস্মৃত হইয়া, আমরা যেন আজ এক-পরিবারে পরিণত হইয়াছি। ভগিনীগণ, এই সময় আমরা গৃহীতব্রতা হইয়া নারী-সমাজের উন্নততর অবস্থায় সামাজিক ব্যভিচারিতার পরিহার করিব।

(বাঙ্গালার কথা হইতে উদ্ধৃত)

—•—

স্বর্গীয় শশিভূষণ তালুকদার।

টাঙ্গাইলের সর্ব্বজন-প্রিয়, নববিধান-ক্ষেত্রের বিশিষ্ট সাধক ও নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মী, সুলেখক, সুকবি, সুস্পষ্ট বক্তা, আমাদের অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় সহ-সাধক ও ধর্ম্মবন্ধু শ্রীমৎ শশিভূষণ তালুকদার আপনার দীর্ঘ জীবনের গুরুতর উচ্চ কর্ত্তব্য সকল সম্পন্ন করিয়া, প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে, চারি পুত্র, তিন কন্যা, সহধর্ম্মিণী, পুত্রবধূ ও নাতি নাতিনী প্রভৃতি প্রিয়-পরিজনবর্গ এবং অনেক ধর্ম্মবন্ধু, আত্মীয় স্বজন রাখিয়া, গত ৬ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ প্রায় ৫ ঘটিকার সময়, শান্তভাবে নীরবে দীর্ঘদিনের রোগাক্রান্ত জীর্ণ দেহখানি রাখিয়া, পরম জননীর স্নেহক্রোড়ে স্থানলাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় স্তরে ও নববিধান-মণ্ডলীর সাধনক্ষেত্রের দ্বিতীয় স্তরে যাঁহারা উদিত হইয়া আপনাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস, সাধনশীলতা, বিধানে দৃঢ়নিষ্ঠা এবং কর্ম্ম-জীবনের সৌন্দর্য্য ও সৌরভে আপনাদিগের জীবনের বিশিষ্টতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমৎ শশিভূষণ তালুকদার অন্যতম।

ইনি বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। টাঙ্গাইল মহকুমা যদিও ইঁহাদের পিতৃকুলের আদি বাসস্থান, ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ কেহ বিষয়াদি উপলক্ষে পাবনা জেলার অন্তর্গত দোগাছি গ্রামে বাস করেন। তাই দোগাছি গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। ইঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ তালুকদার, ইনি একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সাধক ছিলেন। ইনি তন্ত্র-বিষয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যান ; পরবর্ত্তী সময়ে স্বর্গগত উপাধ্যায় পণ্ডিত গৌর গোবিন্দ রায়ের সাহায্যে শশীবাবু তাঁহার পিতার প্রণীত গ্রন্থখানির মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন। বাল্য জীবনে শশীবাবু পিতৃহীন হন। শশীবাবুর অন্যতম পিতৃব্য স্বর্গীয় দীননাথ তালুকদার মহাশয় টাঙ্গাইলে একজন খ্যাতনামা মোক্তার ছিলেন। তাঁহারই অভিভাবকতায় ও তত্ত্বাবধানে শশী বাবুর পাঠ্য জীবন অতিবাহিত হয়।

শশীবাবু আই, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া ওকালতী পরীক্ষা দেন। ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, টাঙ্গাইল মহকুমার মুন্সেফী আদালতে ওকালতী করেন। আমি কোন বিশিষ্ট বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, ইনি যখন স্কুলে পড়াশুনা করিতেন, ইঁহার কথাবার্ত্তা ও আচরণে তখনই ইঁহার জীবনে ধর্ম্মের লক্ষণ প্রকাশ পাইত। টাঙ্গাইল স্কুলে পড়াশুনাকালে ঢাকার নববিধান-সমাজের প্রচারক শ্রদ্ধেয় ভাই মহিম চন্দ্র সেন শশী বাবুর শিক্ষক ছিলেন। হয়ত ইঁহারই যোগে শশী বাবুর প্রাণে তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব কিছু সংক্রামিত হইয়াছিল।

টাঙ্গাইলে নববিধান-ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠার প্রথম হইতেই ইনি সেই সমাজের সভ্যরূপে গৃহীত হন, এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সেই সমাজের পরিচর্য্যা করিয়া আপনার সুদীর্ঘ জীবন শেষ করেন। স্বর্গীয় দুর্গাদাস বসু, স্বর্গীয় রাধানাথ ঘোষ ও শশীবাবু এই তিন জনে মিলিয়া প্রথমে সমাজের কার্য্য আরম্ভ করেন, পরে আমিও তাহাতে যোগদান করি। স্বর্গগত রাধানাথ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে প্রথম হইতে ইনি আধ্যাত্মিকভাবে মিলিত হন, ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম স্তরে রাধানাথ বাবুর পরিচালনা শশী বাবুর জীবনের বিশেষ সহায়তা করে।

শশী বাবু একটু পরিণত বয়সে, ১৮৯৭ কি ১৮৯৮ সনে, সস্ত্রীক নববিধান-ক্ষেত্রে স্বর্গীয় উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দ রায় কর্ত্তৃক দীক্ষিত হন। শশী বাবুর পিতৃব্য দীননাথ তালুকদার মহাশয় তৎকালের হিন্দু সমাজ মধ্যে একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। সপরিবারে নববিধান-সমাজ-গ্রহণ ও তাহাতে স্থিতি ব্যাপারে হিন্দুসমাজের ক্ষমতাশালী অভিভাবকস্থানীয় পিতৃব্যের দ্বারা শশী বাবুর জীবনে জ্বলন্ত পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছিল। দয়াময়ের গূঢ় করুণায় শশী বাবু সে পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন।

শশী বাবু ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-জীবনের আরম্ভেই সাহিত্যিক জীবনের পরিচয় দান করেন। কবিতা-লেখা তাঁহার জীবনের অতি সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল। ওকালতী কর্ম্মের আরম্ভে মানুষকে কেমন তীব্র কর্ম্ম-তাণ্ডবের ভিতর পড়িতে হয়, তাহা সকলেই জানেন। সেই সময়ে তিনি ইংরেজী নবসংহিতা বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন। দেখিয়াছি, আদালত গৃহে যখন ওকালতী সংক্রান্ত কার্য্য হইতে একটু অবসর পাইতেন, সেই অবসরকালে আদালত অফিস গৃহে বসিয়াই নানাকার্য্য গোলের মধ্যেও, শশী বাবু পদ্য-গ্রন্থ রচনা করিতেন। এই সময় হইতে তিনি ধর্ম্মতত্ত্বেও প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। শ্রীদরবার সম্বন্ধে ধর্ম্মজীবনের প্রথমে কয়েকটী সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেন। তৎপর জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্মতত্ত্বের রীতিমত লেখক ছিলেন। প্রয়োজন মতে গদ্যে ও পদ্যে দুইভাবেই তিনি ধর্ম্মতত্ত্বে প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

পদ্য-লেখা তাঁহার বিশেষ সহজসাধ্য বিষয় ছিল। পদ্য নবসংহিতা লিখার পর, তিনি স্বদেশীয়, বিদেশীয়, অতীতের এবং বর্ত্তমানের সাধুভক্তদিগের জীবনী সরল পদ্যে "শ্রীশ্রীহরিলীলা-রসামৃত-সিন্ধু" নাম দিয়া লিখিতে আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান যুগের, অতীত যুগের স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সাধুভক্তগণের জীবনী দ্বারা শ্রীশ্রীহরিলীলা-রসামৃত-সিন্ধুর প্রথম ভাগ ও

দ্বিতীয় ভাগ পূর্ণ হয়। ইহার প্রত্যেক খণ্ডই প্রায় সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মত বৃহৎ গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। এই দুইখণ্ড পুস্তকের তিনি জীবিত কালেই মুদ্রাঙ্কণ করিয়া নিকট বন্ধুদিগের অনেককেই বিতরণ করিয়াছেন এবং অল্প-সংখ্যক বিক্রয়ও হইয়াছে। তাঁহার তৃতীয় খণ্ড শ্রীশ্রীহরিলীলা-রসামৃত-সিন্ধু মহাত্মা রাম মোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগের নববিধানের নবলীলা-ক্ষেত্রের সাধুভক্ত প্রেরিতদিগকে লইয়া। মনে হয়, এই খণ্ড পূর্ব্ব দুই খণ্ড হইতেও বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। অর্থাভাবে এ খণ্ডের মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্য তিনি নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই শ্রীশ্রীহরিলীলা-রসামৃত-সিন্ধু তিন খণ্ড লিখিত হইলে এক মহাকাব্যে পরিণত হইবে। ইহার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনই মধুর, তেমনই ভক্তি প্রেম মাখা।

ইহা ভিন্ন শশী বাবু স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দ রায়ের বিস্তৃত জীবনী ও স্বর্গগত প্রেরিত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের বিস্তৃত জীবনী গদ্যে প্রণয়ন করিয়া ক্রমে ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু অর্থাভাবে জীবিত কালে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে ছাপাইতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনের শেষ গ্রন্থ "নবতত্ত্বামৃতম্"। বাল্মিকী-প্রতিভার ন্যায় একদিন উষাকালে হঠাৎ সংস্কৃতে নবপ্রতিভা-লাভ করিয়া, ঈশ্বর প্রেরণায় সহজ সংস্কৃত পদ্যে পাঁচশত শ্লোকে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, সংস্কৃত শ্লোকগুলির বাঙ্গালা ও ইংরেজি অনুবাদ তৎসহ নিবদ্ধ করিয়া, জীবনে সাধনসিদ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলরূপে বইখানি রাখিয়া গিয়াছেন। পীঠাপুরমের দানশীল মহারাজার অর্থ-সাহায্যে পরলোক-গমনের অতি অল্পদিন পূর্ব্বে, শশীবাবু এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্য শেষ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

নববিধান তাঁহার জীবনের অতি আদরের বস্তু ছিল, জীবনব্যাপী সাধন ও প্রচারের বিষয় ছিল। গ্রন্থ-যোগে ও প্রবন্ধাদি-যোগে তিনি বিশেষ ভাবে নববিধান প্রচার করিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ বংশের জন্য প্রচুর আয়োজন রাখিয়া গিয়াছেন। তারপর তাঁহার সুমিষ্ট উপাসনা, বক্তৃতা, সারগর্ভ প্রবন্ধাদি দ্বারা তিনি নানা ভাবে নববিধান প্রচার করিয়াছেন। আমাদের স্বর্গগত নববিধান-বিশ্বাসী ধর্ম্মজ্যেষ্ঠ রাধানাথ ঘোষ ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন, টাঙ্গাইল ব্রাহ্ম-পল্লীর নাম যেন নৈমিষারণ্য রাখা হয়। তাঁহার ইচ্ছানুসারে টাঙ্গাইল নববিধান-ব্রাহ্মপল্লীর নাম নৈমিষারণ্য রাখা হইয়াছে। রাধানাথ বাবু পল্লীস্থাপনের পূর্ব্বে স্বর্গগত হইয়াছিলেন। আমি কিছুদিন শ্রদ্ধেয় শশীবাবুর সঙ্গে নৈমিষারণ্য নামক ব্রাহ্ম-পল্লীতে বাস করিয়া, পরে দীর্ঘ দিন হইল, কলিকাতায় প্রচারকের জীবন যাপন করিতেছি। শেষ জীবনে একা শশীবাবু নৈমিষারণ্যে বাস করিয়া, একনিষ্ঠ ভাবে সাধন, তপস্যা ও নানা ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রণয়ন ও প্রচার দ্বারা নৈমিষারণ্যের নাম সার্থক করিয়াছেন। তিনি আপনার ধর্ম্ম-জীবনের প্রভাব দ্বারা টাঙ্গাইলবাসী ছোট বড় সকলের শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়া রহিলেন এবং তিনি আপনার প্রিয় নববিধান-মণ্ডলীর ভাই ভগ্নীগণের নিকটও তাঁহার ধর্ম্ম-জীবন ও কর্ম্ম-জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা চিরজীবী হইয়া রহিলেন। সত্য সাধু ভক্তগণ ইহলোকেও জীবিত, পরলোকেও জীবিত।

শ্রীগোপাল চন্দ্র গুহ।

—:—

সংবাদ।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—বিগত ৬ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, টাঙ্গাইলের, আমাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু শশিভূষণ তালুকদার পরলোক গমন করেন। তাঁহার বিবাহিতা কন্যাদ্বয় শ্রীমতী ভক্তিসুধা দেবী ও শ্রীমতী বিধানসুধা দেবী ৯ই ডিসেম্বর, রবিবার, পূর্ব্বাহ্নে পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন; ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ অনুষ্ঠানের কার্য্য সম্পন্ন করেন। শ্রীমতী ভক্তিসুধা প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। ১৬ই ডিসেম্বর, রবিবার, পূর্ব্বাহ্নে শশীবাবুর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র পিতৃ-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ হরিদাস তালুকদার বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইতি পূর্ব্বে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াও এ পর্য্যন্ত গৃহে পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন না। এ দিনের অনুষ্ঠান ভাই চন্দ্রমোহন দাস ও ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ মিলিত ভাবে সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু শ্লোকপাঠে সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রধান শোককারীর প্রার্থনা দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ কালিদাস তালুকদার পাঠ করেন, তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ ব্রহ্মদাস তালুকদার পিতৃদেবের স্বলিখিত জীবন-কাহিনীর বিশেষ বিশেষ অংশ পাঠ করেন। নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানের পর ছোটবিল্লাফৈর-নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শশীবাবুর জীবনের সদ্গুণাবলী কিছু বর্ণনা করেন। এ দুই দিনই স্থানীয় বন্ধু, বান্ধব, সহানুভূতিকারী অনেকে উপস্থিত হইয়া স্বর্গগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং দুই দিনই উপস্থিত অনেকেই অনুষ্ঠানের পর আহারাদি করিয়াছেন। বিশেষ ভাবে দ্বিতীয় দিন অনেক দুঃখী কাঙ্গালীদিগকে আহার করাইয়া, পয়সা ইত্যাদি কিছু কিছু দান করা হইয়াছে। এই সপ্তাহের শেষ ভাগে প্রথম পুত্র শ্রীমান্ হরিদাস তালুকদার কলিকাতা হইয়া টাঙ্গাইল গৃহে পৌঁছেন। তিনি ২৫শে ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে পিতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। এ অনুষ্ঠান-কার্য্য ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ সম্পন্ন করেন। শ্রীমান্ হরিদাস তালুকদার প্রথমে নিজে প্রার্থনা করিয়া, পরে নবসংহিতার প্রধান শোককারীর প্রার্থনাও পাঠ করেন। অনুষ্ঠানগুলি বেশ গম্ভীর-ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। স্নেহময়ী পরমজননী স্বর্গগত আত্মাকে তাঁহার অমৃত ক্রোড়ে সকল সাধু ভক্ত আত্মাদিগের সঙ্গে স্থান দান করুন এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ৫ই ডিসেম্বর স্বর্গীয় গৃহস্থ বৈরাগী শ্রদ্ধেয় রাজমোহন বসুর স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে দুই বেলা বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ৫ই ডিসেম্বর বালীগঞ্জে, শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষের গৃহে, তদীয় মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। ঐ দিন জ্যেষ্ঠ কন্যার গৃহেও ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন

গত ৮ই ডিসেম্বর, ২৪নং তারক চাটার্জ্জি লেনে, স্বর্গগত ভাই কালীনাথ ঘোষের সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন, সহধর্ম্মিণী স্বামীর জীবন-কথা পাঠ করেন, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক শ্লোকাদি-পাঠান্তে বিশেষ প্রার্থনা করেন। সতীশ বাবু ভাই কালীনাথের সঙ্গে জীবনের গূঢ়তম যোগ নিবেদনে প্রকাশ করিয়া তৎপ্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

গত ৯ই ডিসেম্বর, ১৭ A বিপ্রদাস ষ্ট্রীটে, স্বর্গগত সাধু অঘোর নাথের সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন।

১৪ই ডিসেম্বর শ্রীমৎ আচার্য্য মাতা মা সারদা দেবীর স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে রাজাবাগ রাজপ্রাসাদে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন এবং মৌরভঞ্জের মাননীয়া মহারাজ-মাতা মহারাণী সুচারু দেবী প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে কলুটোলার বাড়ীর সমাধি-প্রাঙ্গণে ও সন্ধ্যায় শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে প্রার্থনাদি হয়।

জন্মোৎসব—গত ৫ই অগ্রহায়ণ, ২১শে নবেম্বর, নববিধানাচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে সম্পন্ন হয়। প্রত্যূষে শঙ্খ-ঘণ্টা-সহকারে নবজাগরণ-সঙ্গীত গান করিয়া, পল্লীবাসীদিগের নিকট নবশিশুর জন্মোৎসব ঘোষণা করিয়া, তাহা সাধনের জন্য সকলকে আহ্বান করা হয়। পত্র, পুষ্প ও পতাকা দ্বারা আশ্রমটী সজ্জিত করা হয়। বেলা ৯॥০টার সময় প্রাতঃকালীন উপাসনা হয়। আশ্রম-সেবক ভাই প্রিয়নাথই উপাসনা করেন। নববিধানের নবশিশু আপনাকে জগজ্জনের ভাই বলিয়া সকল মানবকে আপনার অঙ্গে যখন গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার নবজন্মে সমগ্র মানবের নবজন্মগ্রহণ ও দ্বিজত্ব-লাভ, ইহাই উপাসনায় উপলব্ধি হয়। সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলন এক ব্রহ্মানন্দে যাহাতে হয়, তাহাই আকুলভাবে প্রার্থনা করা হয়। স্থানীয় সমবিশ্বাসী পরিবারস্থ প্রায় সকলেই যোগদান করেন এবং মধ্যাহ্নে একান্ন গ্রহণপূর্ব্বক প্রীতিভোজন করেন। অপরাহ্নে আলোচনা, পাঠ বন্ধু-সম্মিলন ও শিশু-সম্মিলন হয় এবং সমাগত সকলকেই কিছু কিছু মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। শিশুগণকে নবশিশুর জন্মকথা ও জীবন-কাহিনী শুনান হয়। সন্ধ্যায় আশ্রম-গৃহ আলোকমালায় আলোকিত করা হয় ও কতকগুলি বাজীও পোড়ান হয়। সন্ধ্যায় আবার উপাসনা ও জমাট কীর্ত্তন হয় এবং প্রায় ৫০।৬০জন নরনারী লুচি তরকারী মিষ্টান্ন ভোজন করেন।

গত ৬শে ডিসেম্বর ভক্তসতী জগন্মোহিনী দেবীর জন্মদিন উপলক্ষে ভক্তিতীর্থ মুঙ্গেরে বিশেষ উৎসব হয়।

জন্মদিন ও গৃহপ্রতিষ্ঠা—গত ৩রা ডিসেম্বর, কলুটোলায়, ব্রহ্মানন্দের অনুজ স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের জন্মদিন উপলক্ষে, এবং এই পুণ্যদিনে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী সেনের জন্য তেতালায় নির্ম্মিত একটী নূতন প্রকোষ্ঠের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। নববিধান-বিশ্বাসীর নিত্যগৃহ সাধু ভক্তের অমর জীবন। এই পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গগত ভক্ত রামকমল সেন, ব্রহ্মানন্দ, কৃষ্ণবিহারী প্রভৃতি সাধু সাধ্বীগণের অমর ধর্ম্মজীবনই বংশধরগণের প্রকৃত বাসগৃহ। তাঁদেরই সুন্দর জীবনের নবতর প্রকাশ ও আশীর্ব্বাদরূপে এবং বিধাতার অপার করুণার-নিদর্শনরূপে গৃহখানির প্রতিষ্ঠা হয়। বিধাতা গৃহখানিকে নববিধানের গৃহ করুন, এবং গৃহবাসী নিত্য সাধুসমাগম করিয়া নববিধানের জীবন লাভ করুন।

খ্রীষ্টের জন্মোৎসব—গত ২৫শে ডিসেম্বর, ৮৪নং অপার সার্কুলার রোডে, শান্তিকুটিরে, খ্রীষ্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন।

মুঙ্গেরের উৎসব—খৃষ্টোৎসব উপলক্ষে কয়দিন ভক্তিতীর্থ মুঙ্গেরে বিশেষ উৎসব হইয়াছে। আরতি, উদ্বোধন, সমস্ত-দিন-ব্যাপী উৎসব, সম্মিলন ও নবভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনাদি হয়। স্থানীয় অনেক বন্ধু বান্ধব যোগদান করেন। ভাই প্রিয়নাথ, ভ্রাতা অখিল চন্দ্র, ভ্রাতা অবিনাশ চন্দ্র দাস, শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু, শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ প্রভৃতি তীর্থযাত্রী হইয়া উৎসব-সাধনে ধন্য হন।

শুভ বিবাহ—গত ১১ই অগ্রহায়ণ (২৭শে নবেম্বর), পাটনা নগরীতে, এলাহাবাদ-প্রবাসী আমাদের প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ বানার্জ্জির সহিত, ময়মনসিংহ-প্রবাসী স্বর্গীয় চারুচন্দ্র মল্লিকের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইন্দিরার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পাটনা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত দীরেন্দ্র নাথ সরকার আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন।

গত ৯ই পৌষ (২৪শে ডিসেম্বর), ঢাকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল দাসের চতুর্থ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ বিনয়রঞ্জন দাসের সহিত, কলিকাতার অন্তর্গত কাশীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপদ দাসের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী নীহার-কণার শুভ বিবাহ কাশীপুরস্থ ৩নং রাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ লেনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীমতী নীহারকণা গত ১৬ই ডিসেম্বর কামাখ্যা বাবুর নিকট নরসংহিতা-মতে দীক্ষিত হয়।

ভগবান্ নবদম্পতি-যুগলকে স্বর্গের আশীর্ব্বাদ দান করুন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির—গত ডিসেম্বর মাসে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। ৭ই ডিসেম্বর স্বর্গগত প্রকাশ চন্দ্রের, ৮ই ভাই কালীনাথের এবং ৯ই সাধু অঘোর নাথের স্বর্গারোহণ দিন ছিল। ৯ই রবিবাসরীয় উপাসনায় তাঁদের জীবন স্মরণ করা হয়। তার পর পর রবিবার, নিবেদনে শ্রীঈশার ব্রহ্মসন্তানত্ব, বাধ্যতা, প্রেম, আত্মদান, ক্ষমা প্রভৃতি স্বর্গীয় গুণের আলোচনা করিয়া, দ্বেষ হিংসা ভেদাভেদ ভুলিয়া, সকলের সঙ্গে মিষ্টতর ও মধুরতর সম্পর্কে নিবদ্ধ হইয়া, উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইবার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা হয়।

শুভাশীর্ব্বাদ—গত ২৬শে ডিসেম্বর, ৬৮।২ A গড়পার রোডে, শান্ত সাধক স্বর্গগত ভাই কেদার নাথ দের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত মনোগতধন দের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী অরুণাশোভার সহিত, ভবানীপুর-নিবাসী ডাঃ উপেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ বসুর শুভ বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া আশীর্ব্বাদানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। ভগবান্ তাঁহার পুত্র কন্যাকে শুভাশীর্ব্বাদ-দানে উদ্বাহ-ব্রত গ্রহণের উপযুক্ত করিয়া লউন।

—•—

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা বিনীত ও কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে, গত নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে, ধর্ম্মতত্ত্বের নিম্নলিখিত মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—

নবেম্বর—কলিকাতার—শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র বড়াল ৩৲, শ্রীমতী মণিকা গুপ্ত ৩৲, শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার ঘোষ ৩৲, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন ১৲, শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী চক্রবর্ত্তী ১৲। ইন্দোরের—P. K. Ghosh Esq. মূল্য ৩৲ ও বিশেষ সাহায্য ৭৲। বিলাতের—P. K. Dutta Esq. মূল্য ৩৲ ও বিশেষ সাহায্য ৭৲। টাঙ্গুর—S. N. Banerjee Esq. ৩৲। বংশদার—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সাহু ৩৲। টাঙ্গাইলের—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার ৩৲। গাজিপুরের—Mrs. Nitya Gopal Roy মূল্য ৩৲ ও বিশেষ সাহায্য ২৲। ঢাকার—শ্রীযুক্ত প্রেমাদিত্য ঘোষ ৩৲।

ডিসেম্বর—যশোহার—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু ১২৲। পাবনার—স্বর্গীয় দীনদয়াল রায় ৯৲। সাবোরের—শ্রীমতী যোগিনী বসু ১৫৲। বাঁকার—শ্রীযুক্ত লালবিহারী রায় চৌধুরী ৬৲। মুলতানের—Mrs. Bhakti Sudha Hemraj ১২৲। কাকিনার—কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ৯৲। বারিপদার—রায়বাহাদুর হরিদাস বসু ৩৲। হাতিয়ার—শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস ৬৲। সিরাজগঞ্জের—শ্রীমতী শান্তিলতা দেবী ২৲। বিলাসিপাড়ার—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকৃষ্ণ বাগচি ৩৲। বালেশ্বরের—শ্রীযুক্ত ভগবান্ চন্দ্র দাস ৩৲। কলিকাতার—শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন ১৲। কটকের—রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু—৩৲।

নিবেদন।

ধর্ম্মতত্ত্বের বৎসর শেষ হইল। যাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্য এখনও বাকী আছে, তাঁহাদিগের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক আপন আপন দেয় মূল্য সত্বর পাঠাইয়া দিতে চেষ্টা করেন।

শ্রীঅক্ষয় কুমার লধ
কার্য্যাধ্যক্ষ।

—•—

নবনবতিতম মাঘোৎসব।

প্রস্তুতি।

কার্য্যপ্রণালী।

[আবশ্যক হইলে এই কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইবে]

১লা জানুয়ারী, ১৯২৯, ১৭ই পৌষ, ১৩৩৫, মঙ্গলবার—প্রাতে ৬৷৷০টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের নবদেবালয়-প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা পাঠ। পূর্ব্বাহ্ন ৯টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে উপাসনা। "রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।" সন্ধ্যা ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে ইংরাজীতে উপাসনা।

২রা জানুয়ারী, ১৮ই পৌষ, বুধবার—"নববিধান, শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব ও প্রেরিতবর্গ"।

৩রা জানুয়ারী, ১৯শে পৌষ, বৃহস্পতিবার—"মাতৃভূমি"।

৪ঠা জানুয়ারী, ২০শে পৌষ, শুক্রবার—"গৃহ"।

৫ই জানুয়ারী, ২১শে পৌষ, শনিবার—"শিশুগণ"।

৬ই জানুয়ারী, ২২শে পৌষ, রবিবার—"ভৃত্যগণ"। সন্ধ্যা ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

৭ই জানুয়ারী, ২৩শে পৌষ, সোমবার—"দীনগণ"।

৮ই জানুয়ারী, ২৪শে পৌষ, মঙ্গলবার—শ্রীমদ্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক। কমলকুটীরে নবদেবালয়ে প্রাতে ৬টায় নাম-পাঠ ও ৯টায় উপাসনা। সন্ধ্যা ৬টায় আলবার্ট হলে স্মৃতিসভা।

৯ই জানুয়ারী, ২৫শে পৌষ, বুধবার—"মহাজনগণ"।

১০ই জানুয়ারী, ২৬শে পৌষ, বৃহস্পতিবার—"জনহিতৈষিগণ"।

১১ই জানুয়ারী, ২৭শে পৌষ, শুক্রবার—"উপকারিগণ"।

১২ই জানুয়ারী, ২৮শে পৌষ, শনিবার—"বিরোধিগণ"।

১৩ই জানুয়ারী, ২৯শে পৌষ, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬টায় উপাসনা ও রাত্রি ১২টায় "জাগরণ"।

সকলের সপরিবারে ও সবান্ধবে যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
৮৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা;
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৮।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন
সহকারী সম্পাদক।

কমলকুটীরে নবদেবালয়ে ১লা ও ৮ই জানুয়ারী ব্যতীত প্রতিদিন প্রাতে ৮টায় উপাসনা এবং ব্রহ্মমন্দিরে ৬ই, ৮ই ও ১৩ই জানুয়ারী ব্যতীত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টায় কীর্ত্তন, পাঠ ও প্রসঙ্গ হইবে। প্রতিদিনের বিশেষ বিশেষ ভাব সাধন নিজ নিজ পরিবারে বাঞ্ছনীয়।

নবনবতিতম মাঘোৎসব

আহ্বান

হেন শুভদিনে কে কোথা আছ ভাই,
এস সবে মিলে জননীর কাছে যাই।
ইহ পরকালে ভেদাভেদ কিছু নাই,
নরামর আত্মপর মিশে যাই এক ঠাঁই।
হেরি মায়ের অভয় চরণ, আনন্দে করি অর্চ্চন বন্দন,
জয় জয় জয় রবে যশোগীত গাই।

যেখানে তাঁর নামে, মিলে দশজনে, এক মনে তাঁরে চাই;
তাহার ভিতরে, আনন্দময়ীরে, সহজে দেখিতে পাই;
উৎসব-মন্দিরে, নিরখি তাঁহারে, তাপিত প্রাণ জুড়াই,
মা মা মা ব'লে ভক্তি-রসে গ'লে,
তাঁহার চরণে লুটাই॥

কার্য্য-প্রণালী

(আবশ্যক হইলে এই কার্য্য প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে)

১লা মাঘ, ১৩৩৫, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯২৯, সোমবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬॥টায় আরতি।

২রা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার—অপরাহ্ণ ৪॥টায় গোলদিঘী প্রান্তরে বক্তৃতা; সন্ধ্যা ৬॥টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে মহিলাগণ কর্ত্তৃক নিশান বরণ।

৩রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী, বুধবার—অপরাহ্ণ ৪॥টায় হেদুয়া প্রান্তরে বক্তৃতা; সন্ধ্যা ৬॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে হিন্দী ভজন।

৪ঠা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ণ ৪॥টায় বিডন স্কোয়ার প্রান্তরে বক্তৃতা; সন্ধ্যা ৬॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা।

৫ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী, শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪॥টায় ওয়েলিংটন প্রান্তরে বক্তৃতা; সন্ধ্যা ৬॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে ইংরাজীতে উপাসনা।

৬ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী, শনিবার—শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক; ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭॥টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৬॥টায় স্মৃতিসভা।

৭ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৮টায় ও সন্ধ্যা ৬॥টায় উপাসনা।

৮ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী, সোমবার—৩ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে নববিধান-প্রচার-কার্য্যালয়ের উৎসব! প্রাতে ৮টায় উপাসনা; অপরাহ্ণ ৫টায় কীর্ত্তনাদি ও উপাসনা।

৯ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—শ্রীদরবারের উৎসব।

১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী, বুধবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৯টায় শান্তিকুটীরে (৮৪ আপার সার্কুলার রোড) ব্রাহ্মিকা উৎসব। সন্ধ্যা ৬॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা।

১১ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭॥টায় উপাসনা; অপরাহ্ণ ৪॥টায় আলোচনা ও সন্ধ্যা ৬॥টায় উপাসনা।

১২ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, শুক্রবার—নববিধান-ঘোষণার দিন। প্রাতে ৭॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা। সন্ধ্যা ৬॥টায় আলবার্ট হলে আলোকচিত্রযোগে বক্তৃতা।

১৩ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, শনিবার—বালকবালিকাদিগের নীতি-বিদ্যালয়ের উৎসব। প্রাতে ৮টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা। অপরাহ্ণ ৪টায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে পুরস্কার-বিতরণ ও বালকবালিকা-সম্মিলন। (প্রবেশের জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র-প্রদর্শন আবশ্যক হইবে)

১৪ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিন-ব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭॥টায় কীর্ত্তন, ৮॥টায় উপাসনা; মধ্যাহ্ন ৩টায় উপাসনা, তৎপরে পাঠ, আলোচনা, ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা; ৫॥টায় কীর্ত্তন ও সন্ধ্যা ৬॥টায় উপাসনা।

১৫ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী, সোমবার—নগরসঙ্কীর্ত্তন। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭॥টায় উপাসনা; সন্ধ্যা ৫॥টার সময় ব্রহ্মমন্দির হইতে নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হইবে।

১৬ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৯টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে আর্য্যনারী-সমাজের উৎসব। সন্ধ্যা ৬॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা।

১৭ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী, বুধবার—কমলকুটীরে কেবলমাত্র মহিলাদিগের জন্য আনন্দবাজার। সন্ধ্যা ৬॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক-মণ্ডলীর বার্ষিক সভা।

১৮ই মাঘ, ৩১শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—কমলকুটীরে কেবলমাত্র মহিলাদিগের জন্য আনন্দবাজার। সন্ধ্যার সময় শান্তিবাচন।

২১শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী, রবিবার—উদ্যান-সম্মিলন।

সকলের সপরিবারে ও সবান্ধবে যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

ভক্তির অঞ্জলি

সবিনয় নিবেদন,

মায়ের আহ্বানে তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সমাগমে যে মহোৎসব হয়, তাহাই ভক্তির পরম তীর্থ ও পবিত্র সেবার ক্ষেত্র। এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে সকলের সেবা করার মত সৌভাগ্য আর কি আছে? ভক্তি ও সেবার ভাবে যথাসাধ্য শক্তি ও অর্থদান এখানেই সম্যক সার্থক হয় এবং অনন্ত-স্নেহময়ী জননীর প্রচুর আশীর্ব্বাদও লাভ হয়। ভক্তির অঞ্জলিরূপে এই মহোৎসবের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ২৮ নং নিউরোড, আলিপুর ঠিকানায় সহকারী সম্পাদকের নামে অথবা ৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয় কুমার নন্দের নামে যিনি যাহা পাঠাইবেন, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ১লা, ১০ই, ১১ই ও ১৪ই মাঘ ব্রহ্মমন্দিরে ভিক্ষার ঝুলি ধরা হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
৮৯ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা;
২০শে ডিসেম্বর, ১৯২৮।

বিনীত—
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন।
সহকারী সম্পাদক।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক, ২রা মাঘ, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।